বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(বৈশাখ—কার্ত্তিক)

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(অগ্রহায়ণ-- চৈত্র)

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
১ নং ব্রাইট ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার্-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইকলী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

সবুজ পত্র

নববর্ষের আশীর্ব্বাদ।

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী!
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।
দূর হ'তে দূরে
বাজে পথ শীর্ণ তীব্র দীর্ঘতান সুরে,
যেন পথহারা
কোন্ বৈরাগীর একতারা।

ওরে যাত্রী,
ধূসর পথের ধূলা সেই তোর ধাত্রী;
চলার অঞ্চলে তোরে ঘূর্ণাপাকে বক্ষেতে আবরি'
ধরার বন্ধন হ'তে নিয়ে যাক্ হরি'
দিগন্তের পারে দিগন্তরে।

ঘরের মঙ্গল-শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহেরে সন্ধ্যার দীপালোক,
নহে প্রেয়সীর অশ্রু-চোখ।
পথে পথে অপেক্ষিছে কাল-বৈশাখীর আশীর্ব্বাদ,
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ় ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সেত নহে সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা,
এই তোর নব বৎসরের আশীর্ব্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ভয় নাই, ভয় নাই, যাত্রী,
ঘরছাড়া দিক্‌হারা অলক্ষ্মী তোমার বরদাত্রী

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
এসেছে নিষ্ঠুর,
হোক্‌রে দ্বারের বন্ধ দূর,
হোক্‌রে মদের পাত্র চূর!
নাই বুঝি, নাই চিনি, নাই তারে জানি,
ধরো তার পাণি;—
ধ্বনিয়া উঠুক তব হৃৎকম্পনে তার দীপ্ত বাণী!
ওরে যাত্রী
গেছে কেটে, যাক্ কেটে পুরাতন রাত্রি।

কলিকাতা
৯ই বৈশাখ ১৩২৩।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র।

শ্রীমান প্রমথ নাথ চৌধুরী

কল্যাণীয়েষু—

সবুজ পত্রের আসরে যখন তোমরা আমাকে প্রথম ডাক দিলে, তখন সাড়া দিতে আমি বেশী বিলম্ব করিনি। তার একটি কারণ এই যে, আমি জানতুম প্রবেশের পথও যেমন খোলা, প্রস্থানের পথও তেমনি। অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর মার খাওয়া আমার অভ্যাস আছে, কিন্তু একটা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মেলে না, সেটি হচ্চে এই যে, আমি ব্যূহে প্রবেশ করি সহজে, আবার ব্যূহ থেকে সহজে বের হবার মন্ত্রও জানি। সাময়িক পত্রের সঙ্গে অনেক বার আমার সম্বন্ধ ঘটেচে, কিন্তু যাতে সেটা সাময়িক হয় সে বিষয়ে কখনো অসতর্ক হইনি।

একটা কাগজ যখন বের করা হয়, তখন তার উৎপত্তি হয় আনন্দে—তারপরে যখন তাকে স্থায়ী করবার চেষ্টা করা হয়, তখন সেটা হয় অহঙ্কারে। যেন কিছু দিন বাদে কাগজ লোপ হয়ে যাবারি মধ্যে একটা লজ্জা আছে।

কিন্তু জগতে প্রাণমাত্রেরই আয়ু আছে। সে চলে যেতে পারে, এইটেই প্রাণের গৌরব,—সে গোরের উপরকার পাথরটার মত অচল নয়।

সবুজপত্র কখনই চিরদিন থাকবার চেষ্টামাত্রও করবে না, এই ভরসা আমার মনের মধ্যে ছিল। এই জন্যে সবুজপত্র চালাবার কাজে তোমা-

দের সহযোগিতায় যখন আমাকে ডাক্‌লে, তখন আমি ভাবলুম এ জিনিসটি যদি প্রাণবান হয় তাহ'লে প্রাণের বেগে এ আপনিই চল্‌বে। যে গাড়ীতে ঘোড়া আছে সে গাড়ী চালাবার সুবিধা এই যে, যেমন সারথী ঘোড়াকে চালায় তেমনি ঘোড়াও সারথীকে চালায়। তাই এই চালানোতে আনন্দ আছে। কিন্তু কালক্রমে ঘোড়াটা যখন মরে তখনো যদি গাড়ী চালাতে হয় তবে তখন গাড়ীটা হয় বোঝা, সে আর সারথীকে বহন করে না।

সবুজপত্রের রথটিকেও প্রাণের ঘোড়া যতক্ষণ টান্‌বে ততক্ষণ তাকে চালাবো, এই মনের আনন্দেই তোমাদের সঙ্গে এসে জুটেছিলুম।

খবরের কাগজ থেকে আরম্ভ করে ধর্ম্মসমাজ পর্য্যন্ত অনেক জিনিস সংসারে আছে, যাকে মরার পরেও টেনে বেড়ান হচ্চে। মানুষের অনেক পরিমাণ শক্তিই এই কাজে আট্‌কা পড়ে' রয়েচে। যথাসময়ে অন্ত্যেষ্টিসৎকার কর্‌তে পার্‌চে না বলে' মানুষের কাঁধের উপর থেকে মৃতদেহ নাম্‌চে না। প্রকৃতির ব্যবস্থা এম্‌নি চমৎকার যে, মরে' গেলে সে কথা গোপন কর্‌বার আর কোনো উপায় থাকে না, পঞ্চভূত অবিলম্বে এসে আপন পাওনা আদায় করে, হিসেব নিঃশেষে চুকিয়ে নেয়।

কিন্তু মানুষের নিজের সৃষ্টিতে মানুষ ফাঁকি দিয়ে মৃত্যুকে চাপা দিয়ে রাখ্‌তে চায়। মানুষের রচনার প্রাণ যখন যায়, তখন তার আসবাব আরো বেড়ে ওঠে। এম্‌নি করে' মমতায় এবং অহঙ্কারে সমাজে মৃত্যুকে আমরা প্রাণের বেশ পরিয়ে কোলে পিঠে করে' নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি,—তা'তে মৃত্যুকে আমরা প্রাণ দিতে পারিনে, প্রাণকেই মৃত্যু দিয়ে থাকি।

সবুজ পত্রকে মৃত সভায় ধ্রুব করে' বসিয়ে রাখা হবে না, এই কথা

মনে স্থির ছিল। শাস্ত্রের সেই উপদেশটি মনে ছিল যে, মৃত্যুর পরে দেহটাকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রের মত মাটীতে ফেলে বিমুখা বান্ধবা যান্তি। কেবলমাত্র ধর্ম্মস্তমনুগচ্ছতি। সবুজপত্রেরও যেটুকু নিত্য পদার্থ, যেটুকু তার ধর্ম্মসঞ্চয়, সেটুকু থেকে যাবে।

মৃত্যুর পরেও টেনে রাখবার চেষ্টা করলে, সেই নিত্যকেই প্রতি-মুহূর্ত্তে ক্লিষ্ট করা হয়, বিনাশের সঙ্গী হয়ে ধর্ম্মও বিনাশ প্রাপ্ত হ'তে থাকে। নাম করতে চাইনে, কিন্তু সমাজে পলিটিক্সে আর্টে ধর্ম্মে, কত শত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে, আমরা এর দৃষ্টান্ত কি চারদিকে দেখ্‌তে পাই নে? হিন্দুকে হিঁদু, ব্রাহ্মণকে বামুন, বৈষ্ণবকে বোষ্টম হ'তে যখন দেখি, তখন বুঝতে পারি ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার উপায় মৃত্যুকে মৃত্যু বলে'ই গ্রহণ করা।

গোড়ায় গণনা করেছিলুম সবুজপত্রের আয়ু বছর দুয়েক। এখন দেখচি কুষ্ঠির গণনাকে ও ছাড়িয়ে যাবে। তাই কেবলমাত্র ধর্ম্মের উপর ওর ভার দিয়ে আজও বান্ধবদের ফিরে যাবার সময় হয় নি। এ কথা কেন বলি, সে আর একটু খোলসা করা যাক্।

যদি দেখা যেত সবুজপত্রের সম্বন্ধে পাঠকেরা একেবারে উদাসীন, তাহলে বোঝা যেত দেশের মনের উপর ওর কোনো প্রাণের ক্রিয়া নেই। যদি দেখতুম সবুজপত্র পাঠকদের কাছ থেকে প্রভূত সম্মান সমাদর পাচ্চে, তাহলেও বুঝতুম ওর প্রাণের ক্রিয়া একটা পরিণতিতে এসে সমাপ্ত হয়েচে।

কিন্তু দেখতে পাচ্চি সবুজপত্র আজও কেবল ঘা দিচ্চে, ঘা পাচ্চে। সেইটেই প্রমাণ, যে, ওর কাজ শেষ হয় নি। যেখানে যা পড়ে' আছে তা' আরামে পড়ে' থাক্‌তে পারে, যদি তার মধ্যে সজীব

প্রাণী এসে না প্রবেশ করে। যে নড়চে সে অনড়কে নড়ায়, তাই নিয়ে যতক্ষণ নালিশ এবং অভিশাপ চল্‌তে থাকে ততক্ষণ সেই সচলের ছুটি নেই; নিন্দার বরমাল্য যতক্ষণ না শুকিয়ে ঝরে যায় ততক্ষণ আসর ছেড়ে তার ওঠ্‌বার হুকুম নেই।

একমাত্র রাষ্ট্রতন্ত্রে আমরা স্বাধীন হ'তে চেষ্টা করব, তা' ছাড়া আর সব জায়গায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে শিক্ষায় দীক্ষায়, আমরা সমস্তকে চোখ বুজে মেনে বসে থাকব,—এই স্থাবর ভাবটা আমাদের দেশের কাঁধের উপর চেপে বসেচে। এমন কি, যুবকেরা পর্য্যন্ত স্থবির হয়ে উঠেচে। তারা মনে করেচে, যা' কিছু আছে তাকে মেনে চলাটাই দেশ-ভক্তি। এ কথা একেবারে ভুলে গেছে যে, দেশ যুবকের কাছ থেকে তার যৌবনের দানই চেয়েচে। নতুন করে ভাব্‌ব, বুঝ্‌ব, প্রশ্ন করব, সন্দেহ করব, নেড়ে চেড়ে উল্‌টে পাল্‌টে দেখব; কেবলমাত্র শাস্ত্রের পরে নয়, মনুষ্যত্বের পরে শ্রদ্ধা রাখব, চিন্তা ও চেষ্টার সকল বিভাগেই দুঃসাহসের জয়পতাকা সগর্ব্বে তুলে ধরে দুর্গম পথে যাত্রা করব, দেশের কোথাও কিছুকে বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে দেব না, যৌবনের চাঞ্চল্যে সমস্তকে নাড়া দিয়ে প্রাণশক্তিকে সকল দিকেই তরঙ্গিত মুখরিত করে' তুলব—দেশের যুবকের কাছ থেকে দেশ যে সেই অস্থির প্রাণ, সেই অস্থির বুদ্ধির অর্ঘ্যই চেয়েছিল। যা' সনাতন এবং যা' চরম, তার ভার যে নিতে চায় নিক্, কিন্তু দেশের আবালবৃদ্ধ সকলে মিলে তাকেই অহোরাত্র কোলে কোলে দোলা দিয়ে বেড়াবে—যেন সে শিশু, যেন তার নিজের কোনো জোর নেই—এ হ'লে সত্যের প্রতি দুর্ব্বলের মত ব্যবহার করে' সমস্ত দেশ দুর্ব্বল হয়ে যাবে। যা' নূতন, যা চঞ্চল, যা' ক্রমশ ব্যক্ত হ'তে থাকে, যাকে সংশোধন করতে করতে পরিবর্ত্তন

করতে করতে নিজের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি করে' তুল্‌তে হবে—তাকে, বুড়োদের নকল করে' আজকের দিনের যুবকেরাও ব্যঙ্গ করতে শিখেছে, এতেই আমাদের দেশ তার মর্ম্মে আঘাত পাচ্চে। এই জন্যেই সৃষ্টিকর্ত্তার কাছ থেকে কেউ সৃষ্টি করবার বর চাচ্চে না, সকলেই কেবলি আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি করতে করতে ভালো ছেলের মত সামাজিক এগ্‌জামিনে ছাত্রবৃত্তি পাবার চেষ্টা কর্‌চে। কিন্তু আমাদের বৃত্তিটা কি কেবলি ছাত্রবৃত্তি? কেবলি নোট নেওয়া, কেবলি পুঁথির বুলিকে বাক্যে ও ব্যবহারে অবিকল আউড়ে যাওয়া? কেবলি প্রাচীন গুরুমশায়ের শাসনকে নবীনের মাথার উপর বহন করা?

আমাদের দেশটা যেন কোন্ এক কুলীন ঘরের মেয়ে। থাকবার মধ্যে তার বৃদ্ধ পিতা আছে—তার বয়স দশ পনেরো হাজার বছর হবে। তার কুলের গৌরব অতীতে প্রতিষ্ঠিত,—কিন্তু তার ভবিষ্যৎটা ফাঁকা। কেন না, যে যুবক পতিকে সে মনে মনে কামনা করে তাকে আজও পেলে না। যার সঙ্গে তার বিবাহ হ'ল, তার রাঙা চেলি-পরা যুবক বরের বেশটা বটে, কিন্তু কপালগুণে সেও বাহাত্তুরে ধরা; তার নড়বার শক্তি নেই বল্লেই হয়,—চিবিয়ে খাবার জিনিসে তার অরুচি, চোখে দেখে চল্‌তে সে পারে না, তার জন্যে পথ বলে জিনিসটাই নেই, আছে ঘরের চণ্ডীমণ্ডপ। যে দেশের পিতাও বৃদ্ধ পতিও বৃদ্ধ, যার আছে কেবল কুলের গৌরব—সেখানে যৌবন ব্যর্থ হল। সেখানে ফুলের ঋতু রইল না বলে' ফলের ঋতুটাও বাদ পড়ল।

অবস্থাটা যখন এমনিই দাঁড়িয়েচে, যৌবন যখন নিজেকে স্থবিরতার বাহন করে তুল্‌তে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা দুঃখ বোধ করচে না, বুদ্ধিতে এবং আচরণে একান্ত পরবশতা চর্চ্চা করাই যখন দেশগৌরবের

সাধনা বলে' সকলে মনে করেচে ; সবুজপত্র সেই দুঃসময়ে পাঠকদের কাছ থেকে বিদ্বেষের অভ্যর্থনা লাভ করেচে,—এই তার সত্য অভ্যর্থনা। জড়ত্বের প্রথম জাগরণ এই বিরোধে বিদ্বেষে। সেই বিদ্বেষের তীব্রতা যতক্ষণ পর্য্যন্ত থাক্‌বে ততক্ষণ বোঝা যাবে সবুজপত্রের যাবার সময় হয় নি। অতএব অপমানের পথে দুর্য্যোগের মধ্য দিয়ে সবুজ পত্রকে চালনা করে' তুমি অগ্রসর হ'তে থাক ;—যতদিন চারদিক থেকে বাণ এসে পড়তে থাক্‌বে ততদিন তুমি রথের পুরোভাগে থেকে নির্ভয়ে তার সারথ্য করতে থাক—তোমার প্রতি আমার এই নববৎসরের আশীর্ব্বাদ। তোমার কাগজ লোকের মনোরঞ্জন করে' লোকপ্রিয় হবে—এই জীবন্মৃতের দুর্ভাগ্য হ'তে তোমার সৃষ্টিকে বিধাতা রক্ষা করুন।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পত্র।

শ্রীযুক্ত "সবুজপত্র" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশে মাসিক পত্রের পরমায়ু গড়ে চার বৎসর।

ত্রিবেদী মহাশয় বাঙ্গলার একজন অগ্রগণ্য আয়ুর্ব্বেদী, ইংরাজিতে যাকে বলে Biologist—অতএব আয়ু সম্বন্ধে তাঁর গণনা যে নির্ভুল, এ কথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য।

এই হিসেবে "সবুজপত্রের" জীবনের মেয়াদ আরও দু'বৎসর আছে। এ স্থলে বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করা অকর্ত্তব্য মনে করে'ই সম্ভবতঃ আপনারা "সবুজপত্রের" পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। এ পত্র যে, দু'বৎসরের কপ্পাড়ে বার করা হয়, সে বিষয়ে আমি সাক্ষি দিতে পারি। কেননা যে ক্ষেত্রে সবুজপত্র প্রকাশ কর্‌বার ষড়যন্ত্র করা হয়—মনে রাখবেন হাল আইনে দুজনেও ষড়যন্ত্র হয়—সে ক্ষেত্রে আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলুম।

সবুজপত্র আর এক বৎসর সবুজ থাক্‌বে, এ সংবাদে পাঠক সমাজ খুসি হবেন কি না জানিনে, কিন্তু সমালোচক-সম্প্রদায় যে হবেন না, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই, কেন না এঁরা ও-পত্রের রঙ কিম্বা রস, দুয়ের কোনটিই পছন্দ করেন না। এঁদের মতে "সবুজপত্র" সাহিত্যের তেজপত্র, যতক্ষণ না তার রঙ ও রস দুই লোপ পায়, অর্থাৎ যতক্ষণ না তা শুকিয়ে যায়,—ততক্ষণ তা' বাঙ্গালী পুরুষের মুখরোচকও হবে না, বঙ্গরমণীর গৃহস্থালির কাজেও লাগবে না। সবুজপত্র তেজপত্র কি না

জানিনে—কিন্তু তা' যে নিস্তেজ পত্র নয়, তার প্রমাণ উত্তেজিত সমালোচনায় নিত্যই পাওয়া যায়।

এ ক্ষেত্রে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, সবুজপত্রের বেঁচে থাক্‌বার কিম্বা ও—পত্রকে বাঁচিয়ে রাখবার আবশ্যকতাই বা কি, আর সার্থকতাই বা কোথায়—তাহলে তার কোনও উত্তর দেবেন না। কেননা ও প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই।

এ পৃথিবীতে বাঁচবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে কোনরূপ যুক্তি নেই, অপরপক্ষে মরবার এবং মারবার পক্ষে এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে যে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শাস্ত্রই মানুষকে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে শিক্ষা দেয়—যে চিন্তার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে নি, তাকে আমরা গভীরও বলিনে, উচ্চও বলিনে। এ জড়বিশ্বের অন্তরে প্রাণ জিনিষটি প্রক্ষিপ্ত। দর্শন বিজ্ঞানের পাকা খাতায় প্রাণের অঙ্কটা একেবারেই ফাজিল, সুতরাং এ অঙ্কটা বেড়ে গেলে দুনিয়ার জ্ঞানের হিসেবটা আগাগোড়া গরমিল হয়ে যাবে। অতএব যতদিন প্রাণের বিলয় না হয় ততদিন একটা প্রলয়ের সম্ভাবনা থেকে যাবে। বিশ্বের সম্বন্ধে যা' সত্য, সমাজের সম্বন্ধেও তাই সত্য—কেননা যাকে আমরা মানবসমাজ বলি, সে ত জীবজগতের একটি অংশমাত্র, এবং জীবজগৎ এই জড়জগতের একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র অঙ্গমাত্র। সুতরাং একাগ্রমনে মৃত্যুর চর্চ্চা করাতেই মানুষে তার সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। হত্যা কর্‌বার স্বপক্ষে কত হিতকর এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি আছে, তার পরিচয় বর্ত্তমান জর্ম্মানীর সামরিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সে দেশে যদি কেউ বলেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, তাহলে তাঁর কথা সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

স্বরূপে গণ্য হবে। অপর পক্ষে, এ দেশে যদি কেউ বলেন "স্বহিংসা পরম অধর্ম্ম" তাহলে তাঁর কথাও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ স্বরূপে গণ্য হবে।

বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেহের মত আমাদের মনের মধ্যেও প্রাণ আছে। কারণ দেহমন একই সত্তার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। সৃষ্টিকে যদি কেউ উল্টে ফেল্‌তে পারেন তাহলে দেখতে পাবেন যে,—তখন মন হবে বহির্জ্জগৎ, আর দেহ হবে অন্তর্জ্জগৎ। বিশ্বটাকে উল্টো করে পড়্‌বার চেষ্টা যে অতিবুদ্ধিমান লোকে নিত্যই করে' থাকে, তার প্রমাণ দেশী ও বিদেশী দর্শনে নিত্যই পাওয়া যায়। সে যাই হোক্ প্রাণ যে মানুষের অন্তরে আছে শুধু তাই নয়,—ও বস্তু অন্য কোথায় ও নেই ; বাহিরে যা আছে সে শুধু প্রাণের লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। যে বস্তুর প্রাণ আছে তা মৃত্যুর অধীন। সুতরাং মনোজগতেও আমরা হত্যা এবং আত্মহত্যা দুই করতে পারি এবং করে'ও থাকি। মনোজগতে মারবার যন্ত্র ও কথা, আর বাঁচাবার মন্ত্রও কথা। দেশকালপাত্রভেদে কেউ বা কথার রূপোর কাঠি, কেউ বা তার সোনার কাঠি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ রাজ্যেও জীবনের স্বপক্ষে কিছু বলবার নেই, কারণ এখানেও যত সুযুক্তি সব মরণকে বরণ করেছে। সত্য কথা বল্‌তে গেলে, প্রাণের বিরুদ্ধে মানুষের ঢের নালিশ আছে। প্রথমতঃ, প্রাণের ধর্ম্মই হচ্চে জগতের শান্তি ভঙ্গ করা। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চভূতের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করে' এ পৃথিবীতে গাছপালা ফুলফল জীবজন্তু প্রভৃতি যা' কিছু সৃষ্টি করেছে, সে সবই পরিবর্ত্তনশীল, প্রতি মুহূর্ত্তেই সে সকলের ভিতর-বার দুয়েরি কিছু-না-কিছু বদল হচ্চে। যার ভিতর স্থিতি নেই তার ভিতর উন্নতি থাক্‌তে পারে, কিন্তু শান্তি নেই। দ্বিতীয়তঃ, এ পৃথিবীতে প্রাণ যে শুধু

প্রক্ষিপ্ত তাই নয়, তা' ঈষৎ ক্ষিপ্তও বটে। জড়বস্তু যে-ভাবে জড়জগতের নিয়ম মেনে চলে, প্রাণ প্রাণীর হাতে-গড়া বাগ সে-ভাবে মানে না। প্রাণ নিত্য নূতন আকারে দেখা দেয়, প্রাণের প্রতি মূর্ত্তির ভিতর কিছু-না-কিছু বিশেষত্ব আছে—পৃথিবীতে এমন ছুটি পাতা নেই যা' এক ছাঁচে ঢালা। ব্যক্তিত্বেই প্রাণী-জগতের পরিচয়। তারপর, প্রাণ যত পরিপুষ্ট হয় তত তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্চে প্রাণকে নষ্ট করা। প্রাণ এতই অবাধ্য ও বেয়াড়া যে, মানুষকে ও-বস্তু নিয়ে দিবারাত্র জ্বালাতন হতে হয়। আসলে ও-বস্তু হচ্চে জড়জগতের বুকের ভিতরকার জ্বালা, যেমন আলো ওর বাইরের জ্বালা। এরূপ হবারও কারণ আছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Lord Kelvin আবিষ্কার করেছেন যে, আদিতে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না, কোন অজানা অতীতের কোন এক অশুভ মুহূর্ত্তে কোন অজানা অতি-পৃথিবী থেকে প্রাণ শূন্যপথে, উল্কাযোগে, মর্ত্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়। প্রাণের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই জড়পৃথিবীর গায়ে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সে আগুণ দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, এবং নানা বস্তুর ভিতর দিয়ে নানা আকারে নানা বর্ণে নানা ভঙ্গিতে জ্বলে উঠেছে। জড়জগৎ এ-আগুন নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে'ও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে পারছে না।

আমাদের মনোজগতে প্রাণ যে কোথা থেকে এল, সে সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নি। অনেকের ধারণা, এদেশে ও-বস্তু বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বেও এদেশে যে প্রাণ ছিল তার প্রমাণ আছে। আমার বিশ্বাস কোনও অতি-মনোজগৎ থেকে কোনও মানসী উল্কার স্কন্ধে ভর করে, প্রাণ মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ

করেছে। যাঁর মনের ভিতর কখনও নূতন প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, তিনিই জানেন যে সে প্রাণ উল্কার মত আসে, অর্থাৎ হঠাৎ এসে পড়ে, আর তার দীপ্ত আলোকে সমস্ত মনটাকে উদ্দীপ্ত উত্তপ্ত করে' তোলে। গেটে বলেছেন যে, মানুষের মনে নূতন ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গেই নূতন জীবন জন্মলাভ করে। আর ভালবাসা যে উল্কার মত আমাদের মনের উপর এসে পড়ে, এ সত্য সকলেই জানেন। সুতরাং একটা আকস্মিক উপদ্রবের মত প্রাণের আবর্ভাব হয়। এ বিষয়ে হৃদয় ও মস্তিষ্ক সমধর্ম্মী। এ জগতে আমরা যাকে সত্য বলি, তাও কোনও অজানা দেশ থেকে অকস্মাৎ এসে সমগ্র অন্তর্লোককে আলোকিত করে, আবির্ভূত হয়। খড়ি পেতে গণনা করে' অদ্যাবধি কোনও দার্শনিক কিম্বা বৈজ্ঞানিক কোন সত্যই আবিষ্কার করতে পারেন নি। এবং যে সত্যের ভিতর প্রাণের আগুণ আছে, তা' মিথ্যাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খায়। সুতরাং একের আবিষ্কৃত সত্যের জ্বালা বহুলোককে সহ্য করতে হয়। এবং মানবমনের যে অংশ জড়, সে অংশ মনের এই প্রক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত ও দীপ্ত আগুনকে নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে'ও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হতে পারে নি।

মানুষের ভিতরে বাইরে জড়ের ও প্রাণের অহর্নিশি যে দ্বন্দ্ব চলছে, সে দ্বন্দ্বের তিলমাত্র বিরাম নেই, ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এ যুদ্ধের শেষ ফল কি দাঁড়াবে, বিশ্বের শেষ কথা মৃত্যু কি অমৃতত্ব, সে কথা যাঁর বিশ্ব তিনিই জানেন,—তুমিও জান না, আমিও জানিনে। তবে প্রাণের কথা হচ্চে এই যে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আর তার হতাশ হয়ে মাঝপথে শুয়ে পড়বার আজও কোন কারণ ঘটে নি। কেননা ক্ষীণ নবীন তৃণাঙ্কুর আজও পৃথিবীর প্রাচীন কঠিন বুক ফুঁড়ে সবুজ হয়ে

উঠছে। প্রাণের শক্তি এতই অদম্য যে, একদেশে তাকে মাটি চাপা দিলে আর এক দেশে তা' ঠেলে ওঠে, এক যুগে তাকে নিবিয়ে দিলে আর এক যুগে তা জ্বলে ওঠে।

মনোজগতের এই জীবন মরণের লড়াইয়ের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নামই সাহিত্য। এ ক্ষেত্রে কে কোনদিক নেবেন, তা তাঁর কোন পক্ষের উপর আস্থা বেশি তার উপর নির্ভর করে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি যে, বাঁচবার আবশ্যকতা কি, এবং বাঁচবার সার্থকতা কোথায়, তা কেউ বল্‌তে পারেন না। তবে যার প্রাণ আছে, ত'র পক্ষে সেই প্রাণ রক্ষা কর্‌বার প্রবৃত্তি এতই স্বাভাবক যে, হাজারে নশ' নিরনব্বইটি প্রাণী, বিনা কারণে প্রাণপণে প্রাণ ধারণ কর্‌তে চায়। প্রাণীমাত্রেরই প্রাণের প্রতি এই অহেতুকী প্রীতিই তার স্থায়িত্বের কারণ। যার এককালে প্রাণ ছিল তা যে একালে মরে'ও মরে না, তার পরিচয় লাভ কর্‌বার জন্য আমাদের দেশান্তরে যেতে হয় না।

সুতরাং সবুজপত্র যে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে স্থিরসংকল্প হয়েছে, তার জন্য কোনও প্রাণীর নিকট আপনার কোনরূপ জবাবদিহি নেই।

বেঁচে থাকবার স্বপক্ষে কোনরূপ যুক্তি না থাক্‌লেও, তার পিছনে প্রকৃতি আছে। কিন্তু বাঁচাবার পক্ষে যুক্তিও নেই প্রকৃতিও নেই।

আমরা যাকে বলি প্রাণধারণ করা, বৈজ্ঞানিকরা তাকে বলেন জীবন-সংগ্রাম। তাঁদের মতে প্রাণের প্রধান শত্রু প্রাণী। একের পক্ষে বাঁচতে হলে অপরকে মারা দরকার। সুতরাং অপরকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টাটি পাগলামি মাত্র। আপনি যদি এ মতে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি কোনও জিনিষকে বাঁচিয়ে তোলবার কথা মুখে আনবেন না,

নইলে সবুজপত্রের কপালে অপমৃত্যু এবং অকালমৃত্যু একই সঙ্গে দুই ঘটতে পারে।

ইহলোক যে একটা যুদ্ধক্ষেত্র এ কথা আমিও মানি, কিন্তু আমার মতে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের কোনও ঝগড়া নেই। সংগ্রামটা হচ্চে আসলে জীবনের সঙ্গে মরণের। সুতরাং নির্ব্বিবাদে বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় হচ্চে ও-দুয়ের মধ্যে একটা আপোষে মীমাংসা করে নেওয়া। অতএব সবুজপত্রকে যদি জীবন্মৃত করতে পারেন, তাহলে তার পরমায়ু অখণ্ড হবে। আধমরা সরস্বতীই যে লক্ষ্মী, এ কথা ত এ দেশে সর্ব্ববাদীসম্মত। ও পত্রকে নির্জীব করবার জন্য কোনরূপ আয়াস করতে হবেনা,—সে আপনিই হবে। কেননা যাঁর স্পর্শে সবুজ পত্র সরস ও সজীব হয়ে উঠেছিল সেই রবীন্দ্রনাথ জাপানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন।

বীরবল।

চার-ইয়ারী-কথা।

সোমনাথ এতক্ষণ, যেমন তাঁর অভ্যাস, একটির পর আর একটি সিগারেট অনবরত খেয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের সুমুখে ধোঁয়ার একটি ছোটখাটো মেঘ জমে গিয়েছিল। তিনি একদৃষ্টে সেইদিকে চেয়ে-ছিলেন,—এমন ভাবে, যেন সেই ধোঁয়ার ভিতর তিনি কোন নূতন তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। পূর্ব্ব পরিচয়ে আমাদের জানা ছিল যে, সোমনাথকে যখন সবচেয়ে অন্যমনস্ক দেখায়, ঠিক তখনি তাঁর মন সব চেয়ে সজাগ ও সতর্ক থাকে, সে সময়ে একটি কথাও তাঁর কাণ এড়িয়ে যায় না, একটি জিনিষও তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় না। সোমনাথের চাঁচাছোলা মুখটি ছিল ঘড়ির dialএর মত, অর্থাৎ তার ভিতরকার কলটি যখন পূরোদমে চল্‌ছে তখন সে মুখের তিলমাত্র বদল হ'ত না, তার একটি রেখাও বিকৃত হ'ত না। তাঁর এই আত্মসংযমের ভিতর অবশ্য আর্ট ছিল। সীতেশ তাঁর কথা শেষ কর্‌তে না কর্‌তেই সোমনাথ ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত কর্‌লেন। আমরা বুঝলুম সোমনাথ তাঁর মনের ধনুকে ছিলে চড়ালেন, এইবার শরবর্ষণ আরম্ভ হবে। আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হল না। তিনি ডান হাতের সিগারেট বাঁ হাতে বদলি করে' দিয়ে, অতি মোলায়েম অথচ অতি দানাদার গলায় তাঁর কথা আরম্ভ করলেন। লোকে যেমন করে' গানের গলা তৈরি করে, সোমনাথ তেমনি করে' কথার গলা তৈরি করেছিলেন, সে কণ্ঠস্বরে কর্কশতা কিম্বা জড়তার লেশমাত্র ছিল না। তাঁর উচ্চারণ এত পরিষ্কার যে, তাঁর মুখের কথার প্রতি অক্ষর গুণে নেওয়া যেত। আমাদের এ বন্ধুটি সহজ

মানুষের মত সহজভাবে কথাবার্ত্তা কইবার অভ্যাস অতি অল্প বয়সেই ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর গোঁফ না উঠতেই চুল পেকেছিল। তিনি সময় বুঝে মিতভাষী বা বহুভাষী হতেন। তাঁর অল্প কথা তিনি বল্‌তেন শানিয়ে, আর বেশি কথা সাজিয়ে। সোমনাথের ভাবগতিক দেখে আমরা একটি লম্বা বক্তৃতা শোনবার জন্য প্রস্তুত হলুম। অমনি আমাদের চোখ সোমনাথের মুখ থেকে নেমে তাঁর হাতের উপর গিয়ে পড়্‌ল। আমরা জানতুম যে তিনি তাঁর আঙ্গুল ক'টিকেও তাঁর কথার সঙ্গৎ করতে শিখিয়েছিলেন।

সোমনাথের কথা।

তোমরা আমাকে বরাবর ফিলজফার বলে' ঠাট্টা করে' এয়েছ, আমিও অদ্যাবধি সে অপবাদ বিনা আপত্তিতে মাথা পেতে নিয়েছি। রমণী যদি কবিত্বের একমাত্র আধার হয়, আর যে কবি নয় সেই যদি ফিলজফার হয়, তাহলে আমি অবশ্য ফিলজফার হয়েই জন্মগ্রহণ করি। কি কৈশোরে, কি যৌবনে, স্ত্রীজাতির প্রতি আমার মনের কোনরূপ টান ছিল না। ও জাতি আমার মন কিম্বা ইন্দ্রিয় কোনটিই স্পর্শ করতে পারত না। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন নরমও হ'ত না, শক্তও হ'ত না। আমি ও-জাতীয় জীবদের ভালও বাসতুম না, ভয়ও করতুম না,—এক কথায়, ওদের সম্বন্ধে আমি স্বভাবতই সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলুম। আমার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবান আমাকে পৃথিবীতে আর যে কাজের জন্যই পাঠান, নায়িকা সাধন করবার জন্য পাঠান নি। কিন্তু নারীর প্রভাব যে, সাধারণ লোকের মনের উপর কত বেশি, কত বিস্তৃত, আর কত স্থায়ী, সে বিষয়ে আমার চোখ কাণ দুই সমান খোলা ছিল। দুনিয়ার লোকের এই স্ত্রীলোকের পিছনে পিছনে ছোটাটা আমার কাছে যেমন লজ্জাকর মনে হ'ত, দুনিয়ার কাব্যের নারীপূজাটাও আমার কাছে তেমনি হাস্যকর মনে হ'ত। যে প্রবৃত্তি পশুপক্ষী গাছপালা ইত্যাদি প্রাণী মাত্রেরই আছে, সেই

প্রবৃত্তিটিকে যদি কবিরা সুরে জড়িয়ে, উপমায় সাজিয়ে, ছন্দে নাচিয়ে, তার মোহিনী শক্তিকে এত বাড়িয়ে না তুলতেন, তাহলে মানুষে তার এত দাস হয়ে পড়ত না। নিজের হাতেগড়া দেবতার পায়ে মানুষে যখন মাথা ঠেকায়, তখন অভক্ত দর্শকের হাসিও পায়, কান্নাও পায়। এই eternal feminineএর উপাসনাই ত মানুষের জীবনকে একটা tragi-comedy করে' তুলেছে। একটি বর্ণচোরা দৈহিক প্রবৃত্তিই যে পুরুষের নারীপূজার মূল, এ কথা অবশ্য তোমরা কখনও স্বীকার করনি। তোমাদের মতে, যে জ্ঞান পশুপক্ষী গাছপালার ভিতর নেই, শুধু মানুষের মনে আছে,—অর্থাৎ সৌন্দর্য্যজ্ঞান,—তাই হচ্ছে এ পূজার যথার্থ মূল। এবং জ্ঞান জিনিষটে অবশ্য মনের ধর্ম্ম, শরীরের নয়। এ বিষয়ে আমি তোমাদের সঙ্গে কখনও একমত হতে পারিনি, তার কারণ রূপ সম্বন্ধে হয় আমি অন্ধ ছিলুম, নয় তোমরা অন্ধ ছিলে।

আমার ধারণা, প্রকৃতির হাতে-গড়া, কি জড় কি প্রাণী, কোন পদার্থেরই যথার্থ রূপ নেই। প্রকৃতি যে কত বড় কারিগর, তাঁর সৃষ্ট এই ব্রহ্মাণ্ড থেকেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সূর্য্য চন্দ্র পৃথিবী, এমন কি উল্কা পর্য্যন্ত, সব এক ছাঁচে ঢালা, সব গোলাকার,—তাও আবার পুরোপুরি গোল নয়, সবই ঈষৎ তেড়া-বাঁকা, এখানে ওখানে চাপা ও চেপ্টা। এ পৃথিবীতে যা-কিছু সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তা মানুষের হাতেই গড়ে' উঠেছে। Athensএর Parthenon থেকে আগ্রার তাজমহল পর্য্যন্ত এই সত্যেরই পরিচয় দেয়। কবিরা বলে' থাকেন যে, বিধাতা তাঁদের প্রিয়াদের নির্জ্জনে বসে' নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু বিধাতাকর্ত্তৃক এই নির্জ্জনে-নির্ম্মিত কোন প্রিয়াই রূপে গ্রীকশিল্পীর বাটালিতে কাটা পাষাণ-মূর্ত্তির সুমুখে দাঁড়াতে পারে না। তোমাদের চাইতে আমার রূপজ্ঞান ঢের বেশি ছিল বলে' কোনও মর্ত্ত্য নারীর রূপ দেখে আমার অন্তরে কখনও হৃদ্‌রোগ জন্মায় নি। এ-স্বভাব এ-বুদ্ধি নিয়েও আমি জীবনের পথে eternal feminineকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারি নি। আমি তাঁকে খুঁজি নি,—একেও নয়, অনেকেও নয়—কিন্তু তিনি আমাকে খুঁজে বার করেছিলেন। তাঁর হাতে

আমার এই শিক্ষা হয়েছে যে, স্ত্রীপুরুষের এই ভালবাসার পুরো অর্থ মানুষের দেহের ভিতরও পাওয়া যায় না, মনের ভিতরও পাওয়া যায় না। কেননা ওর মূলে যা আছে তা হচ্ছে একটি বিরাট রহস্য,—ও-শব্দের সংস্কৃত অর্থেও বটে, বাঙ্গলা অর্থেও বটে—অর্থাৎ ভালবাসা হচ্ছে both a mystery and a joke.

একবার লণ্ডনে আমি মাসখানেক ধরে' ভয়ানক অনিদ্রায় ভুগছিলুম। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন Ilfracombe যেতে। শুনলুম ইংলণ্ডের পশ্চিম সমুদ্রের হাওয়া লোকের চোখে-মুখে হাতবুলিয়ে দেয়, চুলের ভিতর বিলিকেটে দেয়; সে হাওয়ার স্পর্শে জেগে থাকাই কঠিন—ঘুমিয়ে পড়া সহজ। আমি সেই দিনই Ilfracombe যাত্রা করলুম। এই যাত্রাই আমাকে জীবনের একটি অজানা দেশে পৌঁছে দিলে।

আমি যে হোটেলে গিয়ে উঠি, সেটি Ilfracombeএর সব চাইতে বড়, সব চাইতে সৌখীন হোটেল। সাহেব মেমের ভিড়ে সেখানে নড়বার জায়গা ছিল না, পা বাড়ালেই কারও না কারও পা মাড়িয়ে দিতে হ'ত। এ অবস্থায় আমি দিনটে বাইরেই কাটাতুম,—তাতে আমার কোন দুঃখ ছিল না, কেননা তখন বসন্তকাল। প্রাণের স্পর্শে জড়জগৎ যেন হটাৎ শিহরিত পুলকিত উদ্বেজিত হয়ে উঠেছিল। এই সঞ্জীবিত সন্দীপিত প্রকৃতির ঐশ্বর্য্যের ও সৌন্দর্য্যের কোন সীমা ছিল না। মাথার উপরে সোণার আকাশ, পায়ের নীচে সবুজ মখ্‌মলের গালিচা, চোখের সুমুখে হীরেকষের সমুদ্র, আর ডাইনে বাঁয়ে শুধু ফুলে-ছাওয়া গাছ্‌পালা,—তার কোনটি বা সাদা, কোনটি বা লাল, কোনটি বা গোলাপী, কোনটি বা বেগুনি। বিলেতে দেখেছ বসন্তের রং, শুধু জল-স্থল-আকাশের নয়, বাতাসের গায়েও ধরে। প্রকৃতির রূপে অঙ্গসৌষ্ঠবের, রেখার সুষমার যে অভাব আছে, তা সে এই রঙের বাহারে পুষিয়ে নেয়। এই খোলা আকাশের মধ্যে এই রঙীন প্রকৃতির সঙ্গে আমি দুদিনেই ভাব করে' নিলুম। তার সঙ্গই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, মুহূর্ত্তের জন্য কোন মানব সঙ্গীর অভাব বোধ করিনি। তিন চার দিন বোধহয় আমি কোন মানুষের সঙ্গে একটি কথাও কইনি, কেননা

সেখানে আমি জনপ্রাণীকেও চিনতুম না, আর কারও সঙ্গে গায়ে পড়ে' আলাপ করা আমার ধাতে ছিল না।

তারপর একদিন রাত্তিরে ডিনার খেতে যাচ্ছি, এমন সময় বারেণ্ডায় কে একজন আমাকে Good-evening বলে' সম্বোধন করলে। আমি তাকিয়ে দেখি সুমুখে একটী ভদ্রমহিলা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়েস পঞ্চাশের কম নয়, তার উপর তিনি যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। সেই সঙ্গে নজরে পড়ল যে, তাঁর পরণে চক্‌চকে কালো সাটিনের পোষাক, আর আঙ্গুলে রঙ-বেরঙের নানা আকারের পাথরের আংটি। বুঝলুম যে এঁর আর যে-বস্তরই অভাব থাক, পয়সার অভাব নেই। ছোটলোকো বড়মানুষীর এমন চোখে-আঙ্গুল-দেওয়া চেহারা বিলেতে বড় একটা দেখা যায় না। তিনি দু'কথায় আমার পরিচয় নিয়ে আমাকে তাঁর সঙ্গে ডিনার খেতে অনুরোধ করলেন, আমি ভদ্রতার খাতিরে স্বীকৃত হলুম।

আমরা খানার কামরায় ঢুকে সবে টেবিলে বসেছি, এমন সময়ে একটি যুবতী গজেন্দ্রগমনে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলুম, কেননা হাতে-বহরে স্ত্রীজাতির এ-হেন নমুনা সে দেশেও অতি বিরল। মাথায় তিনি সীতেশের সমান উঁচু, শুধু বর্ণে সীতেশ যেমন শ্যাম, তিনি তেমনি শ্বেত,—সে সাদার ভিতর অন্য কোন রঙের চিহ্নও ছিল না,—না গালে, না ঠোঁটে, না চুলে, না ভুরুতে। তাঁর পরণের সাদা কাপড়ের সঙ্গে তাঁর চামড়ার কোন তফাৎ করবার যো ছিল না। এই চুণ-কাম-করা মূর্ত্তির গলায় যে একটি মোটা সোণার শিকলি-হার আর দু'হাতে তদনুরূপ chain-bracelet ছিল, আমার চোখ ঈষৎ ইতস্ততঃ করে' তার উপরে গিয়েই বসে' পড়ল। মনে হল যেন ব্রহ্ম-দেশের কোন রাজ-অন্তঃপুর থেকে একটি শ্বেত হস্তিনী তার স্বর্ণশৃঙ্খল ছিঁড়ে পালিয়ে এসেছে! আমি এই ব্যাপার দেখে এতটা ভেবড়ে গিয়েছিলুম যে, তাঁর অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে উঠতে

ভুলে গিয়ে, যেমন বসেছিলুম তেমনি বসেই রইলুম। কিন্তু বেশীক্ষণ এ ভাবে থাক্‌তে হল না। আমার নবপরিচিতা প্রৌঢ়া সঙ্গিনীটি চেয়ার ছেড়ে উঠে সেই রক্তমাংসের মনুমেণ্টের সঙ্গে এই বলে' আমার পরিচয় করে' দিলেন—

"আমার কন্যা Miss Hildesheimer"—মিষ্টার— ?

"সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়"

"মিষ্টার গ্যাঁগো—গ্যাঁগো—গ্যাঁগো"—

আমার নামের উচ্চারণ ওর চাইতে আর বেশি এগুলো না। আমি শ্রীমতীর করমর্দ্দন করে' বসে' পড়লুম। একতাল "জেলির" উপর হাত পড়লে গাটা যেমন করে' ওঠে, আমার তেমনি করতে লাগল। তারপর ম্যাডাম আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলেন, মিস্ চুপ করেই রইলেন। তাঁর কথা বন্ধ ছিল বলে' যে তাঁর মুখ বন্ধ ছিল, অবশ্য তা নয়। চর্ব্বণ চোষণ লেহন পান প্রভৃতি দন্ত ওষ্ঠ রসনা কণ্ঠ তালুর আসল কাজ সব সজোরেই চলছিল। মাছ মাংস, ফল মিষ্টান্ন, সব জিনিষেই দেখি তাঁর সমান রুচি। যে বিষয়ে আলাপ সুরু হল তাতে যোগদান করবার, আশা করি, তাঁর অধিকার ছিল না।

এই অবসরে আমি যুবতীটিকে একবার ভাল করে' দেখে নিলুম। তাঁর মত বড় চোখ ইউরোপে লাখে একটি স্ত্রীলোকের মুখে দেখা যায় না—সে চোখ যেমন বড়, তেমনি জলো, যেমন নিশ্চল, তেমনি নিস্তেজ। এ চোখ দেখলে সীতেশ ভালবাসায় পড়ে' যেত, আর সেন কবিতা লিখতে বস্‌ত। তোমাদের ভাষায় এ নয়ন বিশাল, তরল, করুণ, প্রশান্ত। তোমরা এরকম চোখে মায়া, মমতা, স্নেহ, প্রেম প্রভৃতি কত কি মনের ভাব দেখতে পাও—কিন্তু তাতে আমি যা দেখতে পাই, সে হচ্চে পোষা জানোয়ারের ভাব। গরু ছাগল ভেড়া প্রভৃতির সব ঐ জাতের চোখ,—তাতে অন্তরের দীপ্তিও নেই, প্রাণের স্ফূর্ত্তিও নেই। এর পাশে বসে' আমার সমস্ত শরীরের ভিতর যে অসোয়াস্তি করছিল, তাঁর মার কথা শুনে আমার মনের ভিতর তার চাইতেও বেশি অসোয়াস্তি করতে লাগল। জানো তিনি আমাকে কেন পাকড়াও করেছিলেন? সংস্কৃত শাস্ত্র ও বেদান্ত-

দর্শন আলোচনা করবার জন্য! আমার অপরাধের মধ্যে, আমি যে সংস্কৃত খুব কম জানি, আর বেদান্তের বে দূরে থাক্, আলেফ পর্য্যন্ত জানি নে,—এ কথা একটি ইউরোপীয় স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হয়েছিলুম। ফলে তিনি যখন আমাকে জেরা করতে সুরু করলেন, তখন আমি মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করলুম। "শ্বেতাশ্বতর" উপনিষদ্ শ্রুতি কি না, গীতার "ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ" ও বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এ দুই এক জিনিষ কি না,—এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি নিতান্তই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। এ সব বিষয়ে আমাদের পণ্ডিত-সমাজে যে বহু এবং বিষম মতভেদ আছে, আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার সেই কথাটাই বলছিলুম। আমি যে কি মুস্কিলে পড়েছি, তা আমার প্রশ্নকর্ত্রী বুঝুন আর নাই বুঝুন, আমি দেখতে পাচ্ছিলুম যে আমার পাশের টেবিলের একটি রমণী তা বিলক্ষণ বুঝছিলেন।

সে টেবিলে এই স্ত্রীলোকটি একটি জাঁদরেলি চেহারার পুরুষের সঙ্গে ডিনার খাচ্চিলেন। সে ভদ্রলোকের মুখের রঙ এত লাল যে, দেখলে মনে হয়, কে যেন তার সদ্য ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে। পুরুষটি যা বলছিলেন, সে সব কথা তার গোঁফেই আট্‌কে যাচ্ছিল, আমাদের কাণে পৌঁছচ্ছিল না। তাঁর সঙ্গিনীও তা কাণে তুলছিলেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কেন না, স্ত্রীলোকটি যদিচ আমাদের দিকে একবারও মুখ ফেরান্ নি, তবু তাঁর মুখের ভাব থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি আমাদের কথাই কাণ পেতে শুনছিলেন। যখন আমি কোন প্রশ্ন শুনে কি উত্তর দেব ভাবছি, তখন দেখি তিনি আহার বন্ধ করে' তাঁর সুমুখের প্লেটের দিকে অন্যমনস্কভাবে চেয়ে রয়েছেন,—আর যেই আমি একটু গুছিয়ে উত্তর দিচ্ছি, তখনি দেখি তাঁর চোখের কোণে একটু সকৌতুক হাসি দেখা দিচ্ছে। আসলে আমাদের এই আলোচনা শুনে তাঁর খুব মজা লাগছিল। কিন্তু আমি শুধু ভাবছিলুম এই ডিনার ভোগরূপ কর্ম্মভোগ থেকে কখন উদ্ধার পাব। অতঃপর যখন টেবিল ছেড়ে সকলেই উঠলেন, সেই সঙ্গে আমিও উঠে পালাবার চেষ্টা করছি, এমন সময়ে এই বিলাতি ব্রহ্ম-

বাদিনী গার্গী আমাকে বল্লেন—"তোমার সঙ্গে হিন্দুদর্শনের আলোচনা করে' আমি এত আনন্দ আর এত শিক্ষালাভ করেছি যে, তোমাকে আর আমি ছাড়ছি নে। জানো উপনিষদই হচ্ছে আমার মনের ঔষধ ও পথ্য।" আমি মনে মনে বল্লুম—"তোমার যে কোন ওষুধ পথ্যির দরকার আছে, তাত তোমার চেহারা দেখে মনে হয় না। সে যাই হোক, তোমার যত খুসি তুমি তত জর্ম্মাণীর ল্যাবরিটেরিতে তৈরি বেদান্তভস্ম সেবন কর, কিন্তু আমাকে যে কেন তার অনুপান যোগাতে হবে তা বুঝতে পারছিনে।" তাঁর মুখ চলতেই লাগল। তিনি বললেন—"আমি জর্ম্মণীতে Deussenএর কাছে বেদান্ত পড়েছি, কিন্তু তুমি যত পণ্ডিতের নাম জান, ও যত বিভিন্ন মতের সন্ধান জান, আমার গুরু তার সিকির সিকিও জানেন না। চল তোমার কাছ থেকে আমি এই সব অচেনা পণ্ডিত আর অজানা বইয়ের নাম লিখে নেব। বেদান্ত পড়া ত চিন্তারাজ্যের হিমালয়ে চড়া. শঙ্কর ত জ্ঞানের গৌরীশঙ্কর। সেখানে কি শান্তি, কি শৈত্য, কি শুভ্রতা, কি উচ্চতা, মনে করতে গেলেও মাথা ঘুরে যায়। হিন্দুদর্শন যে যেমন উচ্চ তেমনি বিস্তৃত, এ কথা আমি জানতুম না।"

এ কথা শুনে আমার আতঙ্ক উপস্থিত হল, কেননা শাস্ত্রে বলে মিথ্যে কথা—"শতং বদ মা লিখ"। বলা বাহুল্য যে আমি যত বইয়ের নাম করি তার একটিও নেই, আর যত পণ্ডিতের নাম করি তাঁরা সবাই সশরীরে বর্ত্তমান থাক্‌লেও তার একজনও শাস্ত্রী নন্। আমার পরিচিত যত গুরু পুরোহিত দৈবজ্ঞ কুলজ্ঞ আচার্য্য অগ্রদানী—এমন কি রাঁধুনে-বামন পর্য্যন্ত—আমার প্রসাদে সব মহামহোপাধ্যায় হয়ে উঠেছিলেন। এ অবস্থায় আমি কি করব না ভেবে পেয়ে, ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে অবস্থিতি করছি, এমন সময় পাশের টেবিল থেকে সেই স্ত্রীলোকটি উঠে এক মুখ হাসি নিয়ে আমার সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"বা! তুমি এখানে? ভাল আছ ত? অনেক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি। চল আমার সঙ্গে ড্রয়িং রুমে, তোমার সঙ্গে একরাশ কথা আছে।"

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। প্রথমেই আমার চোখে

পড়ল যে এই রমণীটির শরীরের গড়নে ও চলবার ভঙ্গীতে শীকারী-চিতার মত একটা লিক্‌লিকে ভাব আছে। ইতিমধ্যে আড় চোখে একবার দেখে নিলুম যে গার্গী এবং তাঁর কন্যা হাঁ করে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন যেন তাদের মুখের গ্রাস কে কেড়ে নিয়েছে—এত ক্ষিপ্রহস্তে যে তাঁরা মুখ বন্ধ করবারও অবসর পান নি।

ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করবামাত্র আমার এই বিপদ-তারিণী আমার দিকে ঈষৎ ঘাড় বাঁকিয়ে বল্‌লেন "ঘণ্টা খানেক ধরে' তোমার উপর যে উৎপীড়ন হচ্ছিল আমার আর তা সহ্য হল না, তাই তোমাকে ঐ জর্ম্মাণ পশু দুটির হাত থেকে উদ্ধার করে' নিয়ে এসেছি। তোমার যে কি বিপদ কেটে গেছে তা তুমি জান না। মার দর্শনের পালা শেষ হলেই মেয়ের কবিত্বের পালা আরম্ভ হত। তুমি ওই সব ন্যাকড়ার পুতুলদের চেনো না। ওই সব স্ত্রীরত্নদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন তেন প্রকারেণ পুরুষের গললগ্ন হওয়া। পুরুষ মানুষ দেখলে ওদের মুখে জল আসে, চোখে তেল আসে, বিশেষতঃ সে যদি দেখ্‌তে সুন্দর হয়।" আমি বল্লুম—"অনেক অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু তুমি শেষে যে বিপদের কথা বল্লে এ ক্ষেত্রে তার কোনও আশঙ্কা ছিলনা।"

কেন?

শুধু ও জাতি নয়, আমি সমগ্র স্ত্রীজাতির হাতের বাইরে।

তোমার বয়স কত?

চব্বিশ।

তুমি বলতে চাও যে আজ পর্য্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক তোমার চোখে পড়ে নি, "তোমার মনে ধরে নি?"

তাই।

"মিথ্যে কথা বলাটা যে তুমি একটা আর্ট করে তুলেছ তার প্রমাণ ত এতক্ষণ ধরে পেয়েছি"

"সে বিপদে পড়ে"

"তবে এই সত্যি যে একদিনের জন্যও কেউ তোমার নয়ন মন আকর্ষণ করতে পারে নি"

"হাঁ এই সত্যি। কেন না সে নয়ন সে মন একজন চিরদিনের জন্য মুগ্ধ করে রেখেছে"

সুন্দরী?

জগতে তার আর তুলনা নেই।

তোমার চোখে?

না, যার চোখ আছে তারই চোখে।

তুমি তাকে ভালবাসো?

বাসি।

সে তোমাকে ভালবাসে?

না।

কি করে জান্‌লে?

তার ভালবাসবার ক্ষমতা নেই।

কেন?

তার হৃদয় নেই।

এ সত্বেও তুমি তাকে ভালবাসো?

"এ সত্বেও নয়" এই জন্যেই আমি তাকে ভালবাসি, অন্যের ভালবাসাটা একটা উপদ্রব বিশেষ—

তার নাম ধাম জান্‌তে পারি?

অবশ্য। তার ধাম প্যারিস্ আর নাম Venus de Milo.

এই উত্তর শুনে আমার নবসখী মুহূর্তের জন্য অবাক হয়ে রইল তার পরেই হেসে বল্‌লে,

"তোমাকে কথা কইতে কে শিখিয়েছে?"

আমার মন।

এ মন কোথা থেকে পেলে ?

জন্ম থেকে।

এবং তোমার বিশ্বাস, এ মনের আর কোনও বদল হবে না।

এ বিশ্বাস ত্যাগ করবার আজ পর্য্যন্ত ত কোনও কারণ ঘটে নি।

যদি Venus de Milo বেঁচে ওঠে ?

তা হলে আমার মোহ ভেঙ্গে যাবে।

আর আমাদের কারও ভিতরটা যদি পাথর হয়ে যায় ?

এ কথা শুনে আমি তার মুখের দিকে একবার ভাল করে চেয়ে দেখলুম। আমার statue দেখা চোখ তাতে পীড়িত কিম্বা ব্যথিত হল না। আমি তার মুখ থেকে আমার চোখ তুলে নিয়ে উত্তর করলুম—

তা হলে হয়ত তার পূজা করব।

পূজা নয় দাসত্ব ?

আচ্ছা তাই।

আগে যদি জানতুম যে তুমি এত বাজেও বক্‌তে পারো তাহলে আমি তোমাকে ওদের হাত থেকে উদ্ধার করে আনতুম না। যার জীবনের কোনও জ্ঞান নেই তার দর্শন বকাই উচিত। এখন এসো মুখবন্ধ করে, আমার সঙ্গে লক্ষ্মী ছেলেটির মত বসে দাবা খেলো।

এ প্রস্তাব শুনে আমি একটু ইতস্ততঃ করছি দেখে সে বললে—

আমি যে পথের মধ্যে থেকে তোমাকে লুকে নিয়ে এসেছি, সে মোটেই তোমার উপকারের জন্য নয়। ওর ভিতর আমার স্বার্থ আছে। দাবা খেলা হচ্ছে আমার বাতিক। ও যখন তোমার দেশের খেলা, তখন তুমি নিশ্চয়ই ভাল খেলতে জানো, এই মনে করে, তোমাকে গ্রেপ্তার করে আনবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না।

আমি উত্তর করলুম—

এর পরেই হয়ত আর একজন আমাকে টেনে নিয়ে গিয়ে বলবে "এস আমাকে ভানুমতীর বাজী দেখাও, তুমি যখন ভারতবর্ষের লোক তখন অবশ্য যাদু জানো"

সে এ কথার উত্তরে একটু হেসে বললে,

তুমি এমন লোভনীয় বস্তু নও যে তোমাকে হস্তগত করবার জন্ম হোটেল শুদ্ধ স্ত্রীলোক উতলা হয়ে উঠেছে। সে যাই হোক্, আমার হাত থেকে তোমাকে যে কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সে ভয় তোমার পাবার দরকার নেই। আর যদি তুমি যাদু জানো তা হলে বরং আমাদেরি পাবার কথা।

একবার হিন্দুদর্শন জানি বলে বিষম বিপদে পড়েছিলুম তাই এবার স্পষ্ট করে বললুম—

দাবা খেলতে আমি জানি নে।

শুধু দাবা কেন? দেখছি পৃথিবীর অনেক খেলাই তুমি জানো না। আমি যখন তোমাকে হাতে নিয়েছি, তখন আমি তোমাকে ও সব শেখাব ও খেলাব।

এর পর আমরা দুজনে দাবা নিয়ে বসে গেলুম। আমার শিক্ষয়িত্রী কোন্ বলের কি নাম, কার কি চাল, এ সব বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উপদেশ দিতে সুরু করলেন। আমি অবশ্য সে সবই জানতুম তবু অজ্ঞতার ভান কচ্ছিলুম, কেন না এঁর সঙ্গে কথা কইতে আমার মন্দ লাগছিল না। আমি ইতিপূর্ব্বে এমন একটি রমণীও দেখিনি যিনি পুরুষ মানুষের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা কইতে পারেন, যাঁর সকল কথা সকল ব্যবহারের ভিতর কতকটা কৃত্রিমতার আবরণ না থাকে। সাধারণতঃ স্ত্রীলোক সে যে দেশেরই হো'ক আমাদের জাতের সুমুখে মন বেআব্রু করতে পারে না। এই আমি প্রথম স্ত্রীলোক দেখলুম যে পুরুষ বন্ধুর মত সহজ ও খোলাখুলি ভাবে কথা কইতে পারে।

এর সঙ্গে যে পর্দার আড়াল থেকে আলাপ করতে হচ্ছে না এতেই আমি খুসি হয়েছিলুম। সুতরাং এই শিক্ষা জিনিষটে একটু লম্বা হওয়াতে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। মাথা নীচু করে অনর্গল বকে গেলেও আমার সঙ্গিনীটি যে ক্রমান্বয়ে বারান্দার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করছিল, তা আমার নজর এড়িয়ে যায় নি। আমি সেই দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলুম যে তার ডিনারের সাথীটি ঘন ঘন পায়চারি করছেন—এবং তাঁর মুখে জ্বলছে চুরোট আর চোখে রাগ। আমার বন্ধুটিও যে তা লক্ষ্য করছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কেননা স্পষ্ট দেখা-যাচ্ছিল যে ঐ ভদ্রলোকটি তার মনের উপর একটি চাপের মত বিরাজ করছেন। সকল বলের গতিবিধির পরিচয় দিতে তার বোধ হয় আধ ঘণ্টা লেগেছিল। তারপরে খেলা সুরু হল। পাঁচ মিনিট না যেতেই বুঝলুম যে দাবার বিদ্যে আমাদের দুজনেরি সমান, এক বাজি উঠতে রাত কেটে যাবে। প্রতি চাল দেবার আগে যদি পাঁচ মিনিট করে ভাবতে হয় তারপর আবার চাল ফিরিয়ে নিতে হয়, তাহলে খেলা যে কতটা এগোয় তা ত বুঝতেই পারো। সে যাই হোক ঘণ্টা আধেক বাদে সেই জাঁদরেলি চেহারার সাহেবটি হটাৎ ঘরে ঢুকে আমাদের খেলার টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়ে অতি বিরক্তির স্বরে আমার খেলার সাথীকে সম্বোধন করে বল্লেন—

"তাহলে আমি এখন চল্লুম"

সে কথা শুনে স্ত্রীলোকটি দাবার ছকের দিকে চেয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে উত্তর করলেন—"এত শীগ্‌গির" ?

"শীগ্‌গির কি রকম ? রাত সাড়ে এগারটা বেজে গেছে।

তাই নাকি ? তবে যাও আর দেরী করো না—তোমাকে ছ, মাইল ঘোড়ায় যেতে হবে।"

কাল আসছ ?

অবশ্য। সে ত কথাই আছে। বেলা দশটার ভিতর গিয়ে পৌঁছব।

কথা ঠিক রাখবে ত ?

আমি বাইবেল হাতে করে তোমার কথার জবাব দিতে পারি না।

Good-bye.

Good-bye.

পুরুষটি চলে গেলেন আবার কি মনে করে ফিরে এলেন। একটু থম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্‌লেন—"কবে থেকে তুমি দাবা খেলার এত ভক্ত হলে?" উত্তর এলো "আজ থেকে।" এর পরে সেই সাহেবপুঙ্গবটি 'হুঁ" এইমাত্র শব্দ উচ্চারণ করে ঘর থেকে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

আমার সঙ্গিনী অমনি দাবার ঘরটি উল্টে ফেলে খিল খিল করে হেসে উঠলেন। মনে হল পিয়ানোর সব চাইতে উঁচু সপ্তকের উপর কে যেন অতি হাল্কা ভাবে আঙ্গুল বুলিয়ে গেল। সেই সঙ্গে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তার ভিতর থেকে যেন একটি প্রাণের ফোয়ারা উছলে পড়ে আকাশে বাতাসে চারিয়ে গেল। দেখতে দেখতে বাতির আলো সব হেসে উঠল। ফুলদানের কাটা ফুল সব টাট্‌কা হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে আমার মনের যন্ত্রও এক সুর চড়ে গেল।

তোমার সঙ্গে দাবা খেলবার অর্থ এখন বুঝলে?

না।

"ঐ ব্যক্তির হাত এড়াবার জন্য। নইলে আমি দাবা খেলতে বসি? ওর মত নির্বুদ্ধির খেলা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। Georgeএর মত লোকের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যে একত্র থাকলে শরীর মন একদম ঝিমিয়ে পড়ে," ওদের কথা শোনা আর আফিং খাওয়া একই কথা।

কেন?

ওদের সব বিষয়ে মত আছে অথচ কোনও বিষয়ে মন নেই। ও জাতের লোকের ভিতরে সার আছে কিন্তু রস নেই। ওরা স্ত্রীলোকের স্বামী হবার যেমন উপযুক্ত সঙ্গী হবার তেমনি অনুপযুক্ত।

কথাটা ঠিক বুঝলুম না। স্বামীই ত স্ত্রীর চিরদিনের সঙ্গী।

চিরদিনের হলেও একদিনেরও নয় এমন হতে পারে এবং হয়েও থাকে।

তবে কি গুণে তারা স্বামী হিসেবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়ে উঠে?

ওদের শরীর ও চরিত্র দুয়েরই ভিতর এতটা জোর আছে যে ওরা জীবনের ভার অবলীলাক্রমে বহন করতে পারে। ওদের প্রকৃতি ঠিক তোমাদের উল্টো। ওরা ভাবে না কাজ করে। এক কথায়—ওরা হচ্ছে সমাজের স্তম্ভ তোমাদের মত ঘর সাজাবার ছবি কি পুতুল নয়।

হতে পারে এক দলের লোকের বাইরেটা পাথর আর ভিতরটা শিশে দিয়ে গড়া আর তারাই হচ্ছে আসল মানুষ, কিন্তু তুমি এই দুদণ্ডের পরিচয়ে আমার স্বভাব চিনে নিয়েছ?

অবশ্য। আমার চোখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ ত, দেখতে পাবে যে তার ভিতর এমন একটি আলো আছে যাতে মানুষের ভিতর পর্য্যন্ত দেখা যায়।

আমি নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে সে চোখ দুটি "লউসনিয়া" দিয়ে গড়া। লউসনিয়া কি পদার্থ জানো? এক রকম রত্ন—ইংরাজীতে যাকে বলে cats-eye—তার উপর আলোর "সুত" পড়ে আর প্রতিমুহূর্ত্তে তার রং বদলে যায়। আমি একটু পরেই চোখ ফিরিয়ে নিলুম, ভয় হল সে আলো পাছে সত্যি সত্যিই আমার চোখের ভিতর দিয়ে আমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে।

এখন বিশ্বাস করছ যে আমার দৃষ্টি মর্ম্মভেদী?

বিশ্বাস করি আর না করি স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই।

শুনতে চাও তোমার সঙ্গে Georgeএর আসল তফাৎটা কোথায়?

পরের মনের আয়নায় নিজের মনের ছবি কি রকম দেখায় তা বোধ হয় মানুষমাত্রেই জানতে চায়।

একটি উপমার সাহায্যে বুঝিয়ে দিচ্ছি। George হচ্ছে দাবার নৌকা আর তুমি গজ। ও একরোখে সিধে পথেই চলতে চায় আর তুমি কোণাকুণি।

এ দুয়ের মধ্যে কোনটি তোমাদের হাতে খেলে ভাল?

আমাদের কাছে ও দুই সমান। আমরা স্কন্ধে ভর করলে দুয়েরই চাল বদলে যায়। উভয়েই এঁকে বেঁকে আড়াই পায়ে চলতে বাধ্য হয়।

পুরুষ মানুষকে ও রকম ব্যতিব্যস্ত করে তোমরা কি সুখ পা'ও?

এ কথা শুনে সে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে

তুমি ত আমার Father confessor নও যে আমার মন খুলে তোমার কাছে আমার সব সুখ দুঃখের কথা বলতে হবে। তুমি যদি আমাকে ও ভাবে জেরা করতে সুরু করো, তাহলে এখনই আমি উঠে চলে যাব"

এই বলে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালে। আমার রূঢ় কথা শোনবার অভ্যাস ছিল না তাই আমি অতি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলুম

"তুমি যদি চলে যেতে চাও ত আমি তোমাকে থাকতে অনুরোধ করব না। ভুলে যেও না যে আমি তোমাকে ধরে রাখি নি"—এ কথার পর মিনিট খানেক চুপ করে থেকে সে অতি বিনীত ও নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করলে

আমার উপর রাগ করেছ?

আমি একটু লজ্জিত ভাবে উত্তর করলুম—

না। রাগ করবার ত কোনও কারণ নেই।

তবে অত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন?

"এতক্ষণ এই বদ্ধ ঘরে গ্যাসের বাতির নীচে বসে বসে আমার মাথা ধরেছে।" এই মিথ্যে কথা আমার মুখ দিয়ে অবলীলাক্রমে বেরিয়ে গেল। এর উত্তরে "দেখি তোমার জ্বর হয়েছে কি না" এই কথা বলে সে আমার কপালে হাত

দিলে। সে স্পর্শের ভিতর তার আঙুলের ডগায় একটু সসঙ্কোচ আদরের ইসারা ছিল। মিনিটখানেক পরে সে তার হাত তুলে নিয়ে বল্লে—"তোমার মাথা একটু গরম হয়েছে কিন্তু ও জ্বর নয়। চল, বাইরে গিয়ে বস্‌বে, তাহলেই ভাল হয়ে যাবে"—
আমি বিনা বাক্যব্যয়ে তার পদানুসরণ করলুম। তোমরা যদি বল যে সে আমাকে mesmerise করেছিল, তাহলে আমি সে কথার প্রতিবাদ করব না।

বাইরে গিয়ে দেখি সেখানে জনমানব নেই—যদিও রাত তখন সাড়ে এগারটা, তবু সবলে শুতে গিয়েছে। বুঝলুম Ilfracombe সত্য সত্যই ঘুমের রাজ্য। আমরা দুজনে দু'খানি বেতের চেয়ারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখ্‌তে লাগলুম। দেখি আকাশ আর সমুদ্র দুই এক হয়ে গেছে—দুইই শ্লেটের রঙ। আর আকাশে যেমন তারা জ্বলছে, সমুদ্রের গায়ে তেমনি যেখানে যেখানে আলো পড়ছে সেখানেই তারা ফুটে উঠছে,—এখানে ওখানে সব জলের টুকরো টাকার মত চক্‌চক্ করছে, পারার মত টল্‌মল্ করছে। গাছপালার চেহারা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে যেন স্থানে স্থানে অন্ধকার জমাট হয়ে গিয়েছে। তখন সসাগরা বসুন্ধরা মৌনব্রত অবলম্বন করেছিল। এই নিস্তব্ধ নিশীথের নিবিড় শান্তি আমার সঙ্গিনীটির হৃদয় মন স্পর্শ করেছিল—কেন না সে কতক্ষণ ধরে ধ্যানমগ্ন ভাবে বসে রইল। আমিও চুপ করে রইলুম। তারপর সে চোখ বুজে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—

তোমার দেশে যোগী বলে একদল লোক আছে ?

—আছে।

তারা কামিনী কাঞ্চন স্পর্শ করে না, আর সংসার ত্যাগ করে বনে চলে যায় ?

—বনে যায়, এ কথা সত্য।

আর সেখানে আহার নিদ্রা ত্যাগ করে অহর্নিশি জপতপ করে ?

—এই রকম ত শুন্‌তে পাই।

আর তার ফলে যত তাদের দেহের ক্ষয় হয় তত তাদের মনের শক্তি বাড়ে, যত তাদের বাইরেটা স্থিরশান্ত হয়ে আসে তত তাদের অন্তরের তেজ ফুটে ওঠে ?

—তা হলেও হতে পারে।

"হতে পারে" বল্‌ছ কেন ? শুনেছি তোমরা বিশ্বাস কর যে, এদের দেহমনে এমন অলৌকিক শক্তি জন্মায় যে, এই সব মুক্ত জীবের স্পর্শে এবং কথায় মানুষের শরীর মনের সকল অসুখ সেরে যায়।

—ও সব মেয়েলি বিশ্বাস।

তোমার নয় কেন ?

—আমি যা জানিনে তা বিশ্বাস করিনে। আমি এর সত্যিমিথ্যে কি করে জানব ? আমিত আর যোগ অভ্যাস করি নি।

আমি ভেবেছিলুম তুমি করেছ।

—এ অদ্ভুত ধারণা তোমার কিসের থেকে হল ?

জিতেন্দ্রিয় পুরুষের মত তোমার মুখে একটা শীর্ণ ও চোখে একটা তীক্ষ্ণ ভাব আছে।

—তার কারণ অনিদ্রা।

আর অনাহার। তোমার চোখে মনের অনিদ্রা ও হৃদয়ের উপবাস, এ দুয়েরি লক্ষণ আছে। তোমার মুখের ঐ ছাইচাপা আগুনের চেহারা প্রথমেই আমার চোখে পড়ে। একটা অদ্ভুত কিছু দেখলে মানুষের চোখ সহজেই তার দিকে যায়, তার বিষয় সবিশেষ জানবার জন্য মন লালায়িত হয়ে ওঠে। Georgeএর হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করবার জন্য যে তোমার আশ্রয় নিই এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা ; তোমাকে একবার নেড়েচেড়ে দেখবার জন্যই আমি তোমার কাছে আসি।

—আমার তপোভঙ্গ করবার জন্য ?

তুমি যেদিন St. Anthony হয়ে উঠবে, আমিও সেদিন স্বর্গের অপ্সরা হয়ে দাঁড়াব। ইতিমধ্যে তোমার ঐ গেরুয়া রঙের মিনে-করা মুখের পিছনে কি ধাতু আছে, তাই জানবার জন্য আমার কৌতূহল হয়েছিল।

—কি ধাতু আবিষ্কার কর্‌লে শুন্‌তে পারি?

আমি জানি তুমি কি শুন্‌তে চাও।

—তাহলে তুমি আমার মনের সেই কথা জান যা আমি জানিনে।

অবশ্য। তুমি চাও আমি বলি—চুম্বক।"

কথাটি শোনবামাত্র আমার জ্ঞান হল যে, এ উত্তর শুন্‌লে আমি খুসি হতুম যদি তা বিশ্বাস করতুম। এই নব আকাঙ্খা সে আমার মনের ভিতর আবিষ্কার কর্‌লে কি নির্ম্মাণ কর্‌লে তা আমি আজও জানি নে। আমি মনে মনে উত্তর খুঁজছি, এমন সময়ে সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে "কটা বেজেছে?" আমি ঘড়ি দেখে বল্লুম— "বারোটা।"

"বারোটা" শুনে সে লাফিয়ে উঠে বল্‌লে—

উঃ! এত রাত হয়ে গেছে? তুমি মানুষকে এত বকাতেও পারো! যাই, শুতে যাই। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। অনেক দূর যেতে হবে, তাও আবার দশটার ভিতর পৌছতে হবে।

—কোথায় যেতে হবে?

একটা শীকারে। কেন, তুমি কি জান না? তোমার সুমুখেইত George-এর সঙ্গে কথা হল।

—তাহলে সে কথা তুমি রাখ্‌বে?

তোমার কিসে মনে হল যে রাখ্‌ব না?

—তুমি যে ভাবে তার উত্তর দিলে।

সে শুধু George কে একটু নিগ্রহ করবার জন্য। আজ রাত্তিরে ওর ঘুম হবে না, আর জানইত ওদের পক্ষে জেগে থাকা কত কষ্ট।

—তোমার দেখছি বন্ধুবান্ধবদের প্রতি অনুগ্রহ অতি বেশী।

অবশ্য। Georgeএর মত পুরুষমানুষের মনকে মাঝে মাঝে একটু উস্‌কে না দিলে তা সহজেই নিভে যায়। আর তা ছাড়া ওদের মনে খোঁচা মারার ভিতর বেশী কিছু নিষ্ঠুরতাও নেই। ওদের মনে কেউ বেশী কষ্ট দিতে পারে না, ওরাও এক প্রহার দেওয়া ছাড়া স্ত্রীলোককে আর কোনও কষ্ট দিতে পারে না। সেই জন্যইত ওরা আদর্শ স্বামী হয়। মন নিয়ে কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ি সে তোমার মত লোকেই করে।

—তোমার কথা আমার হেঁয়ালির মত লাগছে—

যদি হেঁয়ালি হয় ত তাই হোক্। তোমার জন্যে আমি আর তার ব্যাখ্যা করতে পারি নে। আমার যেমন শ্রান্ত মনে হচ্চে তেমনি ঘুম পাচ্চে। তোমার ঘর উপরে?

—হাঁ।

তবে এখন ওঠ, উপরে যাওয়া যাক্—"

আমরা দুজনে আবার ঘরে ফিরে এলুম।

করিডোরে পৌঁছবামাত্র সে বল্লে—"ভাল কথা, তোমার একখানা 'কার্ড আমাকে দেও"—

আমি কার্ডখানি দিলুম। সে আমার নাম পড়ে বল্‌লে—তোমাকে আমি "সু" বলে ডাক্‌ব।

আমি জিজ্ঞেস করলুম "তোমাকে কি বলে সম্বোধন করব?"

উত্তর—যা-খুসি-একটা-কিছু বানিয়ে নেও না। ভাল কথা, আজ তোমাকে যে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছি, তাতে তোমার আমাকে saviour বলে ডাকা উচিত।

—তথাস্তু—

তোমার ভাষায়—ওর নাম কি?

—আমার দেশে বিপন্নকে যিনি উদ্ধার করেন তিনি দেব ন'ন, দেবী—তাঁর নাম "তারিণী।"

বাঃ, দিব্যি নাম তা! ওর তা-টি বাদ দিয়ে আমাকে "রিণী" বলে ডেকো।" এই কথাবার্ত্তা কইতে কইতে আমরা সিঁড়িতে উঠ্‌ছিলুম। একটা গ্যাসের বাতির কাছে আসবামাত্র সে হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমার হাতের দিকে চেয়ে বল্‌লে, "দেখি দেখি তোমার হাতে কি হয়েছে?" অমনি নিজের হাতের দিকে আমার চোখ পড়্‌ল—দেখি হাতটি লাল টক্ টক্ কর্‌ছে, যেন কে তাতে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়েছে। সে আমার ডান হাতখানি নিজের বাঁ হাতের উপরে রেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—

"কার বুকের রক্তে হাত ছুপিয়েছ—অবশ্য Venus de Milo'র নয়?

—না, নিজের।

এতক্ষণ পরে একটি সত্য কথা বলেছ।—আশা করি এ রং পাকা। কেন না যেদিন এ রং ছুটে যাবে, সেদিন জেন তোমার সঙ্গে আমার ভাবও চটে যাবে। যাও, এখন শোওগে। ভাল করে ঘুমিয়ো আর আমার বিষয় স্বপ্ন দেখো।"—

এই কথা বলে সে দু'লাফে অন্তর্ধান হল।

আমি শোবার ঘরে ঢুকে আরসিতে নিজের চেহারা দেখে চম্‌কে গেলুম। এক বোতল শ্যাম্পেন খেলে মানুষের যেরকম চেহারা হয়, আমার ঠিক সেই রকম হয়েছিল। দেখি দুই গালেও রক্ত দেখা দিয়েছে, আর চোখের তারা দুটি শুধু জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে—বাকী অংশ ছল্‌ছল্ কর্‌ছে। সে সময় আমার নিজের চেহারা আমার চোখে বড় সুন্দর লেগেছিল। আমি অবশ্য তাকে স্বপ্ন দেখি নি,—কেননা, সে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় নি।

সে রাত্তিরে আমরা দুজনে যে জীবন-নাটকের অভিনয় সুরু করি, বছর খানেক পরে, আর এক রাত্তিরে তার শেষ হয়। আমি প্রথম দিনের সব ঘটনা তোমাদের বলেছি, আর শেষ দিনের বলব,—কেন না এ দু'দিনের সকল কথা

আমার মনে আজও গাঁথা রয়েছে। তা ছাড়া ইতিমধ্যে যা ঘটেছিল, সে সব আমার মনের ভিতর,—বাইরে নয়। যে ব্যাপারে বাহ্যঘটনার বৈচিত্র্য নেই, তার কাহিনী বলা যায় না। আমার মনের সে বৎসরের ডাক্তারি-ডায়ারি যখন আমি নিজেই পড়তে ভয় পাই, তখন তোমাদের তা পড়ে শোনাবার আমার তিলমাত্রও অভিপ্রায় নেই।

এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, আমার মনের অদৃশ্য তারগুলি, "রিণী" তার দশ আঙ্গুলে এম্‌নি করে' ধরে' সে-মনকে পুতুল নাচিয়েছিল। আমার অন্তরে সে যে-প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলেছিল তাকে ভালবাসা বলে কি না জানি নে; এইমাত্র জানি যে, সে মনোভাবের ভিতর অহঙ্কার ছিল, অভিমান ছিল, রাগ ছিল, জেদ ছিল, আর সেই সঙ্গে ছিল করুণ মধুর দাস্য ও সখ্য এই চারিটি হৃদয়রস—এর মধ্যে যা লেশমাত্রও ছিল না সে হচ্ছে দেহের নাম-কি গন্ধ। আমার মনের এই কড়িকোমল পর্দ্দাগুলির উপর সে তাঁর আঙ্গুল চালিয়ে যখন-যেমন ইচ্ছে তখন-তেমনি সুর বার করতে পারত। তার আঙ্গুলের টিপে সে সুর কখনও বা অতি-কোমল, কখনও বা অতি-তীব্র হত।

একটি ফরাসী কবি বলেছেন যে, রমণী হচ্ছে আমাদের দেহের ছায়া। তাকে ধরতে যাও সে পালিয়ে যাবে, আর তার কাছ থেকে পালাতে চেষ্টা কর, সে তোমার পিছু পিছু ছুটে আসবে। আমি বারোমাস ধরে' এই ছায়ার সঙ্গে অহর্নিশি লুকোচুরি খেলেছিলুম। এ খেলার ভিতর কোনও সুখ ছিল না। অথচ এ খেলা সাঙ্গ করবার শক্তিও আমার ছিল না। অনিদ্রাগ্রস্ত লোক যেমন যত বেশি ঘুমতে চেষ্টা করে তত বেশি জেগে ওঠে, আমিও তেমনি যত বেশি এই খেলা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করতুম তত বেশি তাতে জড়িয়ে পড়্‌তুম। সত্য কথা বলতে গেলে, এ খেলা বন্ধ করবার জন্য আমার আগ্রহও ছিল না,—কেন না আমার মনের এই নব অশান্তির মধ্যে নব জীবনের তীব্র স্বাদ ছিল।

আমি যে শত চেষ্টাতেও "রিণী"র মনকে আমার করায়ত্ত করতে পারি নি,

তার জন্য আমি লজ্জিত নই—কেন না আকাশ বাতাসকে কেউ আর মুঠোর ভিতর চেপে ধরতে পারে না। তার মনের স্বভাবটা অনেকটা এই আকাশের মতই ছিল, দিনে দিনে তার চেহারা বদ্‌লাত। আজ ঝড়-জল বজ্র-বিদ্যুৎ,—কাল আবার চাঁদের আলো, বসন্তের হাওয়া। একদিন গোধুলি, আর একদিন কড়া রোদ্দুর। তা ছাড়া সে ছিল একাধারে শিশু, বালিকা, যুবতী আর বৃদ্ধা। যখন তার স্ফুর্ত্তি হত, তার আমোদ চড়্‌ত, তখন সে ছোট ছেলের মত ব্যবহার করত; আমার নাক ধরে টান্‌ত—চুল ধরে টান্‌ত, মুখ ভেংচাত, জিভ বার করে' দেখাত। আবার কখনও বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে' যেন আপন মনে, নিজের ছেলেবেলাকার গল্প করে' যেত। তাকে কে কবে বকেছে, কে কবে আদর করেছে, সে কবে কি পড়েছে, কবে কি প্রাইজ পেয়েছে, কবে বনভোজন করেছে, কবে ঘোড়া থেকে পড়েছে; যখন সে এই সকলের খুঁটিয়ে বর্ণনা করত, তখন একটি বালিকা-মনের স্পষ্ট ছবি দেখতে পেতুম। সে ছবির রেখাগুলি যেমন সরল, তার বর্ণও তেমনি উজ্জ্বল। তারপর সে ছিল গোঁড়া রোমান-ক্যাথলিক। একটি আব্‌লুশ কাঠের ক্রুশে-আঁটা রূপোর ক্রাইষ্ট তার বুকের উপর অষ্টপ্রহর ঝুল্‌ত, এক মূহূর্ত্তের জন্যও সে তা স্থানান্তরিত করে নি। সে যখন তার ধর্ম্মের বিষয় বক্তৃতা আরম্ভ করত, তখন মনে হত তার বয়েস আশি বৎসর। সে সময়ে তার সরল বিশ্বাসের সুমুখে আমার দার্শনিক বুদ্ধি মাথা হেঁট করে' থাক্‌ত। কিন্তু আসলে সে ছিল পূর্ণ যুবতী; যদি যৌবনের অর্থ হয় প্রাণের উদ্দাম উচ্ছ্বাস। তার সকল মনোভাব, সকল ব্যবহার, সকল কথার ভিতর এমন একটি প্রাণের জোয়ার বইত, যার তোড়ে আমার অন্তরাত্মা অবিশ্রান্ত তোলপাড় করত। আমরা মাসে দশবার করে' ঝগড়া করতুম, আর ঈশ্বরসাক্ষী করে' প্রতিজ্ঞা করতুম যে, জীবনে আর কখনও পরস্পরের মুখ দেখ্‌ব না। কিন্তু দু'দিন না যেতেই, হয় আমি তার কাছে ছুটে যেতুম, নয় সে আমার কাছে ছুটে আস্‌ত। তখন আমরা আগের কথা সব ভুলে যেতুম—সেই পুনর্মিলন আবার আমাদের প্রথম মিলন হয়ে উঠ্‌ত। এই ভাবে দিনের পর দিন, মাসের

পর মাস কেটে গিয়েছিল। আমাদের শেষ ঝগড়াটা অনেক দিন স্থায়ী হয়েছিল। আমি বলতে ভুলে গিয়েছিলুম যে, সে আমার মনের সর্ব্বপ্রধান দুর্ব্বলতাটি আবিষ্কার করেছিল—তার নাম jealousy।—যে মনের আগুনে মানুষ জ্বলে পুড়ে মরে, "রিণী" সে আগুন জ্বালাবার মন্ত্র জানত। আমি পৃথিবীতে বহুলোককে অবজ্ঞা করে' এসেছি—কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কাউকে কখনও হিংসা করিনি। বিশেষতঃ Georgeএর মত লোককে হিংসা করার চাইতে আমার মত লোকের পক্ষে বেশি কি হীনতা হতে পারে? কারণ তার যা ছিল তা হচ্ছে টাকার জোর আর গায়ের জোর। কিন্তু "রিণী" আমাকে এ হীনতাও স্বীকার করতে বাধ্য করেছিল। তার শেষবারের ব্যবহার আমার কাছে যেমন নিষ্ঠুর তেমনি অপমানজনক মনে হয়েছিল। নিজের মনের দুর্ব্বলতার স্পষ্ট পরিচয় পাবার মত কষ্টকর জিনিষ মানুষের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না।

ভয় যেমন মানুষকে দুঃসাহসিক করে' তোলে—আমার ঐ দুর্ব্বলতাই তেমনি আমার মনকে এত শক্ত করে' তুলেছিল যে, আমি আর কখনও তার মুখ-দর্শন করতুম না—যদি না সে আমাকে চিঠি লিখ্ত। সে চিঠির প্রতি অক্ষর আমার মনে আছে,—সে চিঠি এই:—

"তোমার সঙ্গে যখন শেষ দেখা হয় তখন দেখেছিলুম যে তোমার শরীর ভেঙ্গে পড়্ছে।—আমার মনে হয় তোমার পক্ষে একটা change নিতান্ত আবশ্যক। আমি যেখানে আছি, সেখানকার হাওয়া মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলে। এ জায়গাটা একটি অতি ছোট পল্লীগ্রাম। এখানে তোমার থাকবার মত কোনও স্থান নেই। কিন্তু এর ঠিক পরের ষ্টেসনটিতে অনেক ভাল ভাল হোটেল আছে। আমার ইচ্ছে তুমি কালই লণ্ডন ছেড়ে সেখানে যাও। এখন এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি—আর দেরি করলে এমন চমৎকার সময় আর পাবে না। যদি হাতে টাকা না থাকে, আমাকে টেলিগ্রাম কর' আমি পাঠিয়ে দেব। পরে সুদশুদ্ধ তা শুধে দিয়ো।"

আমি ও চিঠির কোনও উত্তর দিলুম না, কিন্তু পরদিন সকালের ট্রেনেই লণ্ডন ছাড়লুম। আমি কোন কারণে তোমাদের কাছে সে জায়গার নাম করব না। এই পর্য্যন্ত বলে রাখি "রিণী" যেখানে ছিল তার নামের প্রথম অক্ষর B এবং তার পরের ষ্টেসনের নামের প্রথম অক্ষর W.

ট্রেন যখন B ষ্টেসনে গিয়ে পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় ছুটো। আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলুম "রিণী" প্ল্যাটফরমে নেই। তার পর এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখি প্ল্যাটফরমের রেলিংয়ের ওপারে রাস্তার ধারে একটি গাছে হেলান দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই যে কেন আমি তাকে দেখতে পাই নি, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম, কেননা সে যে রঙের কাপড় পরেছিল তা আধক্রোশ দূর থেকে মানুষের চোখে পড়ে—একটি মিসমিসে কালো গাউনের উপর একটি ডগ্‌ডগে হল্‌দে জ্যাকেট। সেদিনকে 'রিণী' এক অপ্রত্যাশিত নতুন মূর্ত্তিতে, আমাদের দেশের নববধূর মূর্ত্তিতে দেখা দিয়েছিল। এই বজ্রবিদ্যুৎ দিয়ে গড়া রমণীর মুখে আমি পূর্ব্বে কখন লজ্জার চিহ্নমাত্রও দেখ্‌তে পাইনি। কিন্তু সে দিন তার মুখে যে হাসি ঈষৎ ফুটে উঠেছিল সে লজ্জার রক্তিম হাসি। সে চোখ তুলে আমার দিকে ভাল করে চাইতে পাচ্ছিল না। তার মুখখানি এত মিষ্টি দেখাচ্ছিল যে আমি চোখ ভরে প্রাণভরে তাই দেখ্‌তে লাগলুম। আমি যদি কখন তাকে ভালবেসে থাকি, ত সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে। মানুষের সমস্ত মনটা যে এক মুহূর্ত্তে এমন করে রঙ ধরে উঠতে পারে, এ সত্যের পরিচয় আমি সেই দিন প্রথম পাই।

ট্রেন B ষ্টেসনে বোধ হয় মিনিটখানেকের বেশি থামে নি, কিন্তু সেই এক মিনিট আমার কাছে অনন্তকাল মনে হয়েছিল। তার মিনিটপাঁচেক পরে ট্রেন W ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমি সমুদ্রের ধারে একটি বড় হোটেলে গিয়ে উঠলুম। কেন জানিনে হোটেলে পৌঁছেই আমার অগাধ শ্রান্তি বোধ হতে লাগল। আমি কাপড় ছেড়ে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। এই একটিমাত্র দিন যখন আমি বিলেতে দিবানিদ্রা দিয়েছি, আর এমন ঘুম আমি জীবনে কখনও

ঘুমোই নি। জেগে উঠে দেখি পাঁচটা বেজে গেছে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে নীচে এসে চা খেয়ে পদব্রজে Bর অভিমুখে যাত্রা করলুম। যখন সে গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছিলুম, তখন প্রায় সাতটা ব'জে,—তখনও আকাশে যথেষ্ট আলো ছিল। বিলেতে জানইত গ্রীষ্মকালের রাত্তির,—দিনের জের টেনে নিয়ে আসে; সূর্য্য অস্ত গেলেও তার পশ্চিম আলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাত্তিরের গায়ে জড়িয়ে থাকে। "রিণী" কোন্ পাড়ায় কোন্ বাড়ীতে থাকে, তা আমি জানতুম না, কিন্তু আমি এটা জানতুম যে W থেকে B যাবার রাস্তায় কোথায়ও না কোথায় তার দেখা পাবো।

Bর সীমাতে পা দেবা মাত্রই দেখি একটি স্ত্রীলোক একটু উতলাভাবে রাস্তায় পায়চারি করছে। দূর থেকে তাকে চিন্‌তে পারিনি, কেননা ইতিমধ্যে "রিণী" তার পোষাক বদলে ফেলেছিল। সে কাপড়ের রংয়ের নাম জানি নে, এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে সেই সন্ধ্যের আলোর সঙ্গে সে এক হয়ে গেছল—সে রং যেন গোধূলিতে ছোপান।

আমাকে দেখবামাত্র "রিণী" আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে সেই দিকে এগুতে লাগলুম। আমি জানতুম যে সে এই গাছপালার ভিতর নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে আছে—সহজে ধরা দেবে না—একটু খুঁজে পেতে তাকে বার করতে হবে। আমি অবশ্য তার এ ব্যবহারে আশ্চর্য্য হয়ে যাইনি, কেননা এতদিনে আমার শিক্ষা হয়েছিল, যে "রিণী" যে কখন কি ব্যবহার করবে তা অপরের জানা দূরে থাক, সে নিজেই জান্‌ত না। আমি একটু এগিয়ে দেখি, ডান দিকে বনের ভিতর একটি গলি-রাস্তার ধারে একটি oak গাছের আড়ালে "রিণী" দাঁড়িয়ে আছে, এমন ভাবে যাতে পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরা আলো তার মুখের উপর এসে পড়ে। আমি অতি সন্তর্পনে তার দিকে এগুতে লাগলুম, সে চিত্র-পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়েই রইল। তার মুখের আধখানা ছায়ায় ঢাকা পড়াতে বাকি অংশটুকু স্বর্ণমুদ্রার উপর অঙ্কিত গ্রীকরমণীমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল, সে মূর্ত্তি যেমন সুন্দর তেমনি কঠিন। আমি কাছে যাবামাত্র, সে দুহাত

দিয়ে তার মুখ ঢাক্‌লে। আমি তার সুমুখে গিয়ে দাঁড়ালুম। দুজনের কারও মুখে কথা নেই।

কতক্ষণ এ ভাবে গেল জানিনে। তার পর প্রথমে কথা অবশ্য "ন্নিণীই" কইলে—কেননা সে বেশীক্ষণ চুপ করে থাক্‌তে পারত না—বিশেষতঃ আমার কাছে! তার কথার স্বরে ঝগড়ার পূর্ব্বাভাস ছিল। প্রথম সম্ভাষণ হল এই :—"তুমি এখান থেকে চলে যাও; আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতে চাইনে, তোমার মুখ দেখ্‌তে চাইনে"।

আমার অপরাধ?

তুমি এখানে কেন এলে?

তুমি আস্‌তে লিখেছ বলে।

সে দিন আমার বড় মন খারাপ ছিল। বড় একা একা মনে হচ্ছিল বলে ঐ চিঠি লিখি। কিন্তু কখনও মনে করিনি, তুমি ঐ চিঠি পাবামাত্র ছুটে এখানে চলে আস্‌বে। তুমি জানো যে, মা যদি টের পান্‌ যে আমি একটি কালো লোকের সঙ্গে ইয়ারকি দিই, তাহলে আমাকে বাড়ী ছাড়্‌তে হবে?

ইয়ারকি শব্দটি আমার কাণে খট্‌ করে লাগল, আমি ঈষৎ বিরক্তভাবে বললুম—তোমার মুখেই তা শুনেছি। তার সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন। কিন্তু তুমি কি বল্‌তে চাও যে তুমি ভাবনি যে আমি আস্‌ব?

স্বপ্নেও না।

তাহলে ট্রেণ আসবার সময় কার খোঁজে ষ্টেশনে গিয়েছিলে?

কারও খোঁজে নয়। চিঠি ডাকে দিতে।

তাহলে ওরকম কাপড় পরেছিলে কেন যা, আধক্রোশ দূরে থেকে কাণা লোকেরও চোখে পড়ে?

তোমার সুনজরে পড়্বার জন্য।

সু হোক কু হোক আমার নজরেই পড়্বার জন্য।

তোমার বিশ্বাস তোমাকে না দেখে আমি থাক্তে পারি নে?

তা কি করে বল্‌ব। এইত এতক্ষণ হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখেছ।

সে চোখে আলো সইছে না বলে। আমার চোখে অসুখ করেছে।

"দেখি কি হয়েছে" এই বলে আমি আমার হাত দিয়ে তার মুখ থেকে তার হাত দুখানি তুলে নেবার চেষ্টা কল্লুম। "রিণী" বল্লে, "তুমি হাত সরিয়ে নেও, নইলে আমি চোখ খুলব না। আর তুমি জানো যে, জোরে তুমি আমার সঙ্গে পারবে না।"

আমি জানি যে আমি George নই। গায়ের জোরে আমি কারও চোখ খোলাতে পারবো না।

এ কথা শুনে "রিণী" মুখ থেকে হাত নামিয়ে নিয়ে মহা উত্তেজিতভাবে বল্লে, "আমার চোখ খোলাবার জন্য কারও ব্যস্ত হবার দরকার নেই। আমিত আর তোমার মত অন্ধ নই। তোমার যদি কারও ভিতরটা দেখ্‌বার শক্তি থাক্‌ত, তাহলে তুমি আমাকে যখন তখন এত অস্থির করে তুলতে না। জানো আমি কেন রাগ করেছিলুম? তোমার ঐ কাপড় দেখে? তোমাকে ওকাপড়ে আজ দেখব না বলে আমি চোখ বন্ধ করেছিলুম"।

"কেন এ কাপড়ের কি দোষ হয়েছে? এটি ত আমার সব চাইতে সুন্দর পোষাক"

—"দোষ এই যে, এ সে কাপড় নয় যে কাপড়ে আমি তোমাকে প্রথমে দেখি।"

এ কথা শোনবা মাত্র আমার মনে পড়ে গেল যে "রিণী" সেই কাপড় পরে আছে যে কাপড়ে আমি প্রথমে তাকে Ilbracombeয়ে দেখি। আমি ঈষৎ অপ্রতিভ ভাবে বল্লুম, "এ কথা আমার মনে হয়নি যে আমরা পুরুষমানুষ, কি পারি না পরি তাতে তোমাদের কিছু যায় আসে"—

না, আমরা ত আর মানুষ নই, আমাদের ত আর চোখ নেই। তোমার হয়ত বিশ্বাস যে তোমরা সুন্দর হও, কুৎসিৎ হও তাতেও আমাদের কিছু যায় আসে না"।

আমার ত তাই বিশ্বাস।

তবে কিসের টানে তুমি আমাকে টেনে নিয়ে বেড়াও?

রূপের?

অবশ্য। তুমি হয়ত ভাব তোমার কথাশুনে আমি মোহিত হয়েছি। স্বীকার করি তোমার কথা শুনতে আমার অত্যন্ত ভাল লাগে। শুধু তা নয় নেশাও ধরে। কিন্তু তোমার কণ্ঠস্বর শোনবার আগে যে কুক্ষণে আমি তোমাকে দেখি, সেইক্ষণে আমি বুঝেছিলুম যে আমার জীবনে একটি নূতন জ্বালার সৃষ্টি হল, আমি চাই আর না চাই, তোমার জীবনের সঙ্গে আমার জীবনের চিরসংঘর্ষ থেকেই যাবে।

এ সব কথা ত এর আগে তুমি কখন বলনি।

ও কানে শোনবার কথা নয় চোখে দেখবার জিনিষ। সাধে কি তোমাকে আমি অন্ধ বলি? এখন শুনলে ত, এসো সমুদ্রের ধারে গিয়ে বসি। আজকে তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

যে পথ ধরে চল্লুম সে পথটি যেমন সরু, দুপাশের বড় বড় গাছের ছায়ায় তেমনি অন্ধকার। আমি পদে পদে হোঁচট্ খেতে লাগলুম। "রিণী" বল্লে আমি পথ চিনি তুমি আমার হাত ধরো আমি তোমাকে নিরাপদে সমুদ্রের ধারে পৌঁছে দেব। আমি তার হাত ধরে নীরবে সেই অন্ধকার পথে অগ্রসর হতে লাগলুম। আমি অনুমানে বুঝলুম যে এই নির্জ্জন অন্ধকারের প্রভাব তার মনকে শান্ত, বশীভূত করে আনছে। কিছুক্ষণ পর প্রমাণ পেলুম যে আমার অনুমান ঠিক।

মিনিট দশেক পরে "রিণী" বল্লে—"সু, তুমি জানো যে তোমার হাত তোমার মুখের চাইতে ঢের বেশি সত্যবাদী"?

তার অর্থ?

তার অর্থ তুমি মুখে যা চেপে রাখো, তোমার হাতে তা ধরা পড়ে।

সে বস্তু কি ?

তোমার হৃদয়।

তার পর ?

তারপর তোমার রক্তের ভিতর যে বিদ্যুৎ আছে তোমার আঙুলের মুখ দিয়ে তা ছুটে বেরিয়ে পড়ে। তার স্পর্শে সে বিদ্যুৎ সমস্ত শরীরে চারিয়ে যায়, শিরের ভিতর গিয়ে রি রি করে।

রিণী তুমি আমাকে আজ এ সব কথা এত করে বল্‌ছ কেন ? এতে আমার মন ভুলবে না, শুধু অহঙ্কার বাড়্‌বে।—আমার অহঙ্কারের নেশা এম্‌নি যথেষ্ট আছে, তার আর মাত্রা চড়িয়ে তোমার কি লাভ ?

স্থ, যে রূপ আমাকে মুগ্ধ করে রেখেছে, তা তোমার দেহের কি মনের, আমি জানিনে। তোমার মন ও চরিত্রের কতক অংশ অতি স্পষ্ট, আর কতক অংশ অতি অস্পষ্ট। তোমার মুখের উপর তোমার ঐ মনের ছাপ আছে। এই আলোছায়ায় আঁকা ছবিই আমার চোখে এত সুন্দর লাগে, আমার মনকে এত টানে। সে যাই হোক্ আজ আমি তোমাকে শুধু সত্যকথা বলছি ও বলব, যদিও তোমার অহঙ্কারের মাত্রা বাড়ানোতে আমার ক্ষতি বই লাভ নেই।

কি ক্ষতি ?

তুমি জানো আর না জানো, আমি জানি যে তুমি আমার উপর যত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছ, তার মূলে তোমার অহং ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

নিষ্ঠুর ব্যবহার আমি করেছি ?

হাঁ তুমি।—আগের কথা ছেড়ে দাও—এই একমাস তুমি জানো যে আমার কি কষ্টে কেটেছে। প্রতিদিন যখন ডাকপিয়ন এসে দুয়োরে knock করেছে আমি অমনি ছুটে গিয়েছি—দেখ্‌তে তোমার চিঠি এল কি না। দিনের ভিতর দশবার করে তুমি আমার

আশা ভঙ্গ করেছ। শেষটা এই অপমান আর সহ্য করতে না পেরে আমি লণ্ডন থেকে এখানে পালিয়ে আসি।

যদি সত্যই এত কষ্ট পেয়ে থাকো তবে সে কষ্ট তুমি ইচ্ছে করে ভোগ করেছ কেন?

আমাকে লিখলেই ত তোমার সঙ্গে দেখা করতুম।

ঐ কথাতেই ত নিজেকে ধরা দিলে। তুমি তোমার অহঙ্কার ছাড়তে পারো না, কিন্তু আমাকে তোমার জন্য তা ছাড়তে হবে। শেষে হলোও তাই। আমার অহঙ্কার চূর্ণ করে তোমার পায়ে ধরে দিয়েছি, তাই আজ তুমি অনুগ্রহ করে আমাকে দেখা দিতে এসেছ।

ঐ কথার উত্তরে আমি বল্লুম—

কষ্ট তুমি পেয়েছ, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে অবধি আমার দিন যে কি আরামে কেটেছে তা ভগবানই জানেন।

এ পৃথিবীতে এক জড় পদার্থ ছাড়া আর কারও আরামে থাকবার অধিকার নেই। আমি তোমার জড় হৃদয়কে জীবন্ত করে তুলেছি এই ত আমার অপরাধ? তোমার বুকের তারে মিড় টেনে কোমল সুর বার করতে হয়। একে যদি তুমি পীড়ন করা বলো তাহলে আমার কিছু বলবার নেই।

এই সময় আমরা বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি সুমুখে গোধুলি-ধূসর দিগন্ত বিস্তৃত জলের মরুভূমি ধূ ধূ করছে। তখনও আকাশে আলো ছিল। সেই বিমর্ষ আলোয় দেখলুম রিণীর মুখ একটি গভীর চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে রয়েছে।

সে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রয়েছে কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও লক্ষ্য নেই। সে চোখে যা ছিল তা ঐ সমুদ্রের মত একটা অসীম উদাস ভাব।

রিণী আমার হাত ছেড়ে দিলে, আমরা দুজনে বালির উপরে পাশাপাশি বসে সমুদ্রের দিকে চেয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আমি বল্লুম—রিণী তুমি কি আমাকে সত্যই ভালবাসো?

বাসি।

কবে থেকে?

যে দিন তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয় সেই দিন থেকে। আমার মনের এ প্রকৃতি নয় যে তা ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বলে উঠবে। এ মন এক মুহূর্ত্তে দপ্ করে জ্বলে ওঠে কিন্তু এ জীবনে সে আগুন আর নেবে না

আর তুমি?

তোমার সম্বন্ধে আমার মনোভাব এত বহুরূপী যে তার কোনও একটি নাম দেওয়া যায় না। যার পরিচয় আমি নিজেই ভাল করে জানিনে, তোমাকে তা কি বলে জানাব।

তোমার মনের কথা তুমি জানো আর না জানো আমি জানতুম্।

আমি যে জানতুম না, সে কথা সত্য—কিন্তু তুমি জান্‌তে কি না বল্‌তে পারি নে।

আমি যে জানতুম তা প্রমাণ করে দিচ্ছি। তুমি ভাবতে যে আমার সঙ্গে তুমি শুধু মন নিয়ে খেলা করছ।

তা ঠিক।

আর এ খেলায় তোমার জেত্‌বার এতটা জিদ ছিল যে তার জন্য তুমি প্রাণ পণ করেছিলে।

এ কথাও ঠিক।

কবে বুঝলে যে এ শুধু খেলা নয়?

আজ।

কি করে?

যখন তোমাকে ষ্টেশনে দেখলুম তখন তোমার মুখে আমি নিজের মনের চেহারা দেখতে পেলুম।

এতদিন তা দেখতে পাও নি কেন ?

তোমার মন আর আমার মনের ভিতর তোমার অহঙ্কার আর আমার অহঙ্কারের জোড়া পরদা ছিল। তোমার মনের পর্দ্দার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের পর্দ্দাও উঠে গেছে।

তুমি যে আমাকে কত ভালবাসো সে কথাও আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করবো না।

কেন ?

তাও আমি জানি।

কতটা ?

জীবনের চাইতে বেশি। যখন তোমার মনে হয় যে আমি তোমাকে ভালবাসি নে তখন তোমার কাছে বিশ্ব খালি হয়ে যায়, জীবনের কোনও অর্থ থাকে না।

এ সত্য কি করে জানলে ?

নিজের মন থেকে।

এই কথার পর 'রিণী' উঠে দাঁড়িয়ে বল্‌লে রাত হয়ে গেছে আমার বাড়ী যেতে হবে, চলো তোমাকে ষ্টেশনে পৌছে দিয়ে আসি।—'রিণী' পথ দেখাবার জন্য আগে আগে চলতে লাগল, আমি নীরবে তার অনুসরণ করতে আরম্ভ কল্লুম।

'মিনিট দশেক পরে 'রিণী' বল্লে—আমরা এতদিন ধরে' যে নাটকের অভিনয় করছি, আজ তার শেষ হওয়া উচিত।'

মিলনান্ত না বিয়োগান্ত ?

সে তোমার হাতে।

আমি বল্লুম—যারা একমাস পরস্পরকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না তাদের পক্ষে সমস্ত জীবন পরস্পরকে ছেড়ে থাকা কি সম্ভব?

তাহলে একত্র থাক্‌বার জন্য তাদের কি কর্‌তে হবে?

বিবাহ।

'তুমি কি সকল দিক্ ভেবে চিন্তে এ প্রস্তাব কর্‌ছ?'

আমার আর কোন দিক ভাববার চিন্তবার ক্ষমতা নেই। এই মাত্র আমি জানি যে তোমাকে ছেড়ে আমি আর একদিনও থাক্‌তে পার্‌ব না।

তুমি রোমান ক্যাথলিক হতে রাজি আছ?

এ কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়্‌ল। আমি নিরুত্তর রইলুম।

এর উত্তর ভেবে তুমি কাল দিয়ো। এখন আর সময় নেই, ওই দেখ তোমার ট্রেণ আস্‌ছে—সিগ্‌গির টিকেট কিনে নিয়ে এসো আমি তোমার জন্য প্লাটফরমে অপেক্ষা কর্‌ব।

আমি তাড়াতাড়ি টিকেট কিনে এসে দেখি রিণী অদৃশ্য হয়েছে। আমি একটি ফাষ্টক্লাস গাড়ীতে উঠতে যাচ্ছি এমন সময় সেখান থেকে George নামলেন। আমি ট্রেণে চড়্‌তে না চড়্‌তে গাড়ি ছেড়ে দিলে।

আমি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি "রিণী" আর George পাশাপাশি হেঁটে চলেছে।

সে রাত্তিরে বিকারের রোগীর মাথার যে অবস্থা হয় আমার তাই হয়েছিল, অর্থাৎ আমি ঘুমোইও নি জেগেও ছিলুম না।

পরদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবামাত্র চাকরে আমার হাতে একখানি চিঠি দিলে। শিরোনামায় দেখি রিণীর হস্তাক্ষর।

খুলে যা পড়্‌লুম তা এই—

"এখন রাত বারোটা। কিন্তু এমন একটা সুখবর আছে যা তোমাকে এখনই না দিয়ে থাক্‌তে পারছিনে। আমি এক বৎসর ধরে যা চেয়ে ছিলুম আজ তা হয়েছে। George আজ আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব

করেছে, আমি অবশ্য তাতে রাজি হয়েছি। এর জন্য ধন্যবাদটা বিশেষ করে' তোমারই প্রাপ্য। কারণ Georgeএর মত পুরুষ মানুষের মনে আমার মত রমণীকে পেতেও যেমন লোভ হয়, নিতেও তেমনি ভয় হয়। তাতেই ওদের মনস্থির করতে এত দেরি লাগে যে আমরা একটু সাহায্য না করলে সে মন আর কখনই স্থির হয় না। ওদের কাছে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে jealousy ওদের মনে যত jealousy বাড়ে, ওরা ভাবে ওরা তত বেশী ভালবাসে। ষ্টেশনে তোমাকে দেখেই George উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, তারপর যখন শুনলে যে তোমার একটা কথার উত্তর আমাকে কাল দিতে হবে তখন সে আর কাল বিলম্ব না করে আমাদের বিয়ে ঠিক করে ফেললে। এর জন্য আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ রইব এবং তুমিও আমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থেকো। কেননা তুমি যে কি পাগলামি করতে বসেছিলে, তা পরে বুঝবে। আমি বাস্তবিকই আজ তোমার Saviour হয়েছি।

তোমার কাছে আমার শেষ অনুরোধ এই যে, তুমি আমার সঙ্গে আর দেখা করবার চেষ্টা করো না। আমি জানি যে আমি আমার নতুন জীবন আরম্ভ করলে দুদিনেই তোমাকে ভুলে যাব, আর তুমি যদি আমাকে শীগ্‌গির ভুলতে চাও তাহলে, Miss Hildesheimerকে খুঁজে বার করে তাকে বিবাহ করো। সে যে আদর্শ স্ত্রী হবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তা ছাড়া আমি যদি Georgeকে বিয়ে করে সুখে থাকতে পারি, তাহলে তুমি যে Miss Hildesheimerকে নিয়ে কেন সুখে থাকতে পারবে না, তা বুঝতে পারি নে। ভয়ানক মাথা ধরেছে আর লিখতে পারি নে। Adieu"

এ ব্যাপারে আমি কি George বেশী কৃপার পাত্র তা আমি আজও বুঝতে পারি নি।

এ কথা শুনে সেন হেসে বললেন "দেখ সোমনাথ তোমার অহঙ্কারই এ বিষয়ে তোমাকে নির্ব্বোধ করে রেখেছে। এর ভিতর আর বোঝবার কি আছে? স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তোমার 'রিনী' তোমাকে বাঁদর নাচিয়েছে এবং

ঠকিয়েছে—সীতেশের তিনি যেমন তাকে করেছিলেন। সীতেশের মোহ ছিল শুধু একঘণ্টা তোমার তা আজও কাটে নি। যে কথা স্বীকার করবার সাহস সীতেশের আছে তোমার তা নেই। ও তোমার অহঙ্কারে বাধে।”

সোমনাথ উত্তর করিলেন—

‘ব্যাপারটা যত সহজ মনে করছ তত নয়। তাহলে আর একটু বলি। আমি ‘রিণীর’ পত্রপাঠ প্যারিসে যাই। মনস্থির করেছিলুম যে যতদিন না আমার প্রবাসের মেয়াদ ফুরোয় ততদিন সেখানেই থাকবো এবং লণ্ডনে শুধু Innএর term রাখতে বছরে চারবার করে যাব এবং প্রতি ক্ষেপে ছদিন করে থাকবো। মাস খানেক পরে, একদিন সন্ধ্যে বেলা হোটেলে বসে আছি—এমন সময়ে হটাৎ দেখি ‘রিণী’ এসে উপস্থিত। আমি তাকে দেখে চমকে উঠে বললুম যে “তবে তুমি Geogeকে বিয়ে করো নি, আমাকে শুধু ভোগা দেবার জন্য চিঠি লিখেছিলে— ?”

সে হেসে উত্তর করলে—

“বিয়ে না করলে প্যারিসে Honeymoon করতে এলুম কি করে ? তোমার খোঁজ নিয়ে তুমি এখানে আছ জেনে, আমি Georgeকে বুঝিয়ে পড়িয়ে এখানে এনেছি। আজ তিনি তার একটি বন্ধুর সঙ্গে ডিনার খেতে গিয়েছেন, আর আমি লুকিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।”

সে সন্ধ্যেটা রিণী আমার সঙ্গে গল্প করে কাটালে। সে গল্প হচ্ছে তার বিয়ের রিপোর্ট। আমাকে বসে বসে ও ব্যাপারের সব খুঁটিনাটি বর্ণনা শুনতে হ’ল। চলে যাবার সময় সে বললে—

“সে দিন তোমার কাছে ভাল করে বিদায় নেওয়া হয় নি। পাছে তুমি আমার উপর রাগ করে থাকো এই মনে করে আজ তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম। এই কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা।”

সোমনাথের কথা শেষ হতে না হতে, সীতেশ ঈষৎ অধীর ভাবে বললেন,—

“দেখ এ সব কথা তুমি এই মাত্র বানিয়ে বলছ। তুমি ভুলে গেছ যে

খানিক আগে তুমি বলেছ যে সেই B.তে "রিণীর" সঙ্গে তোমার শেষ দেখা। তোমার মিথ্যে কথা হাতে হতে ধরা পড়েছে।"

সোমনাথ তিলমাত্র ইতস্ততঃ না করে উত্তর দিলেন "আগে যা বলেছিলুম সেই কথাটাই মিথ্যে—আর এখন যা বল্‌ছি তাই সত্যি। গল্পের একটা শেষ হওয়া চাই বলে—আমি ঐ জায়গায় শেষ করেছিলুম। কিন্তু প্রকৃত জীবনে এমন অনেক ঘটনা ঘটে, যা অমন করে শেষ হয় না। সে প্যারিসের দেখাও শেষ দেখা নয় তারপর লণ্ডনে রিণীর সঙ্গে আমার বহুবার অমন শেষ দেখা হয়েছে।"

সীতেশ বল্‌লেন—

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি নে। এর একটা শেষ হয়েছে না হয় নি?"

হয়েছে।

কি করে'?

বিয়ের বছর খানেক পরেই George এর সঙ্গে 'রিণীর' ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আদালতে প্রমাণ হয়, যে George রিণীকে প্রহার করতে সুরু করেছিলেন,—তাও আবার মদের ঝোঁকে নয় ভালবাসার বিকারে তারপর রিণী Spain এর একটি Conventয়ে চিরজীবনের মত আশ্রয় নিয়েছে।

সীতেশ মহা উত্তেজিত হয়ে' বল্‌লেন "George তার প্রতি ঠিক ব্যবহারই করেছিল। আমি হ'লেও তাই করতুম।"

সোমনাথ বল্‌লেন—

"সম্ভবতঃ ও অবস্থায় আমিও তাই করতুম। ও ধর্ম্মজ্ঞান ও বলবীর্য্য আমাদের সকলেরি আছে। এই জন্যই ত দুর্ব্বলের পক্ষে—

"O crux ave unica spera"* এই হচ্ছে মানব মনের শেষ কথা।"

---

* ক্রশ্! তুমিই জীবনের একমাত্র ভরসা।

সীতেশ উত্তর কর্‌লেন—

"তোমার বিশ্বাস তোমার রিণী একটি অবলা—জানো সে কি? এক সঙ্গে চোর আর পাগল।

তাই যদি হয় তাহলেত তোমরা দুজনে চাঁদা করে এক সঙ্গে এক মনে এক প্রাণে তাকে ভালবাস্‌তে পারতে।

সেন এ কথার উত্তরে বল্‌লেন—

"চাঁদা করে' নয় পালা করে'। আমাদের দুজনের পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে একা করতে হয়েছে সুতরাং এ ক্ষেত্রে তুমি যথার্থই অনুকম্পার পাত্র"।

সোমনাথ ইতিমধ্যে একটি সিগরেট ধরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে অম্লান বদনে বল্‌লেন—

"আমি যে বিশেষ অনুকম্পার পাত্র এমন ত আমার মনে হয় না। কেন না পৃথিবীতে যে ভালবাসা খাঁটি তার্ ভিতর পাগলামি ও প্রবঞ্চনা দুই থাকে, ঐ টুকুইত ওর রহস্য।"

সীতেশের কাণে এ কথা এতই অদ্ভুত এতই নিষ্ঠুর ঠেকল যে তা শুনে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। কি উত্তর কর্‌বেন ভেবে না পেয়ে অবাক্ হয়ে রইলেন।

সেন বললেন "বাঃ সোমনাথ বাঃ এতক্ষণ পরে একটা কথার মত কথা বলেছ—এর মধ্যে যেমন নূতনত্ব আছে তেমনি বুদ্ধির খেলা আছে। আমাদের মধ্যে তুমিই কেবল, মনোজগতে নিত্য নতুন সত্যের আবিষ্কার করতে পারো"

সীতেশ আর ধৈর্য্যধরে থাকতে না পেরে বলে উঠলেন—

"অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি—এ কথা যে কতদূর সত্য তোমাদের এই সব প্রলাপ শুন্‌লে তা বোঝা যায়"—

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জাপান-যাত্রীর পত্র।

(১)

বম্বাই থেকে যতবার যাত্রা করেচি জাহাজ চল্‌তে দেরি করে নি। কল্‌কাতার জাহাজে যাত্রার আগের রাত্রে গিয়ে বসে থাক্‌তে হয়। এটা ভাল লাগে না। কেননা যাত্রা করার মানেই মনের মধ্যে চলার বেগ সঞ্চয় করা। মন যখন চলবার মুখে, তখন তাকে দাঁড় করিয়ে রাখা তার এক শক্তির সঙ্গে আর এক শক্তির লড়াই বাধানো। মানুষ যখন ঘরের মধ্যে জমিয়ে বসে আছে, তখন বিদায়ের আয়োজনটা এই জন্যেই কষ্টকর; কেন না, থাকার সঙ্গে যাওয়ার সন্ধিস্থলটাই মনের পক্ষে মুস্কিলের জায়গা,—সেখানে তাকে দুই উল্টো দিক সামলাতে হয়,—সে একরকমের কঠিন ব্যায়াম।

বাড়ীর লোকেরা সকলেই জাহাজে চড়িয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল, বন্ধুরা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিয়ে বিদায় নিলে, কিন্তু জাহাজ চল্‌ল না। অর্থাৎ যারা থাকবার তারাই গেল, আর যেটা চলবার সেটাই স্থির হয়ে রইল,—বাড়ি গেল সরে, আর তরী রইল দাঁড়িয়ে।

বিদায় মাত্রেরই একটা ব্যথা আছে,—সে ব্যথাটার প্রধান কারণ এই, জীবনে যা-কিছুকে সব চেয়ে নির্দ্দিষ্ট করে' পাওয়া গেছে, তাকে অনির্দ্দিষ্টের আড়ালে সমর্পণ করে' যাওয়া। তার বদলে হাতে হাতে আর একটা কিছুকে পাওয়া না গেলে এই শূন্যতাটাই মনের মধ্যে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেই পাওনাটা হচ্চে অনির্দ্দিষ্টকে নির্দ্দিষ্টের মধ্যে পেতে থাকা। সেই জন্যে যাত্রার মধ্যে যে দুঃখ আছে, চলাটাই

হচ্চে তার ওষুধ। কিন্তু যাত্রা করলুম অথচ চল্লুম না—এটা সহ্য করা শক্ত।

অচল জাহাজের ক্যাবিন হচ্চে বন্ধনদশার চুই-চোলাই-করা কড়া আরক। জাহাজ চলে বলে'ই তার কাম্‌রার সঙ্কীর্ণতাকে আমরা ক্ষমা করি। কিন্তু জাহাজ যখন স্থির থাকে তখন ক্যাবিনে স্থির থাকা, মৃত্যুর ঢাক্‌নাটার নীচে আবার গোরের ঢাক্‌নার মত।

ডেকের উপরেই শোবার ব্যবস্থা করা গেল। ইতিপূর্ব্বে অনেকবার জাহাজে চড়েচি, অনেক কাপ্তেনের সঙ্গে ব্যবহার করেচি। আমাদের এই জাপানি কাপ্তেনের একটু বিশেষত্ব আছে। মেলামেশায় ভালমানুষীতে হঠাৎ মনে হয় ঘোরো লোকের মত। মনে হয় এঁকে অনুরোধ করে' যা খুসি-তাই করা যেতে পারে,—কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যায় নিয়মের লেশমাত্র নড়চড় হবার জো নেই। আমাদের সহযাত্রী ইংরেজ বন্ধু ডেকের উপরে তাঁর ক্যাবিনের গদি আনবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের ঘাড় নড়ল, সে ঘটে উঠ্‌ল না। সকালে ব্রেক্‌ফাষ্টের সময় তিনি যে-টেবিলে বসেছিলেন, সেখানে পাখা ছিল না; আমাদের টেবিলে জায়গা ছিল, সেই দেখে তিনি আমাদের টেবিলে বসবার ইচ্ছা জানালেন। অনুরোধটা সামান্য, কিন্তু কাপ্তেন বল্লেন, এ বেলাকার মত বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, ডিনারের সময় দেখা যাবে। আমাদের টেবিলে চৌকি খালি রইল, কিন্তু তবু নিয়মের ব্যত্যয় হল না। বেশ বোঝা যাচ্ছে, অতি অল্পমাত্রও ঢিলেঢালা কিছু হতে পারবে না।

রাত্রে বাইরে শোওয়া গেল, কিন্তু এ কেমনতরো বাইরে? জাহাজের মাস্তুলে আকাশ যেন ভীষ্মের মত শরশয্যায় শুয়ে মৃত্যুর অপেক্ষা করচে। কোথাও শূন্যরাজ্যের ফাঁকা নেই। অথচ বস্তুরাজ্যের স্পষ্টতাও নেই।

জাহাজের আলোগুলো মস্ত একটা আয়তনের সূচনা করচে, কিন্তু কোনো আকারকে দেখ্‌তে দিচ্চে না।

কোনো একটি কবিতায় প্রকাশ করেছিলুম যে, আমি নিশীথরাত্রির সভাকবি। আমার বরাবর এই কথাই মনে হয় যে, দিনের বেলাটা মর্ত্ত্যলোকের, আর রাত্রিবেলাটা সুরলোকের। মানুষ ভয় পায়, মানুষ কাজকর্ম্ম করে, মানুষ তার পায়ের কাছের পথটা স্পষ্ট করে' দেখ্‌তে চায়, এই জন্যে অত বড় একটা আলো জ্বালতে হয়েচে। দেবতার ভয় নেই, দেবতার কাজ নিঃশব্দে গোপনে. দেবতার চলার সঙ্গে স্তব্ধতার কোনো বিরোধ নেই,এই জন্যেই অসীম অন্ধকার দেবসভার আস্তরণ। দেবতা রাত্রেই আমাদের বাতায়নে এসে দেখা দেন।

কিন্তু মানুষের কারখানা যখন আলো জ্বালিয়ে সেই রাত্রিকেও অধিকার করতে চায়, তখন কেবল যে মানুষই ক্লিষ্ট হয় তা নয়,—দেবতাকেও ক্লিষ্ট করে তোলে। আমরা যখন থেকে বাতি জেলে রাত জেগে এগ্‌জামিন পাস করতে প্রবৃত্ত হয়েচি, তখন থেকেই সূর্য্যের আলোয় সুস্পষ্ট নির্দ্দিষ্ট নিজের সীমানা লঙ্ঘন করতে লেগেচি, তখন থেকেই সুর-মানবের যুদ্ধ বেধেচে। মানুষের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো ফুঁ দিয়ে দিয়ে নিজের অন্তরের কালীকে দ্যুলোকে বিস্তার করচে, সে অপরাধ তেমন গুরুতর নয়,—কেন না দিনটা মানুষের নিজের, তার মুখে সে কালী মাখালেও দেবতা তা নিয়ে নালিশ করবেন না। কিন্তু রাত্রির অখণ্ড অন্ধকারকে মানুষ যখন নিজের আলো দিয়ে ফুটো করে দেয়, তখন দেবতার অধিকারে সে হস্তক্ষেপ করে। সে যেন নিজের দখল অতিক্রম করে আলোকের খুঁটি গেড়ে দেবলোকে আপন সীমানা চিহ্নিত করতে চায়।

সেদিন রাত্রে গঙ্গার উপরে সেই দেববিদ্রোহের বিপুল আয়োজন দেখ্‌তে পেলুম। তাই মানুষের ক্লান্তির উপর সুরলোকের শান্তির আশীর্ব্বাদ দেখা গেল না। মানুষ বল্‌তে চাচ্চে আমিও দেবতার মত, আমার ক্লান্তি নেই। কিন্তু সেটা মিথ্যা কথা—এইজন্যে সে চারিদিকের শান্তি নষ্ট করচে। এইজন্যে অন্ধকারকেও সে অশুচি করে তুলেচে।

দিন আলোকের দ্বারা আবিল, অন্ধকারই পরম নির্ম্মল। অন্ধকার রাত্রি সমুদ্রের মত,—তা অঞ্জনের মত কালো, কিন্তু তবু নিরঞ্জন। আর দিন নদীর মত,—তা কালো নয়, কিন্তু পঙ্কিল। রাত্রির সেই অতলস্পর্শ অন্ধকারকেও সেদিন সেই খিদিরপুরের জেটির উপর মলিন দেখ্‌লুম। মনে হল, দেবতা স্বয়ং মুখ মলিন করে' রয়েচেন।

এম্‌নি খারাপ লেগেছিল এডেনের বন্দরে। সেখানে মানুষের হাতে বন্দী হয়ে সমুদ্রও কলুষিত। জলের উপর তেল ভাস্‌চে, মানুষের আবর্জ্জনাকে স্বয়ং সমুদ্রও বিলুপ্ত করতে পারচে না। সেই রাত্রে জাহাজের ডেকের উপর শুয়ে অসীম রাত্রিকেও যখন কলঙ্কিত দেখলুম, তখন মনে হল একদিন ইন্দ্রলোক দানবের আক্রমণে পীড়িত হয়ে ব্রহ্মার কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন—আজ মানবের অত্যাচার থেকে কোন্ রুদ্র দেবতাদের রক্ষা করবেন ?

(২)

জাহাজ ছেড়ে দিলে। মধুর বহিছে বায়ু ভেসে চলি রঙ্গে।

কিন্তু এর রঙ্গটা কেবলমাত্র ভেসে চলার মধ্যেই নয়। ভেসে চলার একটি বিশেষ দৃষ্টি আছে। যখন হেঁটে চলি তখন কোনো অখণ্ড ছবি চোখে পড়ে না। ভেসে চলার মধ্যে দুই বিরোধের পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়েচে—বসেও আছি, চল্‌চিও। সেই জন্যে চলার কাজ হচ্চে, অথচ

চলার কাজে মনকে লাগাতে হচ্চে না। তাই মন, যা সামনে দেখচে তাকে পূর্ণ করে' দেখ্‌ছে। জল স্থল আকাশের সমস্তকে এক করে মিলিয়ে দেখ্‌তে পাচ্চে।

ভেসে চলার মধ্যে দিয়ে দেখার আর একটা গুণ হচ্চে এই যে, তা মনোযোগকে জাগ্রত করে, কিন্তু মনোযোগকে বদ্ধ করে না। না দেখ্‌তে পেলেও চল্‌ত, কোনো অসুবিধে হত না, পথ ভুল্‌তুম না, গর্ত্তয় পড়্‌তুম না। এই জন্যে ভেসে চলার দেখাটা হচ্চে নিতান্তই দায়িত্ববিহীন দেখা,—দেখাটাই তার চরম লক্ষ্য—এই জন্যেই এই দেখাটা এমন বৃহৎ, এমন আনন্দময়।

এতদিনে এইটুকু বোঝা গেছে যে, মানুষ নিজের দাসত্ব করতে বাধ্য, কিন্তু নিজের দাসত্ব করতে তার প্রীতি নেই। খাওয়া পরা, দেওয়া নেওয়ার দরকার তাকে মেটাতেই হয়, কিন্তু তার বাইরে যেখানে তার উদ্বৃত্ত, সেইখানেই সে মুক্ত, সেইখানেই সে আপনার পরিচয় পায়। এই জন্যেই ঘটিবাটি প্রভৃতি দরকারী জিনিসকেও মানুষ সুন্দর করে' গড়ে' তুলতে চায়,—প্রয়োজনকেই চরম করে' দেখ্‌তে তার লজ্জা। "আমি আরো বড়" এই ব্যঞ্জনাটিকে সে আপনার সমস্ত কিছুর সঙ্গে যুক্ত করতে চায়।

আমার না হলেও চল্‌ত, কেবল আমি ইচ্ছা করে' করচি, এই যে মুক্ত কর্ত্তৃত্বের ও মুক্ত ভোক্তৃত্বের অভিমান, যে অভিমান বিশ্ব-স্রষ্টার এবং বিশ্বরাজ্যেশ্বরের,—সেই অভিমানই মানুষের সাহিত্যে এবং আর্টে। এই রাজ্যটি মুক্ত মানুষের রাজ্য, এখানে জীবনযাত্রার দায়িত্ব নেই।

আজ সকালে যে প্রকৃতি সবুজ পাড়-দেওয়া গেরুয়া নদীর সাড়ি

পরে' আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়েছে, আমি তাকে দেখ্‌চি। এখানে আমি বিশুদ্ধ দ্রষ্টা। এই দ্রষ্টা আমি যদি নিজেকে প্রকাশ করত, তাহলে সেইটেই হত সাহিত্য, সেইটেই হত আর্ট। খামকা বিরক্ত হয়ে এমন কথা কেউ বল্‌তে পারে "তুমি দেখ্‌ছ তাতে আমার গরজ কি? তাতে আমার পেটও ভরবে না, আমার ম্যালেরিয়াও ঘুচবে না, তাতে আমার ফসল-ক্ষেতে বেশি করে ফসল ধরবার উপায় হবে না।" ঠিক কথা। আমি যে দেখচি এতে তোমার কোনো গরজ নেই। কিন্তু আমি যে শুদ্ধমাত্র দ্রষ্টা, এ সম্বন্ধে বস্তুতই যদি তুমি উদাসীন হও—তাহলে জগতে আর্ট এবং সাহিত্য সৃষ্টির কোনো মানে থাকে না। আমাকে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পার আজ এতক্ষণ ধরে' তুমি যে লেখাটা লিখচ, ওটাকে কি বল্‌বে? সাহিত্য, না তত্ত্বালোচনা?

নাই বল্লুম তত্ত্বালোচনা। তত্ত্বালোচনায় যে ব্যক্তি আলোচনা করে, সে প্রধান নয়, তত্ত্বটাই প্রধান। সাহিত্যে সেই ব্যক্তিটাই প্রধান, তত্ত্বটা উপলক্ষ্য। এই যে শাদা মেঘের ছিটে-দেওয়া নীল আকাশের-নীচে শ্যামলঐশ্বর্য্যময়ী ধরণীর আঙিনার সাম্‌নে দিয়ে সন্ন্যাসী জলের স্রোত উদাসী হয়ে চলেচে, তার মাঝখানে প্রকাশ পাচ্চে দ্রষ্টা আমি। যদি ভূতত্ত্ব বা ভূবৃত্তান্ত প্রকাশ করতে হত, তাহলে এই আমিকে সরে' দাঁড়াতে হত। কিন্তু এক আমির পক্ষে আর এক আমির অহেতুক প্রয়োজন আছে, এই জন্য সময় পেলেই আমরা ভূ-তত্ত্বকে সরিয়ে রেখে আমির সন্ধান করি।

তেম্‌নি করেই কেবলমাত্র দৃশ্যের মধ্যে নয়, ভাবের মধ্যেও যে ভেসে চলেচে, সেও সেই দ্রষ্টা-আমি। সেখানে, যা বল্‌চে সেটা উপলক্ষ্য, যে বল্‌চে সেই লক্ষ্য। বিশ্বসৃষ্টির দিকেও আমি যেমন

তাকাতে তাকাতে চলেচি, মানবের কলাসৃষ্টি এবং সাহিত্যসৃষ্টির দিকেও আমি তেম্‌নি চিত্তদৃষ্টি দিয়ে তাকাতে তাকাতে চলেচি। আমার চোখের সামনে একদিকে রূপের ধারা, আমার মনের সামনে আর একদিকে চিন্তার ধারা। এই চিন্তার ধারা প্রধানতঃ লজিকের দ্বারা গাঁথা নয়, এর গ্রন্থনসূত্র মুখ্যত আমি। সেই জন্যে আমি কেয়ারমাত্র করিনে সাহিত্য সম্বন্ধে আমার এই রচনাটিকে লোকে পাকা কথা বলে গ্রহণ করবে কি না। বিশ্বলোকে এবং চিত্তলোকে "আমি দেখচি" এই অনাবশ্যক আনন্দের কথাটা বলাই হচ্চে আমার কাজ।

উপনিষদে আছে, এক-ডালে দুই পাখী আছে, তার মধ্যে এক পাখী খাচ্ছে, আর-এক পাখী দেখচে। যে পাখী দেখচে তারি আনন্দ বড় আনন্দ, কেন না, তার সে বিশুদ্ধ আনন্দ, মুক্ত আনন্দ। মানুষের নিজের মধ্যেই এই দুই পাখী আছে। এক পাখীর প্রয়োজন আছে, আর-এক পাখীর প্রয়োজন নেই। এক পাখী ভোগ করে, আর-এক পাখী দেখে। যে-পাখী ভোগ করে সে নির্ম্মাণ করে, যে-পাখী দেখে সে সৃষ্টি করে। নির্ম্মাণ করা মানে মাপে তৈরি করা; অর্থাৎ যেটা তৈরি করা হচ্ছে সেইটেই চরম নয়, সেইটেকে অন্য কিছুর মাপে তৈরি করা,—নিজের প্রয়োজনের মাপে বা অন্যের প্রয়োজনের মাপে। আর সৃষ্টি করা অন্য কোনো-কিছুর মাপের অপেক্ষা করে না, সে হচ্চে নিজেকে সর্জ্জন করা, নিজেকেই প্রকাশ করা। এই জন্য ভোগী পাখী যে সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করচে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখীর উপকরণ হচ্ছে আমি পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোনো দায়ই নেই, কর্ত্তব্যের দায়ও না।

পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় রহস্য, দেখবার বস্তুটি নয়, যে দেখে সেই মানুষটি। এই রহস্য আপনি আপনার ইয়ত্তা পাচ্চে না,—হাজার হাজার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আপনাকে দেখ্‌তে চেষ্টা করচে। যা-কিছু ঘট্‌চে এবং যা-কিছু ঘট্‌তে পারে, সমস্তর ভিতর দিয়ে নিজেকে বাজিয়ে দেখ্‌চে।

এই যে আমার এক-আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চলে' চলে' নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলন-জাত রসের উপলব্ধিই হচ্চে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

তোসা মারু জাহাজ
২০শে বৈশাখ ১৩২৩ শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বাষক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্‌লী নোট্‌স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

ফরাসী সাহিত্যের বর্ণ-পরিচয়।

(রামমোহন লাইব্রেরীতে পঠিত)

আমি আপনাদের সুমুখে ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা ক'রতে প্রস্তুত হয়েছি এ সংবাদ শুনে আমার কোন শুভার্থী বন্ধু অতিশয় ব্যতিব্যস্তভাবে আমার নিকট উপস্থিত হ'য়ে বলেন যে "তুমি ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে এত কম জানো যে আমি ভেবে পাচ্ছিনে কি ভরসায় তুমি এ কাজ ক'রতে উদ্যত হয়েছ ?" আমি উত্তর করি —"এই ভরসায়—যে আমার শ্রোতৃমণ্ডলী এ বিষয়ে আমার চাইতেও কম জানেন।"

এ কথা স্বীকার ক'রতে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি যৎসামান্য ; কেননা সে সাহিত্য এত বিপুল ও এত বিস্তৃত যে, তার সম্যক পরিচয় লাভ ক'রতে একটি পুরো জীবন কেটে যায়। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী হ'তে আরম্ভ করে অদ্যাবধি, এই ন'শ' বৎসর ধ'রে ফরাসীজাতি অবিরাম সাহিত্য সৃষ্টি করে আস্‌ছে। সুতরাং ফরাসী সরস্বতীর ভাণ্ডারে যে ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত রয়েছে, তার আদ্যোপান্ত পরিচয় নেবার সুযোগ এবং অবসর আমার জীবনে ঘটেনি। এর যে অংশের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা আছে, সে হ'চ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য-সাহিত্য। প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যের উদ্যানে আমি শুধু পল্লব গ্রহণ করেছি। কিন্তু এই স্বল্পপরিচয়ের ফলেই আমার মনে ফরাসী সভ্যতার প্রতি একটি আন্তরিক অনুরাগ জন্মলাভ ক'রেছে। সে সাহিত্যের এমন

একটি মোহিনীশক্তি আছে যে, যিনিই তার চর্চ্চা করেন তাঁরই মন ফরাসী সভ্যতার প্রতি একান্ত অনুকূল হয়। যিনিই ফরাসী সাহিত্য ভালবাসেন তিনিই ফরাসীজাতির সুখের সুখী ব্যাথার ব্যাথী হ'য়ে ওঠেন। আজকের দিনে ফ্রান্স তার জাতীয় জীবনের অণু—পরমাণুতে যে অত্যাচারের-বেদনা অনুভব ক'র্ছে, আমরাও তার অংশীদার। জর্ম্মণীর দেহবলের নিকট ফ্রান্সের আত্মবল, জর্ম্মণীর যন্ত্রশক্তির নিকট ফ্রান্সের মন্ত্রশক্তি যদি পরাভূত হয়, যদি এই যুদ্ধে ফরাসীসভ্যতা ধ্বংশপ্রাপ্ত হয়, তাহ'লে ইউরোপের মনোজগতের আলো নিবে যাবে। কি গুণে ফ্রান্স অপর জাতির ভক্তি ও প্রীতি আকর্ষণ ক'র্তে পারে, সে বিষয়ে সুবিখ্যাত মার্কিন নভেলিষ্ট Henry Jamesএর কথা নিম্নে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি।

"Our heroic friend sums up for us, in other words, and has always summed up, the life of the mind and the life of the senses alike, taken together, in the most irrepressible freedom of either, and, after that fashion, positively lives for us, carries on experience for us. * *

She is sole and single in this, that she takes charge of those of the interests of man which most dispose him to fraternise with himself, to pervade all his possibilities and to taste all his faculties, and in consequence to find and to make the earth a friendlier, an easier, and specially a more various sojourn. * *

She has gardened where the soil of humanity has been most grateful and the aspect, so to call it, most toward the sun, and there at the high and yet mild and fortunate centre, she has grown the precious, intimate, the nourishing, finishing things that she has inexhaustively scattered abroad.*

এই কথাগুলি যেমন সুন্দর তেমনি সত্য।

ইহজীবনে আমাদের দেহমনের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। এই সত্যের উপরই ফরাসী সাহিত্যের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত। ফরাসীজাতি চিন্তারাজ্যে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়েও দেয় নি, অকিঞ্চিৎকর ব'লে উপেক্ষা করে নি; সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের ভিতর Science এবং Artএর একত্রে সাক্ষাৎলাভ করা যায়। Henry James বলেছেন যে, ফরাসীজাতি বিশেষ ক'রে সেই সকল মনোভাবের অনুশীলন করেছেন, যাতে ক'রে মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা জন্মায়। এই গুণেই ফরাসীসভ্যতা পরকে আপন ক'রতে পারে। ফরাসী সাহিত্য প্রধানতঃ মানবমনের সাধারণ ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ব'লেই তা সর্ব্বলোকগ্রাহ্য এবং সর্ব্বলোক-প্রিয়। "বসুধৈব কুটুম্বকম্" ফরাসী সভ্যতার এই বীজমন্ত্র কোনও ধর্ম্মমতের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আপনারা সকলেই জানেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর যে সকল ফরাসী দার্শনিক বিশ্বমৈত্রীর বার্ত্তা ঘোষণা

* The Book of France, Macmillan & Co. (1915).

করেন, তাঁরা প্রায় সকলেই নাস্তিক ছিলেন। মানবচরিত্রের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপরেই ফরাসী মনোভাব প্রতিষ্ঠিত, এবং সে মনোভাব প্রধানতঃ ফরাসী সাহিত্যই গঠিত ক'রে তুলেছে। Henry James বলেছেন যে ফরাসী মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে। দিনের আলোয় যা দেখা যায় না, ফরাসী-মন স্বভাবতই তা দেখ্‌তে চায় না; এর ফলে যে মনোভাব অস্পষ্ট ও অস্ফুট—যে সত্য ধরা দেয় না, শুধু আভাসে ইঙ্গিতে আত্মপরিচয় দেয়—সে মনোভাবের, সে সত্যের সাক্ষাৎ ফরাসী সাহিত্যে বড় একটা পাওয়া যায় না। সরস্বতীদর্শনের কাল, ফরাসী কবিদের মতে গোধুলি-লগ্ন নয়। যা কেবলমাত্র কল্পনার ধন, সে ধনে ফরাসী সাহিত্য অনেক পরিমাণে বঞ্চিত। অপর পক্ষে এই আলোক-প্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব্ব উজ্জ্বলতা লাভ ক'রেছে। এর তুল্য স্পষ্টভাষী সাহিত্য ইউরোপে আর দ্বিতীয় নেই। আমরা "স্পষ্টভাষী" শব্দ সচরাচর যে অর্থে ব্যবহার করি, সে অর্থে এ সাহিত্য স্পষ্টভাষী নয়। যিনি দিবারাত্র অপরকে অপ্রিয় কথা ব'ল্‌তে ব্যস্ত, এদেশে আমরা তাঁকেই স্পষ্ট-বক্তা বলি—ভাষায় যাকে বলে ঠোঁটকাটা। ফরাসী সাহিত্য কিন্তু ঠোঁটকাটা সাহিত্য নয়। ফরাসীজাতির ক্ষাত্রধর্ম্ম জগৎবিখ্যাত। ফরাসী লেখকেরা বাক্‌যুদ্ধেও সভ্যতার আইনকানুন মেনে চলেন। সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা ধর্ম্মযুদ্ধের পক্ষপাতী। ফরাসী জাতি হাস্‌তে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণ হাসির যে কি মর্ম্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক। যার হাতে

তরবারি আছে—সে লগুড় ব্যবহার করে না। Voltaireএর হাসির যে বিশ্বজয়ী শক্তিছিল, তার তুলনায় পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের সকল Jeremiahর উচ্চবাচ্য যে ব্যর্থ, এ সত্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক জানে।

ফরাসী সাহিত্য এই অর্থে স্পষ্টভাষী যে, সে সাহিত্যের ভাষায় জড়তা কিম্বা অস্পষ্টতার লেশমাত্রও নেই। যে বিষয়ে লেখকের পরিষ্কার ধারণা আছে, সেই কথা অতি পরিষ্কার ক'রে বলাই হ'চ্চে ফরাসী সাহিত্যের ধর্ম্ম। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ফরাসী সাহিত্যের ভিতর Science এবং Art দুই আছে। ফরাসীমনের এই প্রসাদ-গুণ-প্রিয়তার ফলে, সে দেশের দর্শন বিজ্ঞানের ভিতরও সাহিত্যরস থাকে। পাণ্ডিত্য না ক'রে অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় একমাত্র ফরাসী লেখকেরাই দিতে পারেন। জ্ঞান বিজ্ঞানের ঐকান্তিক চর্চ্চাতেও ফরাসী পণ্ডিতদের সামাজিক-বুদ্ধি ও রসজ্ঞান নষ্ট হয় না। প্রকৃত দার্শনিক কি বৈজ্ঞানিক কেবলমাত্র নিজের ব্যবহারের জন্য সত্য আবিষ্কার করতে ব্রতী হন না। মানবজাতির নিকট সত্য প্রকাশ ও প্রচার করাই তাঁর সর্ব্বপ্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং যে সত্য তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা' পরিষ্কার ক'রে অপরকে দেখিয়ে দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া, যা' জটিল তাকে সরল করা—যা' কঠিন তাকে সহজ করা, তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এক কথায় scientist এর পক্ষে artist, জ্ঞানীর পক্ষে গুণী হওয়া আবশ্যক। জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের সঙ্গে তুলনা ক'রলেই দেখা যায় ফরাসী পণ্ডিতেরা কত শ্রেষ্ঠ গুণী। জর্ম্মাণ পণ্ডিতেরা অসাধারণ পরিশ্রম ক'রে যা' প্রস্তুত করেন তা' অধিকাংশ সময়ে বিদ্যার গ্যাস বই আর কিছুই

নয়। অপর পক্ষে ফরাসী পণ্ডিতেরা মানবজাতির চোখের সুমুখে যা ধরে দেন, সে হ'চ্ছে গ্যাসের আলো। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান দার্শনিক Bergsonএর গ্রন্থসকলের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে, সে সকল গ্রন্থ কাব্য হিসাবেও সাহিত্যের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে। Bergsonএর দর্শন অতি কঠিন, কিন্তু তাঁর রচনা যেমন প্রাঞ্জল তেমনি উজ্জ্বল। দার্শনিক জগতের এই অদ্বিতীয় শিল্পীর হাতে গদ্য রচনা অপূর্ব্ব চমৎকারিত্ব লাভ ক'রেছে। মণিকার যেমন রত্নের সঙ্গে রত্নের যোজনা করেন, Bergson তেমনি পদের সঙ্গে পদের যোজনা করেন। চিন্তারাজ্যের এই ঐন্দ্রজালিকের লেখনীর মুখে বশীকরণ মন্ত্র আছে। এই স্বচ্ছতা, এই উজ্জ্বলতার বলেই ফরাসী সাহিত্য যুগে যুগে ইউরোপের অপরাপব সাহিত্যের উপর নিজের প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। আলোর ধর্ম্ম এই যে, তা দিগদিগন্তে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে এবং সকল দেশকেই নিজের কিরণে উদ্ভাসিত ক'রে তোলে। এই কারণেই আমি পূর্ব্বে বলেছি, ফরাসী সভ্যতার নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গেই মানবের মনোজগতের আলো নিবে যাবে।

(২)

এ স্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, "ফরাসী সভ্যতার অধঃপতন হ'লেও তার পূর্ব্ব কীর্ত্তি সবই বিশ্বমানবের জন্য সঞ্চিত থাকবে— অতএব সে সভ্যতার বিনাশে পৃথিবীর এমন কি ক্ষতি হবে?" এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব—"এতে পৃথিবীর যে ক্ষতি হবে তা"

ইউরোপের অপর কোনও জাতি পূরণ করতে পারবে না।" এ মতের স্বপক্ষে হেনরি-জেম্‌সের আর একটি কথা উদ্ধৃত ক'রে দিচ্চি। তিনি বলেন যে, ফরাসী ইতিহাস ও ফরাসী সাহিত্য বিশ্ব-মানবকে এ আশা ক'রতে শিখিয়েছে যে, ফরাসী সভ্যতা যুগে যুগে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে,—এবং এ আশা ভঙ্গ ক'রলে ফ্রান্সের পক্ষে মানবজাতির নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। তাঁর নিজের কথা এই—

"And we have all so taken them from her so expected them from her as our right, to the point that she would have seemed positively to fail of a passed pledge to help us to happiness if she had disappointed us, this has been because of her treating us to the impression of genius as no nation since the Greeks has treated the watching world and because of our feeling that genius at that intensity is infallible."

সম্প্রতি কোনও কোনও জর্ম্মণ প্রফেসার বর্ত্তমান জর্ম্মণ জাতির পক্ষ থেকে প্রচীন গ্রীক জাতির genius এর উত্তরাধিকারের দাবী করেছেন—কিন্তু এ দাবী উক্ত জর্ম্মাণ প্রফেসার সম্প্রদায় ব্যতীত পৃথিবীর অপর কোন জাতিই মঞ্জুর করেন নি। অপর পক্ষে ফরাসীজাতির genius যে অদম্য, Von Bulow প্রভৃতি জর্ম্মান রাজমন্ত্রীরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন।

Genius শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য হ'চ্ছে প্রতিভা। কিন্তু

এই প্রতিভা শব্দের অর্থ নিয়ে বিষম মতভেদ আছে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতে প্রতিভার অর্থ নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধি। এ অর্থে ফরাসীজাতি যে অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী, তার প্রমাণের জন্য বেশি দূর যাবার দরকার নেই। গত শত বৎসরের ফ্রান্সের ইতিহাসের প্রতি অধ্যায়ে তার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করে নি। এই একশ' বৎসরের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে ফ্রান্স বারম্বার পীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়েছে, অথচ এই অশান্তি, এই উপদ্রবের ভিতরেও, ফ্রান্স মানবজীবনের প্রতিক্ষেত্রেই তার নব-নব-উন্মেষশালিনী বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে Pasteur এবং দর্শনের ক্ষেত্রে Bergson যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ। আর সাহিত্য ক্ষেত্রে Hugo এবং Musset, Gautier এবং Verlaine প্রমুখ কবির, Renan এবং Taine প্রমুখ সমালোচকের, Stendhal এবং Balzac, Flaubert এবং Maupassant, Loti এবং Anatole France প্রমুখ উপন্যাসকারের, Rostand এবং Brieux প্রমুখ নাটককারের নাম ইউরোপের শিক্ষিত সমাজে কার নিকট অবিদিত? এঁরা সকলেই কাব্যজগতের নব পথের পথিক— নব বস্তুর স্রষ্টা। এবং এঁদের রচিত সাহিত্য যতই নতুন হোক্— এক ফ্রান্স ব্যতীত অপর কোনও দেশে তা' রচিত হ'তে পারত না, কেননা এ সকল কাব্যকথা আলোচনার ভিতর থেকে এক-মাত্র ফরাসী প্রতিভাই ফুটে উঠেছে। এ সাহিত্য সম্পূর্ণ নতুন হ'লেও বিজাতীয় নয়, পূর্ব্বপূর্ব্ব যুগের ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে এর রক্তের যোগ আছে। ফরাসী প্রতিভা যে কি পরিমাণে

অদম্য,—দর্শনে বিজ্ঞানে, কাব্যে সাহিত্যে এই সকল নব কীর্ত্তিই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অপর পক্ষে জর্ম্মাণীর দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলে আমরা কি দেখ্‌তে পাই? উনবিংশ শতাব্দী, সাংসারিক হিসাবে, জর্ম্মাণির সত্য যুগ। এই শত বৎসরের মধ্যে জর্ম্মাণী বাণিজ্যে ও সাম্রাজ্যে, বাহুবলে ও অর্থবলে অসাধারণ অভ্যুদয় লাভ করেছে। কিন্তু এই অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার কবি-প্রতিভা, তার দার্শনিক-বুদ্ধি অন্তর্হিত হ'য়েছে। গেটে, শিলার, কাণ্ট, হেগেলের বংশ লোপ পেয়েছে। সে দেশে এখন যা' আছে সে হ'চ্ছে ষষ্টি-সহস্র বালখিল্য প্রফেসার। এরা সকলেই জ্ঞানরাজ্যের মুটে মজুর—কেউ রাজা মহারাজা নয়।

(৩)

ফরাসী সাহিত্যের বিশেষ ধর্ম্মটি যে কি, আজকে এ সভায় আমি সংক্ষেপে তারই পরিচয় দিতে চাই।

বর্ত্তমান ইউরোপের দুটি সর্ব্বপ্রধান সাহিত্য হ'চ্ছে ইংরাজি ও ফরাসী। ইউরোপের অপর কোন দেশের সাহিত্য, ঐশ্বর্য্যে ও গৌরবে—এই দুই সাহিত্যের সমকক্ষ নয়।

ইংরাজি সাহিত্যের সহিত আমাদের সকলেরই যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুতরাং ইংরাজি সাহিত্যের সহিত ফরাসী সাহিত্যের পার্থক্যের পরিচয় লাভ ক'রতে পারলে আমরা ফরাসী সাহিত্যের বিশেষত্বের সন্ধান পাব।

এক কথায় ব'ল্‌তে গেলে ইংরাজি সাহিত্য Romantic এবং ফরাসী সহিত্য Realistic.

Realism এবং Romanticism ব'ল্‌তে ঠিক যে কি বোঝায় যে সম্বন্ধে সাহিত্য-সমাজে বহুকালাবধি বহু তর্কবিতর্ক চ'লে আস্‌ছে। কিছুদিন হ'ল বাঙ্গলা সাহিত্যেও সে আলোচনা সুরু হয়েছে।

আজকের এ প্রবন্ধে সে আলোচনার স্থান নেই, তবে সাহিত্যের এ দুই মার্গের মোটামুটি লক্ষণগুলি নির্দ্দেশ করা কঠিন নয়।

Romantic সাহিত্যের প্রথম লক্ষণ এই যে' তা subjective. রোমাণ্টিক্ কবি প্রধানতঃ নিজের হৃদয়ের কথাই বলেন,—নিজের সুখ দুঃখ, নিজের আশা নৈরাশ্য, নিজের বিশ্বাস সংশয়—এই সকলই হ'চ্ছে তাঁর কাব্যের উপাদান ও সম্বল। শুধু তাই নয়, খাঁটি রোমাণ্টিকের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব হ'চ্ছে জগতের সার সত্য। বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম কবি চণ্ডিদাসের কবিতা আগাগোড়া subjective, অপর পক্ষে সংস্কৃত কবিতা আগাগোড়া objective,—এক ভর্ত্তৃহরি ভিন্ন অপর কোনও সংস্কৃত কবি মানবহৃদয়ের পরিচয় দিতে গিয়ে "অহং জানামি" এ কথা বলেন নি। সংস্কৃতের ন্যায় ফরাসী সাহিত্যও প্রধানতঃ objective, বাহ্যঘটনা ও সামাজিক মন নিয়েই ফরাসী সাহিত্যের আসল কারবার; এক কথায় ফরাসী জাতির দিব্যদৃষ্টি অপেক্ষা বহির্দৃষ্টি এবং অন্তর্দৃষ্টি ঢের বেশি তীক্ষ্ণ ও প্রখর। সে চোখ মানুষের ভিতর বাহির দুই সমান দেখ্‌তে পায়।

Romantic সাহিত্যের দ্বিতীয় লক্ষণ এই যে, সে সাহিত্য আধ্যাত্মিক। আমাদের দর্শনে সত্যকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা

হয়—এক ব্যবহারিক আর এক তদতিরিক্ত। ফরাসী সাহিত্যে এই ব্যবহারিক সত্যেরই আলোচনা ও চর্চ্চা হয়ে থাকে। যা' ইন্দ্রিয়ের অগোচর আর যা' বুদ্ধির অগম্য—ফরাসী সাহিত্যে তার বড় একটা সন্ধান পাওয়া যায় না। The proper study of mankind is man—এই হ'চ্ছে ফরাসী মনের মূল কথা। সুতরাং মানবসমাজ, মানবমন ও মানবচরিত্রের জ্ঞানলাভ করা ও বর্ণনা করাই ফরাসী সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। এ জ্ঞানলাভ ক'রতে হ'লে সামাজিক মানবের আচারব্যবহার লক্ষ্য করতে হয়, এবং সেই সঙ্গে সেই আচার ব্যবহারের আবরণ খুলে ফেলে তার আসল মনের পরিচয় নিতে হয়—তা'ও আবার সমগ্রভাবে নয়, বিশ্লেষণ ক'রে, পরীক্ষা ক'রে। বৈজ্ঞানিক যে-ভাবে যে-পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে জড়বস্তুর তত্ত্ব নির্ণয় করেন, ফরাসী সাহিত্যিকরাও সেই ভাবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে, মানবতত্ত্ব নির্ণয় করেন। তাঁরা মানবজাতিকে চরিত্র অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন—মানবের কার্য্য কারণের আভ্যন্তরিক নিয়মাবলী ও যোগাযোগ আবিষ্কার ক'রতে চান। এই কারণে Moliéreএর নাটক ফরাসী প্রতিভার সর্ব্বোচ্চ নিদর্শন। Moliére ধর্ম্মের আবরণ খুলে পাপের, বিদ্যার আবরণ খুলে মূর্খতার, বীরত্বের আবরণ খুলে কাপুরুষতার, প্রেমের আবরণ খুলে স্বার্থপরতার মূর্ত্তি, পৃথিবীর লোকের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিয়েছেন। কিন্তু এ সকল মূর্ত্তি দেখে মানুষের ভয় হয় না, হাসি পায়। মানুষের ভিতর যা' কিছু লজ্জাকর আর হাস্যকর, তাই Moliéreএর চোখে পড়েছে, আর যা' তাঁর চোখে ধরা পড়েছে তাই তিনি অপরের নিকট ধরিয়ে দিয়েছেন।

ফ্রান্সের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাটককারের সঙ্গে ইংলণ্ডের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

নাটককারের তুলনা করলেই এ উভয়ের প্রতিভার পার্থক্য স্পষ্ট লক্ষিত হবে। Shakespeareএর Richard III, Iago প্রভৃতির পরিচয়ে দর্শকের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। Shylock আমাদের মনে যুগপৎ করুণা ও ঘৃণার উদ্রেক করে, King Learএর পাগলামি আমাদের মনকে বেদনা দেয়। Ariel আমাদের স্বপ্নরাজ্যে নিয়ে যায়। ফরাসী কবিরা শুধু হাস্য ও করুণ, বীর ও মধুর রসের চর্চ্চা করেন। ইংরাজ কবিদের স্থায় তাঁরা ভয়ঙ্কর ও অদ্ভুত রসের রসিক ন'ন। ফরাসী জাতির ভিতর কোনও Shakespeare জন্মায় নি ও জন্মাতে পারে না। পাগল, প্রেমিক ও কবি যে একজাত, এ কথা কোনও ফরাসী কবি বলেনও নি—স্বীকারও করেন নি। কেননা তাঁরা তাঁদের সংসারজ্ঞান ও তাঁদের শিক্ষিত ও মার্জ্জিত বুদ্ধির উপরেই চিরকাল নির্ভর করে এসেছেন। ফরাসী জাতির দেহে কিম্বা মনে কোনও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিন্ কালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেন নি। এই কারণে ফরাসী কবিতা ইংরাজি কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত। সে কবিতা মানবমনের গভীরতম দেশ স্পর্শ করে না।

(৪)

অপরপক্ষে এই সচেতন সচেষ্ট মনের উপর নির্ভর করায় ফরাসী গদ্যসাহিত্য যে শক্তি ও তীক্ষ্ণতা লাভ করেছে ইংরাজি গদ্য সাহিত্যে সে শক্তি সে তীক্ষ্ণতা নেই। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকের মন সামাজিক, সুতরাং ব্যবহারিক সত্যের সঙ্গেই তাদের সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। সেই

পরিচিত সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত ব'লে বিশ্বমানবের নিকট ফরাসী সাহিত্য এত সহজবোধ্য, এত বহুমূল্য। ইংরাজি কবিতা মানুষের মনকে উত্তেজিত, উদ্দীপিত করে, সে-মনকে জ্ঞানবুদ্ধির সীমা অতিক্রম ক'রিয়ে কল্পনার স্বপ্ন-রাজ্যে নিয়ে যায়—কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। সে কবিতার মোহ আমাদের মনকে চিরদিনের মত অভিভূত করে রাখতে পারে না— আমরা আবার এই মাটির পৃথিবীতে দিনের আলোয় ফিরে আসি। এ কবিতার রেশ যে মনের উপর থেকে যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তার ফলে আমাদের হৃদয়মন গভীরতা ও উদারতা লাভ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঐ সামাজিক মনই আমাদের চিরদিনের মন, আর ঐ বুদ্ধিবৃত্তিই আমাদের চিরজীবনের সহায়। ফরাসী সাহিত্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মার্জ্জিত করে, চিত্তবৃত্তিকে সুশৃঙ্খল করে। সে সাহিত্য মানুষকে দেবতা হিসাবে নয়—মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করে,—অতএব সে সাহিত্য আমাদের মনে মানুষের প্রতি ভক্তির না হোক্ প্রীতির উদ্রেক করে—কেন না তার চর্চ্চায় আমরা স্বজাতিকে চিনতে ও বুঝতে শিখি, এবং সেই সঙ্গে আমরা ঔদ্ধত্য ও দাম্ভিকতা, গোঁড়ামি আর হামবড়ামি, মানসিক আলস্য ও জড়তা, হয় পরিহার ক'রতে নয় গোপন ক'রতে শিখি। ফরাসী সাহিত্য মানুষকে দেবতা নয়—সুসভ্য করে তোলে। ফরাসী সাহিত্য সকল প্রকার মিথ্যার সকল প্রকার কপটতার প্রবল শত্রু এবং ফরাসী মনের এই নির্ভীক সত্যসন্ধিৎসা—সে সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ। এই কারণেই ফরাসী প্রতিভা, ইতিহাসে, জীবন চরিতে, সামাজিক উপন্যাসে এত ফুটে উঠেছে। এবং এই একই কারণে ফরাসী সমালোচকদের তুল্য সমালোচক পৃথিবীর অপর কোনও দেশে জন্মগ্রহণ করে নি। এবং ফরাসী সমালোচনার

বিষয় কেবলমাত্র সাহিত্য নয় সমগ্র মানবজীবন। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজ, সভ্যতা এ সকলই ফরাসীজাতির হস্তে যুগে যুগে পরীক্ষিত হয়ে আস্‌ছে।

অনেকের ধারণা যে Zolaর নভেলই হচ্ছে ফরাসী Realismএর চূড়ান্ত উদাহরণ। এ কথা সত্য যে, সত্যের অনুসন্ধানে মনোরাজ্যের হেন দেশ নেই—যেখানে ফরাসী লেখকেরা যেতে প্রস্তুত নন্, সে দেশ যতই অপ্রীতিকর ও যতই অসুন্দর হোক্ এবং সত্যের খাতিরে হেন কথা নেই—যা তাঁরা বল্‌তে প্রস্তুত নন্—সে কথা যতই অপ্রিয় যতই অবক্তব্য হোক্, কিন্তু আমি Realism শব্দ Zolaর অনুমত সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করিনি। লোকে সচরাচর যাকে Idealism বলে থাকে তাও আমার ব্যবহৃত Realism শব্দের অন্তর্ভূত। মানব মন, মানব জীবনের উপর আলো ফেলে যা দেখা যায় তাই হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের বিষয়। বলা বাহুল্য, সে আলোয় অনেক সুন্দর অনেক কুৎসিৎ অনেক মহৎ অনেক ইতর মনোভাব প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। যা হেয় তাও যেমন সত্য, যা উপাদেয় তাও তেমনি সত্য। এর ভিতর কোন্ শ্রেণীর সত্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে তা লেখকের ব্যক্তিগত রুচি ও দৃষ্টির উপর নির্ভর করে। সুতরাং Idealism এবং Realism সাহিত্যে পাশাপাশি দেখা দেয়। ফরাসী লেখকেরা মানবের অন্তরে এমন এক একটি মূল প্রবৃত্তির আবিষ্কার ক'রতে চান, অপর প্রবৃত্তিগুলি যার বিবাদী সম্বাদী অনুবাদী সুর মাত্র। সুতরাং একই মনোভাব থেকে ফরাসী সাহিত্যে মানবের Idealistic এবং Realistic উভয় চিত্রই অঙ্কিত হ'য়ে থাকে। প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যে মানব সমাজের Idealistic চিত্র বিরল নয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে Zola প্রভৃতি Realistগণ

যে অতিমাত্রায় কদর্য্যতার চর্চ্চা করেন—সে কতকটা Victor Hugo প্রভৃতি Romantic লেখকদের প্রতিবাদ স্বরূপে। আর এক কথা—আমার সহিত যত ফরাসী লেখকের পরিচয় আছে, আমার বিশ্বাস, তার মধ্যে এক Zolaর গ্রন্থই বিশেষরূপে ফরাসী-ধর্ম্মে বঞ্চিত। Zolaর রচনায় ফরাসী-সুলভ লিপি-চাতুর্য্য নেই। Zolaর মন সূর্য্যকরোজ্জ্বল নয়—সে মন নিশাচর। Zola মানুষকে দেবতা হিসেবে দেখেন নি—মানব হিসেবেও দেখেন নি—তাঁর চোখে আমরা সকলেই ছদ্মবেশী দানব।—প্রকৃতপক্ষে Zola ফরাসী লেখক নন, তিনি ছিলেন জাতিতে Italian.

(৫)

ফরাসী সাহিত্যের দ্বিতীয় বিশেষত্ব হ'চ্ছে, তার আর্ট। ফরাসী সাহিত্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন—

The one high principle which through so many generations, has guided like a star the writers of France, is the principle of deliberation, of intention, of a conscious search for ordered beauty, an unwavering, an indomitable pursuit of the endless glories of art.—*

* Landmarks in French Literature,
G. L. Strachey,
Home University Library.

এই আর্টের গুণেই ফরাসী রচনা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে।

এক কথায় এ আর্ট Romantic নয় Classical. কি কি গুণের, কি কি লক্ষণের সদ্ভাবে রচনা আর্ট হয়, সে বিষয়ে ফরাসী জাতির মত নিম্নে বিবৃত করছি। ফরাসী রচনার রীতির পরিচয় দেবার পূর্ব্বে ফরাসী ভাষার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক—কেননা ভাষার সহিত সাহিত্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, এত ঘনিষ্ঠ যে একথা ব'ল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না যে, সকল দেশের জাতীয় সাহিত্যের রূপগুণ সেই দেশের ভাষার শক্তির উপর নির্ভর করে। এ স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জাতীয় সাহিত্য রচিত হবার বহু পূর্ব্বে জাতীয় ভাষা গঠিত হয়। যুগ যুগান্তরের আত্ম-প্রকাশের চেষ্টার ফলে একটি জাতীয় ভাষা গড়ে ওঠে এবং সেই ভাষার অঙ্গে জাতীয় মনের ছাপ থেকে যায় এবং তার অন্তরে জাতীয় চরিত্র বিধিবদ্ধ হয়ে থাকে।

বাঙ্গালাভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ, ল্যাটিন ভাষার সঙ্গে ফরাসী ভাষার সেই সম্বন্ধ, অর্থাৎ ফরাসী ল্যাটিনের অপভ্রংশ অথবা প্রাকৃত। ফরাসীভাষার শব্দসমূহ ল্যাটিন হতে উদ্ভূত। সংস্কৃত ব্যাকরণের পরিভাষায় যাকে তদ্ভব বলে—ফরাসী অভিধানের প্রায় সকল শব্দই সেই শ্রেণীভুক্ত—এ সকলই ল্যাটিনের তদ্ভব। এ ভাষায় দেশী এবং বিদেশী শব্দের সংখ্যা এত অল্প যে তা নগণ্য স্বরূপে ধরা যেতে পারে। ফরাসীভাষা মূলতঃ এক হওয়ার দরুন, এ ভাষার ভিতর এমন একটি ঐক্য ও সমতা আছে যা রচনার একটি বিশেষ রীতি গ'ড়ে তোলবার পক্ষে একান্ত অনুকূল। ইংরাজিভাষা ঠিক এর বিপরীত। Anglo-Saxon এবং Norman French এই দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন

ভাষার মিশ্রণে বর্ত্তমান ইংরাজি ভাষার উৎপত্তি। এর ফলে সে ভাষার অন্তরে বৈচিত্র্য আছে, সমতা নেই। ইংরাজি রচনার যে, কোনও একটি বিশিষ্ট রীতি নেই, ইংরাজি ভাষার বর্ণ-সঙ্করতা তার অন্যতম কারণ। ইংরাজি লেখকেরা যে প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারে রচনার স্বতন্ত্র রীতি গড়ে' নিতে পারেন, তার প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ এক ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজি সাহিত্য হ'তে পাওয়া যায়। Carlyle এবং Newman, Ruskin এবং Matthew Arnold, Thackeray এবং Meredith, Wordsworth এবং Shelley, Tennyson এবং Browning—একই যুগে এই সকল বিভিন্নপন্থী লেখকের আবির্ভাব এক ইংলণ্ড ব্যতীত অপর কোন দেশে সম্ভব হ'ত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর ফ্রান্সের Romantic এবং Realistic লেখকদের রচনার ভিতর এরূপ জাতিগত প্রভেদ নেই। ফরাসী ভাষায় এরূপ বৈচিত্র্যের অবসর নেই। সুতরাং ফরাসী লেখকেরা যুগে যুগে রচনার বৈচিত্র্য নয়,—ঐক্যসাধন করে'—একটি আদর্শ রীতি গড়ে' তোলবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করেছেন, এবং সে বিষয়ে কৃতকার্য্যও হয়েছেন। এই যুগযুগান্তরের সাধনার ফলে অধিকাংশ ফরাসী শব্দের অর্থ সুস্পষ্ট, সুনির্দ্দিষ্ট এবং সুপ্রসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। এ ভাষার ব্যবহারে অশিক্ষিতপটুত্ব লাভ করবার জো নেই। আমাদের দেশের বাঁধা ঠাটের বাঁধা রাগিণীর মত, এ ভাষা গুণীব্যক্তির হাতেই পূর্ণ শ্রীলাভ করে, এবং তার মূর্ত্তি পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। একটি বেপর্দ্দায় হাত পড়লে সুর যেমন আগাগোড়া বেসুরো হয়ে যায়, তেমনি একটি অসঙ্গত কথার সংস্পর্শে ফরাসী রচনা আগাগোড়া অশুদ্ধ হয়ে যায়। পরিমিত শব্দে স্পষ্ট মনোভাব ব্যক্ত করবার পক্ষে এ ভাষা যতটা অনুকূল,

হৃদয়ের গভীর ও অস্পষ্ট মনোভাব প্রকাশের পক্ষে তাদৃশ অনুকূল নয়। এর ফলে গদ্য রচনার পক্ষে ফরাসী হচ্ছে ইউরোপের আদর্শ ভাষা।

ভাষা হচ্ছে সাহিত্যের উপাদান, কিন্তু কেবলমাত্র উপাদানের গুণে কোন শিল্পই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে না, যদি না তা' শিল্পীর হাতে পড়ে। আর তা' ছাড়া অন্যান্য শিল্পের উপাদানের সঙ্গে সাহিত্যের উপাদানের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে।

পাষাণ কি ধাতু, বর্ণ কি স্বর, আমরা বাইরে থেকে যা' পাই তাই আমাদের গ্রাহ্য করে' নিতে হয়, কেননা ও-সকল বাহ্য জগতের বস্তু; আমরা তা' সৃষ্টি করি নি,—অতএব আমরা তার ধাতও বদ্‌লে দিতে পারিনে। কিন্তু ভাষা হ'চ্ছে আমাদেরই সৃষ্টি। সুতরাং পূর্ব্বপুরুষদের নিকট যে ভাষা আমরা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে লাভ করি, তার অল্পবিস্তর রূপান্তর করা আমাদের সাধ্যের অতীত নয়। আমরা যা প'ড়ে পাই তা' চৌদ্দ আনা, তাকে ষোল আনা করা না-করা, সে আমাদের হাত। বর্ত্তমান ফরাসী ভাষা এবং প্রাচীন ফরাসী ভাষা, এই দুই মূলতঃ এক হলেও, এ দুইয়ের ভিতর প্রভেদ বিস্তর। যুগের পর যুগের ফরাসী লেখকদের যত্নে ও চেষ্টায় এ ভাষা জাতীয় মনোভাব প্রকাশের এমন উপযোগী যন্ত্র হয়ে উঠেছে। ফরাসী ভাষার এ evolution আপনি হয়নি—এ উন্নতি, এ পরিণতির ভিতর ফরাসী জাতির সুবুদ্ধি ও সুরুচি, যত্ন ও অধ্যবসায়, এ সকলেরই সমান পরিচয় পাওয়া যায়।

(৬)

যেদিন থেকে ফরাসী জাতির ধারণা হল যে, সাহিত্য রচনা করা একটি আর্ট, সেইদিন থেকে ফরাসী লেখকেরা কিসে রচনা সুগঠিত হয়,

সে বিষয়েও পূরো লক্ষ্য রেখে আসূছেন। কি যে আর্ট, আর কি যে আর্ট নয়, সে বিষয়ে অদ্যাবধি বহু মতভেদ আছে। সৌন্দর্য্যের অর্থ যে কি, সে বিষয়ে দার্শনিক তর্কের আর শেষ নেই। তবে আমাদের সহজ মন এবং সাদা চোখ দিয়ে বিচার করতে গেলে, আমরা দেখতে পাই যে, আমরা যাকে বস্তুর রূপ বলি, তা' অনেক পরিমাণে তার আকারের উপর নির্ভর করে। অন্ততঃ আমরা বাঙ্গালীরা যা' কদাকার তাকে সুন্দর বলি নে। মানব মনের এই সহজ প্রকৃতির উপরেই ফরাসী জাতির রচনার আর্ট প্রতিষ্ঠিত। কিসে রচনার অঙ্গসৌষ্ঠব হয়, সে বিষয়ে ফরাসী মনীষীরা বহুচিন্তা বহুবিচার করে' গেছেন, এবং সেই চিন্তা সেই বিচারের ফলে ফরাসী রচনা এত সাকার, এত পরিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে।

আমি প্রথমেই বলেছি যে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ফরাসী সাহিত্য জন্মলাভ করে। প্রথম তিন শত বৎসরের ফরাসী সাহিত্য আর্টহীন; কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশিদাসের মহাভারত, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী যেমন আর্টহীন,—Roman de Roland, Roman de Rose প্রভৃতি ফ্রান্সের জাতীয় মহাকাব্যও সেইরূপ আর্টহীন। এই যুগের লেখকদের শব্দের নির্ব্বাচন ও পদের যোজনার প্রতি কোনই লক্ষ্য ছিল না।

তারপর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফরাসীজাতি যখন প্রাচীন গ্রীক্ এবং ল্যাটিন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করলে, তখন হতে লেখা জিনিষটে যে একটি আর্ট, এ বিষয়ে ফরাসী কাব এবং ফরাসী গদ্য লেখকেরা সজ্ঞান হয়ে উঠ্ল। এই Classic সাহিত্যের আদর্শ ফরাসী লেখকদের নিকট একমাত্র আদর্শ হয়ে উঠ্ল—এবং এই কারণেই Classicism হচ্ছে সে সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম।

(৭)

দুই উপায়ে ভাষার রূপান্তর করা যায়—এক, শব্দের যোগের দ্বারা, আর এক, বিয়োগের দ্বারা। ফরাসী লেখকেরা বর্জ্জনের সাহায্যেই ভাষার সংস্কার করেন। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে Malherbe নামক জনৈক কবি এই ভাষা-সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন। তিনি প্যারি নগরীর মৌখিক ভাষাই সাহিত্য রচনার আদর্শভাষা স্বরূপে গণ্য করেন। কেননা সে ভাষার ভিতর এমন একটি ঐক্য, সমতা, প্রসাদগুণ এবং ভদ্রতা ছিল, যা' কোনও প্রাদেশিক ভাষার অন্তরে ছিল না। এই কারণে সাহিত্য হ'তে প্রাদেশিক শব্দসকল বহিষ্কৃত করে' দেওয়াই তাঁর মতে ভাষা-সংস্কারের সর্ব্বপ্রথম এবং সর্ব্বপ্রধান উপায়। Malherbeএর মতে, একদিকে যেমন প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারে কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়, অপরদিকে সাহিত্যে পারিভাষিক শব্দের ব্যবহারেও তেমনি কুরুচির পরিচয় দেওয়া হয়। এক কথায়, গ্রাম্যতা ও পাণ্ডিত্য—এই দুইই কাব্যের ভাষায় সমান বর্জ্জনীয়।—কেননা সে যুগের ফ্রান্সের ভদ্রসমাজের মতে, নিরক্ষর লোকের ভাষা ও পুঁথিগত বিদ্যার ভাষা, এই দুইই অভদ্র ভাষা বলে' গণ্য হ'ত—দুয়ের ভিতর পার্থক্য এই যে, এর একটি লজ্জার, অপরটি হাস্যের উদ্রেক করে। এই মত ফ্রান্সের লেখকসমাজে গ্রাহ্য হয়েছিল—কেননা তাঁদের মতে প্রাচীন ফরাসী সাহিত্যের ভাষা এক ভাষা নয়—একটা যোড়াতাড়া-দেওয়া ভাষা। এর ফলে Rabelais প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের পাঁচরঙা ভাষার পরিবর্ত্তে ফরাসী গদ্যের ভাষা একরঙা হয়ে উঠ্ল।

উপাদান নির্ব্বাচন হচ্ছে শিল্পীর প্রথম কাজ, কিন্তু সেই উপাদানে মূর্ত্তি গঠন করাই তাঁর আসল কাজ। সুতরাং Malherbe-প্রমুখ সমালোচকেরা পদনির্ব্বাচনের ন্যায় পদ-যোজনার প্রতিও লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমরা পদের সঙ্গে পদের যোজনা করে' বাক্য গঠন করি—এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের যোজনা করে' একটি কবিতা কিম্বা প্রবন্ধ রচনা করি। সুতরাং বাক্য এবং রচনা যাতে সুগঠিত হয়, সে বিষয়ে ফরাসী লেখকেরা এই যুগ থেকে আরম্ভ করে' অদ্যাবধি সমান মনোনিবেশ করে' আসছেন। এ গঠনে যাতে রেখার সুষমা থাকে, সামঞ্জস্য থাকে, রচনার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হয়, এবং পরস্পরের সঙ্গে সুসম্বদ্ধ হয়,—যাতে করে' একটি রচনা পূর্ণাবয়ব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সমগ্র হয়ে ওঠে—এই হচ্ছে ফ্রান্সের সাহিত্যশিল্পীর যুগযুগের সাধনার ধন। রচনার দেহ সুগঠিত করবার জন্য সকলপ্রকার বাহুল্য বর্জ্জন করা আবশ্যক। যাঁরা রাগ আলাপ করেন, ঢিকারির ঝন্‌ঝনানি তাঁদের কানে অসহ্য। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে Beaulieu নামক বিখ্যাত সমালোচক বিশেষ করে' রচনার অমার্জ্জনীয় দোষের সম্বন্ধে সমাজের চোখ ফুটিয়ে দিয়েছিলেন। ভাষার কৃত্রিমতা, বৃথা বাগাড়ম্বর, উপমার আতিশয্য, অনুপ্রাসের ঝঙ্কার প্রভৃতি রচনার দোষের প্রতি তিনি চিরজীবন ধরে' এমন তীক্ষ্ণ, এমন অজস্র বাণ বর্ষণ করেছিলেন যে, ফরাসী সাহিত্য হতে সকল প্রকার অত্যুক্তি ও অতিবাদ, কষ্টকল্পনা ও অবোধ পাণ্ডিত্য চিরদিনের জন্য নির্ব্বাসিত হয়েছে।

রচনাকে শব্দাড়ম্বরে গৌরবান্বিত, শব্দালঙ্কারে ঐশ্বর্য্যবান, পারি-

ভাষিক শব্দপ্রয়োগে মর্য্যাদাপন্ন, এবং বাচালতায় সমৃদ্ধিশালী করবার লোভ সম্বরণ করা যে কি কঠিন, তা' লেখকমাত্রেই জানেন। ফরাসী লেখকেরা এই সংযম নিজেরা অভ্যাস করেন, এবং অপরকে অভ্যাস করতে শিক্ষা দেন। পূর্ব্বোক্ত ফরাসী আলঙ্কারিক কর্ত্তৃক প্রদর্শিত সাহিত্যের ত্যাগমার্গ ফরাসী লেখকেরা যে কেন অবলম্বন করেছিলেন, তার একটু বিশেষ কারণ আছে। Pascal, La Bruyère, Bossuet, Fénèlon, Racine, Molière প্রভৃতি সে যুগের ফ্রান্সের প্রথম শ্রেণীর গদ্যপদ্যলেখক মাত্রেই Malherbe কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত এবং Beaulieu কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত রচনার এই নব পথ অবলম্বন করে'ই সাহিত্যজগতে অমর হয়েছেন। এঁরা যে বিনা আপত্তিতে এই নব আলঙ্কারিক মত গ্রাহ্য করেছিলেন, তার কারণ তাঁরা যে-সকল মনোভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, রচনার এই নবপদ্ধতি সে মনোভাব প্রকাশের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল ছিল। সে যুগের ফরাসী মনোভাবের পূর্ণ পরিচয় Descartesএর দর্শনে পাওয়া যায়। সেই দর্শনে ফরাসী প্রতিভা তার আত্মজ্ঞান লাভ করে। আপনারা অনেকেই জানেন যে, যে আইডিয়া সুস্পষ্ট, পরিছিন্ন ও সুনির্দ্দিষ্ট, তাই হচ্ছে ডেকার্টের মতে সত্যের পরিচায়ক। অর্থাৎ যে জ্ঞান আমাদের জাগ্রত বুদ্ধির আয়ত্বাধীন, এবং যা' ন্যায়শাস্ত্রবিরুদ্ধ নয়, তাই হচ্ছে যথার্থ সত্য। এবং Descartesএর মতে একমাত্র অন্তদৃষ্টির সাহায্যেই এই শ্রেণীর সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়। ফরাসী লেখকেরা, মানবমনের ও মানবচরিত্রের সেই সত্য আবিস্কার করতে এবং প্রকাশ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা' জ্ঞানের আলোকে সুস্পষ্ট হবে, যা' ন্যায়ের

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে। এক কথায়, তাঁরা Reasonকে দেবতা করে' তুলেছিলেন, এবং reasonable মনোভাব প্রকাশের পক্ষে যে সুসংযত, সুসংহত এবং সুশৃঙ্খল ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? Reasonable মনোভাব reasonable ভাষায় ব্যক্ত করার দরুণ ফরাসী Classical লেখকেরা য়ুরোপের সাহিত্যসমাজে সর্ব্বাগ্রগণ্য হয়ে উঠেছিলেন। এই কারণেই সে সাহিত্যের প্রভাব সমগ্র য়ুরোপে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, ও সকল জাতির মন বশীভূত করে। দেশভেদে, কালভেদে, জাতিভেদে Reasonএর কোনও ভেদ হয় না, ও-বস্তু সর্ব্বলোকসামান্য। ঐ হচ্ছে মনের একমাত্র ক্ষেত্র যেখানে সকল মনের মিলন হতে পারে। মানুষ যদি সমবুদ্ধি হয়, তাহলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সহানুভূতি জন্মাতে বাধ্য। এই কারণেই হেন্‌রি জেম্‌স্‌ বলেন যে ফরাসী জাতি "lives for us"। এমন কি, Romantic England এক শতাব্দীর জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে' এই ফরাসী সাহিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। Addison এবং Pope, Locke এবং Hume, Gibbon এবং Goldsmith, সকলেই সাহিত্যের এই ফরাসী রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। ইংলণ্ডের অষ্টাদশ শতাব্দীর classicism, ফরাসী classicismএর অনুকরণ ব্যতীত আর কিছু নয়। ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লবের সময় পর্য্যন্ত এই রীতি একাধিপত্য করে। Voltaireএর হাতে ফরাসী ভাষা এত লঘু আর এত তীক্ষ্ণ, এত চোস্ত এবং এত সাফ হয়ে উঠেছিল যে, তারপর সে রীতির আর ক্রমোন্নতি হবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। Voltaireএর ভাষাই তার চূড়ান্ত পরিণতি। ভাষার ধার এর চাইতে বাড়াতে গেলে, যে পরিমাণ

শান দিয়ে তার দেহ ক্ষয় করতে হয়, তা'তে ভাষার দেহত্যাগ করতে হয়।

(৮)

অপর সকল গুণকে উপেক্ষা করে', একটিমাত্র গুণের অতিমাত্রায় চর্চ্চা করলে, কালক্রমে তা' দোষ হয়ে দাঁড়ায়। এই সুমার্জ্জিত ভাষা মানুষের চিন্তাপ্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, মানব হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা আকুলতা, আশা ভয়, সংশয় বিশ্বাস ,প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট ভাবপ্রকাশের জন্য তেমনি অনুপযুক্ত। ক্রমান্বয়ে ইতর গণ্যে শব্দের পর শব্দ বর্জ্জন করে' এ ভাষা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এ ভাষায় কোনরূপ ছবি আঁকা অসম্ভব। কেননা, যে শব্দের গায়ে রং আছে, সে শব্দ এ সাহিত্যিক ভাষা হতে বহিষ্কৃত হয়েছিল। যে শব্দের বস্তুর সঙ্গে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ সুস্পষ্ট, সেই শব্দই এ সাহিত্যে গ্রাহ্য হত। কিন্তু যে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি আছে, অর্থাৎ যার অর্থের অপেক্ষা অনুরণন (suggestiveness) প্রবল, সে শব্দ এ সাহিত্যে উপেক্ষিত হত। ফরাসী বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের পূর্ব্বসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্ব্ব সাহিত্যের রীতিনীতিও মর্য্যাদাভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নবীন ফ্রান্সে reason তার দেবত্ব হারিয়ে বসেছিল। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের নূতন সাহিত্য Classicism এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে' সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। এই সাহিত্যই Romantic বলে' পরিচিত। Chateaubriand এর প্রবর্ত্তক, এবং Victor

Hugo এর নায়ক। Classicism-এর ভাব ও ভাষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহই এ সাহিত্যের লক্ষণ ও বিশেষত্ব। Reason-এর পরিবর্ত্তে কল্পনা, বাঁধাবাঁধি নিয়মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা, ভাষা প্রয়োগে কৃপণতার পরিবর্ত্তে অজস্রতা,—Romantic সাহিত্যে এই সবই, প্রাধান্য লাভ করেছিল। Romantic লেখকেরা, ইতর বলে' কোন শব্দকেই বর্জ্জন করেননি,—এঁদের প্রসাদে একদিকে শত শত উপেক্ষিত, পতিত ও বিস্মৃত শব্দ, অপরদিকে শিল্পবিজ্ঞান হতে সংগৃহীত শত শত পারিভাষিক শব্দ সাহিত্যে প্রবেশ লাভ করলে। আমাদের নব্য আলঙ্কারিক মতে—

"ন স শব্দো ন তদ্বাচ্যং ন স ন্যায়ো ন সা কলা
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহান্ কবেঃ।"—রুদ্রট-ধৃত বচন।

ফরাসী নব্য আলঙ্কারিকদেরও এই একই মত। এর ফলে সাহিত্যের ভাষা আবার শব্দসম্পদে বিপুল ঐশ্বর্য্যবান হয়ে উঠ্‌ল। এই নূতন ভাষা হৃদয়ের আবেগ প্রকাশের জন্য যেমন উপযোগী, বাহিরের দৃশ্য অঙ্কনের জন্য তেমনি উপযোগী। এ Romantic সাহিত্য কিন্তু আসলে উচ্ছৃঙ্খল সাহিত্য নয়। Victor Hugo, Musset প্রমুখ লেখকেরা মুখে অবাধ স্বাধীনতা প্রচার করলেও, কাজে আর্টের অধীনতা হতে মুক্ত হন নি। এমন কি কোন কোন সমালোচকের মতে Victor Hugo-ফরাসী-সাহিত্যের একজন অপূর্ব্ব শিল্পী। তাঁর প্রতি ছত্রে কারিগরের হস্তের পরিচয় পাওয়া যায়। ফরাসী Romanticism অনেকটা বস্তুগত। এক কথায় Hugo প্রমুখ কবিরা শুধু ভাষার পুষ্টি-মার্গ অবলম্বন করেছিলেন, কেননা Romantic মনোভাব এ জাতির মনে কখনই সম্পূর্ণ অধিকার লাভ করতে পারে নি। মানুষের সমগ্র মন তার বুদ্ধির চাইতে ঢের বড়, এবং যুক্তিতর্কের অপেক্ষা অনুভূতি

ঢের বেশি নির্ভরযোগ্য, এই বিশ্বাসের উপরই যথার্থ Romantic সাহিত্য দাঁড়িয়ে থাকে। এই দৃষ্ট বিশ্বের পিছনে একটি অদৃষ্ট বিশ্ব আছে, মানবমনের এমন একটি ধর্ম্ম আছে যার গুণে এই নিগূঢ় বিশ্বের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়—এই হচ্ছে Romantic দর্শনের মূল কথা। আর যে বস্তু যুক্তিতর্কের সাহায্যে জানা যায় না, তা' যুক্তিতর্কের সাহায্যে অপরকে জানানো যায় না—তাই রোমানটিক কবিরা নিজে যা' অনুভব করেছেন, অপরকে তা' অনুভব করাতে চান। এ স্থলে ভাষার অর্থের চাইতে তার ইঙ্গিতের মূল্য ঢের বেশি।

ফরাসী রোমানটিক সাহিত্যের ভাষার প্রলেপ তুলে ফেল্‌লে দেখা যায় যে, তার ভিতরে Romanticismএর রঙ পাকা নয়।

Romanticism ফরাসী জাতির ধাতুগত নয়। সুতরাং ফরাসী মনের উপর এ জোর-করা সাহিত্যের প্রভাব চিরস্থায়ী হল না। এই Romanticism-এর প্রতিবাদ স্বরূপেই France-এর নব realism জন্মগ্রহণ করে। কল্পনার পরিবর্ত্তে reason ফরাসী সাহিত্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফরাসী realistরা তাদের জাতীয় বুদ্ধির অনুসরণ করে' আবার সত্যের সন্ধানে বহির্গত হয়েছিল। এবং সে সত্য কুৎসিৎই হোক্ আর বীভৎসই হোক্, ফরাসী realistরা তার ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়নি। Romantic দল ফরাসী সাহিত্যকে যা' দান করে' গিয়েছে, সে হচ্ছে অগাধ শব্দসম্পদ,—realistদের নেতা Flaubert সেই নূতন উপাদান নিয়েই পুরাতন রীতিতে সাহিত্য গঠন করেছেন। এর ফলে Flaubert এবং তাঁর শিষ্য Maupassantর ন্যায় শিল্পী জগতের সাহিত্যে দুর্লভ।

যে বিরাট সৌন্দর্য্যে মানুষের মনকে স্তম্ভিত, অভিভূত করে,—যে সৌন্দর্য্য অতি-জগতের আলো ও ছায়ায় রচিত—সে সৌন্দর্য্য ইংরাজী সাহিত্যে আছে, ফরাসী সাহিত্যে নেই। কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য্যে ফরাসী সাহিত্য অতুলনীয়।

আমি ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চায় যে আনন্দ লাভ করেছি, সে আনন্দের ভাগ আপনাদের দিতে পারলুম না, সুতরাং সে সাহিত্য হতে যে শিক্ষা লাভ করেছি তারই পারচয় দিতে চেষ্টা করেছি। যদি এ সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাদের কৌতূহল উদ্রেক করতে কৃতকার্য্য হয়ে থাকি, তাহলেই আমার সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করব।

(৯)

আমি চাই যে আমাদের শিক্ষিত সমাজে ফরাসী সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা হয়। আমার বিশ্বাস সে চর্চ্চার ফলে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে।

আমি বলেছি যে ইংরাজি সাহিত্য মুখ্যতঃ romantic, এবং ফরাসী সাহিত্য মুখ্যতঃ realistic। যে দুটি বিভিন্ন মনোভাব থেকে এই দু'টি পৃথক চরিত্রের সাহিত্য জন্মলাভ করে—প্রতি জাতির মনে সে উভয়েরি স্থান আছে। কোন্ জাতি এর মধ্যে কোন্‌টির উপর ঝোঁক দেন, তার উপরেই জাতীয় সাহিত্যের বিশেষত্ব নির্ভর করে।

প্রাক্‌ব্রিটিশ যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে দেখ্‌তে পাই দু'টি পৃথক ধারা বরাবর পাশাপাশি চলে' এসেছে—একটি সম্পূর্ণ subjective,

অপরটি সম্পূর্ণ objective। যে বাঙ্গালীজাতির মন থেকে বৈষ্ণব পদাবলী জন্মলাভ করেছে, সেই বাঙ্গালীজাতির মন থেকেই কবিকঙ্কন চণ্ডী ও অন্নদামঙ্গল জন্মলাভ করেছে। সুতরাং Romantic এবং Realistic উভয় সাহিত্যই আমাদের হৃদয় মন সমান স্পর্শ করতে পারে। ইংরাজি সাহিত্য যেমন আমাদের মনের একটি দিক ফুটিয়ে তুলেছে, আমাদের মনের আর একটি দিক আছে যা' ফরাসী সাহিত্য তেমনি ফুটিয়ে তুলতে পারে।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের সাহিত্যে যে কি সুফল জন্মেছে তা' সকলেই জানেন—কিন্তু সেই সঙ্গে যে কি কুফল জন্মেছে তা' সকলের কাছে তেমন সুস্পষ্ট নয়।

সঙ্গীতের মত সাহিত্যও যে একটি আর্ট, এবং যত্ন ও অভ্যাস ব্যতীত এ আর্ট যে আয়ত্ত করা যায় না—এ সত্য আমরা উপেক্ষা করতে শিখেছি। ইংরাজি গদ্যের কুদৃষ্টান্তই এর একমাত্র কারণ। কেননা যে জাতির classics হচ্ছে সংস্কৃত, সে জাতির পক্ষে রচনার আর্ট সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া স্বাভাবিক নয়।

একটি ইংরাজ লেখক বলেছেন:—

"The amateur is very rare in French literature —as rare as he is common in our own"—*

ইংরাজি সাহিত্যের এই amateurishness আমরা সাদরে অবলম্বন করেছি, কেননা যেমন-তেমন করে' যা'হোক একটা-কিছু লিখে ফেলার ভিতর কোনরূপ আয়াস নেই, কোনরূপ আত্মসংযম নেই।

* G. L. Strachey.

ফরাসী সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়—কেননা সংযম ব্যতীত, কি মনোজগতে, কি কর্ম্মজগতে, কোন বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না। সংস্কৃতে একটি কথা আছে যে "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং"। রচনা সম্বন্ধে এই কৌশল লাভ করতে হলে, লেখকদের পক্ষে যোগ অভ্যাস করা দরকার,—অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে কোথাও বা হঠযোগ, কোথাও বা রাজযোগ। বাহুল্য আর ঐশ্বর্য্য, স্ফীতি আর শক্তি যে এক বস্তু নয়—এ সত্য ফরাসী সাহিত্য মানুষের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

তারপর সাহিত্যের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক যে কত ঘনিষ্ঠ, সে বিষয়েও উক্ত সাহিত্য আমাদের চোখ ফুটিয়ে দেয়। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, ভাষা সাহিত্যের উপাদান—কিন্তু এ কথা শুধু আংশিক ভাবে সত্য। আসল সত্য এই যে, লেখকদের নিকট ভাষা একাধারে উপাদান ও যন্ত্র। আমাদের দেশে সর্ব্ব শ্রেণীর শিল্পীরা বৎসরে অন্ততঃ একবার যন্ত্র-পূজা করে' থাকে—একমাত্র একালের সাহিত্য-শিল্পীরাই তাঁদের যন্ত্রকে পূজা করা দূরে থাক্, মেজে ঘষে পরিষ্কারও করেন না। ফরাসী সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়। এ শিক্ষা আমরা সহজেই আত্মসাৎ করতে পারি, কেননা আমার বিশ্বাস বাঙ্গলার সঙ্গে ফরাসী ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আমাদের ভাষাও মূলতঃ এক, এবং বিদেশী শব্দে তা' ভারাক্রান্ত নয়। আমাদের ভাষার অন্তরেও ফরাসী ভাষার গতি ও স্ফূর্ত্তি নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় কাব্যগ্রন্থ, জর্ম্মানের ন্যায় স্থূলকায়, গুরুভার, শ্লাপদ ও গজেন্দ্রগামী ভাষায় রচিত হওয়া অসম্ভব। আমার বিশ্বাস ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে

জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকূল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌ত, এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি masterpiece বলে' গণ্য হত।

আমরা যে ভাষায় এখন সাহিত্য রচনা করি, সে ভারতচন্দ্রের ভাষা নয়—ইতিমধ্যে ইংরাজি সাহিত্যের অনুকরণে আমরা সে ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছি, অর্থাৎ তার গায়ে একরাশ মুখস্থকরা শব্দ চাপিয়ে দিয়ে তার ভার বৃদ্ধি করেছি—তার গতি মন্দ করেছি। ফরাসী সাহিত্যের শিক্ষা আমাদের মনে বসে' গেলে আমরা আবার বহুসংখ্যক পণ্ডিতি শব্দকে সসম্মানে বিদায় করব, এবং তার পরিবর্ত্তে বহুসংখ্যক তথাকথিত ইতর শব্দকে সাহিত্যে বরণ করে' নেব। কেননা এই কৃত্রিম ভাষার চাপে আমাদের জাতীয় প্রতিভা মাথা তুল্‌তে পারছে না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

চার-ইয়ারী কথা।

সোমনাথ তাঁর কথার প্রতিবাদ সহ্য করতে পারতেন না, অর্থাৎ কেউ তাঁর লেজে পা দিলে তিনি তখনি উল্টে তাকে ছোবল মারতেন, আর সেই সঙ্গে বিষ ঢেলে দিতেন। যে কথা তিনি শানিয়ে বল্‌তেন, সে কথা প্রায়ই বিষ-দিগ্ধ-বাণের মত লোকের বুকে গিয়ে বিঁধ্‌ত।

সোমনাথের মতের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের যে বিশেষ কোনও মিল ছিল না, তার প্রমাণ ত তাঁর প্রণয়কাহিনী থেকেই স্পষ্ট পাওয়া যায়। গরল তাঁর কণ্ঠে থাক্‌লেও তাঁর হৃদয়ে ছিল না। হাড়ের মত কঠিন ঝিনুকের মধ্যে যেমন জেলির মত কোমল দেহ থাকে, সোমনাথের ও তেমনি অতি কঠিন মতামতের ভিতর অতি কোমল মনোভাব লুকিয়ে থাক্‌ত। তাই তাঁর মতামত শুনে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হত না, যা' হত তা' হচ্ছে ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য, কেননা তাঁর কথা যতই অপ্রিয় হো'ক, তার ভিতর থেকে একটি সত্যের চেহারা উঁকি মারত,—যে সত্য আমরা দেখ্‌তে চাইনে বলে' দেখ্‌তে পাইনে।

এতক্ষণ আমরা গল্প বল্‌তে ও শুনতে এতই নিবিষ্ট ছিলুম যে, বাইরের দিকে চেয়ে দেখবার অবসর আমাদের কারও হয়নি। সকলে যখন চুপ কর্‌লেন, সেই ফাঁকে আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘ কেটে গেছে, আর চাঁদ দেখা দিয়েছে। তার আলোয় চারদিক ভরে' গেছে, আর সে আলো এতই নির্ম্মল, এতই কোমল যে, আমার মনে হ'ল যেন বিশ্ব তার বুক খুলে আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয় কত মধুর আর কত করুণ। প্রকৃতির এ রূপ আমরা নিত্য দেখ্‌তে পাই নে বলেই আমাদের মনে ভয় ও ভরসা, সংশয় ও বিশ্বাস, দিন রাত্তিরের মত পালায় পালায় নিত্য যায় আর আসে।

অতঃপর আমি আমার কথা সুরু কর্‌লুম।

আমার কথা।

সোমনাথ বলেছেন "Love is both a mystery and a joke"। এ কথা যে এক হিসেবে সত্য, তা' আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা এই ভালবাসা নিয়ে মানুষে কবিত্বও করে, রসিকতাও করে। সে কবিত্ব যদি অপার্থিব হয়, আর সে রসিকতা যদি অশ্লীল হয়, তাতেও সমাজ কোনও আপত্তি করে না। Dante এবং Boccaccio, উভয়েই এক যুগের লেখক,—শুধু তাই নয়, এর একজন হচ্ছেন গুরু, আর একজন শিষ্য। Don Juan এবং Epipsychidion, দুই কবিবন্ধুতে এক ঘরে পাশাপাশি বসে লিখেছিলেন। সাহিত্য-সমাজে এই সব পৃথকপন্থী লেখকদের যে সমান আদর আছে, তা'ত তোমরা সকলেই জানো।

এ কথা শুনে সেন বল্লেন "Byron এবং Shelley ও-দুটি কাব্য যে এক সময়ে এক সঙ্গে বসে লিখেছিলেন, এ কথা আমি আজ এই প্রথম শুনলুম"।

আমি উত্তর করলুম "যদি না করে' থাকেন, তাহলে তাঁদের তা' করা উচিত ছিল"।

সে যাই হোক্, তোমরা যে সব ঘটনা বল্লে, তা নিয়ে আমি তিনটি দিব্যি হাসির গল্প রচনা করতে পারতুম, যা' পড়ে' মানুষ খুসি হত। সেন কবিতায় যা' পড়েছেন জীবনে তাই পেতে চেয়েছিলেন। সীতেশ জীবনে যা' পেয়েছিলেন, তাই নিয়ে কবিত্ব করতে চেয়েছিলেন। আর সোমনাথ মানব জীবন থেকে তার কাব্যাংশটুকু বাদ দিয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিলেন। ফলে তিন জনই সমান আহাম্মক বনে' গেছেন। কোনও বৈষ্ণব কবি বলেছেন যে, জীবনের পথ "প্রেমে পিচ্ছিল,"—কিন্তু সেই পথে কাউকে পা পিছলে পড়তে দেখলে মানুষের যেমন আমোদ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু তোমরা, যে-ভালবাসা আসলে হাস্যরসের জিনিষ, তার ভিতর দু'চার ফোঁটা চোখের জল মিশিয়ে তাকে করুণরসে পরিণত করতে গিয়ে, ও-বস্তুকে এমনি ঘুলিয়ে দিয়েছ যে, সমাজের চোখে তা'

কলুষিত ঠেক্‌তে পারে। কেননা সমাজের চোখ, মানুষের মনকে হয় সূর্য্যের নয় চাঁদের আলোয় দেখে। তোমরা আজ নিজের নিজের মনের চেহারা যে আলোয় দেখেছ, সে হচ্ছে আজকের রাত্তিরের ঐ দুষ্ট ক্লিষ্ট আলো। সে আলোর মায়া এখন আমাদের চোখের সুমুখ থেকে সরে' গিয়েছে। সুতরাং আমি যে গল্প বল্‌তে যাচ্ছি, তার ভিতর আর যাই থাক্ আর না থাক্, কোনও হাস্যকর কিম্বা লজ্জাকর পদার্থ নেই।

এ গল্পের ভূমিকাস্বরূপে আমার নিজের প্রকৃতির পরিচয় দেবার কোন দরকার নেই, কেননা তোমাদের যা' বল্‌তে যাচ্ছি, তা' আমার মনের কথা নয়—আর একজনের,—একটী স্ত্রীলোকের। এবং সে রমণী আর যাই হোক্,—চোরও নয়, পাগলও নয়।

গত জুন মাসে আমি কলকাতায় একা ছিলুম। আমার বাড়ী ত তোমরা সকলেই জানো; ঐ প্রকাণ্ড পুরীতে রাত্তিরে খালি দু'টি লোক শুত,—আমি আর আমার চাকর। বহুকাল থেকে একা থাক্‌বার অভ্যেস নেই, তাই রাত্তিরে ভাল ঘুম হত না। একটু কিছু শব্দ শুনলে মনে হত যেন ঘরের ভিতর কে আস্‌ছে, অমনি গা ছম্ ছম্ করে উঠ্‌ত; আর রাত্তিরে জানইত কতরকম শব্দ হয়,—কখনও ছাদের উপর, কখনও দরজা জানালায়, কখনও রাস্তায়, কখনও বা গাছপালায়। একদিন এই সব নিশাচর ধ্বনির উপদ্রবে রাত একটা পর্য্যন্ত জেগেছিলুম, তারপর ঘুমিয়ে পড়্‌লুম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলুম যেন কে টেলিফোনে ঘণ্টা দিচ্ছে। অমনি ঘুম ভেঙ্গে গেল। সেই সঙ্গে ঘড়িতে দুটো বাজ্‌ল। তারপর শুনি যে, টেলিফোনের ঘণ্টা একটানা বেজে যাচ্ছে। আমি ধড়ফড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। মনে হল যে আমার আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কারও হয়ত হঠাৎ কোন বিশেষ বিপদ ঘটেছে, তাই এত রাত্তিরে আমাকে খবর দিচ্ছে। আমি ভয়ে ভয়ে বারান্দায় এসে দেখি আমার ভৃত্যটি অকাতরে নিদ্রা দিচ্ছে। তার ঘুম না ভাঙিয়ে টেলিফোনের রিসিভারটি নিজেই তুলে নিয়ে কাণে ধরে বল্লুম—Hallo!

উত্তরে পাওয়া গেল শুধু ঘন্টার সেই ভোঁ ভোঁ আওয়াজ। তারপর দু'চার বার "হ্যালো" "হ্যালো" করবার পর একটি অতি মৃদু, অতি মিষ্ট কণ্ঠস্বর আমার কানে এল। জানো সে কি রকম স্বর? গির্জ্জার অর্‌গানের সুর যখন আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়, আর মনে হয় যে সে সুর লক্ষ যোজন দূর থেকে আস্‌ছে,—ঠিক সেই রকম।

ক্রমে সেই স্বর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠ্‌ল। আমি শুনলুম কে ইংরাজিতে জিজ্ঞেস কর্‌ছে—

"তুমি কি মিষ্টার রায়?"

—হাঁ— আমি একজন মিষ্টার রায়।

—S. D.?

—হুঁ,—কাকে চাও?

—তোমাকেই।

গলার স্বর ও কথার উচ্চারণে বুঝলুম, যিনি কথা কচ্ছেন, তিনি একটী ইংরাজ রমণী।

আমি প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞেস কল্লুম, "তুমি কে?"

—চিন্‌তে পার্‌ছ না?

—না।

—একটু মনোযোগ দিয়ে শোন ত, এ কণ্ঠস্বর তোমার পরিচিত কিনা।

—মনে হচ্ছে এ স্বর পূর্ব্বে শুনেছি, তবে কোথায় আর কবে তা' কিছুতেই মনে কর্‌তে পারছি নে।

—আমি যদি আমার নাম বলি, তাহলে কি মনে পড়্‌বে?

—খুব সম্ভব পড়্‌বে।

—আমি "আনি"।

—কোন্ "আনি"?

—বিলেতে যাকে চিন্‌তে।

—বিলেতে ত আমি অনেক "আনি"কে চিনতুম। সে দেশে অধিকাংশ স্ত্রীলোকের ত ঐ একই নাম।

—মনে পড়ে তুমি Gordon Squareএ একটি বাড়ীতে দু'টি ঘর ভাড়া করে' ছিলে?

—তা' আর মনে নেই? আমি যে একাদিক্রমে দুই বৎসর সেই বাড়ীতে থাকি।

—শেষ বৎসরের কথা মনে পড়ে?

—অবশ্য। সেত সে দিনকের কথা; বছর দশেক হল সেখান থেকে চলে এসেছি।

—সেই বৎসর সে বাড়ীতে "আনি" বলে' একটি দাসী ছিল মনে আছে?

এই কথা বলবা মাত্র আমার মনে পূর্ব্বস্মৃতি সব ফিরে এল। "আনি"র ছবি আমার চোখের সুমুখে ফুটে উঠ্‌ল।

আমি বল্লুম "খুব মনে আছে। দাসীর মধ্যে তোমার মত সুন্দরী বিলেতে কখনও দেখিনি"।

—আমি সুন্দরী ছিলুম তা' জানি, কিন্তু আমার রূপ তোমার চোখে যে কখনও পড়েছে তা' জানতুম না।

—কি করে' জান্‌বে? আমার পক্ষে ও কথা তোমাকে বলা অভদ্রতা হত।

—সে কথা ঠিক। তোমার আমার ভিতর সামাজিক অবস্থার অলঙ্ঘ্য ব্যবধান ছিল।

আমি এ কথার কোনও উত্তর দিলুম না। একটু পরে সে আবার বল্লে—

—আমিও আজ তোমাকে এমন একটি কথা বল্‌ব, যা' তুমি জানতে না।

—কি বল ত?

—আমি তোমাকে ভালবাসতুম।

—সত্যি?

—এমন সত্য যে, দশ বৎসরের পরীক্ষাতেও তা' উত্তীর্ণ হয়েছে।

—এ কথা কি করে' জানব? তুমি ত আমাকে কখনও বলো নি।

—তোমাকে ও-কথা বলা যে আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তা' ছাড়া ও-জিনিষ ত ব্যবহারে, চেহারায় ধরা পড়ে। ও কথা অন্ততঃ স্ত্রীলোকে মুখ ফুটে বলে না।

—কই আমি ত কখনও কিছু লক্ষ্য করি নি।

—কি করে' করবে, তুমি কি কখনও মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে দেখেছ? আমি প্রতিদিন আধ ঘণ্টা ধরে' তোমার বসবার ঘরে টেবিল সাজিয়েছি, তুমি সে সময় হয় খবরের কাগজ দিয়ে মুখ ঢেকে রাখ্‌তে, নয় মাথা নীচু করে ছুরি দিয়ে নখ চাঁচ্‌তে।

—এ কথা ঠিক,—তার কারণ তোমার দিকে বিশেষ করে' নজর দেওয়াটাও আমার পক্ষে অভদ্রতা হত। তবে সময়ে সময়ে এটুকু অবশ্য লক্ষ্য করেছি যে, আমার ঘরে এলে তোমার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ত, আর তুমি একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়্‌তে। আমি ভাবতুম সে ভয়ে।

—সে ভয়ে নয়, লজ্জায়। কিন্তু তুমি যে কিছু লক্ষ্য করো নি, সেইটেই আমার পক্ষে অতি সুখের হয়েছিল।

—কেন?

—তুমি যদি আমার মনের কথা জান্‌তে পারতে, তাহলে আমি আর লজ্জায় তোমাকে মুখ দেখাতে পারতুম না। ও-বাড়ী থেকে পালিয়ে যেতুম। তাহলে আমিও আর তোমাকে নিত্য দেখ্‌তে পেতুম না, তোমার জন্যে কিছু করতেও পারতুম না।

—আমার জন্য তুমি কি করেছ?

—সেই শেষ বৎসর তোমার একদিনও কোনও জিনিসের অভাব হয়েছে,—একদিনও কোন অসুবিধেয় পড়্‌তে হয়েছে?

—না।

—তার কারণ, আমি প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি। জানো যে, তোমাকে যে ভাল না বাসে, সে কখন তোমার সেবা করতে পারে না?

—কেন বল দেখি ?

—এই জন্যে যে, তুমি নিজের জন্য কিছু করতে পারো না, অথচ তোমার জন্য কাউকে কিছু কর্‌তেও বলো না।

—তুমি যে আমার জন্যে সব করে' দিতে আমি ত তা' জানতুম না। আমি ভাবতুম Mrs. Smith। তাইতে আস্‌বার সময় তোমাকে কিছু না বলে', Mrs. Smithকে ধন্যবাদ দিয়ে আসি।

—আমি তোমার ধন্যবাদ চাই নি। তুমি যে আমাকে কখনও ধমকাও নি, সেই আমার পক্ষে ছিল যথেষ্ট পুরস্কার।

—সে কি কথা! স্ত্রীলোককে কোনও ভদ্রলোক কি কখনও ধমকায় ?

—স্ত্রীলোককে কেউ না ধমকালেও, দাসীকে অনেকেই ধমকায়।

—দাসী কি স্ত্রীলোক নয় ?

—দাসীরা জানে তারা স্ত্রীলোক, কিন্তু ভদ্রলোকে সে কথা দু'বেলা ভুলে যায়।

কথাটা এতই সত্য যে, আমি তার কোন জবাব দিলুম না। একটু পরে সে বললে—

—কিন্তু একদিন তুমি একটি অতি নিষ্ঠুর কথা বলেছিলে।

—তোমাকে ?

—আমাকে নয়, তোমার একটি বন্ধুকে, কিন্তু সে আমার সম্বন্ধে—

—তোমার সম্বন্ধে আমার কোনও বন্ধুকে কখন কিছু বলেছি বলে' ত মনে পড়্‌ছে না।

—তোমার কাছে সে এত তুচ্ছ কথা যে, তোমার তা মনে থাক্‌বার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে তা' চিরদিন কাঁটার মত বিঁধে ছিল।

—শুন্‌লে হয়ত মনে পড়বে।

—তুমি একদিন একটি মুক্তোর Tie-pin নিয়ে এসো, তার পরদিন সেটি আর পাওয়া গেল না।

—হতে পারে।

—আমি সেটি সারা রাত্তির খুঁজে বেড়াচ্ছি, এমন সময় তোমার একটি বন্ধু তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন; তুমি তাঁকে হেসে বল্‌লে যে, "আনি" ওটি চুরি করে' ঠকেছে, কেননা মুক্তোটি হচ্ছে ঝুঁটো, আর পিনটি পিতলের; "আনি" বেচতে গিয়ে দেখ্‌তে পাবে যে ওর দাম এক পেনি।' তারপর তোমরা দু'জনেই হাস্‌তে লাগ্‌লে। কিন্তু ঐ কথায় তুমি ঐ পিতলের পিনটি আমার বুকের ভিতর ফুটিয়ে দিয়েছিলে।

—আমরা না ভেবে চিন্তে অমন অন্যায় কথা অনেক সময় বলি।

—তা' আমি জানতুম,তাই তোমার উপর আমার রাগ হয় নি,—যা' হয়েছিল সে শুধু যন্ত্রণা। দারিদ্র্যের কষ্টের চাইতে তার অপমান যে বেশী, সেদিন আমি মর্ম্মে মর্ম্মে তা' অনুভব করেছিলুম। তুমি কি করে' জান্‌বে যে আমি তোমার এক ফোঁটা ল্যাভেণ্ডারও কখনও চুরি করি নি।

—এর উত্তরে আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। না জেনে হয়ত ঐরকম কথায় কত লোকের মনে কষ্ট দিয়েছি।

—তোমার মুক্তোর পিন্ কে চুরি করেছিল, পরে আমি তা' আবিষ্কার করি।

—কে বল ত?

—তোমার ল্যাণ্ড্‌লেডি Mrs. Smith.

—বল কি! সে ত আমাকে মায়ের মত ভালবাস্‌ত। আমি চলে' আসবার দিন তার চোখ দিয়ে জল পড়্‌তে লাগ্‌ল।

—সে তার ব্যাঙ্ক ফেল হ'ল বলে'!—তোমাকে সে এক টাকার জিনিষ দিয়ে দু'টাকা নিতো।

—আমি কি তাহলে অতদিন চোখ বুজে ছিলুম?

—তোমাদের চোখ তোমাদের দলের বাইরে যায় না, তাই বাইরের ভালমন্দ কিছুই দেখ্‌তে পায় না। সে যাই হোক্, আমি তোমার একটি জিনিষ না বলে' নিতুম,—বই,—আবার তা' পড়ে ফিরে দিতুম।

—তুমি কি পড়তে জানতে ?

—ভুলে যাচ্ছ আমরা সকলেই Board Schoolয়ে লেখাপড়া শিখি।

—হাঁ, তা' ত সত্যি।

—জানো কেন চুরি করে' বই পড়্‌তুম ?

—না।

—ভগবান আমাকে রূপ দিয়েছিলেন, আমি তা' যত্ন করে' মেজে ঘসে রাখতুম।

—তা আমি জানি। তোমার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দাসী আমি বিলেতে দেখিনি।

—তুমি যা জান্‌তে না তা' হচ্ছে এই,—ভগবান আমাকে বুদ্ধিও দিয়েছিলেন, তাও আমি মেজে ঘসে রাখ্‌তে চেষ্টা করতুম,—এবং এ দুইই করতুম তোমারই জন্যে।

—আমার জন্যে ?

—পরিষ্কার থাকতুম এই জন্যে, যাতে তুমি আমাকে দেখে নাক না সেঁটকাও; আর বই পড়তুম এই জন্যে, যাতে তোমার কথা ভাল করে' বুঝতে পারি।

—আমি ত তোমার সঙ্গে কখনও কথা কইতুম না।

—আমার সঙ্গে নয়। খাবার টেবিলে তোমার বন্ধুদের সঙ্গে তুমি যখন কথা কইতে, তখন আমার তা' শুন্‌তে বড় ভাল লাগত। সে ত কথা নয়, সে যেন ভাষার আতসবাজি! আমি অবাক হয়ে শুনতুম, কিন্তু সব ভাল বুঝতে পারতুম না। কেননা তোমরা যে ভাষা বল্‌তে,

তা' বইয়ের ইংরাজি। সেই ইংরাজি ভাল করে' শেখবার জন্য আমি চুরি করে' বই পড়্তুম।

—সে সব বই বুঝতে পার্‌তে?

—আমি পড়তুম শুধু গল্পের বই। প্রথমে জায়গায় জায়গায় শক্ত লাগ্‌ত, তারপর একবার অভ্যাস হয়ে গেলে আর কোথাও বাধ্‌ত না।

—কি রকম গল্পের বই তোমার ভাল লাগ্‌ত? যাতে চোর ডাকাত খুন জখমের কথা আছে?

—না, যাতে ভালবাসার কথা আছে। সে যাই হোক্, তোমাকে ভালবেসে তোমার দাসীর এই উপকার হয়েছিল যে, সে শরীরে মনে ভদ্রমহিলা হয়ে উঠেছিল,—তার ফলেই তার ভবিষ্যৎ জীবন এত সুখের হয়েছিল।

—আমি শুনে সুখী হলুম।

—কিন্তু প্রথমে আমাকে ওর জন্য অনেক ভুগ্‌তে হয়েছিল।

—কেন?

—তোমার মনে আছে তুমি চলে' আসবার সময় বলেছিলে যে, এক বৎসরের মধ্যে আবার ফিরে আস্‌বে?

—সে ভদ্রতা করে',—Mrs. Smith দুঃখ করছিল বলে' তাকে স্তোক দেবার জন্যে।

—কিন্তু আমি সে কথায় বিশ্বাস করেছিলুম।

—তুমি কি এত ছেলেমানুষ ছিলে?

—আমার মন আমাকে ছেলেমানুষ করে' ফেলেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা হবার আশা ছেড়ে দিলে, জীবনে যে আর কিছু ধরে' থাকবার মত আমার ছিল না।

—তার পর?

—তুমি যে দিন চলে' গেলে তার পর দিনই আমি Mrs. Smithএর কাছ থেকে বিদায় হই।

—Mrs. Smith তোমাকে বিনা নোটিসে ছাড়িয়ে দিলে ?

—না, আমি বিনা নোটিসে তাকে ছেড়ে গেলুম। ও শ্মশানপুরীতে আমি আর এক দিনও থাক্‌তে পারলুম না।

—তারপর কি করলে ?

—তারপর একবৎসর ধরে' যেখানে যেখানে তোমার দেশের লোকেরা থাকে, সেই সব বাড়ীতে চাকরি করেছি,—এই আশায় যে, তুমি ফিরে এলে সে খবর পাব। কিন্তু কোথাও এক মাসের বেশি থাক্‌তে পারি নি।

—কেন, তারা কি তোমাকে বক্‌ত, গাল দিত ?

—না, কটু কথা নয়, মিষ্ট কথা বল্‌ত বলে'। তুমি যা' করেছিলে,—অর্থাৎ উপেক্ষা,—এরা কেউ আমাকে তা' করে নি। আমার প্রতি এদের বিশেষ মনোযোগটাই আমার কাছে বিশেষ অসহ্য হত।

—মিষ্টি কথা যে মেয়েদের তিতো লাগে এ ত আগে জানতুম না।

—আমি মনে আর দাসী ছিলুম না—তাই আমি স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে, তাদের ভদ্র কথার পিছনে যে মনোভাব আছে তা' মোটেই ভদ্র নয়। ফলে আমি আমার রূপ যৌবন দারিদ্র্য নিয়েও সকল বিপদ এড়িয়ে গেছি। জানো কিসের সাহায্যে ?

—না।

—আমি আমার শরীরে এমন একটি রক্ষাকবচ ধারণ করতুম, যার গুণে কোনও পাপ আমাকে স্পর্শ করতে পারে নি।

—সেটি কি Cross ?

—বিশেষ করে' আমার পক্ষেই তা' Cross ছিল,—অন্য কারও পক্ষে নয়। তুমি যাবার সময় আমাকে যে গিনিটি বক্‌শিস্ দেও, সেটি আমি একটি কালো ফিতে দিয়ে বুকে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। আমার বুকের ভিতর যে ভালবাসা ছিল, আমার বুকের উপরে ওই স্বর্ণমুদ্রা

ছিল তার বাহ্য নিদর্শন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি সেটিকে দেহছাড়া করি নি, যদিচ আমার এমন দিন গেছে যখন আমি খেতে পাই নি।

—এমন এক দিনও তোমার গেছে যখন তোমাকে উপবাস করতে হয়েছে?

—একদিন নয়, বহুদিন। যখন আমার চাক্‌রি থাক্‌ত না, তখন হাতের পয়সা ফুরিয়ে গেলেই আমাকে উপবাস কর্‌তে হত।

—কেন, তোমার বাপ মা, ভাই ভগ্নী, আত্মীয় স্বজন কি কেউ ছিল না?

—না, আমি জন্মাবধি একটি Foundling Hospitalয়ে মানুষ হই।

—কত বৎসর ধরে' তোমাকে এ কষ্ট ভোগ কর্‌তে হয়েছে?

—এক বৎসরও নয়। তুমি চলে' যাবার মাস দশেক পরে আমার এমন ব্যারাম হল যে, আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হল। সেইখানেই আমি এ সব কষ্ট হতে মুক্তিলাভ করলুম।

—তোমার কি হয়েছিল?

—যক্ষ্মা।

—রোগেরও ত একটা যন্ত্রণা আছে?

—যক্ষ্মা রোগের প্রথম অবস্থায় শরীরের কোনই কষ্ট থাকে না, বরং যদি কিছু থাকে ত সে আরাম। তাই যে ক'মাস আমি হাঁসপাতালে ছিলুম, তা' আমার অতি সুখেই কেটে গিয়েছিল।

—মরণাপন্ন অসুখ নিয়ে হাঁসপাতালে একা পড়ে' থাকা যে সুখের হতে পারে, এ আজ নতুন শুনলুম।

—এ ব্যারামের প্রথম অবস্থায় মৃত্যুভয় থাকে না। তখন মনে হয় এতে প্রাণ হঠাৎ একদিনে নিভে যাবে না। সে প্রাণ দিনের পর দিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে অলক্ষিতে অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে। সে মৃত্যু কতকটা ঘুমিয়ে পড়ার মত। তা' ছাড়া শরীরের ও-অবস্থায় শরীরের কোন কাজ থাকে না বলে' সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখা যায়,—আমি তাই শুধু সুখস্বপ্ন দেখতুম।

—কিসের?

—তোমার। আমার মনে হত যে, একদিন হয়ত তুমি এই হাঁসপাতালে আমার সঙ্গে দেখা করতে আস্‌বে। আমি নিত্য তোমার প্রতীক্ষা করতুম।

—তার যে কোনই সম্ভাবনা ছিল না, তা কি জান্‌তে না?

—যক্ষ্মা হলে লোকের আশা অসম্ভবরকম বেড়ে যায়। সে যাই হোক্, তুমি যদি আস্‌তে তাহলে আমাকে দেখে খুসি হতে।

—তোমার ঐ রুগ্ন চেহারা দেখে আমি খুসি হতুম, এরূপ অদ্ভুত কথা তোমার মনে কি করে' হল?

—সেই ইটালিয়ান পেন্টারের নাম কি, যার ছবি তুমি এত ভালবাসতে যে সমস্ত দেয়ালময় টাঙ্গিয়ে রেখেছিলে?

—Botticelli.

—হাঁ, তুমি এলে দেখতে পেতে যে, আমার চেহারা ঠিক Botticellir ছবির মত হয়েছিল। হাত পা গুলি সরু সরু, আর লম্বা লম্বা। মুখ পাতলা, চোখ দুটো বড় বড়, আর তারা দুটো যেমন তরল তেমনি উজ্জ্বল। আমার রং হাতির দাঁতের রংয়ের মত হয়েছিল, আর যখন জ্বর আসত তখন গাল দুটি একটু লাল হয়ে উঠ্‌ত। আমি জানি যে তোমার চোখে সে চেহারা বড় সুন্দর লাগ্‌ত।

—তুমি কতদিন হাঁসপাতালে ছিলে?

—বেশী দিন নয়। যে ডাক্তার আমায় চিকিৎসা করতেন, তিনি মাস খানেক পরে আবিষ্কার করলেন যে, আমার ঠিক্ যক্ষ্মা হয় নি, শীতে আর অনাহারে শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁর যত্নে ও সুচিকিৎসায় আমি তিন মাসের মধ্যেই ভাল হয়ে উঠলুম।

—তারপর?

—তারপর আমার যখন হাঁসপাতাল থেকে বেরবার সময় হল, তখন ডাক্তারটি এসে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, আমি বেরিয়ে কি করব? আমি উত্তর করলুম—দাসীগিরি। তিনি বললেন যে—তোমার শরীর যখন একবার ভেঙ্গে পড়েছে, তখন জীবনে ওরকম পরিশ্রম করা তোমার দ্বারা আর চলবে না। আমি বললুম—উপায়ান্তর নেই। তিনি প্রস্তাব করলেন যে আমি যদি Nurse হতে রাজি হই ত তার জন্য যা দরকার, সমস্ত খরচা তিনি দেবেন। তাঁর কথা শুনে আমার চোখে জল এল,—কেন না জীবনে এই আমি সব প্রথম একটি সহৃদয় কথা শুনি। আমি সে প্রস্তাবে রাজি হলুম। এত শীগ্‌গির রাজি হবার আরও একটি কারণ ছিল।

—কি?

—আমি মনে করলুম Nurse হয়ে আমি কলকাতায় যাব। তাহলে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে। তোমায় অসুখ হলে তোমার শুশ্রূষা করব।

—আমার অসুখ হবে, এমন কথা তোমার মনে হল কেন?

—শুনেছিলুম তোমাদের দেশ বড়ই অস্বাস্থ্যকর, সেখানে নাকি সব সময়েই সকলের অসুখ করে।

—তারপরে সত্য সত্যই Nurse হলে?

—হাঁ। তারপরে সেই ডাক্তারটি আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করলেন। আমি আমার মন ও প্রাণ, আমার অন্তরের গভীর কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর হাতে সমর্পণ করলুম।

—তোমার বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছে?

—পৃথিবীতে যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আমার স্বামীর কাছে আমি যা' পেয়েছি সে হচ্ছে পদ ও সম্পদ, ধন ও মান, অসীম যত্ন এবং অকৃত্রিম

স্নেহ ; একটি দিনের জন্যও তিনি আমাকে তিলমাত্র অনাদর করেন নি, একটি কথাতেও কখন মনে ব্যথা দেন নি।

—আর তুমি ?

—আমার বিশ্বাস আমিও তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অসুখী করি নি। তিনিত আমার কাছে কিছু চান নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু আমাকে ভালবাসতে ও আমার সেবা করতে। বাপ চিররুগ্ন মেয়ের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে, তিনি আমার সঙ্গে ঠিক সেইরকম ব্যবহার করেছিলেন। আমি সেরে উঠলেও আর আগের শরীর ফিরে পাইনি, বরাবর সেই Botticellir ছবিই থেকে গিয়েছিলুম,—আর আমার স্বামী আমার বাপের বয়সীই ছিলেন। তাঁকে আমি আমার সকল মন দিয়ে দেবতার মত পূজো করেছি।

—আশা করি তোমাদের বিবাহিত জীবনের উপর আমার স্মৃতির ছায়া পড়ে নি ?

—তোমার স্মৃতি আমার জীবন মন কোমল করে' রেখেছিল।

—তাহলে তুমি আমাকে ভুলে যাও নি ?

- না। সেই কথাটা বলবার জন্যইত আজ তোমার কাছে এসেছি। তোমার প্রতি আমার মনোভাব বরাবর একই ছিল।

—বলতে চাও, তুমি তোমার স্বামীকে ও আমাকে দুজনকে এক সঙ্গে ভালবাসতে ?

—অবশ্য। মানুষের মনে অনেক রকম ভালবাসা আছে, যা' পরস্পর বিরোধ না করে' এক সঙ্গে থাকতে পারে। এই দেখো না কেন, লোকে বলে যে শত্রুকে ভালবাসা শুধু অসম্ভব নয়, অনুচিত ;—কিন্তু আমি সম্প্রতি আবিষ্কার করেছি যে শত্রু-মিত্র-নির্ব্বিচারে, যে যন্ত্রণা ভোগ করছে, তার প্রতিই লোকের সমান মমতা, সমান ভালবাসা হতে পারে।

—এ সত্য কোথায় আবিষ্কার করেছ ?

—ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে।

—তুমি সেখানে কি করতে গিয়েছিলে?

—বল্‌ছি। এই যুদ্ধে আমরা দুজনেই ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলুম, তিনি ডাক্তার হিসেবে, আমি Nurse হিসেবে—সেইখান থেকে এই তোমার কাছে আস্‌ছি, যে কথা আগে বল্‌বার সুযোগ পাইনি সেই কথাটি বলবার জন্য।

—তোমার কথা আমি ভাল বুঝতে পারছি নে।

—এর ভিতর হেঁয়ালি কিছু নেই। এই ঘণ্টাখানেক আগে তোমার সেই Botticellir ছবি একটি জর্ম্মাণ গোলার আঘাতে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেছে—অমনি আমি তোমার কাছে চলে' এসেছি।

—তাহলে এখন তুমি?

—পরলোকে।

এর পর টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আমি ঘরে চলে' এলুম। মুহূর্ত্তে আমার শরীর মন একটা অস্বাভাবিক তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে এল। আমি শোবামাত্র ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়্‌লুম। তার পরদিন সকালে চোখ খুলে দেখি বেলা দশটা বেজে গেছে। * * * * * *

কথা শেষ করে' বন্ধুদের দিকে চেয়ে দেখি, রূপকথা শোনবার সময় ছোট ছেলেদের মুখের যেমন ভাব হয়, সীতেশের মুখে ঠিক সেই ভাব। সোমনাথের মুখ কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে। বুঝলুম তিনি নিজের মনের উদ্বেগ জোর করে চেপে রাখ্‌ছেন। আর সেনের চোখ ঢুলে আস্‌ছে,—ঘুমে কি ভাবে, বলা কঠিন। কেউ 'হুঁ না' ও কল্লেন না। মিনিট খানেক পরে বাইরে গির্জ্জের ঘণ্টায় বারোটা বাজলে, আমরা সকলে এক সঙ্গে উঠে পড়ে' boy boy বলে' চীৎকার করলুম, কেউ সাড়া দিলে না। ঘরে ঢুকে দেখি চাকরগুলো সব

মেজেতে বসে' দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমচ্ছে। চাকরগুলোকে টেনে তুলে গাড়ী জুত্‌তে বলতে নীচে পাঠিয়ে দিলুম।

হঠাৎ সীতেশ বলে' উঠ্‌লেন "দেখ রায়, তুমি একজন লেখক, দেখো এ সব গল্প যেন কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো না, তাহলে আমি আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখাতে পারব না"। আমি উত্তর করলুম "সে লোভ আমি সম্বরণ করতে পারব না, তাতে তোমরা আমার উপর খুসিই হও, আর রাগই করো"। সেন বল্লেন "আমার কোনও আপত্তি নেই। আমি যা' বল্লুম তা আগাগোড়া সত্য, কিন্তু সকলে ভাববে যে তা' আগাগোড়া বানানো"। সোমনাথ বল্লেন "আমারও কোনও আপত্তি নেই, আমি যা' বল্লুম তা আগাগোড়া বানানো; কিন্তু লোকে ভাববে যে তা' আগাগোড়া সত্যি"। আমি বল্লুম, "আমি যা' বল্লুম তা' ঘটেছিল, কি আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, তা' আমি নিজেও জানি নে। সেই জন্যই ত এ সব গল্প লিখে ছাপাব। পৃথিবীতে দু'রকম কথা আছে যা' বলা অন্যায়,—এক হচ্ছে মিথ্যা, আর এক হচ্ছে সত্য। যা' সত্যও নয় মিথ্যাও নয়,আর না হয়ত একই সঙ্গে দুই, তা' বলায় বিপদ নেই।

সীতেশ বল্লেন "তোমাদের কথা আলাদা। তোমাদের একজন কবি, একজন ফিলজফার, আর একজন সাহিত্যিক,—সুতরাং তোমাদের কোন্ কথা সত্য আর কোন্ কথা মিথ্যে, তা' কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু আমি হচ্ছি সহজ মানুষ, হাজারে ন'শ নিরনব্বই জন যেমন হয়ে থাকে, তেমনি। আমার কথা যে খাঁটি সত্য, পাঠকমাত্রেই তা' নিজের মন দিয়েই যাচাই করে' নিতে পারবে।"

আমি বল্লুম—"যদি সকলের মনের সঙ্গে তোমার মনের মিল থাকে, তা হলে তোমার মনের কথা প্রকাশ করায় ত তোমার লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই"। সীতেশ বল্লেন, "বাঃ, তুমিত বেশ বল্লে! আর পাঁচজন যে আমার মত, এ কথা সকলে মনে মনে জানলেও, কেউ মুখে তা' স্বীকার করবে না, মাঝ থেকে আমি শুধু বিদ্রূপের ভাগী হব।" এ কথা শুনে সোমনাথ বল্লেন, "দেখ রায়, তাহলে এক কাজ করো,—সীতেশের গল্পটা আমার নামে চালিয়ে দেও, আর আমার

গল্পটা সীতেশের নামে" ! এ প্রস্তাবে সীতেশ অতিশয় ভীত হয়ে বল্‌লেন, "না না, আমার গল্প আমারই থাক্। এতে নয় লোকে দুটো ঠাট্টা কর্‌বে, কিন্তু সোমনাথের পাপ আমার ঘাড়ে চাপালে আমাকে ঘর ছাড়্‌তে হবে"—

এর পরে আমরা সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করলুম।

জানুয়ারি, ১৯১৬।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

জাপান-যাত্রীর পত্র।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সমুদ্রের মোহানায় পাইলট নেবে গেল। এর কিছু আগে থাক্‌তেই সমুদ্রের রূপ দেখা দিয়েচে। তার কূলের বেড়ি খসে' গেচে। কিন্তু এখনও তার মাটীর রং ঘোচে নি। পৃথিবীর চেয়ে আকাশের সঙ্গেই যে তার আত্মীয়তা বেশি, সে কথা এখনো প্রকাশ হয় নি,—কেবল দেখা গেল জলে আকাশে এক-দিগন্তের মালা বদল করেচে। যে ঢেউ দিয়েচে, নদীর ঢেউয়ের ছন্দের মত তার ছোট ছোট পদবিভাগ নয়; এ যেন মন্দাক্রান্তা—কিন্তু এখনো সমুদ্রের শার্দ্দূল বিক্রীড়িত সুরু হয় নি।

আমাদের জাহাজের নীচের তলার ডেকে অনেকগুলি ডেক্-প্যাসেঞ্জার; তাদের অধিকাংশই মাদ্রাজি, এবং তারা প্রায় সকলেই রেঙ্গুনে যাচ্চে। তাদের পরে এই জাহাজের লোকের ব্যবহারে কিছু-মাত্র কঠোরতা নেই, তারা বেশ স্বচ্ছন্দে আছে। জাহাজের ভাণ্ডার থেকে তারা প্রত্যেকে একখানি করে' ছবি আঁকা কাগজের পাখা পেয়ে ভারি খুসি হয়েচে।

এরা অনেকেই হিন্দু, সুতরাং এদের পথের কষ্ট ঘোচান কারো সাধ্য নয়। কোন মতে আখ চিবিয়ে, চিঁড়ে খেয়ে এদের দিন যাচ্চে। একটা জিনিস ভারি চোখে লাগে, সে হচ্চে এই যে, এরা মোটের উপর পরিষ্কার—কিন্তু সেটা কেবল বিধানের গণ্ডির মধ্যে,—বিধানের

বাইরে এদের নোংরা হবার কোনো বাধা নেই। আখ চিবিয়ে তার ছিব্‌ড়ে অতি সহজেই সমুদ্রে ফেলে দেওয়া যায়, কিন্তু সেটুকু কষ্ট নেওয়া এদের বিধানে নেই,—যেখানে বসে খাচ্চে তার নেহাৎ কাছে ছিব্‌ড়ে ফেলচে;—এমনি করে' চারিদিকে কত আবর্জ্জনা যে জমে উঠ্‌চে তাতে এদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সব চেয়ে আমাকে পীড়া দেয় যখন দেখি থুথু ফেলা সম্বন্ধে এরা বিচার করে না। অথচ বিধান অনুসারে শুচিতা রক্ষা করবার বেলায় নিতান্ত সামান্য বিষয়েও এরা অসামান্য রকম কষ্ট স্বীকার করে। আচারকে শক্ত করে তুল্লে বিচারকে ঢিলে করতেই হয়। বাইরে থেকে মানুষকে বাঁধলে মানুষ আপনাকে আপনি বাঁধবার শক্তি হারায়।

এদের মধ্যে কয়েকজন মুসলমান আছে; পরিষ্কার হওয়া সম্বন্ধে তারা যে বিশেষ সতর্ক তা নয়, কিন্তু পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে তাদের ভারি সতর্কতা। ভাল কাপড়টি পরে' টুপিটি বাগিয়ে তারা সর্ব্বদা প্রস্তুত থাক্‌তে চায়। একটু মাত্র পরিচয় হলেই অথবা না হলেও তারা দেখা হলেই প্রসন্ন মুখে সেলাম করে। বোঝা যায় তারা বাইরের সংসারটাকে মানে। কেবলমাত্র নিজের জাতের গণ্ডির মধ্যে যারা থাকে, তাদের কাছে সেই গণ্ডির বাইরেকার লোকালয় নিতান্ত ফিকে। তাদের সমস্ত বাঁধাবাঁধি জাত-রক্ষার বন্ধন। মুসলমান জাতে বাঁধা নয় বলে' বাহিরের সংসারের সঙ্গে তার ব্যবহারের বাঁধাবাঁধি আছে। এই জন্যে আদব কায়দা মুসলমানের। আদব কায়দা সমস্ত মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম। মনুতে পাওয়া যায় মা মাসী মামা পিসের সঙ্গে কিরকম ব্যবহার করতে হবে, গুরুজনের গুরুত্বের মাত্রা কার কতদূর,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে পরস্পরের ব্যবহার

কিরকম হবে ;—কিন্তু সাধারণভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহার কিরকম হওয়া উচিত, তার বিধান নেই। এই জন্য জাত বিচারের বাইরে মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা রক্ষার জন্য, পশ্চিম ভারত, মুসলমানের কাছ থেকে সেলাম শিক্ষা করেচে। কেননা, প্রণাম নমস্কারের সমস্ত বিধি কেবল জাতির মধ্যেই খাটে। বাহিরের সংসারটাকে ইতিপূর্ব্বে আমরা অস্বীকার করে' চলে ছিলুম বলেই সাজসজ্জা সম্বন্ধে পরিচ্ছন্নতা হয় আমরা মুসলমানের কাছ থেকে নিয়েচি, নয় ইংরেজের কাছ থেকে নিচ্চি। ওটাতে আমাদের আরাম নেই। সেই জন্য ভদ্রতার সাজ সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত আমাদের পাকাপাকি কিছুই ঠিক হল না। বাঙ্গালী ভদ্রসভায় সাজসজ্জার যে এমন অদ্ভুত বৈচিত্র্য, তার কারণই এই। সব সাজই আমাদের সাজ। আমাদের নিজের সাজ, মণ্ডলীর ভিতরকার সাজ,— সুতরাং বাহিরের সংসারের হিসাবে সেটা বিবসন বল্লেই হয়,—অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা যেরকম, অর্থাৎ দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমরা ভাই খুড়ো দিদি মাসা প্রভৃতি কোন-একটা সম্পর্ক পাতাবার জন্যে ব্যস্ত থাকি,— নইলে আমরা থই পাইনে। হয় অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা, নয় অত্যন্ত দূরত্ব,— এর মাঝখানে যে একটা প্রকাণ্ড জায়গা আছে, সেটা আজো আমাদের ভাল করে' আয়ত্ত হয় নি। এমন কি, সেখানকার বিধিবন্ধনকে আমরা হৃদ্যতার অভাব বলে নিন্দা করি। এ কথা ভুলে যাই, যে সব মানুষকে হৃদয় দিতে পারিনে, তাদেরও কিছু দেবার আছে। এই দানটাকে আমরা কৃত্রিম বলে' গাল দিই, কিন্তু জাতের কৃত্রিম খাঁচার মধ্যে মানুষ বলেই এই সাধারণ আদবকায়দাকে আমাদের কৃত্রিম বলে' ঠেকে। বস্তুত ঘরের মানুষকে আত্মীয় বলে', এবং তার বাইরের

মানুষকে আপন সমাজের বলে', এবং তারো বাইরের মানুষকে মানব সমাজের বলে' স্বীকার করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। হৃদয়ের বন্ধন, আচারের বন্ধন, এবং আদবকায়দার বন্ধন,—এ তিনই মানুষের প্রকৃতিগত।

কাপ্তেন বলে' রেখেচেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় ঝড় হবে, ব্যারোমিটার নাবচে। কিন্তু শান্ত আকাশে সূর্য্য অস্ত গেল। বাতাসে যে-পরিমাণ বেগ থাক্‌লে তাকে মন্দ পবন বলে, অর্থাৎ যুবতীর মন্দ গমনের সঙ্গে কবিরা তুলনা করতে পারে,—এ তার চেয়ে বেশি; কিন্তু ঢেউগুলোকে নিয়ে রুদ্রতালের করতাল বাজাবার মত আসর জমেনি,—যেটুকু খোলের বোল দিচ্চে তাতে ঝড়ের গৌরচন্দ্রিকা বলেও মনে হয়নি। মনে করলুম মানুষের কুষ্ঠির মত, বাতাসের কুষ্ঠি গণনার সঙ্গে ঠিক মেলে না,—এ যাত্রা ঝড়ের ফাঁড়া কেটে গেল। তাই পাইলটের হাতে আমাদের ডাঙার চিঠিপত্র সমর্পণ করে' দিয়ে প্রসন্ন মনে সমুদ্রকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ডেক-চেয়ার টেনে নিয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে বস্‌লুম।

হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানী দরোয়ানদের খচমচির মত বাতাসের লয়টা ক্রমেই দ্রুত হয়ে উঠ্‌ল। জলের উপর সূর্য্যাস্তের আলপনা-আঁকা আসনটি আচ্ছন্ন করে' নীলাম্বরীর ঘোমটা-পরা সন্ধ্যা এসে বস্‌ল। আকাশে তখনও মেঘ নেই, আকাশ-সমুদ্রের ফেনার মতই ছায়াপথ জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল।

ডেকের উপর বিছানা করে' যখন শুলুম, তখন বাতাসে এবং জলে বেশ একটা কবির লড়াই চল্‌চে,—একদিকে সোঁ সোঁ শব্দে তান লাগিয়েচে, আর একদিকে ছল্‌ ছল্‌ শব্দে জবাব দিচ্চে, কিন্তু ঝড়ের পালা

বলে' মনে হলনা। আকাশের তারাদের সঙ্গে চোখোচোখি করে' কখন্ এক সময় চোখ বুজে এল।

রাতে স্বপ্ন দেখ্‌লুম আমি যেন মৃত্যু সম্বন্ধে কোন্ একটি বেদমন্ত্র আবৃত্তি করে' সেইটে কাকে বুঝিয়ে বল্‌চি। আশ্চর্য্য তার রচনা, যেন একটা বিপুল আর্ত্তস্বরের মত, অথচ তার মধ্যে মরণের একটা বিরাট ঔদাস্য আছে। এই মন্ত্রের মাঝখানে জেগে উঠে দেখি আকাশ এবং জল তখন উন্মত্ত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র চামুণ্ডার মত ফেনার জিব মেলে প্রচণ্ড অট্টহাস্যে নৃত্য করচে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি মেঘগুলো যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে, যেন তাদের কাণ্ডজ্ঞান নেই,—বল্‌চে, যা' থাকে কপালে। আর জলে যে বিষম গর্জ্জন উঠ্‌চে, তাতে নিজের মনের ভাবনাও যেন শোনা যায় না, এমনি বোধ হতে লাগ্‌ল। মাল্লারা ছোট ছোট লণ্ঠন হাতে ব্যস্ত হয়ে এদিকে ওদিকে চলাচল করচে,—কিন্তু নিঃশব্দে। মাঝে মাঝে এঞ্জিনের প্রতি কর্ণধারের সঙ্কেত-ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাচ্চে।

আবার বিছানায় শুয়ে ঘুমবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু বাইরে ঐ জলবাতাসের গর্জ্জন, আর আমার মনের মধ্যে সেই স্বপ্নলব্ধ মরণ মন্ত্র ক্রমাগত বাজ্‌তে লাগল। আমার ঘুমের সঙ্গে জাগরণ ঠিক যেন ঐ ঝড় এবং ঢেউয়ের মতই এলোমেলো মাতামাতি করতে থাক্‌ল,—ঘুমচ্চি কি জেগে আছি বুঝতে পারচি নে।

রাগী মানুষ কথা কইতে না পারলে যেমন ফুলে ফুলে ওঠে সকাল বেলাকার মেঘগুলোকে তেমনি বোধ হল। বাতাস শ ষ স, এবং জল বাকি অন্তঃস্থ বর্ণ য র ল ব হ নিয়ে চণ্ডীপাঠ বাধিয়ে দিলে, আর মেঘগুলো ফুলে ফুলে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মেঘের বাণী জল

ধারায় নেবে পড়ল। নারদের বীণাধ্বনিতে বিষ্ণু গঙ্গাধারায় বিগলিত হয়েছিলেন একবার, আমার সেই পৌরাণিক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু এ কোন্ নারদ প্রলয়-বীণা বাজাচ্চে? এর সঙ্গে নন্দী ভৃঙ্গীর যে মিল দেখি, আর ওদিকে বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের প্রভেদ ঘুচে গেছে।

এ পর্য্যন্ত জাহাজের নিত্যক্রিয়া এক রকম চলে যাচ্চে, এমন কি আমাদের প্রাতরাশেরও ব্যাঘাত হল না। কাপ্তেনের মুখে কোনো উদ্বেগ নেই। তিনি বল্লেন এই সময়টাতে এমন একটু আধটু হয়ে থাকে;—আমরা যেমন যৌবনের চাঞ্চল্য দেখে বলে' থাকি, ওটা বয়সের ধর্ম্ম।

ক্যাবিনের মধ্যে থাক্‌লে ঝুম্‌ঝুমির ভিতরকার বড়াইগুলোর মত নাড়া খেতে হবে, তারচেয়ে খোলাখুলি ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করাই ভাল। আমরা শাল কম্বল মুড়ি দিয়ে জাহাজের ডেকের উপর গিয়েই বস্‌লুম। ঝড়ের ঝাপট পশ্চিম দিক থেকে আসচে, সেইজন্যে পূর্ব্বদিকের ডেকে বসা দুঃসাধ্য ছিল না।

ঝড় ক্রমেই বেড়ে চল্ল। মেঘের সঙ্গে ঢেউয়ের সঙ্গে কোনো ভেদ রইল না। সমুদ্রের সে নীল রং নেই,—চারিদিক ঝাপসা, বিবর্ণ। ছেলেবেলায় আরব্য উপন্যাসে পড়েছিলুম, জেলের জালে যে ঘড়া উঠেছিল তার ঢাক্‌না খুল্‌তেই তার ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত পাকিয়ে পাকিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমার মনে হল, সমুদ্রের নীল ঢাকনাটা কে খুলে ফেলেচে, আর ভিতর থেকে ধোঁয়ার মত লাখো লাখো দৈত্য পরস্পর ঠেলাঠেলি কর্‌তে কর্‌তে আকাশে উঠে পড়চে।

জাপানী মাল্লারা ছুটোছুটি কর্‌চে কিন্তু তাদের মুখে হাসি লেগেই

আছে। তাদের ভাব দেখে মনে হয় সমুদ্র যেন জাহাজটাকে ঠাট্টা করচে মাত্র ;—পশ্চিম দিকের ডেকের দরজা প্রভৃতি সমস্ত বন্ধ, তবু সে সব বাধা ভেদ করে' এক একবার জলের ঢেউ হুড়মুড় করে এসে পড়চে, আর তাই দেখে ওরা হেসে উঠ্‌চে। কাপ্তেন আমাদের বারবার বল্লেন,—ছোট ঝড়, সামান্য ঝড়। এক সময় আমাদের ষ্টুয়ার্ড এসে টেবিলের উপর আঙুল দিয়ে এঁকে আমাদের বুঝিয়ে দিলে, যথাসম্ভব ঝড় বাঁচিয়ে চলবার জন্যে জাহাজ রেঙ্গুনের দিকে না গিয়ে দক্ষিণের দিকে চলেচে। ইতিমধ্যে বৃষ্টির ঝাপটা লেগে শাল কম্বল সমস্ত ভিজে শীতে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েচে। আর কোথাও সুবিধা না দেখে কাপ্তেনের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। কাপ্তেনের যে কোনো উৎকণ্ঠা আছে, বাইরে থেকে তার কোনো লক্ষণ দেখতে পেলুম না। তিনি বল্লেন, এখন আমরা ঘূর্ণি ঝড়ের মাঝখানটাতে এসেচি, এবং ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের গতি পরিবর্ত্তন করচি। অর্থাৎ জাহাজ এখন উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সকল দিকেই চল্‌চে।

ঘরে আর বসে থাক্‌তে পারলুম না। ভিজে শাল মুড়ি দিয়ে আবার বাইরে এসে বস্‌লুম। এত তুফানেও যে আমাদের ডেকের উপর আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে ফেল্‌চে না, তার কারণ জাহাজ আকণ্ঠ বোঝাই। ভিতরে যার পদার্থ নেই তার মত দোলায়িত অবস্থা আমাদের জাহাজের নয়। মৃত্যুর কথা অনেকবার মনে হল। চারিদিকেই ত মৃত্যু, দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত মৃত্যু—আমার প্রাণ এর মধ্যে এতটুকু। এই অতি ছোটটাকেই কি কেবল বিশ্বাস করব, আর এই এত বড়টাকে কিছু বিশ্বাস করব না ?—বড়র উপরে ভরসা রাখাই ভাল।

ডেকে বসে থাকা আর চল্‌চে না। নীচে নাবতে গিয়ে দেখি সিঁড়ি

পর্য্যন্ত জুড়ে সমস্ত রাস্তা ঠেসে ভর্ত্তি করে' ডেক্-প্যাসেঞ্জার বসে। বহু কষ্টে তাদের ভিতর দিয়ে পথ করে' ক্যাবিনের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লুম। এইবার সমস্ত শরীর মন ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মনে হল দেহের সঙ্গে প্রাণের আর বন্‌তি হচ্চে না; দুধ মথন করলে মাখনটা যে রকম ছিন্ন হয়ে আসে প্রাণটা যেন তেমনি হয়ে এসেচে। জাহাজের উপরকার দোলা সহ্য করা যায়, জাহাজের ভিতরকার দোলা সহ্য করা শক্ত। কাঁকরের উপর দিয়ে চলা, আর জুতোর ভিতরে কাঁকর নিয়ে চলার যে তফাৎ, এ যেন তেমনি। একটাতে মার আছে বন্ধন নেই, আর একটা বেঁধে মার।

ক্যাবিনে শুয়ে শুয়ে এক একবার শুন্‌তে পেলুম ডেকের উপর কি যেন সব হুড়মুড় করে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়চে। ক্যাবিনের মধ্যে হাওয়া আসবার জন্যে যে ফানেল গুলো ডেকের উপর হাঁ করে নিশ্বাস নেয়, ঢাকা দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়েচে,—কিন্তু ঢেউয়ের প্রবল চোটে তার ভিতর দিয়েও ঝলকে ঝলকে ক্যাবিনের মধ্যে জল এসে পড়চে। বাইরে উনপঞ্চাশ বায়ুর নৃত্য, অথচ ক্যাবিনের মধ্যে গুমট। একটা ইলেক্‌ট্রিক পাখা চল্‌চে, তাতে যেন তাপটাকে আরো চারিয়ে দিচ্চে।

হঠাৎ মনে হয় এ একেবারে অসহ্য। কিন্তু মানুষের মধ্যে শরীর মন প্রাণের চেয়েও বড় একটা সত্তা আছে। ঝড়ের আকাশের উপরেও যেমন শান্ত আকাশ, তুফানের সমুদ্রের নীচে যেমন শান্ত সমুদ্র—সেই আকাশ সেই সমুদ্রই যেমন বড়; মানুষের অন্তরের গভীরে এবং সমুচ্চে সেইরকম এক একটি বিরাট শান্ত পুরুষ আছে—

বিপদ এবং দুঃখের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে দেখ্‌লে তাকে পাওয়া যায়—দুঃখ তার পায়ের তলায়, মৃত্যু তাকে স্পর্শ করে না।

সন্ধ্যার সময় ঝড় থেমে গেল। উপরে গিয়ে দেখি জাহাজটা সমুদ্রের কাছে এতক্ষণ ধরে' যে চড় চাপড় খেয়েচে, তার অনেক চিহ্ন আছে। কাপ্তেনের ঘরের একটা প্রাচীর ভেঙ্গে গিয়ে তাঁর আসবাব পত্র সমস্ত ভিজে গেছে। একটা বাঁধা লাইফ্‌-বোট জখম হয়েচে। ডেকে প্যাসেঞ্জারদের একটা ঘর, ভাণ্ডারের একটা অংশ ভেঙে পড়েচে। জাপানী মাল্লারা এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত ছিল যাতে প্রাণ সংশয় ছিল। জাহাজ যে বারবার আসন্ন সঙ্কটের সঙ্গে লড়াই করেচে, তার একটা স্পষ্ট প্রমাণ দেখা গেল—জাহাজের ডেকের উপর কর্কের তৈরি সাঁতার দেবার জামাগুলো সাজানো। এক সময়ে এগুলো বের করবার কথা কাঁপ্তেনের মনে এসেছিল।—কিন্তু এই ঝড়ের পালার মধ্যে সব চেয়ে স্পষ্ট করে' আমার মনে পড়চে জাপানি মাল্লাদের হাসি।

শনিবার দিনে আকাশ প্রসন্ন, কিন্তু সমুদ্রের আক্ষেপ এখনো ঘোচে নি। আশ্চর্য্য এই, ঝড়ের সময় জাহাজ এমন দোলে নি, ঝড়ের পর যেমন তার দোলা। কালকেকার উৎপাতকে কিছুতেই যেন সে ক্ষমা করতে পারচে না, ক্রমাগতই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠচে। শরীরের অবস্থাটাও অনেকটা সেই রকম,—ঝড়ের সময় সে একরকম শক্ত ছিল, কিন্তু পরের দিন ভুল্‌তে পারছে না তার উপর দিয়ে ঝড় গিয়েচে।

আজ রবিবার। জলের রং ফিকে হয়ে উঠেচে। এতদিন পরে আকাশে একটি পাখী দেখ্‌তে পেলুম—এই পাখীগুলিই পৃথিবীর বাণী

আকাশে বহন করে নিয়ে যায়—আকাশ দেয় তার আলো, পৃথিবী দেয় তার গান। সমুদ্রের যা-কিছু গান, সে কেবল তার নিজের ঢেউয়ের—তার কোলে জীব আছে যথেষ্ট, পৃথিবীর চেয়ে অনেক বেশি, কিন্তু তাদের কারো কণ্ঠে সুর নেই—সেই অসংখ্য বোবা জীবের হয়ে সমুদ্র নিজেই কথা কচ্চে। ডাঙার জীবেরা প্রধানতঃ শব্দের দ্বারাই মনের ভাব প্রকাশ করে, জলচরদের ভাষা হচ্চে গতি। সমুদ্র হচ্চে নৃত্যলোক, আর পৃথিবী হচ্চে শব্দলোক।

আজ বিকেলে চারটে পাঁচটার সময় রেঙ্গুনে পৌঁছবার কথা। মঙ্গলবার থেকে শনিবার পর্য্যন্ত পৃথিবীতে নানা খবর চলাচল করছিল, আমাদের জন্যে তারা সমস্ত জমে রয়েচে;—বাণিজ্যের ধনের মত নয় প্রতিদিন যার হিসাব চল্‌চে; কোম্পানির কাগজের মত, অগোচরে যার সুদ জম্‌চে।

২৪ বৈশাখ ১৩২৩।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম্, এ, বার-য়্যাট্-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোটস প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

সমুদ্র-যাত্রা।

(মার্কিণ-যাত্রা নামক পুস্তকের মুখপত্র স্বরূপে লিখিত।)

——:o:——
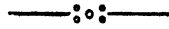
শুন্‌তে পাই ভারতবাসীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ। সম্ভবতঃ একই কারণে ও-যাত্রার উল্লেখও অলঙ্কারশাস্ত্রে নিষিদ্ধ ছিল, কেননা সংস্কৃতসাহিত্যে সমুদ্রযাত্রা-বর্ণন বড় একটা দৃষ্টিগোচর হয় না।. সংস্কৃত কাব্য নাটকের সকল ঘটনা ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই ঘট্‌ত। সংস্কৃত সাহিত্যে Odyssey নেই, Iliad আছে,—এবং সে Iliad অর্থাৎ রামায়ণের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা রামরাবণের যুদ্ধ অবশ্য লঙ্কাদ্বীপে ঘটেছিল, এবং ভারতবর্ষ ও লঙ্কার মধ্যে সাগরের ব্যবধান এখনও আছে, তখনও ছিল। কিন্তু এই স্বল্পপরিসর সাগর-টির এপার থেকে ওপারে যেতে রাম লক্ষ্মণ এবং তাঁদের অনুচর সহচরদের সমুদ্রযাত্রা করতে হয়নি। এ সমুদ্র শ্রীমৎ হনুমান এক লম্ফে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, এবং রাম লক্ষ্মণ সেতু বন্ধন করে', সেই সেতু-পথে সদলবলে পায়ে হেঁটে পার হয়েছিলেন। এ সব উপায়ে সাগর পার হওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে আজকালকার লোকের মনে সন্দেহ থাক্‌তে পারে। সে যাই হোক্, রামায়ণের রচয়িতা যে কখনও সমুদ্র লঙ্ঘন করেন নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, কেননা এর প্রমাণ তাঁর লঙ্কাপুরীর বর্ণনা হতেই পাওয়া যায়। লঙ্কা চোখে দেখ্‌লে সে পুরীকে তিনি আমাদের চোখের সুমুখে খাড়া করে দিতে পারতেন, কেননা

বর্ণনা-শক্তিতে বাল্মীকির সমকক্ষ দ্বিতীয় কবি সংস্কৃত সাহিত্যে নেই। বাল্মীকির পক্ষে লঙ্কাপুরীর চাক্ষুষ পরিচয় লাভ করবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা, তার কারণ রাম জন্মাবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে রামায়ণ লেখা হয়েছিল। এ কাব্য যখন রচিত হয়, তখন সে রামও ছিলনা, সে অযোধ্যাও ছিল না, সে রাবণও ছিলনা, সে লঙ্কাও ছিল না। তাই রামায়ণের বর্ণনায় আমরা লঙ্কার চেহারা দেখ্‌তে পাইনে, যা পাই তা হচ্ছে গাছের ফর্দ্দ, ফুলের ফর্দ্দ, পাখীর ফর্দ্দ ইত্যাদি; এ সব গাছ, এ সব ফুল, এ সব পাখী ভারতবর্ষেও প্রচুর পরিমাণে মেলে। এ লঙ্কাপুরী ভারতবর্ষের যে-কোনও দেশে রচিত হতে পারত। বাল্মীকি বলেছেন যে, লঙ্কা বিশ্বকর্ম্মার মানসী সৃষ্টি, কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই এ পুরী বিশ্বকর্ম্মার নয়, বাল্মীকির মনো-কল্পিত। কবি বলেছেন যে, প্লবগশ্রেষ্ঠ পবননন্দনের নয়নে সে পুরী আকাশে ভাসমান স্বরূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তা হবারই কথা, কেননা রামায়ণের লঙ্কা হচ্ছে ইংরাজিতে যাকে বলে Castle in the air। ফলকথা এই যে, সংস্কৃত সরস্বতী সমুদ্রের জলস্পর্শ করতেন না।

২

সংস্কৃতসাহিত্য এ বিষয়ে নীরব থাক্‌লেও, ভারতবাসীরা সমুদ্র-পথে যে দেশ দেশান্তরে যাতায়াত করতেন, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমরা বৌদ্ধসাহিত্যে পাই। জাতকে, অবদানে, জম্বুদ্বীপবাসীদের সমুদ্রযাত্রার বহু বর্ণনা আছে। এ সাহিত্য গল্পসাহিত্য হলেও রূপকথা বলে' উড়িয়ে দেবার জো নেই, কেননা এ সাহিত্যের সমুদ্র-যাত্রা-বর্ণন থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বর্ণনকারাদের সমুদ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। প্রথমতঃ দেখ্‌তে পাই যে, বৌদ্ধ-

সাহিত্যে লোকে নৌকাযোগেই সমুদ্রযাত্রা করত, যেমন একালে আমরা করে' থাকি। বৌদ্ধসাহিত্যের কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তাহলে মেনে নিতে হয় যে, সেকালে এদেশে বিমানের ছড়াছড়ি ছিল, কিন্তু এই সকল পুষ্পাকরথে বোধিসত্ত্ব, স্থবির, মহাস্থবির প্রভৃতি শূন্যমার্গে বিচরণ করতেন। সমুদ্রপারে যেতে হলে জনসাধারণের পক্ষে জাহাজে চড়া ছাড়া উপায়ন্তর ছিল না। এবং সে যুগে যাঁরা সমুদ্রযাত্রা করতেন, তাঁরা প্রায় সকলেই সাধারণ লোক ছিলেন, কেননা সেকালে বাণিজ্য করাই ছিল বিদেশ গমনের প্রধান উদ্দেশ্য। এই বৌদ্ধসাহিত্য হতে বণিক্-গ্রামের যে সকল আচার ব্যবহার আইন কানুনের পরিচয় পাওয়া যায়, তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সেকালের বণিক সম্প্রদায়ের সমুদ্রযাত্রার কথা কাল্পনিক নয়। তা ছাড়া এ সাহিত্যে সমুদ্রে ঝড় তুফানের যে-সকল বর্ণনা আছে, তার যাথার্থ্য যিনি কালাপানি পার হয়েছেন তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য। বৌদ্ধসাহিত্যে যে-সকল সমুদ্রযাত্রীর পরিচয় পাই, তাঁরা সকলেই ভরুকচ্ছ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ হতে যাত্রা করতেন, অর্থাৎ ভারতবর্ষের পশ্চিম সমুদ্রের তীরবাসী লোকেরাই সেকালে "মহাসমুদ্রে অবতরণ" করতেন। অদ্যাবধি ঐ প্রদেশের অসংখ্য লোকে একালের জাহাজের লস্কর স্বরূপে মহাসমুদ্র পারাপার করছে। তাদের একালে নিজের অর্ণবপোত নেই, নিজের বাণিজ্য নেই, কিন্তু সমুদ্র লঙ্ঘন করবার জাতীয় প্রবৃত্তি এবং অভ্যাস আজও সমান আছে।

৩

মনু বলেন আর্য্যাবর্ত্তের উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত, পশ্চিমে সমুদ্র আর পূর্ব্বে সমুদ্র। এই পূর্ব্বসমুদ্রতীরবাসী হচ্ছি

আমরা বাঙ্গালী জাতি। যারা সমুদ্রতীরে বাস করে, বিদেশ গমনের জন্য সমুদ্রপথই হচ্ছে তাদের রাজপথ, এবং বাণিজ্য করবার জন্য সমুদ্রযাত্রা করা তাদের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং এ বিষয়ে কোন বাহ্য প্রমাণ না থাকলেও, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে সমুদ্র-যাত্রা করতেন, এরূপ অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসঙ্গত হ'ত না। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী জাতি যে পূর্ব্বে সমুদ্রচর ছিল, এ সত্য এখন অনুমানের উপর নির্ভর করছে না, প্রমাণের উপর তা প্রতিষ্ঠিত। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে হেলায় লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, কিম্বা জাপানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন, তার অবশ্য কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু বিজয় সিংহ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয় প্রভৃতি কিম্বদন্তির ভিতরে এইটুকু ঐতিহাসিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যে, বাঙ্গলার এমন এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালী নাবিকেরা বাঙ্গলার অর্ণবপোতে মহাসমুদ্রে অবতরণ করত। এবং এই কারণে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যে অংশ খাঁটি বাঙ্গলা, সে অংশে সমুদ্রযাত্রার বহু বর্ণনা আছে। চণ্ডীর উপাখ্যান, মনসামঙ্গল প্রভৃতিই খাঁটি বাঙ্গলা কাব্য। এ সকল কথার জন্মভূমি বাঙ্গলা দেশ, এ সকল কাব্য কোনও সংস্কৃতকাব্যের অনুবাদ নয়। এ সকল কাব্যের নায়ক ক্ষত্রিয় নয়,—বৈশ্য; রামলক্ষ্মণ, ভীমার্জ্জুন নয়,—চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগর ইত্যাদি। এবং এঁরা সকলেই মহাসমুদ্রে অবতরণ করেছিলেন।

৪

কোন্ যুগে এবং কি কারণে বাঙ্গালী সমুদ্রযাত্রা ত্যাগ করে-ছিল তা জানিনে, কিন্তু বাঙ্গালী জাতি যে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ এবং

সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমুদ্র-যাত্রার এবং সমুদ্রের ওপারের দেশের কথা শুন্‌তে ভালবাস্‌ত, তার প্রমাণ কবিকঙ্কনচণ্ডী এবং নানা কবিরচিত নানা মনসামঙ্গল। পূর্ব্বযুগের বাঙ্গলার আপামর সাধারণের আদর্শ নায়িকা ছিল "বেহুলা"। সাবিত্রী সত্যবানের মৃতদেহ শুধু কোলে করে' বসেছিলেন, কিন্তু বেহুলা লখিন্দরের মৃতদেহ কলার ভেলায় তুলে নিয়ে সমুদ্রের অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, কেননা যে বংশে তাঁর জন্ম, সে বংশের সমুদ্রই ছিল কর্ম্মভূমি। এই বীরবণিক এবং নাবিকের জাতি যে কবে এবং কেন ঘরো বাঙ্গালা হয়ে উঠেছিল, বাঙ্গলার ইতিহাসে অদ্যাবধি তার সন্ধান পাওয়া যায়নি। বাঙ্গালা অবশ্য সমুদ্রের মায়া একেবারে কাটাতে পারেনি। বিলেতি জাহাজে বাঙ্গালী লস্করের সংখ্যা আজও বড় কম নয়,—কিন্তু তারা সব মুসলমান। বোধহয় সমুদ্র-যাত্রা কোরাণে কেতাবে নিষিদ্ধ নয়, এবং আমাদের পুরাণে পুঁথিতে নিষিদ্ধ বলেই বাঙ্গালী হিন্দু বাঙ্গলার মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছিল। এ নিষেধ থাকা সত্বেও এ যুগে আমরা আবার আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অনুসরণ করতে আরম্ভ করেছি। তাঁদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে, তাঁরা যেতেন শ্যামে ও ব্রহ্মে, যবদ্বীপ ও স্বর্ণদ্বীপে, সম্ভবতঃ চীনে ও জাপানে; আমরা যাই ইংলণ্ডে ও আমেরিকায়। অর্থাৎ তাঁরা যেতেন পূর্ব্বে, আমরা যাই পশ্চিমে। তাঁরা বিদেশে যেতেন নিজের জাহাজে অর্থ উপার্জ্জন করবার জন্য, আমরাও পরদেশে যাই, —কিন্তু সে পরের জাহাজে, এবং অর্থ উপার্জ্জন করবার বিদ্যা শিক্ষার জন্য। এ সমুদ্র-যাত্রার ভিতর আমাদের কোনরূপ জাতীয় কৃতিত্ব নেই। আমরা না পারি জাহাজ গড়তে, না পারি জাহাজ চালাতে।

সম্ভবতঃ এই কারণে আমাদের নব বঙ্গসাহিত্যে সমুদ্র-যাত্রা-বর্ণন এত বিরল, যদিচ গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে আমরা শত শত লোক, এক সমুদ্র নয় সাত সমুদ্রের পারে গিয়েছি, এবং সেখান থেকে ফিরে এসেছি।

৫

নূতন দেশে, নূতন দৃশ্য দেখ্‌লে মানুষের চোখ নূতন করে' ফুটে ওঠে, প্রাণে নূতন আনন্দ আসে, মনে নূতন ভাবের উদয় হয়। যে লেখায় এই নূতন ছবি, নূতন আনন্দ, নূতন জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়, সেই লেখাই হচ্ছে যথার্থ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এ যুগের বাঙ্গলার আমি দুটীমাত্র লেখক জানি, যাঁদের সমুদ্র-যাত্রা-বর্ণন পাঠকের মনকেও সমুদ্র-যাত্রা করায়। এঁদের একজন হচ্ছেন শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আর একজন স্বামী বিবেকানন্দ। এঁদের মুখে সমুদ্রের কথা, তার পরপারের কথা শুন্‌লে মনে যে শুধু কৌতূহল জেগে উঠে তাই নয়, আমাদের মনের গায়ে সমুদ্রের হাওয়াও লাগে। রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ এ দু'জনের কেউই অবশ্য পাঁচজনের একজন নন। উভয়েই অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী ব্যক্তি, সুতরাং তাঁদের চোখে ও মনে যা ধরা পড়েছে, তোমার আমার চোখে ও মনে তা ধরা পড়বার সম্ভাবনা নেই। সুতরাং তাঁদের তুল্য ভ্রমণ-বৃত্তান্ত যে আমরা লিখতে পারিনে, তার জন্য আমি দুঃখ করিনে। আমার দুঃখ এই যে, আমরা পৃথিবী ঘুরে আসি, অথচ এই বিচিত্র পৃথিবীর কোন চিত্রই আমাদের নয়নে মনে অঙ্কিত হয় না। নূতনের স্পর্শে স্বামীজির মনে তুফান

উঠ্ত; আমাদের মনের গায়ে কাঁটাও দেয়না। কবির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমাদের চোখে থাক্‌বার কথা নয়, তাই বলে' আমাদের দৃষ্টি এত ক্ষীণ হওয়া উচিত নয় যে, সে দৃষ্টি দু'হাত দূরে যায় না। আমাদের এই দৃষ্টিক্ষীণতা, এই মানসিক জড়তা শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের অকাল বার্দ্ধক্য ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেয়? আমরা যে পৃথিবীর জলস্থলের বর্ণনা করতে পারিনে, শুধু তাই নয়,—আমাদের সে বর্ণনা কর্‌বার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত নেই। তার কারণ নূতন দেশ, নূতন মানব, নূতন সমাজ, নূতন সভ্যতার সংস্পর্শে আমাদের মন সাড়া দেয় না; অপরিচিতের সঙ্গে নবপরিচয়ে আমরা এমন কিছু আনন্দ বা শিক্ষালাভ করিনে, যার প্রকাশের জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

৬

এই কারণে যখন দেখি আমাদের মধ্যে কেউ, বিদেশে যা চোখে দেখেছেন তা পাঁচজনকে শোনাতে জানাতে চান, তখন আমি তাঁকে বাহবা না দিয়া থাক্‌তে পারিনে। সেই জন্যই আমি শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার মহাশয়ের লিখিত এই পুস্তিকার মুখপত্র লিখ্‌তে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হয়েছি। মজুমদার মহাশয় সেই হাজারের মধ্যে একজন বঙ্গযুবক, সমুদ্রযাত্রার ফলে যাঁর অন্তরাত্মা সচকিত, পুলকিত হয়ে উঠেছিল। নূতন আকাশে নূতন আলোয় যে বস্তুর যে রূপ তাঁর চোখে পড়েছিল, তিনি সেই বস্তুর সেই রূপ স্বজাতির চোখের সুমুখে ধরে দিতে চেষ্টা করেছেন, এবং সেই সঙ্গে তাঁর মনে যে কথার উদয় হয়েছিল

সে কথাও আমাদের শোনাতে চেয়েছেন। তঁার চোখে অবশ্য কবির দিব্য দৃষ্টি নেই, এবং তাঁর হাতে চিত্রকরের নৈপুণ্যও নেই। তাঁর রচনায় যা আছে, তা হচ্ছে দেশভ্রমণের সহজ এবং সরল আনন্দ। আশা করি বাঙ্গলার পাঠক-সমাজ এই আনন্দ-উপহার সাদরে গ্রহণ করবেন।

২৬শে ডিসেম্বর ১৯১৫,
রাঁচি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

জাপান-যাত্রীর পত্র।

—:o:—

২৪শে বৈশাখ অপরাহ্নে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছন গেল।

চোখের পিছনে চেয়ে দেখার একটা পাকযন্ত্র আছে, সেইখানে দেখাগুলো বেশ করে' হজম হয়ে না গেলে সেটাকে নিজের করে' দেখানো যায় না। তা' নাইবা দেখানো গেল—এমন কথা কেউ বল্‌তে পারেন। যেখানে যাওয়া গেছে সেখানকার মোটামুটি বিবরণ দিতে দোষ কি?

দোষ না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু আমার অভ্যাস অন্যরকম। আমি টুঁকে যেতে টেঁকে যেতে পারিনে। কখনো কখনো নোট নিতে ও রিপোর্ট দিতে অনুরুদ্ধ হয়েচি, কিন্তু সে সমস্ত টুক্‌রো কথা আমার মনের মুঠোর ফাঁক দিয়ে গলে' ছড়িয়ে পড়ে' যায়। প্রত্যক্ষটা একবার আমার মনের নেপথ্যে অপ্রত্যক্ষ হয়ে গিয়ে তারপরে যখন প্রকাশের মঞ্চে এসে দাঁড়ায়, তখনই তার সঙ্গে আমার ব্যবহার।

ছুট্‌তে ছুট্‌তে তাড়াতাড়ি দেখে দেখে বেড়ানো আমার পক্ষে ক্লান্তিকর এবং নিষ্ফল। অতএব আমার কাছ থেকে বেশ ভদ্ররকম ভ্রমণ-বৃত্তান্ত তোমরা পাবে না। আদালতে সত্যপাঠ করে' আমি সাক্ষি দিতে পারি যে, রেঙ্গুন নামক এক সহরে আমি এসেছিলুম; কিন্তু যে আদালতে আরো বড় রকমের সত্যপাঠ করতে হয়, সেখানে আমাকে বল্‌তেই হবে রেঙ্গুনে এসে পৌঁছই নি।

এমন হতেও পারে রেঙ্গুন সহরটা খুব একটা সত্যবস্তু নয়। রাস্তাগুলি সোজা, চওড়া, পরিষ্কার, বাড়িগুলি তক্‌তক্ করচে, রাস্তায় ঘাটে মাদ্রাজি, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ঘুরে বেড়াচ্চে, তার মধ্যে হঠাৎ কোথাও যখন রঙীন রেশমের কাপড়-পরা ব্রহ্মদেশের পুরুষ বা মেয়ে দেখ্‌তে পাই, তখন মনে হয় এরাই বুঝি বিদেশী। আসল কথা গঙ্গার পুলটা যেমন গঙ্গার নয়, বরঞ্চ সেটা গঙ্গার গলার ফাঁসি,—রেঙ্গুন সহরটা তেমনি ব্রহ্মদেশের সহর নয়, ওটা যেন সমস্ত দেশের প্রতিবাদের মত।

প্রথমত ইরাবতী নদী দিয়ে সহরের কাছাকাছি যখন আসছি, তখন ব্রহ্মদেশের প্রথম পরিচয়টা কি? দেখি তীরে বড় বড় সব কেরোসিন তেলের কারখানা লম্বা লম্বা চিম্‌নি আকাশে তুলে দিয়ে ঠিক যেন চিৎ হয়ে পড়ে' বর্ম্মা চুরুট খাচ্চে। তারপরে যত এগোতে থাকি, দেশ বিদেশের জাহাজের ভিড়। তারপরে যখন ঘাটে এসে পৌঁছই, তখন তট বলে পদার্থ দেখা যায় না— সারি সারি জেটিগুলো যেন বিকটাকার লোহার জোঁকের মত ব্রহ্মদেশের গায়ে একেবারে ছেঁকে ধরেচে। তারপরে আপিস, আদালত, দোকান, বাজারের মধ্যে দিয়ে আমার বাঙালী বন্ধুদের বাড়ীতে গিয়ে উঠলুম, কোনো ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মদেশের কোনো চেহারাই দেখ্‌তে পেলুম না। মনে হল রেঙ্গুন ব্রহ্মদেশের ম্যাপে আছে, কিন্তু দেশে নেই। অর্থাৎ এ সহর দেশের মাটি থেকে গাছের মত ওঠে নি, এ সহর কালের স্রোতে ফেণার মত ভেসেছে,—সুতরাং এর পক্ষে এ জায়গাও যেমন, অন্য জায়গাও তেমনি।

আসল কথা, পৃথিবীতে যে-সব সহর সত্য, তা' মানুষের মমতার দ্বারা তৈরি হয়ে উঠেচে। দিল্লি বল, আগ্রা বল, কাশী বল, মানুষের আনন্দ তাকে সৃষ্টি করে তুলেচে। কিন্তু বাণিজ্য-লক্ষ্মী নির্ম্মম, তার পায়ের

নীচে মানুষের মানস-সরোবরের সৌন্দর্য্য-শতদল ফোটে না। মানুষের দিকে সে তাকায় না, সে কেবল দ্রব্যকে চায়,—যন্ত্র তার বাহন। গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আস্‌ছিল, তখন বাণিজ্য-শ্রীর নির্লজ্জ নির্দ্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখ্‌তে দেখ্‌তে এসেচি। ওর মনে প্রীতি নেই বলে'ই বাংলা দেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেচে।

আমি মনে করি আমার পরম সৌভাগ্য এই, যে, কদর্য্যতার লৌহ-বন্যা যখন কলকাতার কাছাকাছি দুই তীরকে, মেটেবুরুজ থেকে হুগলি পর্য্যন্ত, গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আস্‌ছিল, আমি তার আগেই জন্মেছি। তখনো গঙ্গার ঘাটগুলি গ্রামের স্নিগ্ধ বাহুর মত গঙ্গাকে বুকের কাছে আপন করে' ধরে' রেখেছিল, কুঠির নৌকাগুলি তখনো সন্ধ্যাবেলায় তীরে তীরে ঘাটে ঘাটে ঘরের লোকগুলিকে ঘরে ঘরে ফিরিয়ে আন্‌ত। একদিকে দেশের হৃদয়ের ধারা, আর একদিকে দেশের এই নদীর ধারা, এর মাঝখানে কোনো কঠিন কুৎসিত বিচ্ছেদ এসে দাঁড়ায় নি।

তখনো কলকাতার আশেপাশে বাংলাদেশের যথার্থ রূপটিকে দুই চোখ ভরে' দেখবার কোনো বাধা ছিল না। সেই জন্যেই কলকাতা আধুনিক সহর হলেও, কোকিল শিশুর মত তার পালন-কর্ত্রীর নীড়কে একেবারে রিক্ত করে' অধিকার করে নি। কিন্তু তারপরে বাণিজ্য-সভ্যতা যতই প্রবল হয়ে উঠ্‌তে লাগল, ততই দেশের রূপ আচ্ছন্ন হতে চল্‌ল। এখন কলকাতা বাংলা দেশকে আপনার চারিদিক থেকে নির্ব্বাসিত করে' দিচ্চে,—দেশ ও কালের লড়াইয়ে দেশের শ্যামল শোভা পরাভূত হল, কালের করাল মূর্ত্তিই লোহার দাঁত নখ মেলে' কালো নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগ্‌ল।

তাই বল্‌চি, রেঙ্গুন ত দেখ্‌লুম কিন্তু সে কেবল চোখের দেখা, সে দেখার মধ্যে কোনো পরিচয় নেই ;—সেখান থেকে আমার বাঙালী বন্ধুদের আতিথ্যের স্মৃতি নিয়ে এসেছি, কিন্তু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে কোনো দক্ষিণা আন্‌তে পারি নি। কথাটা হয়ত একটু অত্যুক্তি হয়ে পড়ল। আধুনিকতার এই প্রাচীরের মধ্যে দেশের একটা গবাক্ষ হঠাৎ একটু খোলা পেয়েছিলুম। সোমবার দিনে সকালে আমার বন্ধুরা এখানকার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে নিয়ে গেলেন।

এতক্ষণে একটা কিছু দেখ্‌তে পেলুম। এতক্ষণ যার মধ্যে ছিলুম, সে একটা এব্‌স্‌ট্রাক্‌শন্‌, সে একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ। সে একটা সহর, কিন্তু কো'নো একটা সহরই নয়। এখন যা দেখচি, তার নিজেরই একটা বিশেষ চেহারা আছে। তাই সমস্ত মন খুসি হয়ে, সজাগ হয়ে উঠ্‌ল। আধুনিক বাঙালীর ঘরে মাঝে মাঝে খুব ফ্যাশান্‌ওয়ালা মেয়ে দেখ্‌তে পাই ; তারা খুব গট্‌গট্‌ করে চলে, খুব চট্‌পট্‌ করে' ইংরেজি কয়—দেখে মস্ত একটা অভাব মনে বাজে,—মনে হয় ফ্যাশানটাকেই বড় করে' দেখ্‌চি, বাঙালীর মেয়েটিকে নয় ; এমন সময় হঠাৎ ফ্যাশান্‌বর্জ্জিত সরল সুন্দর স্নিগ্ধ বাঙালী-ঘরের কল্যানীকে দেখ্‌লে তখনি বুঝতে পারি এ ত মরীচিকা নয়, স্বচ্ছ গভীর সরোবরের মত এর মধ্যে একটি তৃষাহরণ পূর্ণতা আপন পদ্মবনের পাড়টি নিয়ে টলটল করচে। মন্দিরের মধ্যে ঢুক্‌তেই আমার মনে তেমনি একটি আনন্দের চমক লাগল ; মনে হল, যাই হোক্‌ না কেন, এটা ফাঁকা নয়—যেটুকু চোখে পড়চে এ তার চেয়ে আরো অনেক বেশি। সমস্ত রেঙ্গুন সহরটা এর কাছে ছোট হয়ে গেল—বহুকালের বৃহৎ ব্রহ্মদেশ এই মন্দিরটুকুর মধ্যে আপনাকে প্রকাশ করলে।

প্রথমেই বাইরের প্রখর আলোর থেকে একটি পুরাতন কালের পরিণত ছায়ার মধ্যে এসে প্রবেশ করলুম। থাকে থাকে প্রশস্ত সিঁড়ি উঠে চলেচে—তার উপরে আচ্ছাদন! এই সিঁড়ির দুই ধারে ফল, ফুল, বাতি, পূজার অর্ঘ্য বিক্রি চল্‌চে। যারা বেচ্‌চে তারা অধিকাংশই ব্রহ্মীয় মেয়ে। ফুলের রঙের সঙ্গে তাদের রেশমের কাপড়ের রঙের মিল হয়ে মন্দিরের ছায়াটি সূর্য্যাস্তের আকাশের মত বিচিত্র হয়ে উঠেচে। কেনাবেচার কোন নিষেধ নেই, মুসলমান দোকানদাররা বিলাতি মণিহারীর দোকান খুলে বসে গেছে। মাছ মাংসেরও বিচার নেই, চারিদিকে খাওয়া দাওয়া ঘরকন্না চল্‌চে। সংসারের সঙ্গে মন্দিরের সঙ্গে ভেদমাত্র নেই—একেবারে মাখামাখি। কেবল, হাটবাজারে যেরকম গোলমাল, এখানে তা' দেখা গেল না। চারদিক্ নিরালা নয়, অথচ নিভৃত; স্তব্ধ নয়, শান্ত। আমাদের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীয় একজন ব্যারিষ্টার ছিলেন, এই মন্দির সোপানে মাছ মাংস কেনাবেচা এবং খাওয়া চল্‌চে, এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, বুদ্ধ আমাদের উপদেশ দিয়েচেন—তিনি বলে' দিয়েছেন কিসে মানুষের কল্যাণ, কিসে তার বন্ধন; তিনি ত জোর করে' কারো ভালো করতে চান নি; বাহিরের শাসনের কল্যাণ নেই, অন্তরের ইচ্ছাতেই মুক্তি; এই জন্যে আমাদের সমাজে বা মন্দিরে আচার সম্বন্ধে জবরদস্তি নেই।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে যেখানে গেলুম সেখানে খোলা জায়গা, তারই নানা স্থানে নানারকমের মন্দির। সে মন্দিরে গাম্ভীর্য্য নেই, কারুকার্য্যের ঠেসাঠেসি ভিড়—সমস্ত যেন ছেলেমানুষের খেলনার মত। এমন অদ্ভুত পাঁচমিশালি ব্যাপার কোথাও দেখা যায় না—

এ যেন ছেলে-ভুলোনো ছড়ার মত; তার ছন্দটা একটানা বটে, কিন্তু তার মধ্যে যা'-খুসি-তাই এসে পড়েচে, ভাবের পরস্পর-সামঞ্জস্যের কোন দরকার নেই। বহুকালের পুরোনো শিল্পের সঙ্গে এখনকার কালের নিতান্ত সস্তাদরের তুচ্ছতা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ভাবের অসঙ্গতি বলে' যে কোন পদার্থ আছে, এরা ত' যেন একেবারে জানেই না। আমাদের কলকাতার বড়মানুষের ছেলের বিবাহ যাত্রায় রাস্তা দিয়ে যেমন সকল রকমের অদ্ভুত অসামঞ্জস্যের বন্যা বয়ে যায়—কেবলমাত্র পুঞ্জীকরণটাই তার লক্ষ্য, সজ্জীকরণ নয়—এও সেই রকম। এক ঘরে অনেকগুলো ছেলে থাক্‌লে যেমন তারা গোলমাল করে, সেই গোলমাল করাতেই তাদের আনন্দ—এই মন্দিরের সাজ সজ্জা, প্রতিমা, নৈবেদ্য, সমস্ত যেন সেইরকম ছেলেমানুষের উৎসব—তার মধ্যে অর্থ নেই, শব্দ আছে। মন্দিরের ঐ সোণা-বাঁধানো পিতল-বাঁধানো চূড়াগুলি ব্রহ্মদেশের ছেলে মেয়েদের আনন্দের উচ্চহাস্য-মিশ্রিত হো হা শব্দ—আকাশে ঢেউ খেলিয়ে উঠ্‌চে। এদের যেন বিচার করবার, গম্ভীর হবার বয়স হয়নি। এখানকার এই রঙীন মেয়েরাই সব চেয়ে চোখে পড়ে। এদেশের শাখা প্রশাখা ভরে' এরা যেন ফুল ফুটে রয়েচে। ভুঁই চাঁপার মত এরাই দেশের সমস্ত—আর কিছু চোখে পড়ে না।

লোকের কাছে শুন্‌তে পাই, এখানকার পুরুষেরা অলস ও আরাম-প্রিয়; অন্য দেশের পুরুষের কাজ প্রায় সমস্তই এখানে মেয়েরা করে' থাকে। হঠাৎ মনে আসে এটা বুঝি মেয়েদের উপরে জুলুম করা হয়েচে। কিন্তু ফলে ত তার উল্টোই দেখ্‌তে পাচ্চি—এই কাজকর্ম্মের হিল্লোলে মেয়েরা আরো যেন বেশি করে' বিকশিত হয়ে উঠেছে।

কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা' নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে বড় মুক্তি। পরাধীনতাই সব চেয়ে বড় বন্ধন নয়, কাজের সঙ্কীর্ণতাই হচ্চে সব চেয়ে কঠোর খাঁচা।

এখানকার মেয়েরা সেই খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে এমন পূর্ণতা এবং আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেচে। তারা নিজের অস্তিত্ব নিয়ে নিজের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে নেই। রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, সাঁওতাল মেয়েদের দেখে তা' আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম। তারা কঠোর পরিশ্রম করে—কিন্তু কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্ত্তিটিকে সুব্যক্ত করে' তোলে, তেমনি এই পরিশ্রমের আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে, তাদের সকলপ্রকার গতিভঙ্গীতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়। কবি কীট্‌স্‌ বলেচেন, সত্যই সুন্দর। অর্থাৎ সত্যের বাধামুক্ত সুসম্পূর্ণতাতেই সৌন্দর্য্য-সত্য মুক্তি লাভ করলে আপনিই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায়। প্রকাশের পূর্ণতাই সৌন্দর্য্য, এই কথাটাই আমি উপনিষদের এই বাণীতে অনুভব করি—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি; অনন্তস্বরূপ যেখানে প্রকাশ পাচ্চেন, সেইখানেই তাঁর অমৃতরূপ আনন্দরূপ। মানুষ ভয়ে, লোভে, ঈর্ষায়, মূঢ়তায়, প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণতায় এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন করে, বিকৃত করে; এবং সেই বিকৃতিকেই অনেক সময় বড় নাম দিয়ে বিশেষ ভাবে আদর করে' থাকে।

তোসা-মারু জাহাজ,

২৭শে বৈশাখ, ১৩২৩।

(২)

২৯ বৈশাখ। বিকেলের দিকে যখন পিনাঙের বন্দরে ঢুকচি, আমাদের সঙ্গে যে বালকটি এসেচে, তার নাম মুকুল, সে বলে' উঠ্‌ল, ইস্কুলে একদিন পিনাং সিঙাপুর মুখস্থ করে' মরেচি—এ সেই সিঙাপুর। তখন আমার মনে হল ইস্কুলের ম্যাপে পিনাং দেখা যেমন সহজ ছিল, এ তার চেয়ে বেশি শক্ত নয়। তখন মাস্টার ম্যাপে আঙুল বুলিয়ে দেশ দেখাতেন, এ হচ্চে জাহাজ বুলিয়ে দেখানো।

এরকম ভ্রমণের মধ্যে "বস্তুতন্ত্রতা" খুব সামান্য। বসে' বসে' স্বপ্ন দেখবার মত। না করচি চেষ্টা, না করচি চিন্তা, চোখের সামনে আপনা আপনি সব জেগে জেগে উঠ্‌চে। এই সব দেশ বের করতে, এর পথ ঠিক করে' রাখ্‌তে, এর রাস্তাঘাট পাকা করে' তুল্‌তে, অনেক মানুষকে অনেক ভ্রমণ এবং অনেক দুঃসাহস করতে হয়েচে, আমরা সেই সমস্ত ভ্রমণ ও দুঃসাহসের বোতলে-ভরা মোরব্বা উপভোগ করচি যেন। এতে কোন কাঁটা নেই, খোসা নেই, আঁটি নেই,—কেবল শাঁসটুকু আছে, আর তার সঙ্গে যতটা সম্ভব চিনি মেশানো। অকূল সমুদ্র ফুলে ফুলে উঠ্‌চে, দিগন্তের পর দিগন্তের পর্দ্দা উঠে উঠে যাচ্চে, দুর্গমতার একটা প্রকাণ্ড মূর্ত্তি চোখে দেখ্‌তে পাচ্চি; অথচ আলিপুরে খাঁচার সিংহটার মত তাকে দেখে আমোদ বোধ করচি; ভীষণও মনোহর হয়ে দেখা দিচ্চে।

আরব-উপন্যাসে আলাদিনের প্রদীপের কথা যখন পড়েছিলুম, তখন সেটাকে ভারি লোভনীয় মনে হয়েছিল। এ ত সেই প্রদীপেরই মায়া। জলের উপর স্থলের উপর সেই প্রদীপটা ঘস্‌চে, আর অদৃশ্য

দৃশ্য হচ্চে, দূর নিকটে এসে পড়চে। আমরা এক জায়গায় বসে' আছি, আর জায়গাগুলোই আমাদের সাম্‌নে এসে পড়চে।

কিন্তু মানুষ ফলটাকেই যে মুখ্যভাবে চায় তা নয়, ফলিয়ে তোলা-নোটাই তার সব চেয়ে বড় জিনিষ। সেই জন্যে, এই যে ভ্রমণ করচি, এর মধ্যে মন একটা অভাব অনুভব করচে—সেটি হচ্চে এই যে, আমরা ভ্রমণ করচিনে। সমুদ্রপথে আস্‌তে আস্‌তে মাঝে মাঝে দূরে দূরে এক-একটা পাহাড় দেখা দিচ্ছিল, আগাগোড়া গাছে ঢাকা; ঠিক যেন কোন্‌ দানবলোকের প্রকাণ্ড জন্তু তার কোঁকড়া সবুজ রোঁয়া নিয়ে সমুদ্রের ধারে ঝিমতে ঝিমতে রোদ পোয়াচ্চে; মুকুল তাই দেখে বল্লে ঐখানে নেবে যেতে ইচ্ছা করে। ঐ ইচ্ছাটা হচ্চে সত্যকার ভ্রমণ করবার ইচ্ছা। অন্য কর্তৃক দেখিয়ে দেওয়ার বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে নিজে দেখার ইচ্ছা। ঐ পাহাড়-ওয়ালা ছোট ছোট দ্বীপগুলোর নাম জানিনে; ইস্কুলের ম্যাপে ও-গুলোকে মুখস্থ করতে হয় নি; দূর থেকে দেখে মনে হয় ওরা একেবারে তাজা রয়েচে, সার্ক্যুলেটিং লাইব্রেরির বইগুলোর মত মানুষের হাতে হাতে ফিরে নানা চিহ্নে চিহ্নিত হয়ে যায় নি; সেই জন্যে মনকে টানে। অন্যের পরে মানুষের বড় ঈর্ষা। যাকে আর কেউ পায় নি, মানুষ তা'কে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

সূর্য্য যখন অস্ত যাচ্চে, তখন পিনাঙের বন্দরে জাহাজ এসে পৌঁছল। মনে হল বড় সুন্দর এই পৃথিবী। জলের সঙ্গে স্থলের যেন প্রেমের মিলন দেখ্‌লুম। ধরণী তার দুই বাহু মেলে সমুদ্রকে আলিঙ্গন করচে। মেঘের ভিতর দিয়ে নীলাভ পাহাড়গুলির উপরে যে একটি সুকোমল

আলো পড়েচে, সে যেন অতি সূক্ষ্ম সোনালি রঙের ওড়নার মত—তাতে বধূর মুখ ঢেকেচে, না প্রকাশ করচে, তা' বলা যায় না। জলে স্থলে আকাশে মিলে এখানে সন্ধ্যাবেলাকার স্বর্ণতোরণের থেকে স্বর্গীয় নহবৎ বাজতে লাগল।

পালতোলা সমুদ্রের নৌকাগুলির মত মানুষের সুন্দর সৃষ্টি অতি অল্পই আছে। যেখানে প্রকৃতির ছন্দে লয়ে মানুষকে চল্‌তে হয়েচে, সেখানে মানুষের সৃষ্টি সুন্দর না হয়ে থাকতে পারে না। নৌকোকে জল বাতাসের সঙ্গে সন্ধি করতে হয়েচে, এই জন্যেই জল বাতাসের শ্রীটুকু সে পেয়েচে। কল যেখানে নিজের জোরে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করতে পারে, সেইখানেই সেই ঔদ্ধত্যে মানুষের রচনা কুশ্রী হয়ে উঠ্‌তে লজ্জামাত্র করে না। কলের জাহাজে পালের জাহাজের চেয়ে সুবিধা আছে, কিন্তু সৌন্দর্য্য নেই। জাহাজ যখন আস্তে আস্তে বন্দরের গা ঘেঁষে এল, যখন প্রকৃতির চেয়ে মানুষের চেষ্টা বড় হয়ে দেখা দিলে, কলের চিম্‌নিগুলো প্রকৃতির বাঁকা ভঙ্গিমার উপর তার সোজা আঁচড় কাটতে লাগ্‌ল, তখন দেখ্‌তে পেলুম মানুষের রিপু জগতে কি কুশ্রীতাই সৃষ্টি করচে। সমুদ্রের তীরে তীরে, বন্দরে বন্দরে, মানুষের লোভ কদর্য্য ভঙ্গীতে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করচে—এম্‌নি করেই নিজেকে স্বর্গ থেকে নির্ব্বাসিত করে দিচ্চে।

তোসা-মারু, পিনাং বন্দর।

(৩)

২রা জ্যৈষ্ঠ। উপরে আকাশ, নীচে সমুদ্র। দিনে রাত্রে আমাদের দুই চক্ষুর বরাদ্দ এর বেশি নয়। আমাদের চোখ দুটো মা-পৃথিবীর

আদর পেয়ে পেটুক হয়ে গেচে। তার পাতে নানা রকমের জোগান দেওয়া চাই। তার অধিকাংশই সে স্পর্শও করে না, ফেলা যায়। কত যে নষ্ট হচ্চে বলা যায় না, দেখবার জিনিষ অতিরিক্ত পরিমাণে পাই বলেই দেখবার জিনিষ সম্পূর্ণ করে' দেখি নে। এই জন্যে মাঝে মাঝে আমাদের পেটুক চোখের পক্ষে এই রকমের উপবাস ভালো।

আমাদের সামনে মস্ত দুটো ভোজের থালা, আকাশ আর সাগর। অভ্যাস দোষে প্রথমটা মনে হয় এ দুটো বুঝি একেবারে শূন্য থালা। তারপর দুই একদিন লঙ্ঘনের পর ক্ষুধা একটু বাড়লেই তখন দেখ্‌তে পাই, যা' আছে তা' নেহাৎ কম নয়। মেঘ ক্রমাগত নতুন নতুন রঙে সরস হয়ে আস্‌চে, আলো ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন স্বাদে আকাশকে এবং জলকে পূর্ণ করে' তুল্‌চে।

আমরা দিনরাত পৃথিবীর কোলে কাঁখে থাকি বলেই আকাশের দিকে তাকাইনে, আকাশের দিগ্‌বসনকে বলি উলঙ্গতা। যখন দীর্ঘকাল ঐ আকাশের সঙ্গে মুখোমুখি করে' থাক্‌তে হয়, তখন তার পরিচয়ের বিচিত্রতায় অবাক্ হয়ে থাকি। ওখানে মেঘে মেঘে রূপের এবং রঙের অহেতুক বিকাশ। এ যেন গানের আলাপের মত, রূপ-রঙের রাগ-রাগিনীর আলাপ চল্‌চে—তাল নেই, আকার আয়তনের বাঁধাবাঁধি নেই, কোনো অর্থবিশিষ্ট বাণী নেই, কেবলমাত্র মুক্ত স্বরের লীলা। সেই সঙ্গে সমুদ্রের অপ্সর-নৃত্যও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজচে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

এই বিরাট রঙ্গশালায় আকাশ এবং সমুদ্রের যে রঙ্গ, সেইটি দেখবার শক্তি ক্রমে আমাদের বেড়ে ওঠে। জগতে যা'-কিছু মহান,

তার চারদিকে একটা বিরলতা আছে,তার পট-ভূমিকা (background) সাদাসিধে। সে আপনাকে দেখাবার জন্যে আর কিছুর সাহায্য নিতে চায় না। নিশীথের নক্ষত্রসভা অসীম অন্ধকারের অবকাশের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। এই সমুদ্র আকাশের যে বৃহৎ প্রকাশ, সেও বহু-উপকরণের দ্বারা আপন মর্য্যাদা নষ্ট করে না। এরা হল জগতের বড় ওস্তাদ, ছলাকলায় আমাদের মন ভোলাতে এরা অবজ্ঞা করে। মনকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আপন হতে অগ্রসর হয়ে এদের কাছে যেতে হয়। মন যখন নানা ভোগে জীর্ণ হয়ে অলস এবং "অন্যথা-বৃত্তি" হয়ে থাকে, তখন এই ওস্তাদের আলাপ তার পক্ষে অত্যন্ত ফাঁকা।

আমাদের সুবিধে হয়েচে, সাম্‌নে আমাদের আর কিছু নেই। অন্যবারে যখন বিলিতি যাত্রী-জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিয়েচি, তখন যাত্রীরাই ছিল এক দৃশ্য। তারা নাচে গানে খেলায় গোলেমালে অনন্তকে আচ্ছন্ন করে' রাখ্‌ত। এক মুহূর্ত্তও তারা ফাঁকা ফেলে রাখ্‌তে চাইত না। তার উপরে সাজসজ্জা, কায়দাকানুনের উপসর্গ ছিল। এখানে জাহাজের ডেকের সঙ্গে সমুদ্র আকাশের কোনো প্রতিযোগিতা নেই। যাত্রীর সংখ্যা অতি সামান্য, আমরাই চারজন; বাকী দু-তিন জন ধীর প্রকৃতির লোক। তারপরে ঢিলাঢালা বেশেই ঘুমচ্চি, জাগচি, খেতে যাচ্চি, কারো কোনো আপত্তি নেই; তার প্রধান কারণ, এমন কোনো মহিলা নেই, আমাদের অপরিচ্ছন্নতায় যাঁর অসম্ভ্রম হতে পারে।

এই জন্যেই প্রতিদিন আমরা বুঝতে পারচি, জগতে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত সামান্য ব্যাপার নয়, তার অভ্যর্থনার জন্যে স্বর্গে মর্ত্ত্যে রাজকীয় সমারোহ। প্রভাতে পৃথিবী তার ঘোম্‌টা খুলে দাঁড়ায়,

তার বাণী নানা সুরে জেগে ওঠে; সন্ধ্যায় স্বর্গলোকের যবনিকা উঠে যায়, এবং দ্যুলোক আপন জ্যোতি-রোমাঞ্চ নিঃশব্দতার দ্বারা পৃথিবীর সম্ভাষণের উত্তর দেয়। স্বর্গমর্ত্ত্যের এই মুখোমুখ আলাপ যে কত গম্ভীর এবং কত মহীয়ান, এই আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তা' আমরা বুঝতে পারি।

দিগন্ত থেকে দেখ্‌তে পাই মেঘগুলো নানা ভঙ্গীতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টিকর্ত্তার আঙ্গিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেচে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনটার সঙ্গে কোনটার মিল নেই। নানা রকমের আকার;—কেবল সোজা লাইন নেই। সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানা ঘরের চিম্‌নিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষের শাসন মানে; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

যেমন আকৃতির হরির লুঠ, তেমনি রঙের। রং যে কতরকম হতে পারে, তার সীমা নেই। রঙের তান উঠ্‌চে, তানের উপর তান; তাদের মিলও যেমন, তাদের অমিলও তেমনি; তারা বিরুদ্ধ নয়, অথচ বিচিত্র। রঙের সমারোহেও যেমন প্রকৃতির বিলাস, রঙের শান্তিতেও তেম্‌নি। সূর্য্যাস্তের মুহূর্ত্তে পশ্চিম আকাশ রঙের ঐশ্বর্য্য যেখানে পাগলের মত দুই হাতে বিনা প্রয়োজনে ছড়িয়ে দিচ্চে সেও যেমন আশ্চর্য্য, পূর্ব্ব আকাশে যেখানে শান্তি এবং সংযম, সেখানেও রঙের পেলবতা, কোমলতা, অপরিমেয় গভীরতা তেমনি আশ্চর্য্য। প্রকৃতির হাতে অপর্য্যাপ্তও যেমন মহৎ হতে পারে, পর্য্যাপ্তও তেমনি; সূর্য্যাস্তে

সূর্য্যোদয়ে প্রকৃতি আপনার ডাইনে বাঁয়ে একই কালে সেটা দেখিয়ে দেয়; তার খেয়াল আর ধ্রুপদ একই সঙ্গে বাজ্‌তে থাকে, অথচ কেউ-কারো মহিমাকে আঘাত করে না।

তার পরে, রঙের আভায় আভায় জল যে কত বিচিত্র কথাই বল্‌তে পারে তা' কেমন করে' বর্ণনা করব। সে তার জলতরঙ্গে রঙের যে গৎ বাজাতে থাকে, তাতে সুরের চেয়ে শ্রুতি অসংখ্য। আকাশ যে-সময়ে তার প্রশান্ত স্তব্ধতার উপর রঙের মহতোমহীয়ানকে দেখায়, সমুদ্র সেই সময় তার ছোট ছোট লহরীর কম্পনে রঙের অণোরণীয়ান্‌কে দেখাতে থাকে, তখন আশ্চর্য্যের অন্ত পাওয়া যায় না।

সমুদ্র আকাশের গীতিনাট্য-লীলায় রুদ্রের প্রকাশ কিরকম দেখা গেছে, সে পূর্ব্বেই বলেছি। আবার কালও তিনি তাঁর ডমরু বাজিয়ে অট্টহাস্যে আর এক ভঙ্গীতে দেখা দিয়ে গেলেন। সকালে আকাশ জুড়ে নীল মেঘ এবং ধোঁয়ালো মেঘ স্তরে স্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে ফুলে উঠ্‌ল। মুষলধারে বৃষ্টি। বিদ্যুৎ আমাদের জাহাজের চারদিকে তার তলোয়ার খেলিয়ে বেড়াতে লাগল। তার পিছনে পিছনে বজ্রের গর্জ্জন। একটা বজ্র ঠিক আমাদের সাম্‌নে জলের উপর পড়ল, জল থেকে একটা বাষ্প রেখা সাপের মত ফোঁস করে উঠ্‌ল। আর একটা বজ্র পড়ল আমাদের সাম্‌নেকার মাস্তুলে। রুদ্র যেন সুইট্‌জারল্যাণ্ডের ইতিহাস-বিশ্রুত বীর উইলিয়ম টেলের মত তাঁর অদ্ভুত ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিয়ে গেলেন, মাস্তুলের ডগাটায় তাঁর বাণ লাগল, আমাদের স্পর্শ করল না। এই ঝড়ে আমাদের সঙ্গী আর একটা জাহাজের প্রধান মাস্তুল বজ্রে বিদীর্ণ হয়েচে শুনলুম। মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য্য।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

পুস্তক-প্রশংসা।

(তীর্থভ্রমণ।)

——:০:——

এই পুস্তকখানি পাঠকদিগের গোচরে উপস্থিত করিবার অগ্রে এ কথা বলিলে মন্দ হইবে না যে, গ্রন্থখানিকে ইংরাজীতে যাহাকে বলে Article of virtue বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। ইহাতে একটী নূতনত্ব ও বিশিষ্টতা আছে। গ্রন্থখানি একটী ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, কিন্তু যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কখনও Mangopark কিম্বা Marco-polo কিম্বা অন্য কোন প্রসিদ্ধ পর্য্যাটকের নাম শ্রবণ করেন নাই, ইউরোপে দেশ-পর্য্যটন যে একটা জীবনের কাজকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হয়, তাহাও জানেন না এবং পর্য্যটন-প্রসঙ্গে ইউরোপের নানা ভাষাতে যে একটা বিপুল-বিস্তার সাহিত্য গঠন হইয়াছে, যাহা পাঠ করিতে এক ব্যক্তির সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইতে পারে, ইহাও গ্রন্থকার অবগত নহেন। তিনি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক। কতকটা জল-বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য, কতকটা তীর্থ-দর্শনের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া উত্তর পশ্চিমে গমন করেন। বোধ হয়, সেই সময়ে মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু দেখিবেন লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হওয়াতে এই গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। কিরূপে চটিতে চটিতে রাত্রিবাস করিয়া পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া, কোথা হইতে কালি-কলম ইত্যাদি যোগাড় করিয়া তিনি এই কার্য্য সমাধা করিয়াছেন, তাহা

আশ্চর্য্যের বিষয়। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা একটী নূতন ঘটনা বলিতে হইবে। কোন বাঙ্গালী বোধ হয়, ইহার পূর্ব্বে কিম্বা পরে তীর্থ পর্য্যটনে নির্গত হইয়া এ প্রকার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখিয়া জান নাই। ইদানীন্তন যে দুই পাঁচখানা বাঙ্গালীর রচিত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইংরাজদিগের নকলে। সেই সমস্ত পেশাদারী ভ্রমণ-বৃত্তান্তের সহিত আমরা এ গ্রন্থকে তুলনা করিতে ইচ্ছা করি না। পাঠ করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, গ্রন্থকার ইহার রচনাকল্পে কোনরূপ পারিপাট্য দেখাইবার চেষ্টা করেন নাই। সরল, সহজ, পরিষ্কার বাঙ্গালাতে যাহা কিছু মনে আসিয়াছে লিখিয়া গিয়াছেন, ইংরাজির ভেজাল কিছুমাত্র নাই। ইহার ভাষা আন্‌কোরা খাঁটী বাঙ্গলা, এমন কি অনেক স্থলে বানান করিতে পর্য্যন্ত তিনি অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন। 'সমভিব্যাহারে' না লিখিয়া তিনি লেখেন 'সমভ্যারে', 'তিনি' না লিখিয়া লেখেন 'তেঁহ'। আমি জানি গ্রন্থকার যে অঞ্চলের লোক অর্থাৎ খানাকুলকৃষ্ণনগর, যে অঞ্চলে রায়বংশীয় একজন পার্শীনবিস ছিলেন, তাঁহার নাম আমি করিতে ইচ্ছা করি না, ঐ লোকটী অনেক সময় বলিতেন যে, বাঙ্গালাতে তালব্য শ কারের পরিবর্ত্তে দন্ত্য স কার লিখিলেই এবং মূর্দ্ধান্য ণ কারের পরিবর্ত্তে দন্তন্য ন লিখিলে কি এমন বিশেষ ক্ষতি আছে? অর্থাৎ বাঙ্গালাতে বানানের বিষয়ে তাঁহার সম্পূর্ণ ঔদাস্য ছিল। এ প্রকার ঔদাস্য কখনই পরিগৃহীত হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে বানান এত নানারূপ ধারণ করিবে যে, লিখিত ভাষা পরস্পরের বুঝিয়া উঠা ভার হইবে। কিন্তু এই গ্রন্থে বানানের যে সকল বৈজাত্য আছে, যদি কোন বর্ণশুদ্ধি-পরায়ণ

পাঠক তাহাতে বিরাগ প্রদর্শন করেন, তাহা দুঃখের বিষয় হইবে। সেই সমস্ত বৈজাত্য মুদ্রাঙ্কনকালে অনায়াসে সংশোধন করিতে পারা যাইত, কিন্তু না করিয়া এক প্রকার ভালই হইয়াছে।

যদি কোন বস্তুতে কিছু পদার্থ থাকে, তাহার প্রকৃত মুর্ত্তিই সহৃদয় ব্যক্তিদিগের প্রীতিপদ হয়। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান নেতা ক্রমোএল যখন নিজের ছবি তোলান, চিত্রকরকে বলিলেন, 'ছাখো, আমি যেমনটী, ঠিক তেমনটী আঁকিবে। যেখানে গালের মাংস কুঁকড়িয়া গিয়াছে, সেখানে ছবিতে তাই ত ওঠা চাই। যদি একটীও বাদ যায় মেহন্নতানা এক পয়সাও পাইবে না।' Paint me as I am. If you omit one wrinkle, I shall not pay you a shilling. মেকলে এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, ইহাই যথার্থ মহাত্মা ব্যক্তির মত কথা। কৃত্রিম শোভাতে তাঁহারা একান্ত বিরক্ত।

গ্রন্থকারের পরিচয় দিতে গেলে তাঁহার পুত্রপৌত্রের নাম করিতে হয়। প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। ইনি সেকালের হিন্দুকালেজে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া কয়েক বৎসর ৪০ টাকা ছাত্রবৃত্তি ভোগ এবং কালেজের সকল পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন। তাঁহার পরীক্ষার দু'একটী প্রশ্নোত্তর সে সময়ের Education রিপোর্টে ছাপা আছে। তাহা পাঠ করিলে ইংরাজী সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য বিদ্যাবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠ সমাপন করিয়া কয়েক বৎসর তিনি সামান্য শিক্ষকতা করিয়া পরে সংস্কৃতকালেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক, ক্রমে ঐ কালেজের অধ্যক্ষ, তৎপরে প্রেসিডেন্সী কালেজের অধ্যাপক

ইত্যাদি মাননীয় পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রসন্নকুমারের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বাঙ্গালা পাটীগণিত। অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও গবেষণা দ্বারা তিনি ঘাতাবেশ, মূলাকর্ষণ, করণী ইত্যাদি পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালাতে প্রচলিত করেন। এক্ষণে সে সকল শব্দ সাধারণের সম্পত্তি হইয়াছে; হউক, কিন্তু প্রসন্নকুমারের নাম লুপ্ত হওয়া উচিত নয়। এক সময়ে পাটীগণিত ও প্রসন্নকুমার পর্য্যায়-শব্দবৎ (synonymous) প্রতীয়-মান হইত। প্রসন্নকুমারের মধ্যম ভ্রাতা সূর্য্যকুমার এক সময়ে কলিকাতার ৩।৪ জন বড় ডাক্তারের মধ্যে একজন ছিলেন। সূর্য্য-কুমারের মধ্যম পুত্র দেবপ্রসাদ সংপ্রতি Vice-chancellor অপর পুত্র সুরেশপ্রসাদ বাঙ্গালী জাতির মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসক বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন।

যদুনাথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তখানিকে আমরা একখানি নূতন ধরণের বাঙ্গালী-রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তা বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না যে, 'মনসার ভাসান' বা ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' গ্রন্থের মত একটা কৌতুকাবহ বস্তুর ন্যায় এক পাশে ফেলিয়া রাখিতে হইবে, কখন পাঠ করিবার প্রয়োজন নাই। লেখক যে প্রকার অক্লিষ্ট গবেষণা সহকারে গয়া, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, হরিদ্বার পুষ্কর প্রভৃতি তীর্থস্থানের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে খুব ভালই লাগিবে, এতদ্ব্যতীত এখনকার তীর্থযাত্রিগণ অনেক আবশ্যক বিষয়ের সন্ধান পাইবেন এবং উপস্থিত উপকার হয় এরূপ জ্ঞানও লাভ করিবেন। সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়, যাহাকে বিষয়বুদ্ধি বা ইংরাজীতে Common sense বলে লেখকের তাহা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। যদিচ তিনি খাঁটী হিন্দু ছিলেন এবং শাস্ত্রোক্ত এমন গল্পটী নাই, যাহা তিনি

বিশ্বাস করিতেন না, তথাপি তীর্থের পাণ্ডাদিগের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, শঠতা অর্থপিশাচতা প্রকটন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা পরাঙ্মুখ হয়েন নাই, প্রত্যুত অতি তীব্র লেখনীদ্বারা জাজ্বল্যমান করিয়া দিয়াছেন। এই নিমিত্ত আমাদিগের বিশ্বাস যে, অধুনাতন তীর্থযাত্রিগণ তীর্থ-পর্য্যটনকালে এই গ্রন্থ এক-একখানি সঙ্গে রাখিলে ভাল করিবেন। একাধারে এত বিবিধ বিষয়ের সন্ধান আর কুত্রাপি পাইবেন না।

পরিশেষে বক্তব্য যে, এই গ্রন্থ পড়িতে পড়িতে ক্রমাগত মনে হইতে থাকে যে, সে কাল আর নাই। রেল্‌রোড হইয়া আমরা যেন মোট বা বস্তার মত এক স্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হই। প্রকৃত পর্য্যটন আর হয় না। নানা স্থানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচয় হইবার উপায় নাই। কেবল প্রধান প্রধান স্থানগুলি পেশাদারী ধরণে পর্য্যবেক্ষণ করা হয় মাত্র। তাজমহল, কুতব মিনার এই সকল নাম আবৃত্তি করিতে শিখি, কিন্তু বৃন্দাবনের সান্নিধ্যে গ্রামের ভিতর লোকজনের কি প্রকার ভাব-গতিক, কি খায়, কি পরে, কি রূপে দিন গুজরান করে, এ সকল কথা নিরবচ্ছিন্ন অপরিজ্ঞাত থাকে। ইহার কোন চারা নাই। এ যুগের সভ্যতার সঙ্গে এইরূপই হইবে। সে কালের সুদীর্ঘ রাজমার্গসকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। মোটরেই যাও, আর বাইসিকলেই যাও, জ্ঞানলাভ সমান। সমস্ত চীনদেশ কেহ কেহ বাইসিকলে এপার-ওপার করিতেছেন, ভাবিতেছেন তিনি চীনদেশের সব দেখিলেন। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান কিছুই হয় না। কোথায় কবে একটা ঝড় হইয়াছিল —এই পর্য্যন্ত। কিন্তু এ সমস্ত আক্ষেপ করিয়া কোন ফল নাই। অতএব এই স্থানেই উপসংহার হইল।

শ্রীকৃষ্ণ কমল ভট্টাচার্য্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গান।

(ফিনিক্স লাইব্রেরিতে কথিত)

—————ঃ০ঃ—————

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা বলেছেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের রচনা সাহিত্য কি না, কবি হিসেবে বঙ্গ সাহিত্যে তাঁর স্থান কোথায়, সে সব বিচার তিনি কর্‌তে চান না। সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাস যে সে বিচার অনাবশ্যক। কেননা, তাঁর মতে, যেহেতু দ্বিজেন্দ্রলাল "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমি" এই দুটি গানে, স্বদেশকে "দেশাত্মবোধের চরমবাণী" শুনিয়েছেন, সে কারণ তিনি বাঙ্গলার দেশপূজ্য শিক্ষক। এইখানেই তাঁর রচনার বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব।

কিন্তু আমার বিশ্বাস, পূর্ব্বোক্ত গান দুটি যতই লোকপ্রিয় হোক্ না কেন, তার থেকে আমরা দ্বিজেন্দ্রলালের কবি-প্রতিভার পূর্ণ ও প্রকৃত পরিচয় পাইনে। প্রথমতঃ, "দেশাত্মবোধের" প্রকাশেই যে কবিত্বের চরম বিকাশ, পৃথিবীর সাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না। কেননা মানবের আত্মপ্রকাশই হচ্ছে সাহিত্যের স্বধর্ম্ম। এবং মানুষের অন্তরে, "দেশাত্মবোধ" ছাড়া আরও কত রকমের আত্মবোধ আছে, যা' উপেক্ষনীয়ও নয়, অকিঞ্চিৎকরও নয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত গান দুটি বাদ দিলেও দ্বিজেন্দ্রলালের অবশিষ্ট রচনার যে যথেষ্ট মূল্য ও যথেষ্ট মর্য্যাদা আছে, তার প্রমাণ,—"আমার দেশ"

এবং "আমার জন্মভূমি" রচনা করবার বহু পূর্ব্বে দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা নয়, দেশব্যাপী খ্যাতিও লাভ করেছিলেন। অদ্যকার সভার প্রবন্ধ-পাঠক শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে, অনেকের মতে তাঁর হাসির গানই হচ্ছে বঙ্গ-সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্র লালের অক্ষয়কীর্ত্তি। এ কথা যদি সত্য হয়— এবং আমার বিশ্বাস তা সম্পূর্ণ সত্য,—তাহলে আমাদের স্বীকার কর্‌তেই হবে যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার উজ্জ্বল আলো, "আমার দেশ" ও "আমার জন্মভূমির" বাইরেও পড়েছে। শুধু তাই নয়—তাঁর "দেশাত্মবোধের" প্রকৃত এবং প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর হাসির গানের ভিতরই পাওয়া যায়।

(২)

"দেশাত্মবোধ" কথাটি আমি পছন্দ করিনে। প্রথমতঃ তা শ্রুতিকটূ—দ্বিতীয়তঃ তা বাঙ্গলা নয়। এ কথাটি আমাদের সাধু ভাষার টাঁকশালে হালফিল তৈরি করা হয়েছে; অর্থাৎ এ হচ্ছে Geographical consciousness, এই ইংরাজী কথাটির অবিকল অনুবাদ। এ সাধু শব্দের গা থেকে বিলিতি গন্ধ আজও যায় নি। কিন্তু "দেশাত্মবোধের" বিরুদ্ধে আমার প্রধান আপত্তি এই যে—এই নব-সংস্কৃত-সমাস রচনা করবার কোনই আবশ্যকতা ছিল না। ওই গালভরা নব-কল্পিত-পদের দ্বারা যা' বোঝাবার চেষ্টা করা হয়, "আমার দেশ" এই দুটি সহজ বাঙ্গলা কথায় তা অতি সহজে বোঝা যায়। শুধু তাই নয়, ও দুটি বাঙ্গলা

কথা আমাদের কাণের ভিতর দিয়ে মরমেও প্রবেশ করে। আর এক কথা, আমাদের ভাষায় "দেশাত্মবোধ" আসবার পূর্ব্বেও আমাদের মনের ভিতর দেশের প্রতি "মমতা" ছিল। এবং সে "মমতা" স্বদেশী যুগের আগমনের পূর্ব্বে যে-সকল বাঙ্গালী লেখকের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তার মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। সাহিত্যে স্বদেশের প্রতি এবং স্বদেশীর প্রতি মমতা প্রকাশের পদ্ধতি সে যুগে একটু স্বতন্ত্র ছিল। সেই স্বাতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য কর্‌লেই, দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে তাঁর স্বদেশ-প্রীতির কি অপূর্ব্ব পরিচয় দিয়েছেন, তা আমাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(৩)

আমাদের নব শিক্ষার আলোকে, প্রাচীন ভারতবর্ষ এবং বর্ত্তমান ইউরোপের তুলনায় আমাদের বর্ত্তমান হীনতাই প্রথমে নজরে পড়ে। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার নাম দেশপ্রীতি,—দেশভক্তি নয়। আমি ভক্তি শব্দ ব্যবহার কর্‌তে একটু ভয় পাই। কেননা নিত্যই দেখ্‌তে পাই যে, যে প্রীতির সঙ্গে বুদ্ধি বিবেচনার কোনও সম্পর্ক নেই, সচরাচর লোকে তাকেই ভক্তি বলে থাকে,—যেন জ্ঞান ও কর্ম্মকে বলিদান দেওয়াই হচ্ছে ভক্তির ধর্ম্ম। অবশ্য এ ধারণা সত্য নয়, কেননা শাস্ত্রমতে ভক্তির অর্থ পরা-প্রীতি। এ অর্থে ভক্তির একমাত্র পাত্র ভগবান। সুতরাং স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি মানুষের ভালবাসাকে প্রীতি বলাই নিরাপদ, কেননা এ মনোভাব হচ্ছে লৌকিক

মনোভাব,—পারমার্থিক নয়। তা ছাড়া কোন জিনিষের প্রতি প্রীতি থাকলে সেই সঙ্গে তার প্রতি ভক্তি যে থাক্‌তেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখান যেতে পারে যে, মানুষের যে ভালবাসা নিঃস্বার্থ প্রীতির পরাকাষ্ঠা,—অর্থাৎ ছোট ছেলের প্রতি ভালবাসা, তার মধ্যে ভক্তির নামগন্ধও নেই। যেখানেই প্রীতি আছে, সেখানে প্রিয় ব্যক্তির শুভকামনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। আমরা যাকে ভালবাসি, তাকে আমরা দেহে, মনে, চরিত্রে, সবল সুস্থ ও সুন্দর করে তুল্‌তে চাই। এবং এর জন্য তার দোষ দেখিয়ে দিতে আমরা কুণ্ঠিত হইনে, তাকে ব্যথা দিতেও ভয় পাই নে। কেননা, দর্শনের মতে বেদনা হতেই চৈতন্য জন্মলাভ করে। যাতে করে' জাতির মনে নিজের ত্রুটি সম্বন্ধে লজ্জা ও ধিক্কার জন্মায়, তার জন্য যে কথার মার মার্‌তে হয়, সকল দেশের সকল সাহিত্যে তা গ্রাহ্য। বিদ্রূপের হাসি সাহিত্য-জগৎকে উজ্জ্বল করে' রেখেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের অনেক গানের প্রাণ হচ্ছে এই বিদ্রূপের হাসি।

(৪)

দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয় দৈন্য এত মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে-ছিলেন যে, তাঁর হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। বক্তা মহাশয় বলেছেন, স্বজাতির নিকট দ্বিজেন্দ্রলালের "চরম বাণী" এই যে, "আমরা ঘুচাব মা তোর দৈন্য"। নিজের চেষ্টায় নিজের উন্নতি সাধন করবার সংকল্প যে পুরুষোচিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; কিন্তু

উক্ত বাণীর তিনি যা অর্থ করেছেন, আমি তা গ্রাহ্য করতে পারি নে। তিনি বলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ কথা এই যে, "আমরা যতই অযোগ্য হই, যতই অক্ষম হই, যতই দুর্ব্বল হই, আমরাই মায়ের দৈন্য দূর করব"। দ্বিজেন্দ্রলালের অসংখ্য গান উচ্চহাস্যে এ মতের প্রতিবাদ করছে। তিনি স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তাহলে তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রে যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস তাঁর দেশপ্রীতির চরমবাণী এই যে, "আবার তোরা মানুষ হ"। মিছে আত্মশ্লাঘা যে আমাদের পক্ষে মানুষ হবার প্রতিবন্ধক, এ কথা আর কেউ জানুন আর নাই জানুন, দ্বিজেন্দ্রলাল জানতেন। ইংরাজীতে যাকে বলে Self-criticism, মানুষের মনের পক্ষে তার চাইতে স্বাস্থ্যকর জিনিষ আর নেই, কেননা মানবের যথার্থ ঐশ্বর্য্য যেমন ভিতরকার জিনিষ,বাইরের নয়,—তেমনি তার যথার্থ দৈন্যও ভিতরকার জিনিষ, বাইরের নয়। আমাদের নব-সাহিত্য যাঁরা সৃষ্টি করেছেন, রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে' তাঁরা প্রায় সকলেই স্বজাতিকে তার অন্তরের দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন করে' তোলবার চেষ্টা করেছেন। বাঙ্গলা-সাহিত্যের এ বড় কম গৌরবের কথা নয়। এর থেকেই স্বদেশের প্রতি স্বজাতির প্রতি বাঙ্গালীর মমতার বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫)

সাহিত্যের ধর্ম্মই হচ্ছে এই যে, তার প্রসাদে মানুষে আত্মজ্ঞান লাভ করে। দুই উপায়ে এই আত্মজ্ঞান উদ্রেক করা যেতে পারে—

এক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে, আর এক বিদ্রূপের দ্বারা। যিনি আমাদের মনের উপর জ্ঞানের আলো ফেলেন, তাঁর উপরেও আমাদের রাগ হয়,—আর যিনি হাসির আলো ফেলেন, তাঁর উপরে তার চাইতেও ঢের বেশি রাগ হয়, কেননা হাসির অন্তরে যে দাহিকা শক্তি আছে, জ্ঞানের অন্তরে তা নেই। এ জাতীয় লেখকদের সমাজ প্রথমে শত্রু বলেই জ্ঞান করে। কেননা তাঁরাই যে সমাজের যথার্থ বন্ধু—সে সত্য আবিষ্কার করতে সময় লাগে। সুতরাং যে সমাজ রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে সমাজের নিকট দ্বিজেন্দ্রলাল যে শুধু বাহবা ও করতালি লাভ করেছিলেন, এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কেননা, দ্বিজেন্দ্রলাল যা-কিছু জাতীয় জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করতেন, তার পৃষ্ঠে চাবুক প্রয়োগের যে পক্ষপাতী ছিলেন, এ কথা তিনি নিজ মুখেই স্বীকার করেছেন। আর আমরা যে কেউ চাবুক খেতে ভালবাসিনে,—না দেহে, না মনে,—এ সত্যও সর্ব্বলোকবিদিত। তারপর দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান ও কবিতা কাব্য বলে' গ্রাহ্য করবার অনেক বাধা ছিল। তাঁর ভাষা যেমন অপূর্ব্ব, তাঁর ছন্দবন্ধও তেমনি অপূর্ব্ব; এতই অপূর্ব্ব যে, তা অদ্ভুত বললেও অত্যুক্তি হয় না। রচনার যে ভঙ্গীটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত নয়, যে ধরণের কথা আমাদের শোনা অভ্যাস নেই, তা উচ্চারণ করবামাত্র আমাদের কাণে বিসদৃশ লাগে। এত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলালের গান বাঙ্গালী সমাজের কাছে যে এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার একমাত্র কারণ তাতে রস ছিল। শাস্ত্রমতে হাস্যরসও রস।

(৬)

হাস্যরস পদার্থটি যে কি, তা নিয়ে অনেক দার্শনিক অনেক মাথা ঘামিয়েছেন, বহু বৈজ্ঞানিক তার মূল অন্বেষণ করেছেন, সম্ভবতঃ এই কারণে যে,—মানুষে কেন যে কাঁদে তা মানুষমাত্রেই জানে, কিন্তু আমরা কেন যে হাসি তা আমরা কেউ জানি নে। অন্যান্য রসের মত হাস্যরসের অন্তরেও একটা রহস্য আছে। সে রহস্য উদ্ঘাটন করবার চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও, কার্য্যতঃ প্রায়ই তা নিষ্ফল হয়। তবে এই পর্য্যন্ত আমরা জানি যে, মানুষে হাসে—এবং শুধু যে হাসে তাই নয়, পাঁচজনে মিলে হাসে। অপর পক্ষে, যে যথার্থ কাঁদে সে একা কাঁদে,—পাঁচজনে মিলে কান্নাটা হচ্ছে শুধু ক্রন্দনের অভিনয়। এর থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, হাসি জিনিষটে একটি সামাজিক ব্যাপার। সুতরাং যে পাঁচজনকে হাসাতে পারে, সে পাঁচজনকে আনন্দ দেয়—এবং সেই সঙ্গে সমাজের উপকারও করে। Bergson নামক জগদ্বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক বলেন, সমাজ আত্মরক্ষার জন্য হাসির সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে জড়ে ও জীবে যে শুধু প্রভেদ আছে তাই নয়, এ উভয় পরস্পরের পরম শত্রু। জড়জগতের ধর্ম্মই হচ্ছে সে জীবকে গ্রাস করতে চায়, নিজের অন্তর্ভূত করে' নিতে চায়,—এক কথায় জড়পদার্থে পরিণত করতে চায়। দেহ ও মনের জড়তার বিরুদ্ধে মানবাত্মার তীব্র প্রতিবাদের নামই হাসি। তিনি উদাহরণ স্বরূপে দেখিয়েছেন যে, একজনকে পা পিছলে পড়তে দেখলে আর পাঁচজনে যে হাসে, তার কারণ ও-ভাবে যে পড়ে, সে একটি জড়পদার্থের মত পড়ে। সে মুহূর্ত্তে তার সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে যায়, তখন দেখতে মনে

হয় যেন সে শরীর কাঠ কিম্বা পাথর দিয়ে গড়া। এই হচ্ছে হাসির সর্ব্বনিম্নস্তর। আর যে হাসি মনের জড়তার বিরুদ্ধে মাথা তোলে, সে হচ্ছে উচ্চস্তরের হাসি।

এই কারণেই, যখন কোনও জাতির মন ও চরিত্র জড়বৎ হয়ে আসে, তখন সে সমাজের ভিতর যদি জীবনী-শক্তি থাকে, তাহলে সে শক্তি হাসির আকারে ফুটে ওঠে, এবং তার প্রভাবে সামাজিক জীবন জড়তার হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করে। ইউরোপীয় সাহিত্য, যুগে যুগে এ সত্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে। এ মত গ্রাহ্য কর্‌লে, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির কার্য্যকারণ দুয়েরি সন্ধান পাওয়া যায়। আমাদের সামাজিক মনে ও চরিত্রে যে জড়তা আছে, দ্বিজেন্দ্রলাল তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন, আর সে প্রতিবাদ বাঙ্গালী সমাজ যে সহাস্যমুখে গ্রাহ্য করে নিয়েছেন, তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, আমাদের জাতির অন্তরে আজও যথেষ্ট জীবনী-শক্তি আছে।

একই মনোভাব থেকে প্রসূত একের হাসিতে কেন আর পাঁচজনের মনে ফুর্ত্তি এনে দেয়, কিন্তু আর একজনের হাসিতে কেন তা এনে দেয় না? Bergsonএর দর্শনে সে প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। আমরা হাসির উৎপত্তির সকল কারণগুলিও যদি ধর্‌তে পারি, তাহলেও কেবলমাত্র সেই সকল কারণের সমবায়ে হাসি জন্মগ্রহণ করে না। যদি কর্‌ত তাহলে দার্শনিকেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসের রসিক হয়ে উঠতেন। অথচ দার্শনিকের মত অরসিক লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। এই কারণে আমরা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, হাসির অন্তরে তার সকল উপাদানের অতিরিক্ত এমন একটি পদার্থ আছে যা হচ্ছে তার রস, অর্থাৎ আত্মা। এদেশের

নব্য আলঙ্কারিকেরা বলেন যে, রমনীর সৌন্দর্য্য কেবলমাত্র তার নাক্, কাণ, চোখ, তার অঙ্গসৌষ্ঠবের উপর নির্ভর করে না; কিন্তু এ সকলের অতিরিক্ত "লাবণ্য" নামক একটি পদার্থ আছে, যা হচ্ছে সে সৌন্দর্য্যের প্রাণ ও আত্মা। হাস্যরস সম্বন্ধে "লাবণ্য" শব্দটি প্রয়োগ করা চলে না, কিন্তু ঐ একই অর্থের একটি ফার্সি কথা আছে—নিমক—যা বাঙ্গালীর কাছে একেবারে অপরিচিত নয়। যা জলোও নয়, মিষ্টিও নয়, অথচ অতিশয় মুখরোচক, তার সেই বিশেষ স্বাদটীর নাম "নিমক"।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান কাব্য, কেননা তাতে "লাবণ্য" না থাক্‌লেও "নিমক" আছে। এবং এ রসের রসিক বাঙ্গলাদেশে পূর্ব্বেও ছিল, আজও আছে, আর আশা করি ভবিষ্যতেও থাক্‌বে,— সুতরাং তাঁর হাসির গান বাঙ্গলা-সাহিত্যে অমর হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

প্রত্ন-তত্ত্বের পারস্য-উপন্যাস।

——:০:——

ভারতবর্ষের যে কোনও ভবিষ্যৎ নেই, সে বিষয়ে বিদেশীর দল ও স্বদেশীর দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন; এক যাঁরা রাজ্যের সংস্কার চান, আর এক যাঁরা সমাজের সংস্কার চান। বর্ত্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হলে, তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। এই নিয়েই ত যত গোল! যা আছে তার বদল করা যে রাজ্য-শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্য-শাসকদের মত; আর যা আছে তার বদল করা যে সমাজ-শাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজ-শাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়, এ সত্য ইংরাজী ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।

(২)

ভবিষ্যৎ না থাক্, গতকল্য পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত বলে' একটা পদার্থ ছিল; শুধু ছিল বলে' ছিল না,—আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসেছিল। কিন্তু আজ শুনছি সে অতীত ভারতবর্ষের নয়,—অপর দেশের। এ কথা শুনে

এই কারণে, সক্রেটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটীর উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটীর নীচে পুঁতে ফেলেছেন।

(৫)

এ দলের মতে, ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলেও, পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি,—কেননা কাল, অতীতের অগ্নিসৎকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এক কথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করলেও, তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই ভারতবর্ষ, ইতিহাসের মহাশ্মশান নয়,—মহাগোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে। এই জ্ঞান হবামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে কোদাল পাড়তে সুরু করলেন, এই আশায় যে, এ দেশের উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে, সেখানেই লুপ্ত সভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোষের জন্য আমাদের আর চাষ আবাদ করতে হবে না।

এই খোঁড়াখুঁড়ির ফলে, সোনা না হোক্—তামা বেরিয়েছে, হীরে না হোক্—পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা, যে-সে পাথর নয়,—সব হরফ-কাটা। এই সব মুদ্রাঙ্কিত তাম্রফলকের বিশেষ কিছু মূল্য নেই,—তা পয়সারই মত সস্তা। এ কালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না, কেননা তার অক্ষর সব [illegible]।

কিন্তু অতীতের এই ক্ষোদিত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র।—বিদ্যা বলেছিলেন :—

"শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"।—

কিন্তু আজ কাল যদি কেউ বলেন যে—

"কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সঙ্গীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়"—

তাহলে তিনি অবিদ্যারই পরিচয় দেবেন। কেননা আজকাল পাষাণের সঙ্গীতে দেশ মাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ বদনে, তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কান দিই নে। রামায়ণ মহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে, এবং ইতিহাস এখন বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটী খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাঁকে আমরা হিন্দু সভ্যতা বলি, সেটা একটি অর্ব্বাচীন পদার্থ,—বৌদ্ধ সভ্যতার পাকা বুনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্ব্ব নিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম্ম নিয়েই গৌরব কর্‌ছিলুম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলীপুত্রই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল,—একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।

(৬)

কথা সরিৎ-সাগরের প্রসাদে পাটলীপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম। এবং আমরা,—কাব্যরসের রসিকেরা,—সেই জন্ম-

বৃত্তান্তই সাদরে গ্রাহ্য করে নিয়েছিলুম, কেননা সে কথায় বস্তুতন্ত্রতা না থাক্‌লেও রস আছে,—তাও আবার একটি নয়, তিন তিনটি,—মধুর, বীর এবং অদ্ভুত রস। পুত্র কর্ত্তৃক পাটলী-হরণের বৃত্তান্ত, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রুক্মিণী হরণ, এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সুভদ্রা হরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কৃষ্ণ প্রভৃতি রথে চড়ে' স্থলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পুত্র পাটলীকে ক্রোড়স্থ করে', মায়া পাদুকায় ভর দিয়ে নভোমার্গে উড্ডীন হয়েছিলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন স্ব স্ব নগরীতে প্রস্থান করেছিলেন। পুত্র কিন্তু তাঁর মায়া যষ্ঠির সাহায্যে যে পুরী আকাশে নির্ম্মাণ করেছিলেন, সেই পুরী ভূমিষ্ঠ হয়ে পাটলীপুত্র নাম ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু যাদুতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতে পাটলীপুত্রকে খনন করা অবশ্যকর্ত্তব্য হয়ে পড়েছিল, এবং সে কর্ত্তব্যও সম্প্রতি কার্য্যে পরিণত করা হয়েছে। খোঁড়া জিনিষটের ভিতর একটা বিপদ আছে, কেননা কোনও কোনও স্থলে কেঁচো খুঁড়্‌তে সাপ বেরোয়। এ ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।

Dr. Spooner নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্ত্তাব্যক্তি এই ভূমধ্য রাজধানী খনন করে' আবিষ্কার করেছেন যে, এ দেশের মাটী খুঁড়্‌লে দেখা যায় যে, তার নীচে ভারতবর্ষ নেই,—আছে শুধু পারস্য। Palimpsest নামক এক প্রকার প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে, আর নীচে আর এক ভাষায়। বলা বাহুল্য উপরে যা লেখা থাকে তা জাল, আর নীচে যা লেখা থাকে তাই আসল। Dr. Spooner এর দিব্যদৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট Palimpsest, তার উপরে পালি কিম্বা সংস্কৃত ভাষায় যা লেখা আছে তা জাল, আর

তার নীচে যা লেখা আছে তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফার্সি,—কেননা, আমরা কেউ তা পড়্‌তে পারি নে। Dr. Spooner-এর কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন্, মান্য কর্‌তে বাধ্য,—কেননা সেকালের কাব্যের যাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের যাদুঘরের অধ্যক্ষকে তা করা চলে না।

Dr. Spooner তাঁর নবমত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নানা প্রমাণ, নানা অনুমান, নানা দর্শন, নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। এ সকলের মূল্য যে কি, তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি যে, তিনি এমন একটি যুক্তি বাদ দিয়েছেন, যার আর কোনও খণ্ডন নেই। Spooner সাহেবের মতে, যার নাম অসুর তারই নাম দানব—এবং যার নাম দানব, তারই নাম শক্,—এবং যার নাম শক, তারই নাম পার্শি। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, এ দেশের মাটী খুঁড়্‌লে পার্শি সহর বেরিয়ে পড়্‌তে বাধ্য। দানবপুরী যে পাতালে অর্থাৎ মাটীর নীচে অবস্থিত, এ কথা ত হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত।

(৭)

অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের ভবিষ্যৎও নেই, অতীতও নেই। এক বাকী থাক্‌ল—বর্ত্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্ত্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুস্কিলের কথা। বই পড়ে' বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখে শুনে লেখা আর। এ কাজ কর্‌তে হলে চোখ কান খুলে রাখ্‌তে হবে, মনকে

খাটাতে হবে,—এক কথায় সচেতন হতে হবে। তারপর এত কষ্ট স্বীকার করে' যে সাহিত্য গড়্‌তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য কর্‌বেন না। মানুষে বর্ত্তমানকেই সব চাইতে অগ্রাহ্য করে। যা'দের চোখ কান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নব সাহিত্যকে নবীন বলে' নিন্দা কর্‌বেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্ত্তমানের কোনও ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন থেকে বঙ্গ-সরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।

বীরবল।

আহুতি।

——:•:——

ইউরোপীয় সভ্যতা আজ পর্য্যন্ত আমাদের গ্রামের বুকের ভিতর তার শিং ঢুকিয়ে দেয় নি; অর্থাৎ রেলের রাস্তা সে গ্রামকে দূর থেকে পাশ কাটিয়ে চলে গেছে। কাজেই কলিকাতা থেকে বাড়ী যেতে, অদ্যাবধি কতক পথ আমাদের সেকেলে যানবাহনের সাহায্যেই যেতে হয়; বর্ষাকালে নৌকা, আর শীত-গ্রীষ্মে পাল্কিই হচ্ছে আমাদের প্রধান অবলম্বন।

এই স্থলপথ আর জলপথ ঠিক উল্টো উল্টো দিকে। আমি বরাবর নৌকাযোগেই বাড়ী যাতায়াত করতুম, তাই এই স্থলপথের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ আমার কোনই পরিচয় ছিল না। তারপর যে বৎসর আমি B A. পাস করি, সে বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে কোনও বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমাকে একবার দেশে যেতে হয়; অবশ্য স্থলপথে। এই যাত্রায় যে অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল, তোমাদের কাছে আজ তারই পরিচয় দেব।

আমি সকাল ছ'টায় ট্রেণ থেকে নেমে দেখি, আমার জন্য ষ্টেসনে পাল্কি-বেহারা হাজির রয়েছে। পাল্কি দেখে তার অন্তরে প্রবেশ করবার যে বিশেষ লোভ হয়েছিল, তা বলতে পারি নে। কেননা চোখের আন্দাজে বুঝলুম যে, সেখানি প্রস্থে দেড় হাত আর দৈর্ঘ্যে তিন হাতের চাইতেও কম। তারপর বেহারাদের চেহারা দেখে

আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। এমন অস্থিচর্ম্মসার মানুষ, অন্য কোনও দেশে বোধহয় হাঁসপাতালের বাইরে দেখা যায় না। প্রায় সকলেরি পাঁজরার হাড় ঠেলে বেরিয়েছে, হাতপায়ের মাংস সব দড়ি পাকিয়ে গিয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, এদের শরীরের একটিমাত্র অঙ্গ—উদর—অস্বাভাবিকরকম স্ফীতি ও চাকচিক্য লাভ করেছে। আমি ডাক্তার না হলেও, অনুমানে বুঝলুম যে তার অভ্যন্তরে পীলে ও যকৃৎ পরস্পর পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। মনে পড়ে গেল বৃহদারণ্যক্ উপনিষদে পড়েছিলুম যে, অশ্বমেধের অশ্বের "যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পর্ব্বতা"। পীলে ও যকৃৎ নামক মাংসপিণ্ড দুটিকে পর্ব্বতের সঙ্গে তুলনা করা যে অসঙ্গত নয়, এই প্রথম আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। মানুষের দেহ যে কতদূর শ্রীহীন, শক্তিহীন হতে পারে, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেয়ে আমি মনে মনে লজ্জিত হয়ে পড়লুম ; এরকম দেহ মনুষ্যত্বকে প্রকাশ্যে অপমান করে। অথচ আমাদের গ্রামের হিন্দুর বীরত্ব এই সব দেহ আশ্রয় করেই টিঁকে আছে। এরা জাতিতে অস্পৃশ্য হলেও হিন্দু— শরীরে অশক্ত হলেও বীর। কেননা শীকার এদের জাতিব্যবসা। এরা বর্শা দিয়ে শুয়োর মারে, বনে ঢুকে জঙ্গল ঠেঙ্গিয়ে বাঘ বার করে ; অবশ্য উদরান্নের জন্য। এদের তুলনায়, মাথায় লাল পাগড়ি ও গায়ে সাদা চাপকান-ধারী আমার দর্শনধারী সঙ্গী ভোজপুরী দরওয়ানটিকে রাজপুত্রের মত দেখাচ্ছিল।

এই সব কৃষ্ণের জীবদের কাঁধে চড়ে, বিশ মাইল পথ যেতে, প্রথমে আমার নিতান্ত অপ্রবৃত্তি হয়েছিল। মনে হ'ল এই সব জীর্ণ শীর্ণ জীবন্মৃত হতভাগ্যদের স্কন্ধে আমার দেহের ভার চাপানোটা

নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য হবে। আমি পাল্কিতে চড়্‌তে ইতস্ততঃ করছি দেখে, বাড়ী থেকে যে মুসলমান সর্দ্দারটি এসেছিল, সে হেসে বল্‌লেঃ—

"হুজুর উঠে পড়ুন, কিছু কষ্ট হবে না। আর দেরি কর্‌লে বেলা চারটের মধ্যে বাড়ী পৌঁছতে পার্‌বেন না।"

দশ ক্রোশ পথ যেতে দশ ঘণ্টা লাগবে, এ কথা শুনে আমার পাল্কি চড়্‌বার উৎসাহ যে বেড়ে গেল, অবশ্য তা নয়। তবুও আমি দুর্গা 'বলে' হামাগুড়ি দিয়ে সেই প্যাক্‌বাক্সের মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম, কেননা তা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। বলা বাহুল্য ইতিমধ্যে নিজের মনকে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে, মানুষের স্কন্ধে আরোহণ করে' যাত্রা করায় পাপ নেই। আমরা ধনীলোকেরা পৃথিবীর দরিদ্র লোকদের কাঁধে চড়েই ত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছি। আর পৃথিবীতে যে স্বল্পসংখ্যক ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্র ছিল, আছে, থাক্‌বে এবং থাকা উচিত,—এই ত পলিটিকাল ইকনমির শেষ কথা। Conscienceকে ঘুম পাড়াবার কত-না মন্ত্রই আমরা শিখেছি!

অতঃপর পাল্কি চল্‌তে সুরু কর্‌ল।

সর্দ্দারজী আশা দিয়েছিলেন যে, হুজুরের কোনও কষ্ট হবে না। কিন্তু সে আশা যে "দিলাশা" মাত্র, তা বুঝতে আমার বেশীক্ষণ লাগে নি। কেননা হুজুরের সুস্থ শরীর ইতিপূর্ব্বে কখনও এতটা ব্যতিব্যস্ত হয় নি। পাল্কির আয়তনের মধ্যে আমার দেহায়তন খাপ খাওয়াবার বৃথা চেষ্টায় আমার শরীরের যে ব্যস্তসমস্ত অবস্থা হয়েছিল, তাকে শোয়াও বলা চলে না, বসাও বলা চলে না। শালগ্রামের শোওয়া বসা দুই এক হলেও, মানুষের অবশ্য তা নয়। কাজেই এ দুয়ের

ভিতর যেটি হোক্ একটি আসন গ্রহণ কর্‌বার জন্য আমাকে অবিশ্রাম কসরৎ কর্‌তে হচ্ছিল। কুচিমোড়া না ভেঙ্গে বীরাসন ত্যাগ করে' পদ্মাসন গ্রহণ করবার জো ছিল না, অথচ আমাকে বাধ্য হয়ে মিনিটে মিনিটে আসন পরিবর্ত্তন কর্‌তে হচ্ছিল। আমার বিশ্বাস এ অবস্থায় হঠযোগীরাও একাসনে বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারতেন্ না, কেননা পৃষ্ঠদণ্ড ঋজু কর্‌বামাত্র, পাল্কির ছাদ সজোরে মস্তকে চপেটাঘাত কর্‌ছিল। ফলে, গুরুজনের সুমুখে কুলবধূর মত, আমাকে কুব্জপৃষ্ঠে নতশিরে অবস্থিতি কর্‌তে হয়েছিল। নাভিপদ্মে মনঃসংযোগ করবার এমন সুযোগ আমি পূর্ব্বে কখনও পাই নি; কিন্তু অভ্যাস-দোষে আমার বিক্ষিপ্ত চিত্তবৃত্তিকে সংক্ষিপ্ত করে' নাভি-বিবরে সুনিবিষ্ট কর্‌তে পারলুম না।

শরীরের এই বিপর্য্যস্ত অবস্থাতে আমি অবশ্য কাতর হয়ে পড়ি নি। তখন আমার নবযৌবন। দেহ তার স্থিতিস্থাপকতা-ধর্ম্ম তখনও হারিয়ে বসে নি। বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, নিজদেহের এই সব অনিচ্ছাকৃত অঙ্গভঙ্গী দেখে আমার শুধু হাসি পাচ্ছিল। এই যাত্রার মুখে, পূর্ব্বদিক থেকে যে আলো ও বাতাস ধীরে ধীরে বয়ে আসছিল, তার দর্শনে ও স্পর্শনে আমার মন উৎফুল্ল, উল্লসিত হয়ে উঠেছিল; সে বাতাস যেমন সুখস্পর্শ, সে আলো তেমনি প্রিয়দর্শন। দিনের এই নব-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে আমার নয়ন মন সব জেগে উঠেছিল। আমি একদৃষ্টে বাইরের দৃশ্য দেখ্‌তে লাগলুম। চারিদিকে শুধু মাঠ ধূ ধূ করছে, ঘর নেই দোর নেই, গাছ নেই পালা নেই, শুধু মাঠ—অফুরন্ত মাঠ—আগাগোড়া সমতল ও সমরূপ, আকাশের মত বাধাহীন এবং ফাঁকা। কলিকাতার ইটকাঠের পায়রার খোপের ভিতর থেকে

বেরিয়ে এসে, প্রকৃতির এই অসীম উদারতার মধ্যে আমার অন্তরাত্মা মুক্তির আনন্দ অনুভব কর্‌তে লাগল। আমার মন থেকে সব ভাবনা চিন্তা ঝরে গিয়ে, সে মন ঐ আকাশের মত নির্ব্বিকার ও প্রসন্নরূপ ধারণ কর্‌লে,—তার মধ্যে যা ছিল, সে হচ্ছে আনন্দের ঈষৎ রক্তিম আভা। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না, কেননা দিনের সঙ্গে রোদ, প্রকৃতির গায়ের জ্বরের মত বেড়ে উঠতে লাগল, আকাশ বাতাসের উত্তাপ, দেখ্‌তে দেখ্‌তে একশ'পাঁচ ডিগ্রিতে চড়ে গেল। যখন বেলা প্রায় ন'টা বাজে, তখন দেখি বাইরের দিকে আর চাওয়া যায় না; আলোয় চোখ ঝল্‌সে যাচ্ছে। আমার চোখ একটা কিছু সবুজ পদার্থের জন্য লালায়িত হয়ে দিগ্‌দিগন্তে তার অন্বেষণ করে' এখানে ওখানে দুটি একটি বাবলা গাছের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌লে। বলা বাহুল্য এতে চোখের পিপাসা মিট্‌ল না, কেননা এ গাছের আর যে গুণই থাক, এর গায়ে শ্যামল-শ্রী নেই, পায়ের নীচে নীল ছায়া নেই। এই তরুহীন, পত্রহীন, ছায়াহীন পৃথিবী আর মেঘমুক্ত রৌদ্রপীড়িত আকাশের মধ্যে ক্রমে একটি বিরাট অবসাদের মূর্ত্তি ফুটে উঠ্‌ল। প্রকৃতির এই একঘেয়ে চেহারা আমার চোখে আর সহ্য হল না। আমি একখানি বই খুলে পড়্‌বার চেষ্টা করলুম। সঙ্গে Meredith-এর Egoist এনেছিলুম, তার শেষ চ্যাপ্টার পড়্‌তে বাকী ছিল। একটানা দু'চার পাতা পড়ে দেখি, তার শেষ চ্যাপ্টার তার প্রথম চ্যাপ্টার হয়ে উঠেছে,—অর্থাৎ তার একবর্ণও আমার মাথায় ঢুক্‌ল না। বুঝলুম পাল্কির অবিশ্রাম ঝাঁকুনিতে আমার মস্তিষ্ক বেবাক ঘুলিয়ে গেছে। আমি বই বন্ধ করে' পাল্কি-বেহারাদের একটু চাল বাড়াতে অনুরোধ করলুম, এবং সেই সঙ্গে

বক্‌শিষের লোভ দেখালুম। এতে ফল হল। অর্দ্ধেক পথে যে গ্রামটিতে আমাদের বিশ্রাম করবার কথা ছিল, সেখানে বেলা সাড়ে দশটায়, অর্থাৎ মেয়াদের আধঘণ্টা আগে গিয়ে পৌঁছলুম।

এই মরুভূমির ভিতর এই গ্রামটি যে ওয়েসিসের একটা খুব নয়নাভিরাম এবং মনোরম উদাহরণ, তা বল্‌তে পারি নে। মধ্যে একটি ডোবা, আর তার তিন পাশে একতলা-সমান উঁচু পাড়ের উপর খান দশবারো খড়োঘর, আর এক পাশে একটি অশ্বত্থ গাছ। সেই গাছের নীচে পাল্কি নামিয়ে, বেহারারা ছুটে গিয়ে সেই ডোবায় ডুব দিয়ে উঠে, ভিজে কাপড়েই চিড়ে-দইয়ের ফলার করতে বস্‌ল। পাল্কি দেখে গ্রাম-বধূরা সব পাড়ের উপরে এসে কাতার দিয়ে দাঁড়াল। এই পল্লীবধূদের সম্বন্ধে কবিতা লেখা কঠিন, কেননা এদের আর যাই থাক্,—রূপও নেই, যৌবনও নেই। যদি বা কারও রূপ থাকে ত তা কৃষ্ণবর্ণে ঢাকা পড়েছে, যদি বা কারও যৌবন থাকে ত তা মলিন বসনে চাপা পড়েছে। এদের পরণের কাপড় এত ময়লা যে, তাতে চিমটি কাট্‌লে একতাল মাটি উঠে আসে। যা বিশেষ করে' আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, সে হচ্ছে তাদের হাতের পায়ের রূপোর গহনা। এক যোড়া চূড় আমার চোখে পড়ল, যার তুল্য সুশ্রী গড়ন একালের গহনায় দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। এই থেকে প্রমাণ পেলুম যে, বাঙ্গলার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকের দেহে সৌন্দর্য্য না থাক্, সেই শ্রেণীর পুরুষের হাতে আর্ট আছে।

ঘণ্টা আধেক বাদে আমরা আবার রওনা হলুম। পাল্কি অতি ধীরে সুস্থে চল্‌তে লাগল, কেননা ভূরিভোজনের ফলে আমার বাহকদের গতি আপন্নসত্ত্বা স্ত্রীলোকের তুল্য মৃদুমন্থর হয়ে এসেছিল।

ইতিমধ্যে আমার শরীর মন ইন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি সব এতটা ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল যে, আমি চোখ বুজে ঘুমবার চেষ্টা করলুম। ক্রমে জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদ্দুর এবং পাল্কির দোলার প্রসাদে আমার তন্দ্রা এল ; সে তন্দ্রা কিন্তু নিদ্রা নয়। আমার শরীর যেমন শোওয়া বসা এ দুয়ের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, আমার মনও তেমনি সুপ্তি ও জাগরণের মাঝামাঝি একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল। এই অবস্থায় ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেল। তারপর পাল্কির একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমি জেগে উঠলুম,—সে ধাক্কার বেগ এতই বেশি যে, তা আমার দেহের ষঠ্চক্র ভেদ করে' একেবারে সহস্রারে গিয়ে উপনীত হয়েছিল! জেগে দেখি ব্যাপার আর কিছুই নয়—বেহারারা একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় সোয়ারি সজোরে নিক্ষেপ করে' একদম অদৃশ্য হয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সর্দ্দারজী বললেন, ওরা একটু তামাক খেতে গিয়েছে। যাত্রা করে' অবধি, এই প্রথম একটি জায়গা আমার চোখে পড়্ল, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। সে বট একাই একশ' ; চারিদিকে সারিসারি বোয়া নেমেছে, আর তার উপরে পাতা এত ঘনবিন্যস্ত যে, সূর্য্যরশ্মি তা ভেদ করে আস্‌তে পারছে না। মনে হল প্রকৃতি, তাপক্লিষ্ট পথশ্রান্ত পথিকদের জন্য একটি হাজার থামের পান্থশালা সস্নেহে স্বহস্তে রচনা করে রেখেছেন। সেখানে ছায়া এত নিবিড় যে, সন্ধ্যে হয়েছে বলে' আমার ভুল হল, কিন্তু ঘড়ি খুলে দেখি বেলা তখন সবে একটা।

আমি এই অবসরে বহুকষ্টে পাল্কি থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে' হাত পা ছড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলুম। দেহটিকে সোজা করে'

খাড়া করতে প্রায় মিনিট পোনেরো লাগল; কেননা ইতিমধ্যে আমার সর্ব্বাঙ্গে খিল ধরে এসেছিল, তার উপর আবার কোন অঙ্গ অসাড় হয়ে গিয়েছিল; কোনও অঙ্গে ঝিন্‌ঝিনি ধরেছিল, কোন অঙ্গে পক্ষাঘাত, কোনও অঙ্গে ধনুষ্টঙ্কার হয়েছিল। যখন শরীরটি সহজ অবস্থায় ফিরে এল, তখন মনে ভাবলুম গাছটি একবার প্রদক্ষিণ করে' আসি। খানিকটে দূর এগিয়ে দেখি, বেহারাগুলো সব পাঁড়েজীকে ঘিরে বসে আছে, আর সকলে মিলে একটা মহা জটলা পাকিয়ে তুলেছে। প্রথমে আমার ভয় হল যে, এরা হয়ত আমার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করবার চক্রান্ত করছে; কেননা সকলে একসঙ্গে মহা উৎসাহে বক্তৃতা করছিল। কিন্তু তারপরেই বুঝলুম যে, এই বকাবকি চেঁচামেচির অন্য কারণ আছে। এরা যে বস্তুর ধূমপান করছিল, তা যে তামাক নয়—গঞ্জিকা, তার পরিচয় ঘ্রাণেই পাওয়া গেল। এদের স্ফূর্ত্তি, এদের আনন্দ, এদের লম্ফঝম্ফ দেখে, গঞ্জিকার হরিতানন্দ নামের সার্থকতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেলুম। এক একজন কল্কেয় এক এক টান দিচ্ছে, আর "ব্যোম্ কালী কল্‌কাত্তাওয়ালি" বলে হুঙ্কার ছাড়ছে! গাঁজার কল্কের গড়ন যে এত সুডোল, তা আমি পূর্ব্বে জানতুম না,—গড়নে কল্কে ফুলও এর কাছে হার মানে। মাদকতার আধার যে সুন্দর হওয়া দরকার, এ জ্ঞান দেখলুম এদেরও আছে।

প্রথমে এদের এই ধূমপানোৎসব দেখতে আমার আমোদ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু ক্রমে বিরক্তি ধরতে লাগল। ছিলেমের পর ছিলেম পুড়ে যাচ্ছে, অথচ দেখি কারও ওঠবার অভিপ্রায় নেই। এদের গাঁজা খাওয়া কখন শেষ হবে জিজ্ঞাসা করাতে,

সর্দ্দারজী উত্তর করলেন—"হুজুর, এদের টেনে না তুললে এরা উঠবে না, সুমুখে ভয় আছে তাই এরা গাঁজায় দম দিয়ে মনে সাহস করে নিচ্ছে।" আমি বল্লুম, "কি ভয়?" সে জবাব দিলে "হুজুর, সে ভয়ের নাম করতে নেই। একটু পরে সব চোখেই দেখতে পাবেন।" এ কথা শুনে; ব্যাপার কি দেখবার জন্যে আমার মনে এতটা কৌতূহল জন্মাল যে, বেহারাগুলোকে টেনে তোলবার জন্যে স্বয়ং তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। দেখি, যে-সব চোখ ইতি-পূর্ব্বে যকৃতের প্রভাবে হলুদের মত হলদে ছিল, এখন সে-সব গঞ্জিকার প্রসাদে চূন-হলুদের মত লাল হয়ে উঠেছে। প্রতি লোকটিকে নিজের হাতে টেনে খাড়া করতে হল, তার ফলে বাধ্য হয়ে কতকটা গাঁজার ধোঁয়া আমাকে উদরস্থ করতে হল; সে ধোঁয়া আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করে' আমার মাথায় গিয়ে চড়ে' বসল। অমনি আমার গা পাক্ দিয়ে উঠল, হাত পা ঝিম্‌ঝিম্ করতে লাগল, চোখ টেনে আসতে লাগল, আমি তাড়াতাড়ি পাল্কিতে গিয়ে আশ্রয় নিলুম। পাল্কি আবার চলতে সুরু করল। এবার আমি পাল্কি চড়বার কষ্ট কিছুমাত্র অনুভব করলুম না, কেননা আমার মনে হল যে শরীরটে যেন আমার নয়—অপর কারো।

খানিকক্ষণ পর,—কতক্ষণ পর তা বলতে পারি নে,—বেহারাগুলো সব সমস্বরে ও তারস্বরে চীৎকার করতে আরম্ভ করলে। এদের গায়ের জোরের চাইতে গলার জোর যে বেশি, তার প্রমাণ পূর্ব্বেই পেয়েছিলুম,—কিন্তু সে জোর যে এত অধিক, তার পরিচয় এই প্রথম পেলুম। এই কোলাহলের ভিতর থেকে একটা কথা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল—সে হচ্ছে রামনাম। ক্রমে আমার পাঁড়েজীটিও বেহারাদের

সঙ্গে গলা মিলিয়ে "রামনাম সৎ হ্যয়" "রামনাম সৎ হ্যয়" এই মন্ত্র অবিরাম আউড়ে যেতে লাগ্‌লেন। তাই শুনে আমার মনে হল যে আমার মৃত্যু হয়েছে, আর ভূতেরা পাল্কিতে চড়িয়ে আমাকে প্রেত-পুরীতে নিয়ে যাচ্ছে! এ ধারণার মূলে আমার অন্তরস্থ গঞ্জিকাধূমের কোনও প্রভাব ছিল কিনা জানিনে। এরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে জানবার জন্য আমার মহা কৌতূহল হল। আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি, গ্রামে আগুন লাগলে যেরকম হয়, আকাশের চেহারা সেইরকম হয়েছে, অথচ আগুন লাগবার অপর লক্ষণ,—আকাশ-যোড়া হৈ হৈ রৈ রৈ শব্দ শুন্‌তে পেলুম না। চারিদিক এমন নির্জ্জন, এমন নিস্তব্ধ যে, মনে হল মৃত্যুর অটল শান্তি যেন বিশ্বচরাচরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তারপর পাল্কি আর একটু অগ্রসর হলে দেখলুম যে, সুমুখে যা পড়ে আছে তা একটি মরুভূমি—বালির নয়, পোড়ামাটির,—সে মাটি পাতখোলার মত, তার গায়ে একটি তৃণ পর্য্যন্ত নেই। এই পোড়ামাটির উপরে মানুষের এখন বসবাস নেই, কিন্তু পূর্ব্বে যে ছিল, তার অসংখ্য এবং অপর্য্যাপ্ত চিহ্ন চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। এ যেন ইটের রাজ্য। যতদূর চোখ যায়, দেখি শুধু ইট আর ইট, কোথায়ও বা তা গাদা হয়ে রয়েছে, কোথায়ও বা হাজারে হাজারে মাটির উপর বেছানো রয়েছে; আর সে ইট এত লাল যে, দেখতে মনে হয় টাটকা রক্ত যেন চাপ বেঁধে গেছে। এই ভূতলশায়ী জনপদের ভিতর থেকে যা আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, সে হচ্ছে গাছ,—কিন্তু তার একটিতেও পাতা নেই, সব নেড়া, সব শুকনো, সব মরা। এই গাছের কঙ্কালগুলি কোথাও বা দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, কোথায়ও বা দু'একটি একধারে

আলগোছ হয়ে রয়েছে। আর এই ইটকাঠ, মাটি, আকাশের সর্ব্বাঙ্গে যেন রক্তবর্ণ আগুন জড়িয়ে রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে বেহারাদের প্রকৃতির লোকের ভয় পাওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কেননা আমারই গা ছম্‌ ছম্‌ কর্‌তে লাগল। খানিকক্ষণ পরে এই নিস্তব্ধতার বুকের ভিতর থেকে একটি অতি ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি আমার কানে এল। সে স্বর এত মৃদু, এত করুণ, এত কাতর যে, মনে হল সে সুরের মধ্যে যেন মানুষের যুগযুগান্তের বেদনা সঞ্চিত, ঘনীভূত হয়ে রয়েছে। এ কান্নার সুরে আমার সমগ্র অন্তর অসীম করুণায় ভরে গেল, আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বমানবের ব্যথার ব্যথী হয়ে উঠলুম। এমন সময়ে হঠাৎ ঝড় উঠল, চারিদিক থেকে এলোমেলো ভাবে বাতাস বইতে লাগল। সেই বাতাসের তাড়নায় আকাশের আগুন যেন পাগল হয়ে ছুটোছুটি কর্‌তে লাগল। আকাশের রক্তগঙ্গায় যেন তুফান উঠল, চারিদিকে আগুনের ঢেউ বইতে লাগল। তারপর দেখি সেই অগ্নি-প্লাবনের মধ্যে অসংখ্য নরনারীর ছায়া কিলবিল করছে, ছট্‌ফট্‌ কর্‌ছে। এই ব্যাপার দেখে উনপঞ্চাশ বায়ু মহানন্দে করতালি দিতে লাগল, হা হা হো হো শব্দে চীৎকার কর্‌তে লাগল। ক্রমে এই সব শব্দ মিলেমিশে একটা অট্টহাস্যে রূপান্তরিত হল,—সে হাসির নির্ম্মম বিকট ধ্বনি দিগদিগন্তে ঢেউ খেলিয়ে গেল। সে হাসি ক্রমে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, আবার সেই মৃদু করুণ ও কাতর ক্রন্দনধ্বনিতে পরিণত হল। এই বিকট হাসি আর এই করুণ ক্রন্দনের দ্বন্দ্বে আমার মনের ভিতর এই ধ্বংশপুরীর পূর্ব্বস্মৃতি সব জাগিয়ে তুল্‌লে,—সে স্মৃতি ইহজন্মের কি পূর্ব্বজন্মের তা আমি বল্‌তে পারি নে। আমার

ভিতর থেকে কে যেন আমাকে বলে' দিলে যে, সে গ্রামের ইতিহাস এই ঃ—

(২)

এই ইটকাঠের মরুভূমি হচ্ছে রুদ্রপুরের ধ্বংশাবশেষ। রুদ্রপুরের রায় বাবুরা এককালে এ অঞ্চলের সর্ব্বপ্রধান জমিদার ছিলেন। রায় বংশের আদি পুরুষ রুদ্রনারায়ণ, নবাব-সরকারে চাকরি করে' রায়-রাইয়ান খেতাব পান, এবং সেই সঙ্গে তিন পরগণার মালিকি সত্ত্ব লাভ করেন। লোকে বলে এঁদের ঘরে দিল্লীর বাদশার স্বহস্তে স্বাক্ষরিত সনদ ছিল, এবং সেই সনদে তাঁদের কোতল কচ্ছলের ক্ষমতা দেওয়া ছিল। সনদের বলে হোক্ আর না হোক্, এঁরা যে কোতল কচ্ছল কর্‌তেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কিম্বদন্তি এই যে, এমন দুর্দ্দান্ত জমিদার এ দেশে পূর্ব্বাপর কখনও হয় নি। এঁদের প্রবল প্রতাপে বাঘে ছাগলে একঘাটে জল খেত। কেননা, যার উপর এঁরা নারাজ হতেন, তাকে ধনে প্রাণে বিনাশ কর্‌তেন। এঁরা কত লোকের ভিটামাটি যে উচ্ছন্নে দিয়েছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। রায় বাবুদের দোহাই অমান্য করে, এত বড় বুকের পাটা বিশ ক্রোশের মধ্যে কোনও লোকের ছিল না। তাঁদের কড়া শাসনে পরগণার মধ্যে চুরি ডাকাতি দাঙ্গাহাঙ্গামার নামগন্ধও ছিল না, তার একটি কারণ ও-অঞ্চলের লাঠিয়াল সড়কিয়াল তীরন্দাজ প্রভৃতি যত ক্রূরকর্ম্মা লোক, সব তাঁদের সরকারে পাইক সর্দ্দারের দলে ভর্ত্তি হত। একদিকে যেমন মানুষের প্রতি তাঁদের নিগ্রহের সীমা ছিল না, অপরদিকে তেমনি অনুগ্রহেরও সীমা ছিল না। দরিদ্রকে অন্নবস্ত্র,

আতুরকে ঔষধপথ্য দান এঁদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে ছিল। এঁদের অনুগত আশ্রিত লোকের লেখাযোখা ছিল না। এঁদের প্রদত্ত ব্রহ্মোত্তরের প্রসাদে দেশের গুরুপুরোহিতের দল সব জোৎদার হয়ে উঠেছিলেন। তারপর পূজা আর্চ্চা, দোল দুর্গোৎসবে তাঁরা অকাতরে অর্থ ব্যয় কর্‌তেন। রুদ্রপুরে দোলের সময় আকাশ আবীরে, ও পূজোর সময় পৃথিবী রুধিরে লাল হয়ে উঠ্‌ত। রুদ্রপুরের অতিথিশালায় নিত্য একশত অতিথি-ভোজনের আয়োজন থাকত। পিতৃদায় মাতৃদায় কন্যাদায়গ্রস্ত কোনও ব্রাহ্মণ, রুদ্রপুরের বাবুদের দ্বারস্থ হয়ে কখনও রিক্তহস্তে ফিরে যায় নি। এঁরা বলতেন ব্রাহ্মণের ধন বাঁধবার জন্য নয়—সৎকার্য্যে ব্যয় করবার জন্য। সুতরাং সৎকার্য্যে ব্যয় করবার টাকার যদি কখনও অভাব হত, তাহলে বাবুরা সে টাকা সা-মহাজনদের ঘর লুঠে নিয়ে আস্‌তেও কুণ্ঠিত হতেন না। এক কথায়, এঁরা ভাল কাজ মন্দ কাজ সব নিজের খেয়াল ও মর্জ্জি অনুসারে কর্‌তেন; কেননা নবাবের আমলে তাঁদের কোনও শাসনকর্ত্তা ছিল না। ফলে, জনসাধারণে তাঁদের যেমন ভয় কর্‌ত, তেমনি ভক্তিও কর্‌ত,—তার কারণ তাঁরা জনসাধারণকে ভক্তিও কর্‌তেন না, ভয়ও কর্‌তেন না। এই অবাধ যথেচ্ছাচারের ফলে তাঁদের মনে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ধারণা উত্তরোত্তর অসাধারণ বৃদ্ধিলাভ করেছিল। তাঁদের মনে যা ছিল, সে হচ্ছে জাতির অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বলের অহঙ্কার, রূপের অহঙ্কার। রায় পরিবারের পুরুষেরা সকলেই গৌরবর্ণ, দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাঁদের ঘরের মেয়েদের রূপের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সব কারণে মানুষকে মানুষ জ্ঞান করা এঁদের পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

এ দেশে ইংরেজ আসবার পূর্ব্বেই এ পরিবারের ভগ্নদশা উপস্থিত হয়েছিল, তারপর কোম্পানির আমলে এঁদের সর্ব্বনাশ হয়। এঁদের বংশবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পত্তি ভাগ হওয়ার দরুণ যে-সকল সরিক নিঃস্ব হয়ে পড়েছিল, ক্রমে তাদের বংশ লোপ হতে আরম্ভ হল; কেননা নিজের চেষ্টায়, নিজের পরিশ্রমে অর্থোপার্জ্জন করাটা এঁদের মতে অতি হেয় কার্য্য বলে' গণ্য ছিল। তারপর সরিকানা বিবাদ। রায় পরিবার ছিল শাক্ত,—এত ঘোর শাক্ত যে, রুদ্রপুরের ছেলে বুড়োতে মদ্যপান করত। এমন কি, এ বংশের মেয়েরাও তাতে কোন আপত্তি করত না, কেননা তাদের বিশ্বাস ছিল মদ্যপান করা একটী পুরুষালি কাজ। সন্ধ্যার সময় কুলদেবতা সিংহবাহিনীর দর্শনের পর বাবুরা যখন বৈঠকখানায় বসে মদ্যপানে রত হতেন—তখন সেই সকল গৌরবর্ণ প্রকাণ্ড পুরুষদের কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা আর জবাফুলের মত দুই চোখ, এই তিনে মিলে সাক্ষাৎ মহাদেবের রোষ-কষায়িত ত্রিনেত্রের মত দেখাত। এই সময়ে পৃথিবীতে এমন দুঃসাহসের কার্য্য নেই, যা তাঁদের দ্বারা সিদ্ধ না হত। তাঁরা লাঠিয়ালদের এ-সরিকের ধানের গোলা লুঠে আনতে, ও-সরিকের প্রজার বৌঝিকে বে-ইজ্জৎ করতে হুকুম দিতেন। ফলে রক্তারক্তি কাণ্ড হত। এই জ্ঞাতি-শত্রুতার দরুণ তাঁরা উৎসন্নের পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তারপর এঁদের বিষয়সম্পত্তি যা অবশিষ্ট ছিল, তা দশশালা বন্দোবস্তের প্রসাদে হস্তান্তরিত হয়ে গেল। কিস্তির শেষ তারিখে সদর খাজানা কোম্পানির মালখানায় দাখিল না করলে লক্ষ্মী যে চিরদিনের মত গৃহত্যাগ করবেন,—এ জ্ঞান এঁদের মনে কখনও জন্মাল না। পূর্ব্ব আমলে নবাব-সরকারে নিয়মিত শালিয়ানা মাল-

খাজানা দাখিল করবার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। এই অনভ্যাসবশতঃ কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব এঁরা সময়মত দিয়ে উঠতে পারতেন না। কাজেই এঁদের অধিকাংশ সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে রায়বংশ প্রায় লোপ পেয়ে এসেছিল। যে গ্রামে এঁরা প্রায় একশ' ঘর ছিলেন, সেই গ্রামে আজ একশ' বৎসর পূর্ব্বে ছ'ঘর মাত্র জমিদার ছিল।

এই ছ'ঘরের বিষয়সম্পত্তিও ক্রমে ধনঞ্জয় সরকারের হস্তগত হল। এর কারণ ধনঞ্জয় সরকার ইংরাজের আইন যেমন জানতেন, তেমনি মানতেন। ইংরাজের আইনের সাহায্যে, এবং সে আইন বাঁচিয়ে, কি করে' অর্থোপার্জ্জন করতে হয়, তার অন্ধি-সন্ধি ফিকির-ফন্দি সব তাঁর নখাগ্রে ছিল। তিনি জিলার কাছারিতে মোক্তারি করে' দুচার বৎসরের মধ্যেই অগাধ টাকা রোজগার করেন। তারপর তেজারতিতে সেই টাকা সুদের সুদ, তস্য সুদে হুহু করে বেড়ে যায়। জনরব যে, তিনি বছর দশেকের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা উপায় করেন। এত না হোক্, তিনি যে দু'চার লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিলেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। এই টাকা করবার পর তাঁর জমিদার হবার সাধ গেল, এবং সেই সাধ মেটাবার জন্য তিনি একে একে রায় বাবুদের সম্পত্তিসকল খরিদ করতে আরম্ভ করলেন; কেননা এ জমিদারির প্রতি কাঠা জমি তাঁর নখদর্পণে ছিল। রায়বংশের চাকরি করেই তাঁর চৌদ্দ পুরুষ মানুষ হয়, এবং তিনিও অল্প বয়সে রুদ্রপুরের বড় সরিক ত্রিলোকনারায়ণের জমাসেরেস্তায় পাঁচ সাত বৎসর মুহুরির কাজ করেছিলেন। সকল সরিকের সমস্ত সম্পত্তি মায় বসতবাটী খরিদ করলেও, বহুকাল যাবৎ তাঁর রুদ্রপুরে যাবার সাহস ছিল না, কেননা তাঁর মুনিবপুত্র উগ্র-

নারায়ণ তখনও জীবিত ছিলেন। উগ্রনারায়ণ হাতে পৈতা জড়িয়ে সিংহবাহিনীর পা ছুঁয়ে শপথ করেছিলেন যে, তিনি বেঁচে থাক্‌তে ধনঞ্জয় যদি রুদ্রপুরের ত্রিসীমানার ভিতর পদার্পণ করে, তাহলে সে সশরীরে আর ফিরে যাবে না। তিনি যে তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর্‌বেন, সে বিষয়ে ধনঞ্জয়ের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেননা তিনি জান্‌তেন যে, উগ্রনারায়ণের মত দুর্দ্ধর্ষ ও অসমসাহসী পুরুষ রায়বংশেও কখন জন্মগ্রহণ করে নি।

উগ্রনারায়ণের মৃত্যুর কিছুদিন পরে, ধনঞ্জয় রুদ্রপুরে এসে রায়বাবুদের পৈতৃকভিটা দখল করে বসলেন। তখন সে গ্রামে রায়বংশের একটি পুরুষও বর্ত্তমান ছিল না, সুতরাং তিনি ইচ্ছা কর্‌লে সকল সরিকের বাড়ী নিজ-দখলে আন্‌তে পার্‌তেন, তবুও তিনি উগ্রনারায়ণের একমাত্র বিধবা কন্যা রত্নময়ীকে তাঁর পৈতৃক বাটী থেকে বহিস্কৃত করে দেবার কোনও চেষ্টা করেন নি। তার প্রথম কারণ, রুদ্রপুরের সংলগ্ন পাঠানপাড়ার প্রজারা উগ্রনারায়ণের বাটীতে রত্নময়ীর স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা কর্‌বার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। এরা গ্রামশুদ্ধ লোক পুরুষানুক্রমে লাঠিয়ালের ব্যবসা করে এসেছে; সুতরাং ধনঞ্জয় জানতেন যে, রত্নময়ীকে উচ্ছেদ কর্‌তে চেষ্টা কর্‌লে, খুন্ জখম হওয়া অনিবার্য্য। তাতে অবশ্য তিনি নিতান্ত নারাজ ছিলেন, কেননা তাঁর মত নিরীহ ব্যক্তি বাঙ্গলা দেশে তখন আর দ্বিতীয় ছিল না। তার দ্বিতীয় কারণ, যার অন্নে চৌদ্দপুরুষ প্রতিপালিত হয়েছে, ধনঞ্জয়ের মনে তার প্রতি পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ কিঞ্চিৎ ভয় এবং ভক্তিও ছিল। এই সব কারণে, ধনঞ্জয় উগ্রনারায়ণের অংশটি বাদ দিয়ে, রায়বংশের আদ্‌বাড়ীর বাদ বাকী অংশ অধিকার করে বসলেন্,—সেও নাম মাত্র। কেননা, ধনঞ্জয়ের

পরিবারের মধ্যে ছিল তাঁর একমাত্র কন্যা রঙ্গিনী দাসী, আর তাঁর গৃহ-জামাতা এবং রঙ্গিনীর স্বামী রতিলাল দে। এই বাড়ীতে এসে ধনঞ্জয়ের মনের একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটল। অর্থ উপার্জ্জন করবার সঙ্গে সঙ্গে ধনঞ্জয়ের অর্থলোভ এতদূর বেড়ে গিয়েছিল যে, তাঁর অন্তরে সেই লোভ ব্যতীত অপর কোনও ভাবের স্থান ছিল না। সেই লোভের ঝোঁকেই তিনি এতদিন অন্ধভাবে যেন-তেন-উপায়েন টাকা সংগ্রহ করতে ব্যস্ত ছিলেন। কিসের জন্য, কার জন্য টাকা জমাচ্ছি, এ প্রশ্ন ধনঞ্জয়ের মনে কখনও উদয় হয় নি।

কিন্তু রুদ্রপুরে এসে জমিদার হয়ে বসবার পর ধনঞ্জয়ের জ্ঞান হল যে, তিনি শুধু টাকা করবার জন্যই টাকা করেছেন; আর কোনও কারণে নয়, আর কারও জন্য নয়। কেননা তাঁর স্মরণ হ'ল যে, যখন তাঁর একটির পর একটি সাতটি ছেলে মারা যায়, তখনও তিনি একদিনের জন্যও বিচলিত হন্ নি, একদিনের জন্যও অর্থোপার্জ্জনে অবহেলা করেন নি। তাঁর চির-জীবনের অর্থের আত্যন্তিক লোভ, এই বৃদ্ধবয়েসে অর্থের আত্যন্তিক মায়ায় পরিণত হল। তাঁর সংগৃহীত ধন কি করে চিরদিনের জন্য রক্ষা করা যেতে পারে, এই ভাবনায় তাঁর রাত্তিরে ঘুম হত না। অতুল ঐশ্বর্য্যও যে কাল-ক্রমে নষ্ট হয়ে যায়, এই রুদ্রপুরই ত তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। ক্রমে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হল যে, মানুষে নিজ চেষ্টায় ধনলাভ করতে পারে, কিন্তু দেবতার সাহায্য ব্যতীত সে ধন রক্ষা করা যায় না। ইংরাজের আইন কণ্ঠস্থ থাকলেও, ধনঞ্জয় একজন নিতান্ত অশিক্ষিত লোক ছিলেন। তাঁর প্রকৃতিগত বর্ব্বরতা কোনরূপ শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা পরাভূত কিম্বা নিয়মিত হয় নি। তাঁর সমস্ত মন সেকালের শূদ্রবুদ্ধিজাত সকলপ্রকার কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি ছেলেবেলায় শুনেছিলেন

যে, একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যদি টাকার সঙ্গে একটি ঘরে বন্ধ করে দেওয়া যায়, তাহলে সেই শিশুটি সেই ঘরে অনাহারে প্রাণত্যাগ করে' যক্ষ হয়ে সেই টাকা চিরকাল রক্ষা করে। ধনঞ্জয়ের মনে এই উপায়ে তাঁর সঞ্চিত ধন রক্ষা করবার প্রবৃত্তি এত অদম্য হয়ে উঠল যে, তিনি যখ্ দেওয়াটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে স্থিরনিশ্চিত হলেন। যেখানে টাকার কথা, সেখানে ধনঞ্জয়ের কোন মায়া মমতা ছিল না,— এবং তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে নিজের কার্য্য উদ্ধার কর্‌বার কৌশলে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে এক বিষম বাধা উপস্থিত হ'ল। ধনঞ্জয় একটি ব্রাহ্মণ-শিশুকে যখ্ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে, রঙ্গিনী আহার নিদ্রা ত্যাগ কর্‌লে। ফলে, ধনঞ্জয়ের পক্ষে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা অসম্ভব হয়ে পড়্‌ল। ধনঞ্জয় এ পৃথিবীতে টাকা ছাড়া আর কিছু যদি ভালবাসতেন ত, সে হচ্ছে তাঁর কন্যা। চুণসুরখির গাঁথনির ভিতর এক একটি গাছ যেমন শিকড় গাড়ে, ধনঞ্জয়ের কঠিন হৃদয়ের কোন একটি ফাটলের ভিতর এই কন্যাবাৎসল্য তেমনি ভাবে শিকড় গেড়েছিল। ধনঞ্জয় এ বিষয়ে উদ্যোগী না হলেও, ঘটনাচক্রে তাঁর জীবনের শেষ সাধ পূর্ণ হ'ল।

রত্নময়ীর একটি তিন বৎসরের ছেলে ছিল। তার নাম কিরীটচন্দ্র। তিনি সেই ছেলেটি নিয়ে দিবারাত্র ঐ বাড়ীতে একা বাস কর্‌তেন, জনমানবের সঙ্গে দেখা কর্‌তেন না, এবং তাঁর অন্তঃপুরে কারও প্রবেশাধিকার ছিল না। রুদ্রপুরে লোকে তাঁর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যেত, যদি না তিনি প্রতিদিন স্নানান্তে ঠিক দুপুরবেলায় সিংহবাহিনীর মন্দিরে ঠাকুর দর্শন কর্‌তে যেতেন। সে সময়ে তাঁর আগে পিছে পাঠানপাড়ার দুজন লাঠিয়াল তাঁর রক্ষক হিসেবে থাক্‌ত। রত্নময়ীর

বয়েস তখন বিশ কিম্বা একুশ। তাঁর মত অপূর্ব্ব সুন্দরী স্ত্রীলোক আমাদের দেশে লাখে একটি দেখা যায়। তাঁর মূর্ত্তি সিংহবাহিণীর প্রতিমার মত ছিল, এবং সেই প্রতিমার মতই উপরের দিকে কোণ্-তোলা তাঁর চোখ দুটি, দেবতার চোখের মতই স্থির ও নিশ্চল ছিল। লোকে বলত সে চোখে কখনও পলক পড়ে নি। সে চোখের ভিতরে যা জাজ্জ্বল্যমান হয়ে উঠেছিল, সে হচ্ছে চারপাশের নরনারীর উপর তাঁর অগাধ অবজ্ঞা। রত্নময়ী তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের তিনশত বৎসরের সঞ্চিত অহঙ্কার উত্তরাধিকারীসত্বে লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য রত্নময়ীর অন্তরে তাঁর রূপেরও অসাধারণ অহঙ্কার ছিল। কেননা, তাঁর কাছে সে রূপ ছিল তাঁর আভিজাত্যের প্রত্যক্ষ নিদর্শন। রত্নময়ীর মতে রূপের উদ্দেশ্য মানুষকে আকর্ষণ করা নয়—তিরস্কার করা। তিনি যখন মন্দিরে যেতেন, তখন পথের লোকজন সব দূরে সরে দাঁড়াত—কেননা তাঁর সকল অঙ্গ, তার বর্ণ ও রেখার নীরব ভাষায় সকলকে বলত "দূর হ! ছায়া মাড়ালে নাইতে হবে।" বলা বাহুল্য তিনি কোনও দিকে দৃকপাত করতেন না, মাটির দিকে চেয়ে সবল পথ রূপে আলো করে' সোজা মন্দিরে যেতেন, আবার ঠিক সেই ভাবে বাড়ী ফিরে আসতেন। রঙ্গিণী জানালার ফাঁক দিয়ে রত্নময়ীকে নিত্য দেখত, এবং তার সকল মন, সকল দেহ হিংসার বিষে জর্জ্জরিত হয়ে উঠত—কেননা রঙ্গিণীর আর যাই থাক্, রূপ ছিল না। আর তার রূপের অভাব তার মনকে অতিশয় ব্যথা দিত, কেননা তার স্বামী রতিলাল ছিল অতি সুপুরুষ।

ধনঞ্জয় যেমন টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী তেমনি তার স্বামীকে ভালবাসত,—অর্থাৎ এ ভালবাসা একটি প্রচণ্ড ক্ষুধা ব্যতীত আর কিছুই নয়, এবং সে ক্ষুধা শারীরিক ক্ষুধার মতই অন্ধ ও নির্ম্মম। এ ভালবাসার

সঙ্গে মনের কতটা সম্পর্ক ছিল বলা কঠিন, কেননা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণীর মত জীবদের মন, দেহের অতিরিক্ত নয়, অন্তর্ভূক্ত বস্তু। তারপর ধনঞ্জয় যে-ভাবে টাকা ভালবাসতেন, রঙ্গিণী ঠিক সেইভাবে তার স্বামীকে ভালবাসত— অর্থাৎ নিজের সম্পত্তি হিসেবে। সে সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে, এ কথা মনে হলে সে একেবারে মায়ামমতাশূন্য হয়ে পড়ত। এবং সে সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য পৃথিবীতে এমন নিষ্ঠুর কাজ নেই, যা রঙ্গিণী না করতে পারত। রঙ্গিণীর মনে সম্পূর্ণ অকারণে এই সন্দেহ জন্মেছিল যে, রতিলাল রত্নময়ীর রূপে মুগ্ধ হয়েছে,—ক্রমে সেই সন্দেহ তার কাছে নিশ্চয়তায় পরিণত হল। রঙ্গিণী হঠাৎ আবিষ্কার করলে যে, রতিলাল লুকিয়ে লুকিয়ে উগ্রনারায়ণের বাড়ী যায়, এবং যতক্ষণ পারে ততক্ষণ সেইখানেই কাটায়। এর যথার্থ কারণ এই যে, রতিলাল রত্নময়ীর বাড়ীতে আশ্রিত যে ব্রাহ্মণটি ছিল, তার কাছে ভাঙ্গ খেতে যেত। তারপর রত্নময়ীর ছেলেটির উপর নিঃসন্তান রতিলালের এতদূর মায়া পড়ে গিয়েছিল যে, সে কিরীটচন্দ্রকে না দেখে একদিনও থাকতে পারত না। বলা বাহুল্য রত্নময়ীর সঙ্গে রতিলালের কখনও চার চক্ষুর মিলন হয় নি, কেননা পাঠান-পাড়ার প্রজারা তার অন্তঃপুরের দ্বার রক্ষা করত। কিন্তু রঙ্গিনীর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেল যে, রত্নময়ী তার স্বামীকে সুপুরুষ দেখে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে। এর প্রতিশোধ নেবার জন্য, তার মজ্জাগত হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য, রঙ্গিণী রত্নময়ীর ছেলেটিকে যখ্ দেবার জন্য কৃতসংকল্প হল। রঙ্গিণী একদিন ধনঞ্জয়কে জানিয়ে দিলে যে যখ্ দেওয়া সম্বন্ধে তার আর কোনও আপত্তি নেই,—শুধু তাই নয়, ছেলের সন্ধান সে নিজেই করবে।

এ কাজ অবশ্য অতি গোপনে উদ্ধার করতে হয়। তাই বাপে মেয়েতে পরামর্শ করে স্থির হল যে, রঙ্গিণীর শোবার পাশের ঘরটিতে যখ্ দেওয়া হবে। দু-চার দিনের ভিতর সে ঘরটির সব দুয়ার জানালা ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর অতি গোপনে ধনঞ্জয়ের সঞ্চিত যত সোণা রূপোর টাকা ছিল—সব বড় বড় তামার ঘড়াতে পুরে সেই ঘরে সারি সারি সাজিয়ে রাখা হল। যখন ধনঞ্জয়ের সকল ধন সেই কুঠরিজাত হল, তখন রঙ্গিণী একদিন রতিলালকে বল্‌লে যে, রত্নময়ীর ছেলেটি এত সুন্দর যে, তার সেই ছেলেটিকে একবার কোলে করতে নিতান্ত ইচ্ছে যায়,—সুতরাং যে উপায়েই হোক্ তাকে একদিন রঙ্গিণীর কাছে আন্‌তেই হবে। রতিলাল উত্তর করলে, সে অসম্ভব,—রত্নময়ীর লাঠিয়ালরা টের পেলে তার মাথা নেবে। কিন্তু রঙ্গিণী এত নাছোড় হয়ে তাকে ধরে বসল যে, রতিলাল অগত্যা একদিন সন্ধ্যাবেলা কিরীটচন্দ্রকে ভুলিয়ে সঙ্গে করে রঙ্গিণীর কাছে নিয়ে এল। কিরীটচন্দ্র আসবামাত্র রঙ্গিণী ছুটে গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিলে, চুমো খেলে, কত আদর করলে, কত মিষ্টি কথা বল্‌লে। তারপর সে কিরীটচন্দ্রের গায়ে লাল চেলির যোড় তার গলায় ফুলের মালা, তার কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, আর তার হাতে দু'গাছি সোণার বালা পরিয়ে দিলে। কিরীটচন্দ্রের এই সাজ দেখে রতিলালের চোখমুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌ল। তারপর রঙ্গিণী হঠাৎ তার হাত ধরে টেনে নিয়ে, সেই ব্রাহ্মণ শিশুকে সেই অন্ধকূপের ভিতর পুরে দিয়ে, বাইরে থেকে দরজায় গা-চাবি বন্ধ করে চলে গেল।—রতিলাল এ দোর ও দোর ঠেলে দেখে বুঝলে যে, রঙ্গিণী তাকেও

তার শোবার ঘরে বন্দী করে চলে গিয়েছে। রতিলাল ঠেলে, ঘুঁসো মেরে, লাথি মেরে সেই অন্ধকূপের কপাট ভাঙ্গবার চেষ্টা করে দেখ্‌লে সে চেষ্টা বৃথা। সে কপাট এত ভারি আর এত শক্ত যে, কুড়োল দিয়েও তা কাটা কঠিন। কিরীটচন্দ্র সেই অন্ধকার ঘরে বন্ধ হয়ে প্রথমে ককিয়ে কাঁদ্‌তে লাগলে, তারপর রতিলালকে দাদা দাদা বলে ডাক্‌তে লাগলে। দু' তিন ঘণ্টার পর তার কান্নার আওয়াজ আর শুন্‌তে পাওয়া গেল না। রতিলাল বুঝলে সে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। তারপর তিন দিন তিন রাত নিজের ঘরে বন্দী হয়ে, রতিলাল কখনও শোনে যে কিরীটচন্দ্র দুয়োরে মাথা ঠুক্‌ছে, কখনও শোনে সে কাঁদ্‌ছে, আবার কখনও বা চুপচাপ। রতিলাল এই তিন দিন, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে' দিনের ভিতর হাজার বার পাগলের মত ছুটে গিয়ে সেই কপাট ভাঙ্গ্‌তে চেষ্টা করেছে—অথচ সে দরজা একচুলও নাড়াতে পারে নি। যখন কান্নার আওয়াজ তার কাণে আস্‌ত, তখন রতিলাল দুয়োরের কাছে ছুটে গিয়ে বলত "দাদা দাদা অমন করে' কেঁদনা, কোনও ভয় নেই—আমি এখানে আছি"। রতিলালের গলা শুনে সে ছেলে আরও জোরে কেঁদে উঠত, ঘন ঘন কপাটে মাথা ঠুকত। রতিলাল তখন দুই কাণে হাত দিয়ে ঘরের অন্য কোণে পালিয়ে যেত, ও চীৎকার করে কখনও রঙ্গিণীকে কখনও ধনঞ্জয়কে ডাকত, এবং যা মুখে আসে তাই বলে গালি দিত। এই পৈশাচিক ব্যাপারে সে এতটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল যে, কিরীটচন্দ্রের উদ্ধারের যে অপর কোনও উপায় হতে পারে, এ কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তার মনে উদয় হয় নি, তার সকল মন ঐ কান্নার টানে সেই অন্ধকূপের মধ্যেই বন্দী হয়ে ছিল। তিন দিনের পর সেই শিশুর ক্রন্দনধ্বনি ক্রমে অতি মৃদু, অতি

ক্ষীণ হয়ে এসে, পঞ্চম দিনে একেবারে থেমে গেল। রতিলাল বুঝলে কিরীটচন্দ্রের ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ হয়ে গিয়েছে। তখন সে তার ঘরের জানালার লোহার গরাদে দু হাতে ফাঁক্ করে, নীচে লাফিয়ে পড়ে একদৌড়ে রত্নময়ীর বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হল। সেদিন দেখলে অন্তঃপুরের দরজায় প্রহরী নেই, পাঠানপাড়ার প্রজারা সব ছেলে খোঁজবার জন্য নানা দিকে বেরিয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে রতিলাল রত্নময়ীর নিকট উপস্থিত হয়ে সকল ঘটনা তার কাছে এক নিঃশ্বাসে জানালে। আজ তিন বৎসরের মধ্যে রত্নময়ীর মুখে কেউ হাসি দেখে নি। তার ছেলের এই নিষ্ঠুর হত্যার কথা শুনে তার মুখ চোখ সব উজ্জ্বল হয়ে উঠলে, দেখতে মনে হল সে যেন হেসে উঠলে। এ দৃশ্য রতিলালের কাছে এতই অদ্ভুত বোধ হল যে, সে রত্নময়ীর কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।—

তারপর সেই দিন দুপুর রাত্তিরে—যখন সকলে শুতে গিয়েছে—রত্নময়ী নিজের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলে। সকল সরিকের বাড়ী সব গায়ে গায়ে। তাই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সে আগুন দেবতার রোষাগ্নির মত ব্যাপ্ত হয়ে ধনঞ্জয়ের--বাড়ী আক্রমণ করলে। ধনঞ্জয় ও রঙ্গিণী ঘর থেকে বেরিয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল, সদর ফটকে এসে দেখে রত্নময়ীকে ঘিরে পাঠানপাড়ার প্রায় একশ প্রজা ঢাল সড়কি ও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রত্নময়ীর আদেশে তারা ধনঞ্জয় ও রঙ্গিনীকে সড়কির পর সড়কির ঘা'য়ে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করে সেই জ্বলন্ত আগুনের ভিতর ফেলে দিলে। রত্নময়ী অমনি অট্টহাস্য করে উঠল। তার সঙ্গীরা বুঝলে যে সে পাগল হয়ে গিয়েছে। তারপর সেই পাঠানপাড়ার প্রজাদের মাথায় খুন চড়ে গেল, তারা

ধনঞ্জয়ের চাকর দাসী, আমলা ফয়লা, দ্বারবান বরকন্দাজ যাকে সুমুখে পেলে তার উপরেই সড়কি ও তলোয়ার চালালে, রায় বংশের পৈতৃক ভিটার উপরে আগুনের ও নীচে রক্তের নদী বইতে লাগল। তারপর ঝড় উঠল, ভূমিকম্প হতে লাগল—যখন সব পুড়ে ছারখার হয়ে গেল—তখন রত্নময়ী সেই আগুনে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করলে। রুদ্রপুরের সব ধ্বংশ হয়ে গিয়েছে। শুধু কিরীটচন্দ্রের কান্না ও রত্নময়ীর উন্মত্ত হাসি আজও তার আকাশ বাতাস পূর্ণ করে রেখেছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত

জাপান-যাত্রীর পত্র।

——:•:——

এই কয়দিন আকাশ এবং সমুদ্রের দিকে চোখ ভরে দেখ্‌চি, আর মনে হচ্চে অনন্তের রং ত শুভ্র নয়, তা কালো কিম্বা নীল। এই আকাশ খানিক দূর পর্য্যন্ত আকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ—ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল। আলো যতদূর, সীমার রাজ্য সেই পর্য্যন্ত; তারপরেই অসীম অন্ধকার। সেই অসীম অন্ধকারের বুকের উপরে এই পৃথিবীর আলোকময় দিনটুকু যেন কৌস্তুভমণির হার দুল্‌চে।

এই প্রকাশের জগৎ, এই গৌরাঙ্গী, তার বিচিত্র রঙের সাজ পরে' অভিসারে চলেচে—ঐ কালোর দিকে, ঐ অনির্ব্বচনীয় অব্যক্তর দিকে। বাঁধা নিয়মের মধ্যে বাঁধা থাকাতেই তার মরণ—সে কুলকেই সর্ব্বস্ব করে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে না, সে কুল খুইয়ে বেরিয়ে পড়েচে। এই বেরিয়ে যাওয়া বিপদের যাত্রা, পথে কাঁটা, পথে সাপ, পথে ঝড় বৃষ্টি,—সমস্তকে অতিক্রম করে, বিপদকে উপেক্ষা করে সে যে চলেচে, সে কেবল ঐ অব্যক্ত অসীমের টানে। অব্যক্তর দিকে, "আরোর" দিকে প্রকাশের এই কুল-খোয়ানো অভিসার-যাত্রা,—প্রলয়ের ভিতর দিয়ে, বিপ্লবের কাঁটাপথে পদে পদে রক্তের চিহ্ন এঁকে।

কিন্তু কেন চলে, কোন্ দিকে চলে, ওদিকে ত পথের চিহ্ন নেই, কিছু ত দেখ্‌তে পাওয়া যায় না?—না, দেখা যায় না, সব অব্যক্ত। কিন্তু শূন্য ত নয়,—কেননা ঐ দিক থেকেই বাঁশির সুর আস্‌চে। আমাদের চলা, এ চোখে দেখে চলা নয়, এ সুরের টানে চলা। যেটুকু চোখে দেখে চলি, সে ত বুদ্ধিমানের চলা,—তার হিসাব আছে, তার প্রমাণ আছে; সে ঘুরে ঘুরে কূলের মধ্যেই চলা। সে চলায় কিছুই এগোয় না। আর যেটুকু বাঁশি শুনে পাগল হয়ে চলি, যে চলায় মরা বাঁচা জ্ঞান থাকে না, সেই পাগলের চলাতেই জগৎ এগিয়ে চলেচে। সেই চলাকে নিন্দার ভিতর দিয়ে, বাধার ভিতর দিয়ে চল্‌তে হয়, কোনো নজির মান্‌তে গেলেই তাকে থম্‌কে দাঁড়াতে হয়। তার এই চলার বিরুদ্ধে হাজার রকম যুক্তি আছে, সে যুক্তি তর্কের দ্বারা খণ্ডন করা যায় না; তার এই চলার কেবল একটিমাত্র কৈফিয়ৎ আছে,—সে বল্‌চে ঐ অন্ধকারের ভিতর দিয়ে বাঁশি আমাকে ডাক্‌চে। নইলে কেউ কি সাধ করে আপনার সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে?

যেদিক থেকে ঐ মনোহরণ অন্ধকারের বাঁশি বাজ্‌চে, ঐ দিকেই মানুষের সমস্ত আরাধনা, সমস্ত কাব্য, সমস্ত শিল্পকলা, সমস্ত বীরত্ব, সমস্ত আত্মত্যাগ মুখ ফিরিয়ে আছে; ঐ দিকে চেয়েই মানুষ রাজ্য-সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে গেছে, মরণকে মাথায় করে নিয়েচে। ঐ কালোকে দেখে মানুষ ভুলেচে। ঐ কালোর বাঁশিতেই মানুষকে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরুতে টানে, অণুবীক্ষণ দূরবীক্ষণের রাস্তা বেয়ে মানুষের মন দুর্গমের পথে ঘুরে বেড়ায়, বারবার মরতে মরতে সমুদ্র-পারের পথ বের করে, বারবার মরতে মরতে আকাশ-পারের ডানা মেল্‌তে থাকে।

• মানুষের মধ্যে যে-সব মহাজাতি কুলত্যাগিনী, তারাই এগচ্চে, —ভয়ের ভিতর থেকে অভয়ে, বিপদের ভিতর দিয়ে সম্পদে। যারা সর্ব্বনাশা কালোর বাঁশি শুনতে পেলে না, তারা কেবল পুঁথির নজির জড় করে কুল আঁকড়ে বসে রইল—তারা কেবল শাসন মান্‌তেই আছে। তারা কেন বৃথা এই আনন্দলোকে জন্মেচে, যেখানে সীমা কাটিয়ে অসীমের সঙ্গে নিত্য লীলাই হচ্চে জীবনযাত্রা, যেখানে বিধানকে ভাসিয়ে দিতে থাকাই হচ্চে বিধি।

আবার উল্টোদিক থেকে দেখ্‌লে দেখ্‌তে পাই, ঐ কালো অনন্ত আস্‌চেন তাঁর আপনার শুভ্র জ্যোতির্ম্ময়ী আনন্দমূর্ত্তির দিকে। অসীমের সাধনা এই সুন্দরীর জন্যে, সেই জন্যেই তাঁর বাঁশি বিরাট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে এমন ব্যাকুল হয়ে বাজচে, অসীমের সাধনা এই সুন্দরীকে নূতন নূতন মালায় নূতন করে সাজাচ্চে। ঐ কালো এই রূপসীকে এক মুহূর্ত্ত বুকের থেকে নামিয়ে রাখ্‌তে পারেন না,—কেননা, এ যে তাঁর পরমা সম্পদ। ছোটর জন্যে বড়র এই সাধনা যে কি অসীম, তা ফুলের পাপড়িতে পাপড়িতে, পাখীর পাখায় পাখায়, মেঘের রঙে রঙে, মানুষের হৃদয়ের অপরূপ লাবণ্যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ধরা পড়চে। রেখায় রেখায়, রঙে রঙে, রসে রসে তৃপ্তির আর শেষ নাই। এই আনন্দ কিসের?—অব্যক্ত যে ব্যক্তর মধ্যে কেবলি আপনাকে প্রকাশ কর্‌চেন, আপনাকে ত্যাগ করে করে ফিরে পাচ্চেন।

এই অব্যক্ত কেবলি যদি না-মাত্র, শূন্যমাত্র হতেন,—তাহলে প্রকাশের কোনো অর্থই থাকত না, তাহলে বিজ্ঞানের অভিব্যক্তি কেবল একটা শব্দমাত্র হত। ব্যক্ত যদি অব্যক্তেরই প্রকাশ না হত,

তাহলে যা-কিছু আছে তা নিশ্চল হয়ে থাকত, কেবলি আরো-কিছুর দিকে আপনাকে নূতন করে তুল্‌ত না। এই আরো-কিছুর দিকেই সমস্ত জগতের আনন্দ কেন—এই অজানা আরো-কিছুর বাঁশি শুনেই সে কুল ত্যাগ করে কেন? ঐ দিকে শূন্য নয় বলেই, ঐ দিকেই সে পূর্ণকে অনুভব করে বলেই। সেই জন্যই উপনিষদ বলেচেন—ভূমৈব সুখং, ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। সেইজন্যই ত সৃষ্টির এই লীলা দেখ্‌চি, আলো এগিয়ে চলেচে অন্ধকারের অকূলে, অন্ধকার নেমে আস্‌চে আলোর কূলে। আলোর মন ভুলেচে কালোয়, কালোর মন ভুলেচে আলোয়।

মানুষ যখন জগৎকে না-এর দিক থেকে দেখে, তখন তার রূপক একেবারে উল্টে যায়। প্রকাশের একটা উল্টো পিঠ আছে, সে হচ্চে প্রলয়। মৃত্যুর ভিতর দিয়ে ছাড়া প্রাণের বিকাশ হতেই পারে না। হয়ে-ওঠার মধ্যে দুটো জিনিষ থাকাই চাই,—যাওয়া এবং হওয়া। হওয়াটাই হচ্চে মুখ্য, যাওয়াটাই গৌণ।

কিন্তু মানুষ যদি উল্টো পিঠেই চোখ রাখে,—বলে সবই যাচ্চে, কিছুই থাক্‌চে না; বলে জগৎ বিনাশেরই প্রতিরূপ, সমস্তই মায়া, যা-কিছু দেখ্‌চি, এ সমস্তই "না"; তাহলে এই প্রকাশের রূপকেই সে কালো করে, ভয়ঙ্কর করে দেখে; তখন সে দেখে, এই কালো কোথাও এগচ্চে না, কেবল বিনাশের বেশে নৃত্য কর্‌চে। আর অনন্ত রয়েচেন আপনাতে আপনি নির্লিপ্ত, এই কালিমা তাঁর বুকের উপর মৃত্যুর ছায়ার মত চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্চে, কিন্তু স্তব্ধকে স্পর্শ কর্‌তে পারচে না। এই কালো দৃশ্যত আছে, কিন্তু বস্তুত নেই—আর যিনি কেবলমাত্র আছেন, তিনি স্থির, ঐ প্রলয়রূপিনী না-থাকা তাঁকে

লেশমাত্র বিক্ষুব্ধ করে না। এখানে আলোর সঙ্গে কালোর সেই সম্বন্ধ, থাকার সঙ্গে না-থাকার যে সম্বন্ধ। কালোর সঙ্গে আলোর আনন্দের লীলা নেই, এখানে যোগের অর্থ হচ্চে প্রেমের যোগ নয়, জ্ঞানের যোগ। দুইয়ের যোগে এক নয়, একের মধ্যেই এক। মিলনে এক নয়, প্রলয়ে এক।

কথাটাকে আর একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করি।

একজন লোক ব্যবসা কর্‌চে। সে লোক কর্‌চে কি?—তার মূলধনকে, অর্থাৎ পাওয়া-সম্পদকে, সে মুনফা, অর্থাৎ না-পাওয়া সম্পদের দিকে প্রেরণ কর্‌চে। পাওয়া-সম্পদটা সীমাবদ্ধ ও ব্যক্ত, না-পাওয়া সম্পদটা অসীম ও অব্যক্ত। পাওয়া-সম্পদ সমস্ত বিপদ স্বীকার করে' না-পাওয়া সম্পদের অভিসারে চলেচে। না-পাওয়া সম্পদ অদৃশ্য ও অলব্ধ বটে, কিন্তু তার বাঁশি বাজচে,—সেই বাঁশি ভূমার বাঁশি। যে বণিক সেই বাঁশি শোনে, সে আপন ব্যাঙ্কে জমানো কোম্পানি-কাগজের কূল ত্যাগ করে', সাগর গিরি ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়ে। এখানে কি দেখ্‌চি?—না, পাওয়া-সম্পদের সঙ্গে না-পাওয়া সম্পদের একটি লাভের যোগ আছে। এই যোগে উভয়ত আনন্দ। কেননা, এই যোগে পাওয়া না-পাওয়াকে পাচ্চে, এবং না-পাওয়া পাওয়ার মধ্যে ক্রমাগত আপনাকেই পাচ্চে।

কিন্তু মনে করা যাক্, একজন ভীতু লোক বণিকের খাতায় ঐ খরচের দিকের হিসাবটাই দেখ্‌চে। বণিক কেবলি আপনার পাওয়া-টাকা খরচ করেই চলেছে, তার অন্ত নেই। তার গা শিউরে ওঠে! সে বলে, এই ত প্রলয়! খরচের হিসাবের কালো অঙ্কগুলো রক্ত-লোলুপ রসনা দুলিয়ে কেবলি যে নৃত্য কর্‌চে। যা খরচ,—অর্থাৎ

বস্তুত যা নেই,—তাই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্ক-বস্তুর আকার ধরে খাতা জুড়ে বেড়ে বেড়েই চলেচে। ঐকেই ত বলে মায়া। বণিক মুগ্ধ হয়ে এই মায়া-অঙ্কটার চিরদীর্ঘায়মান শৃঙ্খল কাটাতে পারচে না। এস্থলে মুক্তিটা কি ?—না, ঐ সচল অঙ্কগুলোকে একেবারে লোপ করে দিয়ে খাতার নিশ্চল নির্ব্বিকার শুভ্র কাগজের মধ্যে নিরাপদ ও নিরঞ্জন হয়ে স্থিরত্ব লাভ করা। দেওয়া ও পাওয়ার মধ্যে যে-একটি আনন্দ-ময় সম্বন্ধ আছে, যে সম্বন্ধ থাকার দরুণ মানুষ দুঃসাহসের পথে যাত্রা করে' মৃত্যুর মধ্য দিয়ে জয়লাভ করে, ভীতু-মানুষ তাকে দেখ্‌তে পায় না। তাই বলে—

মায়ামায়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা।

তোসা-মারু
চীন সমুদ্র
৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

---

(২)

শুনেছিলুম, পারস্যের রাজা যখন ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন, তখন হাতে-খাওয়ার প্রসঙ্গে তিনি ইংরেজকে বলেছিলেন, কাঁটাচামচ দিয়ে খেতে গিয়ে তোমরা খাওয়ার একটা আনন্দ থেকে বঞ্চিত হও। যারা ঘটকের হাত দিয়ে বিয়ে করে, তারা কোর্টশিপের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাত দিয়ে স্পর্শ করেই খাবারের সঙ্গে কোর্টশিপ আরম্ভ হয়। আঙ্গুলের ডগা দিয়েই স্বাদগ্রহণের সুরু।

আমার তেমনি জাহাজ থেকেই জাপানের স্বাদ শুরু হয়েচে। যদি ফরাসী জাহাজে করে জাপানে যেতুম, তাহলে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হত না।

এর আগে অনেকবার বিলিতি জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা করেচি—তার সঙ্গে এই জাহাজের বিস্তর তফাৎ। সে সব জাহাজের কাপ্তেন ঘোরতর কাপ্তেন। যাত্রীদের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া হাসি তামাসা যে তার বন্ধ—তা নয়; কিন্তু কাপ্তেনীটা খুব টক্‌টকে রাঙা। এত জাহাজে আমি ঘুরেচি, তার মধ্যে কোনো কাপ্তেনকেই আমার মনে পড়ে না। কেননা তারা কেবলমাত্র জাহাজের অঙ্গ। জাহাজ-চালানোর মাঝখান দিয়ে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ।

হতে পারে আমি যদি য়ুরোপীয় হতুম, তাহলে তারা যে কাপ্তেন ছাড়াও আর কিছু—তারা যে মানুষ—এটা আমার অনুভব করতে বিশেষ বাধা হত না। কিন্তু এ জাহাজেও আমি বিদেশী,—একজন য়ুরোপীয়ের পক্ষেও আমি যা, একজন জাপানীর পক্ষেও আমি তাই।

এ জাহাজে চড়ে অবধি দেখতে পাচ্ছি, আমাদের কাপ্তেনের কাপ্তেনীটা কিছুমাত্র লক্ষ্যগোচর নয়, একেবারেই সহজ মানুষ।

যাঁরা তাঁর নিম্নতর কর্ম্মচারী, তাঁদের সঙ্গে তাঁর কর্ম্মের সম্বন্ধ এবং দূরত্ব আছে, কিন্তু যাত্রীদের সঙ্গে কিছুমাত্র নেই। ঘোরতর ঝড়-ঝাপটের মধ্যেও তাঁর ঘরে গেছি,—দিব্যি সহজ ভাব। কথায় বার্ত্তায় ব্যবহারে তাঁর সঙ্গে আমাদের যে জমে গিয়েচে, সে কাপ্তেন-হিসাবে নয়, মানুষ-হিসাবে। এ যাত্রা আমাদের শেষ হয়ে যাবে, তাঁর সঙ্গে জাহাজ-চলার সম্বন্ধ আমাদের ঘুচে যাবে, কিন্তু তাঁকে আমাদের মনে থাকবে।

আমাদের ক্যাবিনের যে ষ্টুয়ার্ড আছে, সেও দেখি তার কাজ-কর্ম্মের সীমাটুকুর মধ্যেই শক্ত হয়ে থাকে না। আমরা আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কচ্চি, তার মাঝখানে এসে সেও ভাঙা ইংরাজিতে যোগ দিতে বাধা বোধ করে না। মুকুল ছবি আঁকচে, সে এসে খাতা চেয়ে নিয়ে তার মধ্যে ছবি আঁকতে লেগে গেল।

আমাদের জাহাজের যিনি খাজাঞ্চি, তিনি একদিন এসে আমাকে বল্লেন,—আমার মনে অনেক বিষয়ে প্রশ্ন আসে, তোমার সঙ্গে তার বিচার করতে ইচ্ছে করি ; কিন্তু আমি ইংরাজি এত কম জানি যে, মুখে মুখে আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি যদি কিছু না মনে কর, তবে আমি মাঝে মাঝে কাগজে আমার প্রশ্ন লিখে এনে দেব, তুমি অবসরমত সংক্ষেপে দু'চার কথায় তার উত্তর লিখে দিয়ো।—তারপর থেকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সমাজের সম্বন্ধ কি, এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার প্রশ্নোত্তর চল্‌চে।

অন্য কোন জাহাজের খাজাঞ্চি এই সব প্রশ্ন নিয়ে যে মাথা বকায়, কিম্বা নিজের কাজকর্ম্মের মাঝখানে এরকম উপসর্গের সৃষ্টি করে, এরকম আমি মনে করতে পারিনে। এদের দেখে আমার মনে হয়

এরা নূতন-জাগ্রত জাতি,—এরা সমস্তই নূতন করে জানতে, নূতন করে ভাবতে উৎসুক। ছেলেরা নতুন জিনিষ দেখ্‌লে যেমন ব্যগ্র হয়ে ওঠে, আইডিয়া সম্বন্ধে এদের যেন সেইরকম ভাব।

তা ছাড়া আর একটা বিশেষত্ব এই যে, একপক্ষে জাহাজের যাত্রী, আর এক পক্ষে জাহাজের কর্ম্মচারী, এর মাঝখানকার গণ্ডিটা তেমন শক্ত নয়। আমি যে এই খাজাঞ্চির প্রশ্নের উত্তর লিখ্‌তে বসব, এ কথা মনে কর্‌তে তার কিছু বাধেনি,—আমি দুটো কথা শুনতে চাই, তুমি দুটো কথা বল্‌বে, এতে বিঘ্ন কি আছে? মানুষের উপর মানুষের যে একটি দাবী আছে, সেই দাবীটা সরলভাবে উপস্থিত কর্‌লে মনের মধ্যে আপনি সাড়া দেয়, তাই আমি খুসি হয়ে আমার সাধ্যমত এই আলোচনায় যোগ দিয়েচি।

আর একটা জিনিষ আমার বিশেষ করে চোখে লাগ্‌চে। মুকুল বালকমাত্র, সে ডেকের প্যাসেঞ্জার। কিন্তু জাহাজের কর্ম্মচারীরা তার সঙ্গে অবাধে বন্ধুত্ব কর্‌চে। কি করে জাহাজ চালায়, কি করে সমুদ্রে পথ নির্ণয় করে, কি করে গ্রহনক্ষত্র পর্য্যবেক্ষণ করতে হয়, কাজ কর্‌তে কর্‌তে তারা এই সমস্ত তাকে বোঝায়। তা ছাড়া নিজেদের কাজকর্ম্ম আশাভরসার কথাও ওর সঙ্গে হয়। মুকুলের সখ গেল, জাহাজের এঞ্জিনের ব্যাপার দেখ্‌বে। ওকে কাল রাত্রি এগারোটার সময় জাহাজের পাতালপুরীর মধ্যে নিয়ে গিয়ে, এক ঘণ্টা ধরে সমস্ত দেখিয়ে আন্‌লে।

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ—এইটেই বোধহয় আমাদের পূর্ব্বদেশের জিনিষ। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানব-সম্বন্ধের

দাবী ঘেঁষতে পারে না। তাতে কাজ খুব পাকা হয় সন্দেহ নেই। আমি ভেবেছিলুম জাপান ত য়ুরোপের কাছ থেকে কাজের দীক্ষা গ্রহণ করেচে, অতএব তার কাজের গণ্ডিও বোধহয় পাকা। কিন্তু এই জাপানী জাহাজে কাজ দেখতে পাচ্চি, কাজের গণ্ডিগুলোকে দেখতে পাচ্চিনে। মনে হচ্চে যেন আপনার বাড়ীতে আছি—কোম্পানির জাহাজে নেই। অথচ ধোওয়া মাজা প্রভৃতি জাহাজের নিত্যকর্ম্মের কোন খুঁৎ নেই।

প্রাচ্যদেশে মানবসমাজের সম্বন্ধগুলি বিচিত্র এবং গভীর। পূর্ব্বপুরুষ যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেও আমাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হয় না। আমাদের আত্মীয়তার জাল বহুবিস্তৃত। এই নানা সম্বন্ধের নানা দাবী মেটানো আমাদের চিরাভ্যস্ত, সেই জন্যে তাতে আমাদের আনন্দ। আমাদের ভৃত্যেরাও কেবল বেতনের নয়, আত্মীয়তার দাবী করে। সেই জন্যে যেখানে আমাদের কোনো দাবী চলেনা, যেখানে কাজ অত্যন্ত খাড়া, সেখানে আমাদের প্রকৃতি কষ্ট পায়। অনেক সময়ে ইংরেজ মনিবের সঙ্গে বাঙালী কর্ম্মচারীর যে বোঝাপড়ার অভাব ঘটে, তার কারণ এই,—ইংরেজ কর্ত্তা বাঙালী কর্ম্মচারীর দাবী বুঝতে পারে না, বাঙালী কর্ম্মচারী ইংরেজ কর্ত্তার কাজের কড়া শাসন বুঝতে পারে না। কর্ম্মশালার কর্ত্তা যে কেবলমাত্র কর্ত্তা হবে, তা নয়—মা বাপ হবে,—বাঙালী কর্ম্মচারী চিরকালের অভ্যাস বশতঃ এইটে প্রত্যাশা করে; যখন বাধা পায় তখন আশ্চর্য্য হয়, এবং মনে মনে মনিবকে দোষ না দিয়ে থাকতে পারে না। ইংরেজ কাজের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত, বাঙালী মানুষের দাবীকে মান্‌তে অভ্যস্ত,—এই জন্যে উভয়পক্ষে ঠিকমত মিট্‌মাট্‌ হতে চায় না।

কিন্তু কাজের সম্বন্ধ এবং মানুষের সম্বন্ধ, এ দুইয়ের বিচ্ছেদ না হয়ে সামঞ্জস্য হওয়াটাই দরকার, এ কথা না মনে করে থাকা যায় না। কেমন করে সামঞ্জস্য হতে পারে, বাইরে থেকে তার কোনো বাঁধা নিয়ম ঠিক করে দেওয়া যায় না। সত্যকার সামঞ্জস্য প্রকৃতির ভিতর থেকে ঘটে। আমাদের দেশে প্রকৃতির এই ভিতরকার সামঞ্জস্য ঘটে ওঠা কঠিন—কেননা যাঁরা আমাদের কাজের কর্ত্তা, তাঁদের নিয়ম অনুসারেই আমরা কাজ চালাতে বাধ্য।

জাপানে প্রাচ্যমন পাশ্চাত্যের কাছ থেকে কাজের শিক্ষালাভ করেচে, কিন্তু কাজের কর্ত্তা তারা নিজেই। এই জন্যে মনের ভিতরে একটা আশা হয় যে, জাপানে হয় ত পাশ্চাত্য কাজের সঙ্গে প্রাচ্য-ভাবের একটা সামঞ্জস্য ঘটে উঠ্‌তে পারে। যদি সেটা ঘটে, তবে সেইটেই পূর্ণতার আদর্শ হবে। শিক্ষার প্রথম অবস্থায় অনুকরণের ঝাঁজটা যখন কড়া থাকে, তখন বিধিবিধান সম্বন্ধে ছাত্র গুরুর চেয়ে আরো কড়া হয়; কিন্তু ভিতরকার প্রকৃতি আস্তে আস্তে আপনার কাজ কর্‌তে থাকে, এবং শিক্ষার কড়া অংশগুলোকে নিজের জারক রসে গলিয়ে আপন করে নেয়। এই জীর্ণ করে নেওয়ার কাজটা একটু সময়সাধ্য। এই জন্যেই পশ্চিমের শিক্ষা জাপানে কি আকার ধারণ কর্‌বে, সেটা স্পষ্ট করে দেখবার সময় এখনো হয় নি। সম্ভবত এখন আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বিস্তর অসামঞ্জস্য দেখ্‌তে পাব, যেটা কুশ্রী। আমাদের দেশেও পদে পদে তা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতির কাজই হচ্চে অসামঞ্জস্যগুলোকে মিটিয়ে দেওয়া। জাপানে সেই কাজ চল্‌চে সন্দেহ নেই। অন্ততঃ এই জাহাজটুকুর মধ্যে আমি ত এই দুই ভাবের মিলনের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চি।

২রা জ্যৈষ্ঠে আমাদের জাহাজ সিঙাপুরে এসে পৌঁছল। অনতি-কাল পরেই একজন জাপানী যুবক আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তিনি এখানকার একটি জাপানী কাগজের সম্পাদক। তিনি আমাকে বল্লেন, তাঁদের জাপানের সব চেয়ে বড় দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছ থেকে তাঁরা তার পেয়েচেন যে আমি জাপানে যাচ্চি, সেই সম্পাদক আমার কাছ থেকে একটি বক্তৃতা আদায় করবার জন্যে অনুরোধ করেচেন। আমি বল্লুম, জাপানে না পৌঁছে আমি এ বিষয়ে আমার সম্মতি জানাতে পারব না। তখনকার মত এই টুকুতেই মিটে গেল। আমাদের যুবক ইংরেজ বন্ধু পিয়ার্সন এবং মুকুল সহর দেখতে বেরিয়ে গেলেন। জাহাজ একেবারে ঘাটে লেগেচে। এই জাহাজের ঘাটের চেয়ে কুশ্রী বিভীষিকা আর নেই—এরি মধ্যে ঘন মেঘ করে বাদলা দেখা দিলে। বিকট ঘড়ঘড় শব্দে জাহাজ থেকে মাল ওঠানো নাবানো চলতে লাগল! আমি কুঁড়ে মানুষ, কোমর বেঁধে সহর দেখতে বেরনো আমার ধাতে নেই। আমি সেই বিষম গোলমালের সাইক্লোনের মধ্যে ডেক্-এ বসে মনকে কোনোমতে শান্ত করে রাখবার জন্যে লিখতে বসে গেলুম।

খানিক বাদে কাপ্তেন এসে খবর দিলেন যে, একজন জাপানী মহিলা আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি লেখা বন্ধ করে একটি ইংরাজি-বেশ-পরা জাপানী মহিলার সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হলুম। তিনিও সেই জাপানী সম্পাদকের পক্ষ নিয়ে, বক্তৃতা করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করতে লাগলেন। আমি বহু কষ্টে সে অনুরোধ কাটালুম। তখন তিনি বল্লেন, আপনি যদি একটু সহর বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছা করেন ত আপনাকে সব দেখিয়ে আনতে পারি।

তখন সেই বস্তা তোলার নিরন্তর শব্দ আমার মনটাকে জাঁতার মত পিষ্‌ছিল, কোথাও পালাতে পারলে বাঁচি,—সুতরাং আমাকে বেশী পীড়াপীড়ি কর্‌তে হল না। সেই মহিলাটির মোটর গাড়িতে করে, সহর ছাড়িয়ে রবার গাছের আবাদের ভিতর দিয়ে, উঁচু নীচু পাহাড়ের পথে অনেকটা দূর ঘুরে এলুম। জমি ঢেউ-খেলানো, ঘাস ঘন সবুজ, রাস্তার পাশ দিয়ে একটি ঘোলা জলের স্রোত কল্‌কল্‌ করে এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে, জলের মাঝে মাঝে আঁটিবাঁধা কাটা বেত ভিজ্‌চে। রাস্তার দুই ধারে সব বাগানবাড়ী। পথে ঘাটে চীনেই বেশী—এখানকার সকল কাজেই তারা আছে।

গাড়ি সহরের মধ্যে যখন এল, মহিলাটি তাঁর জাপানী জিনিষের দোকানে আমাকে নিয়ে গেলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেচে, মনে মনে ভাবচি জাহাজে আমাদের সন্ধ্যাবেলাকার খাবার সময় হয়ে এল; কিন্তু সেখানে সেই শব্দের ঝড়ে বস্তা তোলপাড় কর্‌চে কল্পনা করে, কোন মতেই ফির্‌তে মন লাগছিল না। মহিলাটি একটি ছোট ঘরের মধ্যে বসিয়ে, আমাকে ও আমার সঙ্গী ইংরাজটিকে থালায় ফল সাজিয়ে খেতে অনুরোধ কর্‌লেন। ফল খাওয়া হলে পর তিনি আস্তে আস্তে অনুরোধ কর্‌লেন, যদি আপত্তি না থাকে তিনি আমাদের হোটেলে খাইয়ে আন্‌তে ইচ্ছা করেন। তাঁর এ অনুরোধও আমরা লঙ্ঘন করি নি। রাত্রি প্রায় দশটার সময় তিনি আমাদের জাহাজে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেলেন।

এই রমণীর ইতিহাসে কিছু বিশেষত্ব আছে। এঁর স্বামী জাপানে আইনব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু সে ব্যবসায় যথেষ্ট লাভজনক ছিল না। তাই আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য হওয়া কঠিন হয়ে উঠ্‌ছিল। স্ত্রীই

স্বামীকে প্রস্তাব করলেন, এস আমরা একটা কিছু ব্যবসা করি। স্বামী প্রথমে তাতে নারাজ ছিলেন। তিনি বল্লেন, আমাদের বংশে ব্যবসা ত কেউ করে নি, ওটা আমাদের পক্ষে একটা হীন কাজ। শেষকালে স্ত্রীর অনুরোধে রাজি হয়ে, জাপান থেকে দুজনে মিলে সিঙাপুরে এসে দোকান খুল্লেন। সে আজ আঠারো বৎসর হল। আত্মীয় বন্ধু সকলেই একবাক্যে বল্লে, এইবার এরা মজ্‌ল। এই স্ত্রীলোকটির পরিশ্রমে, নৈপুণ্যে এবং লোকের সঙ্গে ব্যবহার-কুশলতায়, ক্রমশই ব্যবসায়ের উন্নতি হতে লাগ্‌ল। গত বৎসরে এঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েচে—এখন এঁকে একলাই সমস্ত কাজ চালাতে হচ্চে।

বস্তুত এই ব্যবসাটি এই স্ত্রীলোকেরই নিজের হাতে তৈরি। আমি যে কথা বল্‌ছিলুম, এই ব্যবসায়ে তারই প্রমাণ দেখ্‌তে পাই। মানুষের মন বোঝা এবং মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধ রক্ষা করা স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ—এই মেয়েটির মধ্যে আমরাই তার পরিচয় পেয়েছি। তারপরে কর্ম্মকুশলতা মেয়েদের স্বাভাবিক। পুরুষ স্বভাবত কুঁড়ে, দায়ে পড়ে তাদের কাজ কর্‌তে হয়। মেয়েদের মধ্যে একটা প্রাণের প্রাচুর্য্য আছে, যার স্বাভাবিক বিকাশ হচ্চে কর্ম্মপরতা। কর্ম্মের সমস্ত খুঁটিনাটি যে কেবল ওরা সহ্য কর্‌তে পারে, তা নয়—তাতে ওরা আনন্দ পায়। তা ছাড়া দেনাপাওনা সম্বন্ধে ওরা সাবধানী। এই জন্যে, যে সব কাজে দৈহিক বা মানসিক সাহসিকতার দরকার হয় না, সে সব কাজ মেয়েরা পুরুষের চেয়ে ঢের ভাল করে কর্‌তে পারে, এই আমার বিশ্বাস। স্বামী যেখানে সংসার ছারখার করেচে, সেখানে স্বামীর অবর্ত্তমানে স্ত্রীর হাতে সংসার পড়ে সমস্ত সুশৃঙ্খলায় রক্ষা পেয়েচে, আমাদের দেশে তার বিস্তর প্রমাণ আছে; শুনেছি ফ্রান্সের মেয়েরাও

ব্যবসায়ে আপনাদের কর্ম্মনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েচে। যে সব কাজে উদ্ভাবনার দরকার নেই, যে সব কাজে পটুতা, পরিশ্রম, ও লোকের সঙ্গে ব্যবহারই সব চেয়ে দরকার, সে সব কাজ মেয়েদের।

৩রা জ্যৈষ্ঠ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়লে। ঠিক এই ছাড়বার সময় একটি বিড়াল জলের মধ্যে পড়ে' গেল। তখন সমস্ত ব্যস্ততা ঘুচে গিয়ে, ঐ বিড়ালকে বাঁচানোই প্রধান কাজ হয়ে উঠ্‌ল। নানা উপায়ে নানা কৌশলে তাকে জল থেকে উঠিয়ে তবে জাহাজ ছাড়লে। এতে জাহাজ ছাড়ার নির্দ্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেল। এইটিতে আমাকে বড় আনন্দ দিয়েচে।

তোসা-মারু
চীন সমুদ্র
৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।

——:o:——

(৩)

সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের দিনগুলি ভেসে চলেচে, পালের নৌকার মত। সে নৌকা কোনো ঘাটে যাবার নৌকা নয়, তাতে কোনো বোঝাই নেই। কেবলমাত্র ঢেউয়ের সঙ্গে, বাতাসের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে কোলাকুলি কর্‌তে তারা বেরিয়েচে। মানুষের লোকালয় মানুষের বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই লোকালয়ের দাবী মিটিয়ে সময় পাওয়া যায় না, বিশ্বের নিমন্ত্রণ আর রাখ্‌তেই পারিনে। চাঁদ যেমন তার একটা মুখ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়ে রেখেচে, তার আর একটা মুখ অন্ধকার—তেমনি লোকালয়ের প্রচণ্ড টানে মানুষের সেই দিকের পিঠটাতেই চেতনার সমস্ত আলো খেলচে, অন্য একটা দিক আমরা ভুলেই গেচি; বিশ্ব যে মানুষের কতখানি, সে আমাদের খেয়ালেই আসে না।

সত্যকে যেদিকে ভুলি, কেবল যে সেই দিকেই লোকসান, তা নয়—সে লোকসান সকল দিকেই। বিশ্বকে মানুষ যে পরিমাণে যতখানি বাদ দিয়ে চলে, তার লোকালয়ের তাপ এবং কলুষ সেই পরিমাণে ততখানি বেড়ে ওঠে। সেই জন্যেই ক্ষণে ক্ষণে মানুষের একেবারে উল্‌টোদিকে টান আসে। সে বলে "বৈরাগ্যমেবাভয়ং"—বৈরাগ্যের কোনো বালাই নেই। সে বলে' বসে, সংসার কারাগার; মুক্তি খুঁজতে শান্তি খুঁজতে সে বনে, পর্ব্বতে, সমুদ্রতীরে ছুটে যায়। মানুষ সংসারের সঙ্গে বিশ্বের বিচ্ছেদ ঘটিয়েচে বলেই, বড় করে' প্রাণের নিঃশ্বাস নেবার জন্যে তাকে সংসার ছেড়ে বিশ্বের দিকে যেতে হয়। এত বড় অদ্ভুত কথা তাই মানুষকে বল্‌তে হয়েচে,—মানুষের মুক্তির রাস্তা মানুষের কাছ থেকে দূরে।

লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি, অবকাশ জিনিষটাকে তখন ডরাই। কেননা লোকালয় জিনিষটা একটা নিরেট জিনিষ, তার মধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকটাকে কোনো মতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাস পাশা চাই, রাজা-উজির মারা চাই—নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে আমরা বাদ দিতে চাই।

কিন্তু অবকাশ হচ্চে বিরাটের সিংহাসন। অসীম অবকাশের মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠা। বৃহৎ যেখানে আছে, অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়,—একেবারে পরিপূর্ণ। সংসারের মধ্যে যেখানে বৃহৎকে আমরা রাখিনি, সেখানে অবকাশ এমন ফাঁকা; বিশ্বে যেখানে বৃহৎ বিরাজমান, সেখানে অবকাশ এমন গভীরভাবে মনোহর। গায়ে কাপড় না থাক্‌লে মানুষের যেমন লজ্জা, সংসারে অবকাশ আমাদের তেমনি লজ্জা দেয়, কেননা, ওটা কিনা শূন্য, তাই ওকে আমরা বলি জড়তা, আলস্য ;—কিন্তু সত্যকার সন্ন্যাসীর পক্ষে অবকাশে লজ্জা নেই, কেননা তার অবকাশ পূর্ণতা,—সেখানে উলঙ্গতা নেই।

এ কেমনতর—যেমন প্রবন্ধ এবং গান। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে, সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে, সেখানে সুরে ভরাট। বস্তুত সুর যতই বৃহৎ হয়, ততই কথার অবকাশ বেশী থাকা চাই। গায়কের সার্থকতা কথার ফাঁকে, লেখকের সার্থকতা কথার ঝাঁকে!

আমরা লোকালয়ের মানুষ এই যে জাহাজে করে চলচি, এইবার আমরা কিছুদিনের জন্যে বিশ্বের দিকে মুখ ফেরাতে পেরেচি। সৃষ্টির যে-পিঠে অনেকের ঠেলাঠেলি ভিড়, সেদিক থেকে যে-পিঠে একের

আসন, সেদিকে এসেচি। দেখতে পাচ্চি, এই যে নীল আকাশ এবং নীল সমুদ্রের বিপুল অবকাশ,—এ যেন অমৃতের পূর্ণ ঘট।

অমৃত,—সে যে শুভ্র আলোর মত পরিপূর্ণ এক। শুভ্র আলোয় বহুবর্ণচ্ছটা একে মিলেচে, অমৃতরসে তেমনি বহুরস একে নিবিড়। জগতে এই এক আলো যেমন নানাবর্ণে বিচিত্র, সংসারে তেমনি এই এক রসই নানা রসে বিভক্ত। এই জন্যে, অনেককে সত্য করে জান্‌তে হলে, সেই এককে সঙ্গে সঙ্গে জান্‌তে হয়। গাছ থেকে যে ডাল কাটা হয়েচে, সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয়, গাছে যে ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক, তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা,—একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক, সেই ত মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

সংসারে একদিকে আবশ্যকের ভিড়, অন্যদিকে অনাবশ্যকের। আবশ্যকের দায় আমাদের বহন কর্‌তেই হবে, তাতে আপত্তি কর্‌লে চল্‌বে না। যেমন ঘরে থাক্‌তে হলে দেয়াল না হলে চলে না,—এও তেমনি। কিন্তু সবটাই ত দেয়াল নয়। অন্তত খানিকটা করে জানলা থাকে—সেই ফাঁক দিয়ে আমরা আকাশের সঙ্গে আত্মীয়তা রক্ষা করি। কিন্তু সংসারে দেখ্‌তে পাই, লোকে ঐ জানলাটুকু সইতে পারে না। ঐ ফাঁকটুকু ভরিয়ে দেবার জন্যে যতরকম সাংসারিক অনাবশ্যকের সৃষ্টি। ঐ জানলাটার উপর বাজে কাজ, বাজে চিঠি, বাজে সভা, বাজে বক্তৃতা, বাজে হাঁস্‌ফাঁস্ মেরে দিয়ে, দশে মিলে ঐ ফাঁকটাকে একেবারে বুজিয়ে ফেলা হয়। নারকেলের ছিব্‌ড়ের মত, এই অনাবশ্যকের পরিমাণটাই বেশী। ঘরে, বাইরে, ধর্ম্মে, কর্ম্মে,

আমোদে, আহ্লাদে, সকল বিষয়েই এরই অধিকার সব চেয়ে বড়—এর কাজই হচ্চে ফাঁক বুজিয়ে বেড়ানো।

কিন্তু কথা ছিল ফাঁক বোজাব না, কেননা ফাঁকের ভিতর দিয়ে ছাড়া পূর্ণকে পাওয়া যায় না। ফাঁকের ভিতর দিয়েই আলো আসে, হাওয়া আসে। কিন্তু আলো হাওয়া আকাশ যে মানুষের তৈরি জিনিষ নয়, তাই লোকালয় পারৎপক্ষে তাদের জন্যে জায়গা রাখতে চায় না—তাই আবশ্যক বাদে যেটুকু নিরালা থাকে, সেটুকু অনাবশ্যক দিয়ে ঠেসে ভর্ত্তি করে দেয়। এম্‌নি করে মানুষ আপনার দিন-গুলোকে ত নিরেট করে তুলেইচে, রাত্রিটাকেও যতখানি পারে ভরাট করে দেয়। ঠিক যেন কল্‌কাতার ম্যুনিসিপালিটির আইন। যেখানে যত পুকুর আছে বুজিয়ে ফেল্‌তে হবে,—রাবিশ দিয়ে হোক্, যেমন করে হোক্। এমন কি, গঙ্গাকেও যতখানি পারা যায় পুল-চাপা, জেটি-চাপা, জাহাজ-চাপা দিয়ে গলা টিপে মারবার চেষ্টা। ছেলেবেলাকার কল্‌কাতা মনে পড়ে, ঐ পুকুরগুলোই ছিল আকাশের স্যাঙাৎ, সহরের মধ্যে ঐখানটাতে দ্যুলোক এই ভূলোকে একটুখানি পা ফেলবার জায়গা পেত, ঐখানেই আকাশের আলোকের আতিথ্য কর্‌বার জন্য পৃথিবী আপন জলের আসনগুলি পেতে রেখেছিল।

আবশ্যকের একটা সুবিধা এই যে, তার একটা সীমা আছে। সে সম্পূর্ণ বেতালা হতে পারে না, সে দশটা-চারটেকে স্বীকার করে, তার পার্ব্বণের ছুটি আছে, সে রবিবারকে মানে, পারৎপক্ষে রাত্রিকে সে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইট্ দিয়ে একেবারে হেসে উড়িয়ে দিতে চায় না। কেননা, সে যেটুকু সময় নেয়, আয়ু দিয়ে, অর্থ দিয়ে তার দাম চুকিয়ে দিতে হয়—সহজে কেউ তার অপব্যয় কর্‌তে পারে না। কিন্তু

অনাবশ্যকের তালমানের বোধ নেই, সে সময়কে উড়িয়ে দেয়, অসময়কে টিঁক্‌তে দেয় না। সে সদর রাস্তা দিয়ে ঢোকে, খিড়কির রাস্তা দিয়ে ঢোকে, আবার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়ে। সে কাজের সময় দরজায় ঘা মারে, ছুটির সময় হুড়্‌মুড়্‌ করে আসে, রাত্রে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তার কাজ নেই বলেই তার ব্যস্ততা আরো বেশী।

আবশ্যক কাজের পরিমাণ আছে, অনাবশ্যক কাজের পরিমাণ নেই—এইজন্যে অপরিমেয়ের আসনটি ঐ লক্ষ্মীছাড়াই জুড়ে বসে, ওকে ঠেলে ওঠানো দায় হয়। তখনই মনে হয় দেশ ছেড়ে পালাই, সন্ন্যাসী হয়ে বেরই, সংসারে আর টেঁকা যায় না!

যাক্‌, যেমনি বেরিয়ে পড়েচি, অমনি বুঝতে পেরেচি বিরাট বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যে আনন্দের সম্বন্ধ, সেটাকে দিনরাত অস্বীকার করে কোনো বাহাদুরি নেই। এই যে ঠেলাঠেলি ঠেসাঠেসি নেই, অথচ সমস্ত কানায় কানায় ভরা, এইখানকার দর্পণটিতে যেন নিজের মুখের ছায়া দেখ্‌তে পেলুম। "আমি আছি" এই কথাটা গলির মধ্যে, ঘর-বাড়ীর মধ্যে ভারি ভেঙে চুরে বিকৃত হয়ে দেখা দেয়। এই কথাটাকে এই সমুদ্রের উপর, আকাশের উপর সম্পূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌লে তবে তার মানে বুঝতে পারি—তখন আবশ্যককে ছাড়িয়ে, অনাবশ্যককে পেরিয়ে, আনন্দলোকে তার অভ্যর্থনা দেখ্‌তে পাই,—তখন স্পষ্ট করে বুঝি, ঋষি কেন মানুষদের অমৃতস্য পুত্রা বলে আহ্বান করেছিলেন।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

গ্রাম্য-সাহিত্য-সভা।

——ঃ০ঃ——

একদা গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামের জমীদার দত্ত বাবুদের একমাত্র কুলতিলক, বি. এ. উপাধিধারী বিপিনবিহারী যখন স্বগ্রামে একটি সাহিত্যালোচনার সভা স্থাপন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া আমাকে তলব করিলেন, তখন সে তলব অমান্য করিতে পারিলাম না, কারণ বিপিন আমার সহপাঠী এবং আমি তাহার চিরানুগত বন্ধু। জ্যৈষ্ঠের নিঃঝুম দুপুরবেলায়, সতরঞ্চ-পাতা তক্তপোষের উপর, খাতাপত্র মাথায় দিয়া, হাতপাখার সাহায্যে ঘুমাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম; কিন্তু উঠিতে হইল এবং মনে ভয় হইতে লাগিল। গ্রামে সভার নাম শুনিলেই আমার আতঙ্ক হইত। কারণ, গ্রামে কোন "ক্লাব" হইলেই আমাকে তাহার সেক্রেটারী হইতে হইত; তাহার কারণ এ নয় যে, আমি অপর সকলের অপেক্ষা কার্য্যক্ষম ছিলাম। আসল কথা, সভার প্রথম অধিবেশনে, সহানুভূতি প্রকাশের বেগটা কমিয়া আসিলে সকলেই যখন উচ্চৈঃস্বরে নিজেদের অনুপযুক্ততা প্রকাশ করিতেন, তখন আমার মৃদু কণ্ঠের আপত্তি কেহই শুনিতে পাইতেন না, কাজেই এই অযাচিত সম্মান আমার শিরে পড়িত। তবে সুবিধা ছিল এই যে, দ্বিতীয় অধিবেশনের অভাবে আমার সম্মানটা বজায় থাকিয়া যাইত এবং অযোগ্যতা প্রকাশ পাইত না।

গিয়া দেখিলাম বিপিনের বসিবার ঘরে গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বসিয়া আছেন; গ্রামের স্কুলের হেডমাষ্টার মহাশয়, পুরোহিত

ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতি গম্ভীরভাবে সভ্যদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন দেখিয়া মনটা বিশেষ উৎফুল্ল হইল না। ভাবিলাম এবার ফাঁকি নয়, এবার সত্যিকার সভা। সশঙ্কিত চিত্তে চৌকীর একপাশে গিয়া বসিলাম। যাঁহাদের আসিবার কথা ছিল তাঁহারা সকলে যখন আসিলেন, তখন হেডমাষ্টার মহাশয় দণ্ডায়মান হইলেন। আমরাও তাঁহার কাছে পড়িয়াছি—এবং এখন পর্য্যন্ত যে ভয় কাটাইয়া উঠিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নাম ছিল শ্রীরসিক লাল চক্রবর্ত্তী, কিন্তু পিতামাতা যে গুণের দোহাই দিয়া পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। তিনি তাঁহার গলদেশে লম্বমান চাদর ও শাদা কাপড়ের ঘেরাটোপ-দেওয়া ছাতাটি চেয়ারের উপর সযত্নে রাখিয়া, ওজস্বিনী ভাষায় আমাদিগকে সম্বোধন করিয়া যে বক্তৃতা দিলেন, তাহার সারাংশ নীচে দিলাম। তিনি কহিলেন—"আজ আমরা যে মহৎ উদ্দেশ্যে মিলিত হইয়াছি, আশা করি আপনারা তাহা জানেন; পৃথিবীতে যতপ্রকার আনন্দ আছে— শুধু আনন্দ নয়, বিশুদ্ধ আনন্দ আছে—তাহার মধ্যে সাহিত্যপাঠ অন্যতম"। চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেশহিতৈষী ছিলেন, তাই স্বতঃই দেশের কথা উঠিল; তিনি বলিলেন, দেশের অবস্থা শোচনীয়। প্রাচীন কালের সরলতা নম্রতা ইত্যাদির সহিত তুলনা করিয়া, আধুনিক কালের ছেলেদের অশিষ্ট ব্যবহারের অতিশয় নিন্দা করিলেন। পূর্ব্বে নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত উচ্চশ্রেণীর লোক-দিগের কিরূপ সৌহৃদ্য ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাদের গ্রামে (হেডমাষ্টার মহাশয় ভিন্নগ্রামের লোক) একটি কৈবর্ত্ত আছেন, এবং হেডমাষ্টার মহাশয় তাঁহাকে (কৈবর্ত্তকে) দাদা বলেন, এবং সমাগত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, জমীদারদের ম্যানেজার

সরকার মহাশয় এবং আরো দুই একটি ভদ্রলোক ভিন্ন, এমন কেহ নাই যাঁহাকে তিনি প্রাগুক্ত কৈবর্ত্ত মহাশয়ের অপেক্ষা বেশী শ্রদ্ধা করেন। দেশের দুরবস্থা হইতে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আসিয়া পড়িল। তিনি কহিলেন, প্রকৃত শিক্ষা যে কি মূল্যবান জিনিষ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পশুপক্ষীর সহিত মানুষের যদি কোন প্রভেদ থাকে, তবে তাহা এই শিক্ষার প্রভেদ। এইরূপ দুই ঘণ্টাকালব্যাপী বক্তৃতার পর, তিনি শ্রান্ত হইয়া, মুখ দাড়ী এবং গোঁফ মুছিতে মুছিতে বসিয়া পড়িলেন। আমরা এতক্ষণ অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া ছিলাম—বড় হইয়া এরূপ ভৎর্সনা বোধহয় আর কখন শুনি নাই!

তারপর উঠিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়। তিনি কহিলেন যে, হেড-মাষ্টার মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ও অমায়িক ব্যক্তি অতি বিরল, এমন কি দেখা যায় না বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না,—অতএব তাঁহার সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় সম্পূর্ণ একমত, এবং তিনি এই আশা করেন যে সকলেই যেন এই বক্তৃতার সারমর্ম্ম মনে রাখেন, ও সেই অনুসারে চলেন। তারপর হেডমাষ্টার মহাশয় বানিজ্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমর্থন করিলেন, ও কহিলেন যে আমাদের প্রাচীন গ্রন্থেই আছে—"বানিজ্যে বসবৎ লক্ষ্মী তদ্দর্দ্ধে কৃষিকর্ম্ম"। সে যাহা হউক, এই সভার সহিত তাঁহার বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে। তৎপরে ইহাও বলিলেন যে, শ্রীমান বিপিন উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান—তাহার যেমন স্বভাব, তেমনি শিক্ষা; তা নাই বা হবে কেন, যে পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সে পরিবারের মত ইত্যাদি। অবশেষে শ্রীমান বিপিন দীর্ঘজীবী হউক, এই আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তারপর দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় ইংরাজীতে বক্তৃতা দিলেন। আমরা তাঁহার কাছেও পড়িয়াছিলাম। স্কুলে পড়িবার কালে শুনিতাম যে, তিনি বি. এ. পাশ নন, কিন্তু ইংরাজীতে তাঁহার অসামান্য অধিকার; যেবার তিনি বি. এ. ফেল্ করিলেন, সেবার নাকি তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীতে তৃতীয় হইয়াছিলেন, অন্য একটা নগণ্য বিষয়ে দুই মার্ক কম পড়াতে পাশ করিতে পারেন নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাপ্রণালীর তিনি অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন। যদিচ বাহিরে হেডমাষ্টার মহাশয়কে মানিয়া চলিতে হইত, কিন্তু অন্তরে তিনি হেডমাষ্টার মহাশয়কে যে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন না, তাহা আমরা স্কুলে পাঠাবস্থায় বেশ বুঝিতাম। তিনি আমাদিগকে এণ্ট্রান্স ক্লাসে ইতিহাস পড়াইতেন, এবং সেই সময়ে মাঝে মাঝে কোন ইংরাজী শব্দের উচ্চারণ জিজ্ঞাসা করিতেন, ও উচ্চারণ ঠিক না হইলে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিতেন—"এ বুঝি তোমরা হেডমাষ্টার মহাশয়ের কাছে শিখিয়াছ"—তারপর একথা ওকথার পর বলিতেন "হেডমাষ্টার মহাশয় অঙ্কশাস্ত্রে বি. এ, তা বুঝি তোমরা জাননা"?—আমরা তাহা বিলক্ষণ জানিতাম, কারণ এ কথা দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের কাছেই বহুবার শুনিয়াছি। এক এক দিন কথা উঠিত কেমন করিয়া তিনি ইংরাজী শিখিয়াছিলেন—তিনি বলিতেন, "দেখ, তোমরা Dictionary consult করিও, তাহা না হইলে কিছুতেই ইংরাজী শিখিতে পারিবেনা, আর কতকগুলি idiom মনে রাখিতে চেষ্টা করিও"। তাঁহাকে লইয়া আমাদের ক্লাসে দুই দল হইয়াছিল,—কেহ তাঁহার পক্ষে, কেহ হেডমাষ্টার মহাশয়ের পক্ষে।—তাঁহার পক্ষীয় দল তাঁহার ইংরাজী বিদ্যার পরিচয় দিবার সময়ে সগর্ব্বে কহিত—এই দেখ, হেডমাষ্টার এবং আর সবাই Bengalee কাগজ পড়ে,

কিন্তু উনি কি পড়েন জান?—Statesman। ইহার পরে আর কথা চলিত না।

যাহা হউক, দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হইবে, এমন সময়ে আমার পাশ হইতে একটি অপরিচিত লোক দুটি কথা বলিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে আমি প্রথমে লক্ষ্য করি নাই, এখন দেখিলাম ভদ্রলোকটি শীর্ণকায় ও বেঁটে, কিন্তু তাঁহার গোঁফ ও চাপদাড়ির অনাবশ্যক প্রাচুর্য্য আছে,—একেবারে চোখের নীচে হইতে গলার নিম্নতম সীমা পর্য্যন্ত শ্মশ্রুতে আবৃত। গায়ে একটি তিলেপড়া সার্ট, এবং হাতের বোতাম না থাকাতে সুতা দিয়া আস্তিন সেলাই-করা। লোকটি কালো, এবং তাঁহার বয়স পঁয়ত্রিশ হইতে চল্লিশের মধ্যে। তিনি হেডমাষ্টার মহাশয়ের কথার প্রতিবাদ করিলেন, আধুনিককালের অনেক সুখ্যাতি করিলেন, এবং বিজ্ঞানের জয় ঘোষণা করিলেন; তবে "অবশ্য opinion সকলের এক নয়—হেডমাষ্টার মহাশয়ের যাহা opinion তাহা সকলে না মানিতে পারে, এবং আমার opinion এ—আশা করি হেডমাষ্টার মহাশয় রাগ করিবেন না—কিন্তু আমার opinion এ হেডমাষ্টার মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা ভুল—কারণ আমি সকল বিষয়ে বর্ত্তমানের ও বিজ্ঞানের পক্ষে"। আমরা এই অসমসাহসিক ব্যক্তিটির পরিচয় পাইলাম এই যে, তিনি আমাদের নূতন পোষ্টমাষ্টার—নাম অঘোর বাবু, নিবাস শ্রীবিক্রমপুর। হেডমাষ্টার মহাশয় কহিলেন যে, যদি তাঁহাকে দুই মিনিট সময় দেওয়া হয়, তবে তিনি পোষ্টমাষ্টার বাবুর উত্তরে দুটি কথা বলেন;—কিন্তু সময় ছিলনা। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল, এবং আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল,—আমাকেই সেক্রেটারী হইতে হইল।

(২)

সভার সৃষ্টি হইল; ও সেই সঙ্গে গ্রামের সকল বুদ্ধিমান ব্যক্তি আগেই অনেক কথা বলিয়া রাখিলেন। বলিলেন, দেখিও এ সভা টিঁকিবে না,—অথবা টিঁকিলেও, যেরূপ হইবার কথা সেরূপ কিছুতেই হইবে না। এর আগেও ত অনেক সভা হইয়াছিল, কিন্তু টিকিল কই? এও তাই হইবে, ইত্যাদি। প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বেই সভা লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—শুনিলাম যে সকলে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না। রামহরি চক্রবর্ত্তীর ভ্রাতা ভজহরি, গ্রামের থিয়েটার-পার্টিতে ফ্লুট বাজাইত। সে আসিয়া আমাকে স্পষ্টই বলিয়া গেল—এ সভায় অনেক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক আসিবেন না, কারণ তাঁহাদের ব্রাহ্মণদ্বারা নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। কাগজে ব্রাহ্মণ মহাশয়দিগের নাম লিখিয়া, নিম্নজাতির লোকের হাত দিয়া নিমন্ত্রণচিঠি পাঠান হইয়াছে, এবং সে চিঠিতে 'শ্রীচরণকমলেষু' না লিখিয়া 'মহাশয়' লেখা হইয়াছে। এরূপ নিমন্ত্রণ পূর্ব্বে কখনও তাঁরা গ্রহণ করেন নাই, আজও করিবেন না। আরও বলিল যে, একথা সে কাহাকেও বলিতে ভয় পায় না,—সত্যি কথা বলিতে ভয় আবার কাকে? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভাইপো গুপে, হরেকৃষ্ণ সাহার দোকানে হিসাব লিখিত। সে কহিল— সে যদি এ সভায় যায়, তবে সে ব্রাহ্মণের পুত্র নয়। কারণ যে সভায় কৈবর্ত্তের সহিত তুলনা করিয়া ব্রাহ্মণের অপমান করা হইয়াছে, সে সভায় যে যায় যাক, শ্রী রাম-কুমার ভট্টাচার্য্য যাইবে না। শুনিলাম রামকুমার তাহারই নাম, গুপেটা ডাকনাম মাত্র।

এত বাধা, এত বিপত্তি সত্ত্বেও, সভার দ্বিতীয় অধিবেশন হইল। লোকসংখ্যাও মন্দ হইল না। বাবুদের বাড়ীতে সভা,—এ অবস্থায়

না আসিলে তাঁহারা কি মনে করিবেন, তাই সকলেই আসিয়াছিলেন—এমন কি ভজহরি এবং গুপেও আসিয়াছিল। সভাগৃহে ঢুকিয়া গায়ের রক্ত হিম হইয়া গেল—বিপিনদের খাতাঞ্চী, জমানবীশ হইতে আরম্ভ করিয়া মুহুরীরা পর্যাস্ত, সকলেই উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা শেষ পর্য্যন্ত সমান অটলভাবে বসিয়া রহিলেন,—ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন। প্রথমে গান হইল "কবে নেবে হে ভব কিনারে"। গানের ভাষা এবং সুর হৃদয়ে গভীর নৈরাশ্য সঞ্চার করিল। হেড-মাষ্টার মহাশয় 'সংযম' সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। গ্রামের হরিসভার সভাপতি গৌরীবাবু কৃষ্ণের কথা কহিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন। ক্রন্দন এবং গাম্ভীর্য্যে সভার আবহাওয়া থৈ থৈ করিতেছে; এমন সময় বাহিরের বারান্দায় সভাসীন ভদ্রলোকদিগের যে-সকল নানাবিধ পাদুকা জড় হইয়াছিল, তাহাতে হুঁচোট খাইয়া গুপে সশব্দে পড়িয়া গেল, ও আমরা সেই সুযোগে খুব খানিকটা হাসিয়া লইলাম! হেডমাষ্টার মহাশয় আমাদের বলিলেন যে, কেহ আছাড় খাইলে হাসা গর্হিত।

পোষ্টমাষ্টার অঘোর বাবুর কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যদিও সভার প্রথম অধিবেশনের পূর্ব্বে আমাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয় হয় নাই, তবু ছুটিতে বাড়ী যাইয়াই তাঁহার যশ আমরা শুনিতে পাইয়া-ছিলাম। লোকটি পৃথিবীর অধিকাংশ বিষয়ে মতামত স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। রুষ-জাপান যুদ্ধের ফলাফল হইতে আরম্ভ করিয়া বিজ্ঞানের প্রভাব,—এর মধ্যে এমন কিছু ছিল না যে বিষয়ে তিনি নিজ অভ্রান্ত মতামত খুব গম্ভীরভাবে এবং সজোরে প্রকাশ না করিতেন। তাঁহার এসকল মতামত কোনপ্রকার শিক্ষার প্রসাদে জন্মগ্রহণ করে নাই। তিনি এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন, এবং

প্রমোশন না পাইয়া village-পোষ্টমাস্টার হইয়াছিলেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর উপর তাঁহার অত্যন্ত অবজ্ঞা ছিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—আজকাল যাহারা পাশ করে তাহারা বিশেষ কিছু শেখে না, আমাদের সময়ে সকল বিষয়ে একটা স্বাধীন চিন্তা ছিল—আর কেবল পড়লেই কি জানা যায়?—পরীক্ষা পাশ সম্বন্ধে তাঁহার মত শুনিলে পাশকরা লোকেরা চটিবেন।

(৩)

অঘোর বাবুর এই আত্মনির্ভরতার বলে, সভার প্রায় সকল লোকই অঘোর বাবুকে একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক বলিয়া শ্রদ্ধা করিত, এবং তাঁহার মতের সমর্থন করিত। আমরা মনে মনে যাহাই ভাবি না কেন, জনসাধারণের এই মতের প্রতি বিপিনও প্রকাশ্যে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে সাহস পাইত না, কারণ এসকল বিষয় শেষ বিচারের ভার জনসাধারণেরই হাতে। স্কুলের ডিবেটিং সোসাইটীর অধিবেশনে কবিতা পাঠ করাতে, এবং গ্রামের একটী বিবাহে স্বরচিত কবিতা ছাপাইয়া প্রকাশ করাতে, অঘোর বাবুর প্রতিপত্তি গ্রামের লোকের কাছে বাড়িয়া গিয়াছিল। গ্রামের যুবকেরা হেডমাস্টার মহাশয়কে গোপনে উপহাস করিত, বিপিন কেবল উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য আলোচনা করিত বলিয়া তাহারা বিপিনের কথা বুঝিত না, এবং ভাবিত ও একটা বড়মানুষী খেয়াল। কিন্তু অঘোর বাবু যাহা পড়িতেন বা যাহা বলিতেন, তাহা তাহাদের বুঝিতে কষ্ট হইত না,—কাজেই অঘোর বাবুকেই তাহারা তাহাদের নেতৃত্বে বরণ করিয়া লইয়াছিল। অঘোর বাবু কিন্তু আমাদের কাছে স্বীয় দলবলের সাহিত্য-বোধের অতিশয় নিন্দা করিতেন।

হেডমাষ্টার মহাশয় যখন সংযম, বিদ্যা, সরলতা, Plain living and high thinking প্রভৃতি বক্তৃতা দিবার বিষয় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন, তখন বিপিন প্রস্তাব করিলেন যে, এবার বঙ্কিমের কোন উপন্যাস সভায় পড়িয়া শোনান হউক। হেড্‌মাষ্টার মহাশয় তাহার মত অনুমোদন করিলেন না, কহিলেন—"এইত বেশ হচ্ছিল, সভায় আবার নাটক নভেল পড়া কেন? এমন কিছু পড় যাতে কিছু শেখা যায়"। রস-সাহিত্যের উপর এরূপ অন্যায় আক্রমণে অঘোর বাবু উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিলেন যে, নাটক নভেল পড়িয়া 'ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের পরাজয়' বোঝা যায়, এবং কহিলেন "বলেন কি, রসিক বাবু, এমন এক একটা বই আছে, যা পড়লে মনে যে কি ভাব হয় আপনাকে বোঝাতে পারি না। আসল কথা এই যে, ওসব বোঝবার ক্ষমতা, ঈশ্বর সবলকে দেন নি—আচ্ছা এবার না হয় বিপিন বাবু কি পড়তে চাচ্ছেন সেটা থাক, আমি একটা বই পড়ি, দেখুন কেমন লাগে;— সেই জায়গাটা, যে জায়গায় ননী নদীতে ঝাঁপ দিল,—উঃ! সে আর বলতে পারি নে, পড়লে বুঝতে পারবেন"। হেডমাষ্টার মহাশয় তর্ক করিতে পারিতেন না। তিনি হয় বক্তৃতা করিতেন, নাহয় চুপ করিয়া থাকিতেন। আজও চুপ করিয়া গেলেন। সে সভায় কিছুই ঠিক হইল না। পরদিন সভা। সকালবেলা আমি বিপিনের ওখানে বসিয়া আছি। সেই তিলে-পরা সার্টটী গায়ে দিয়া, সমগ্র কোঁচাটা উঠাইয়া ডান কাঁধের উপর ফেলিয়া, হাসিতে হাসিতে অঘোর বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই অনাবশ্যক হাসির হেতু বিপিন বা আমি কেহই বুঝিতে পারিলাম না। অঘোর বাবু আসিয়া, কোন একটী অজ্ঞাত লেখকের 'রূপসী কলঙ্কিনী' নামক উপন্যাস বাহির

করিলেন, এবং অত্যন্ত উৎসাহের সহিত বলিলেন "এই বইটা পড়ব ঠিক করেছি।" আমি আপত্তি করিয়া বলিলাম "কই কমিটিতে ত এ কথা স্থির হয় নাই।" বিপিন বঙ্কিম পড়া হইল না বলিয়া বিরক্ত হইয়াছিল, সে গম্ভীরভাবে কহিল "এ সব বাজে নভেল পড়ার চেয়ে সভা উঠিয়ে দেওয়া ভাল"। সেদিন বিপিন ও অঘোর বাবুতে যে কথোপকথন হইল, তাহা ঠিক তর্ক বলা চলেনা, কারণ বিপিন বেশী কথা বলে নাই;— কিন্তু যাহা বলিয়াছিল তাহা অতি কড়াভাবে। আর অঘোর বাবু বলিয়াছিলেন অনেক কথা, কিন্তু অতি বিনীত ও মিষ্ট ভাবে। যাহাই হউক, এ তর্কে অঘোর বাবুরই জয় হইয়াছিল। তিনি চলিয়া গেলে বিপিনকে আমি এই কথা বলিয়াছিলাম বলিয়া বিপিন কহিয়াছিল "তুমিও অতি নির্ব্বোধ"। আমি যদি পাণ্টা জবাব দিতাম, তবে সেটা কি ভাল হইত?—কিন্তু সে কথা যা'ক। সত্যের খাতিরে একথা বলিতে আমি বাধ্য যে, তর্কপ্রসঙ্গে অঘোর বাবু যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, বিপিন তাহার খণ্ডন করিতে পারে নাই। অঘোর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই বইখানি কি আপনি পড়িয়াছেন?" বিপিন উত্তর করিল "পড়ি নাই, এবং পড়িতেও চাহি না"। অঘোর বাবু কহিলেন "সে বেশ্ কথা, কিন্তু না পড়েই একটা বই সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা কি আপনি ঠিক বিবেচনা করেন? বঙ্কিম বাবুর বই এর চেয়ে ভাল কি মন্দ সে কথা আমি বল্‌তে চাই না, কিন্তু আপনি কি বল্‌তে চান যে, নামী লেখক ব্যতীত অপর কারও লেখার কোনও মূল্য নেই, বড়লোক না হলে কি কেউ বড় লেখক হতে পারে না? আপনি এ বইটা পড়ে দেখুন, তার পরে আপনি যে মত দেবেন তা আমি শুন্‌তে বাধ্য। তা ছাড়া আপনার opinionএ যেটা ভাল,

সেটাই যে ভাল—এতো সবাই মানবে না। রাগ করবেন না বিপিনবাবু, কিন্তু কথাটা সত্য কিনা একটু ভেবে দেখুন। আপনি অবশ্য আমার চেয়ে বিদ্বান, কিন্তু পরীক্ষা পাশ করলেই যে এ সব বোঝা যায়, তা আমার মনে হয় না। তা থাক, আপনি যখন অমত করলেন, তা আমি নাই পড়লুম।” বেচারা বিপিন! এ সব যুক্তি তাহার নিজেরই যুক্তি, ভাগ্যক্রমে আজ নিজের বিরুদ্ধেই সে সব শুনিতে হইল, এবং কোন উত্তর দিতে পারিল না। বিপিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সভা থাক অথবা যাক, “রূপসী কলঙ্কিনী” নামক উপন্যাস পড়িতে দেওয়া হইবে না। অঘোর বাবু যে নিজেই পিছাইয়া গেলেন, তাহাতেও তাহার রাগ গেল না—সে কহিল—“আমি ও বই পড়তে দেব না; আর আপনি এসব পড়াশুনার কি বোঝেন যে, সব কথায় যোগ দিতে আসেন? আপনার লজ্জা করে না? আপনার মত bumptious individual আমি আর দেখি নি।” অঘোর বাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হাসিয়া কহিলেন—“আচ্ছা তা হ'লে আজ আসি।” আমরা কেহই জবাব দিলাম না।

বলা বাহুল্য ইহার পর সাহিত্য-সভা টিঁকিল না। একে গালাগালি, তাহাতে দুর্বোধ ইংরেজী গালাগালি! তখনি গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে, বিপিন অঘোর বাবুকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করিয়াছে। সেই দিন দুপুরে হেডমাস্টার মহাশয়, অঘোর বাবু প্রভৃতি আমার নিকট লিখিয়া পাঠাইলেন যে, এতদিন সভায় আসার দরুণ তাঁহাদের নিজ নিজ কার্য্যের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে তাঁহারা সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। পরম্পর শুনিলাম যে, অঘোর বাবু অপর একটি সভা স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বিপিনের কথা নানা আকারে পল্লবিত হইয়া অঘোর বাবুর দলে প্রচারিত হইত।

শুনিতাম বিপিন নাকি বলিয়াছে যে, দারোয়ান দিয়া প্রকাশ্য পথে অঘোর বাবুকে অপমান করিবে। আমি এসব কথার প্রতিবাদ করিতাম, কিন্তু লোকে বলিত "ওঃ তুমি!—তুমিত চিরকাল বিপিন বাবুর খোষামুদে।" বলা নিষ্প্রয়োজন যে, আমি কোনদিন কাহারও খোষামোদ করি নাই। আবার অঘোর বাবুর কথাও অতিরঞ্জিত হইয়া বিপিনের কানে উঠিত। শুনিলাম অঘোর বাবু নাকি বিপিনের বিরুদ্ধে মানহানির মোকর্দ্দমা আনিবেন। ব্যাপার যখন এরূপ হইয়া উঠিল, তখন বিপিন সভা বন্ধ করিয়া দিল। সে কহিল—"যে গ্রামে মূর্খের সংখ্যা এত অধিক, সে গ্রামে সাহিত্যচর্চ্চা হতে পারে না।" হেডমাষ্টার মহাশয় বলিলেন, সভা থাকিলেই নাটক নভেল পড়া চলিত এবং অনেক লোকের মস্তিষ্ক ভক্ষিত হইত—এ অবস্থায় সভা উঠিয়া যাওয়ায় গ্রামের মঙ্গলই হইয়াছে। দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয় কহিলেন—Put not your trust in princes, said Cromwell। আমি আপত্তি করিলাম, কহিলাম মাষ্টার মহাশয়, Cromwell?—তিনি কহিলেন—হ্যাঁ Cromwell—Cromwellএর নামটাও কি শোন নাই—তোমরা যে কিরকম বি. এ. পাশ-করা, আমরা বুঝিতেই পারি না। অঘোর বাবু কহিলেন—বড় লোক দিয়া পৃথিবীতে কোন কাজ হয় না—সব তাতে কি জমিদারী চাল খাটালে চলে? গ্রামের জনসাধারণ কহিল—কি জানি বাপু, আমরা মূর্খ মানুষ, আমরা অত ভালমন্দ বুঝি না। এবং বিজ্ঞেরা মাথা নাড়িয়া বলিলেন—আমরাত আগেই বলেছিলুম যে, এ সভা টিঁকবে না, দেখতে দেখতে বুড়ো হয়ে গেলাম—দেখতে তো আর কিছুই বাকী নেই!

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়

সোদাহরণ অলঙ্কার।

——:০:——

সবুজপত্রের সম্পাদক মহাশয় কিছুদিন হইতে কাব্যালঙ্কার সম্বন্ধে অনবরত বক্তৃতা করিয়া আসিতেছেন ; কিন্তু সে বক্তৃতায় কেহই বড় একটা কান দেন না।—

ইহার জন্য দায়ী বক্তা, শ্রোতা নন্। প্রথমতঃ, তিনি যে ভাষায় রচনা করেন সে ভাষা সকলের শোনা অভ্যাস থাকিলেও ; আমাদের কাহারও পাঠ করা অভ্যাস নাই। এই অনভ্যাসের ভাষায় পাঠক সমাজের যে চোখ চড়্‌চড়্‌ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তাঁহার ভাষা যে শ্রুতিকটূ, এ কথা অবশ্য সম্পাদক মহাশয় স্বীকার করিবেন না,—কিন্তু তাহা যে দৃষ্টিকটূ, এ কথা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না। যে ভাষা আমরা নিত্য শ্রবণ করি, তাহা লেখনীর মুখ হইতে নির্গত হইলে কেন যে অশ্রাব্য হইয়া উঠে,—অপর পক্ষে যে ভাষা লোকের মুখে শুনিলে আমরা হাস্য সম্বরণ করিতে পারি না, তাহা ছাপার অক্ষরে উঠিলে কেন যে আমাদের ভক্তি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, সে রহস্যের কারণ আবিষ্কার করা আমার সাধ্যের অতীত। শ্রীযুক্ত বিজয় চন্দ্র মজুমদারের ভাষায় বলিতে গেলে, তাহা "বেজায় হেঁয়ালি" ! তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, এইরূপই হইয়া থাকে। যাহা শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় তাহাকে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত করিতে গেলে, তাহার রূপান্তর করা আবশ্যক। বাগ্দেবীর বসতি রসনায়। অতএব তিনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আটপৌরে বসন ধারণ করাই তাঁহার পক্ষে

শ্রেয়ঃ। কিন্তু তিনি যখন লেখনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সার্কাস করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার পক্ষে তদনুরূপ সাধু অর্থাৎ জরিজরা-বৎ-সম্বলিত সাজসজ্জা ধারণ করাই কর্ত্তব্য। এবং আর পাঁচজনে যাহা করে তাহাই যে সাধু, এ বিষয়ে পাঁচজনে একমত। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, যিনি বঙ্গ-সরস্বতীর চরণে সংস্কৃত অলঙ্কারের শৃঙ্খল পরাইতে এত উৎসুক, তিনি নিজে যে কেন উচ্ছৃঙ্খল ভাষা ব্যবহার করেন, তা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য। দ্বিতীয়তঃ, তিনি তাঁহার বক্তব্য কথা উদাহরণ সংযোগে স্পষ্ট করিয়া তুলেন না। যদ্যপিস্যাৎ কখনও উদাহরণ দেন, তাহা হইলে সে উদাহরণ এরূপ স্থল হইতে উদাহৃত হয়, যে স্থলে কোনও অর্ব্বাচীন আলঙ্কারিকের প্রবেশাধিকার নাই। সম্পাদক মহাশয়ের যদি দেশ-কাল-পাত্র সম্বন্ধে কোনরূপ জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি গত যুগের সাহিত্যাচার্য্যদিগের আর্য প্রয়োগের উপর তাঁহার অবৈদিক হস্তক্ষেপ করিতেন না।

সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং বহুশ্রুত ব্যক্তি হইয়াও যে এইরূপ অসমীক্ষ্য-কারিতা এবং অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেন, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কেননা ইহার ফলে, আমাদের নব-সাহিত্য-সমাজে অলঙ্কার শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে অচিরাগত কুসংস্কার আছে, তাহা আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মাবলী উপেক্ষা করায় সাহিত্য যে সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ বিষয়ে আমি সম্পাদক মহাশয়ের সহিত একমত।

পূর্ব্বোক্ত কারণে আমি দুটি তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রমাণ করিতে চাহি যে, অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে কবিতার শব্দ-গৌরব এবং ভাবসম্পদ উভয়েই মাঠে মারা যায়।

প্রথম এই শ্লোকটি নিন্ :—

বিবর নামেতে পশু মহা বুদ্ধিমান,
সর্ব্বাঙ্গ আছয়ে তার, আরো দুটি কান।

এ কথা কোন পাঠক অস্বীকার করিতে পারেন যে, যে-গুণে কাব্য মহাকাব্য হয়, সে গুণ এ শ্লোকে পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান? এ কবিতার স্পষ্ট উদ্দেশ্য পাঠককে শিক্ষা দেওয়া, আনন্দ দেওয়া নহে। উদাহৃত শ্লোক প্রথমতঃ বাঙ্গালী-সমাজকে বিবর সম্বন্ধে জ্ঞান দান করে। দ্বিতীয়তঃ, যদিচ শাস্ত্রমতে "জ্ঞানাৎ পরতরং নহি", তথাচ কবি এ স্থলে পাঠককে জ্ঞানের অতিরিক্ত বস্তুও দান করিয়াছেন,—এবং সে বস্তু নৈতিক শিক্ষা। কবি অতি চতুরতার সহিত আকারে ইঙ্গিতে কহিয়াছেন—হে পাঠক! তুমি বিবরের মত বুদ্ধিমান হও, চরিত্রবান হও, তোমার মনুষ্যত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া পশুবুদ্ধি প্রাপ্ত হও। এ কবির অন্তরে পশুজাতির প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা নাই। উদার চরিতানাম্ বসুধৈব কুটুম্বকম। কিন্তু এতদূর উদারচেতা এবং মহানুভব হইলেও, উক্ত শ্লোকের রচয়িতা যে ব্যাস বাল্মীকির দলভুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ, তিনি অলঙ্কার শাস্ত্রকে অমান্য করিয়াছেন।

বিবরের দুটি অতিরিক্ত কান টানিয়া আনিবার দরুণ এই শ্লোকটি বাহুল্য অত্যুক্তি প্রভৃতি দোষে দুষ্ট হইয়াছে। যদি কবির বক্তব্য ইহাই হয় যে, বিবর চতুষ্কর্ণ,—তাহা হইলে অবশ্য কোন দোষই এ বর্ণনাকে স্পর্শ করে নাই। স্বভাবোক্তি ত গুণ বলিয়াই গণ্য। কিন্তু অদ্যাবধি যখন কোনই চতুষ্কর্ণ চতুষ্পদ আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তখন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, "বুদ্ধিমানের" সহিত

মিল করিবার জন্যই অতিরিক্ত দুটি কানের আমদানি করা হইয়াছে। তবে যদি প্রকাশ পায় যে, প্রাচীন সংস্কৃতে (বলা বাহুল্য যে আমরা সম্প্রতি আবিষ্কার করিয়াছি যে, এক সংস্কৃত প্রাচীন এবং অপর অর্ব্বাচীন) কান অর্থে কান নয়, কিন্তু কর্ণবিবর, তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বিবরের অন্ততঃ ও বিবর থাকা সম্ভব। তবে প্রাচীন সংস্কৃতের দোহাই দিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে যথেচ্ছাচার করা চলে কি না—সাহিত্য-পরিষৎ তাহার বিচার করিবেন।

অতঃপর আর একটি উদাহরণ লওয়া যাউক ;—

বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলি অতিবড় উঁচু,
নৃত্য করে শিখী শাখে, উঁচু করি পুচ্ছ।

এ শ্লোকটি শ্রবণমাত্রেই আমাদের চৈতন্য হয় যে, ইহা সুললিত অনুপ্রাসঘটিত, এবং অতি সাধু' শুদ্ধ ভাষায় রচিত। পদে পদে "বৃ" "বৃ", "শি" "শা", "খী" খে" প্রভৃতির একত্র সঙ্ঘটনে কবি শব্দালঙ্কারের চরমোৎকর্ষ্য লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু এই ভাষার লালিত্য এবং বিশুদ্ধি ইহার প্রথম গুণ হইলেও, প্রধান গুণ নহে। ইহার ব্যঞ্জনা যে কত গভীর ও কত উদার তাহা সহৃদয় পাঠকমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

কবি বলিয়াছেন "নৃত্য করে শিখী শাখে"—কিন্তু তিনি সে নৃত্যের কোনও কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। কবিপ্রসিদ্ধি এই, যে ঘন-দরশনে "চাতকিনী কুতুকিনী" হয়, ভেক মহ্লার গায়, এবং ময়ুর নৃত্য করে। কিন্তু গগনে যে ঘনঘটা করিয়াছে, এ কথা ত কবি বলেন নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে, এ নৃত্যের কারণান্তর আছে। সে অব্যক্ত কারণ কি? এ ময়ুর যে-সে ময়ুর নহে—ইহারা সব বৃন্দাবনের শিখী।—

সুতরাং ব্রজাঙ্গনাদিগের "প্রাণের হরির" নীরদবরণ রূপ দিবারাত্র ইহাদের মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ভাসিতেছে, হাসিতেছে, ও নাচিতেছে—"কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী"—এবং তজ্জন্য "হরিস্মরণে সরসমন" হইয়া ইহারা নৃত্য করিতেছে। আর ইহারা যে পুচ্ছ উচ্চ করিয়া নৃত্য করিতেছে, তাহার কারণ বৃন্দাবনের বৃক্ষগুলি "অতি বড় উঁচু"।—উচ্চতায় এবং শ্যামলতায় বৃক্ষগুলিকে পরাভূত করিবার উদ্দ্যেশ্যেই ইহারা পুচ্ছ উচ্চে বিস্তার করিয়াছে।—পাঠক এই শ্রাবণ মাসের প্রবাসী পত্রের মলাটস্থ ময়ুরের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে এরূপ স্পর্দ্ধা করা ময়ুরের পক্ষে সঙ্গত কি অসঙ্গত।

ভাষা এবং ভাবের এতাদৃশ চমৎকারিত্ব থাকা সত্বেও, পদ-লালিত্যে নৈষধের, এবং অর্থ গৌরবে ভারবির সমতুল্য হইলেও,—এ শ্লোকটি যে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর কবিতা স্বরূপে গণ্য নহে, সে কেবল ঐ পুছুর জন্য।—মিলের খাতিরে পুচ্ছকে "পুছুতে" রূপান্তরিত করায় অলঙ্কারশাস্ত্র মতে উক্ত পদের শব্দহানি করা হইয়াছে; এক কথায় "পুছু" ঐরূপ অবৈধ ভাবে উঁচু করায়-কবির মাথা নীচু হইয়া গিয়াছে। পুচ্ছ অবশ্য তুচ্ছ পদার্থ নহে, তথাপি সেটিকে ও ভাবে আস্ফালন করিলে, কাব্য-জগতের শোভাবৃদ্ধি হয় না।—

কাব্যের রস কাহাকে বলে, কবিতা কি পরিমাণে এবং অনুপাতে বস্তুতন্ত্রতা সাপেক্ষ,—এই সকল সমস্যা লইয়া বর্ত্তমানে আমাদের সাহিত্য সমাজে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হইয়াছে। এ তর্ক ভারতবর্ষে পূর্ব্বেও হইয়া গিয়াছে। নব্য অলঙ্কার এই রসতত্বে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বযুগেও আলঙ্কারিকগণ উদাহরণের সাহায্যেই তাঁহাদের নিজ নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া আমি একটি

উদাহরণের সাহায্যে এই প্রাচীন সমস্যার নূতন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিব।

নিম্নলিখিত চতুষ্পদীটি জনৈক মুসলমান কবি রচিত :—

খাজুরির বড় ভাই।
গুণির সীমে দিতি নাই॥
আঁঠি আর চামড়া।
হায়রে মোর আমড়া॥

এ কবিতাটি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত, কিন্তু তজ্জন্য নিন্দনীয় নহে। এ স্থলে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, প্রাকৃত ভাষায় গদ্য লেখাই অশাস্ত্রীয়,—পদ্য লেখা নয়। আমাদের নববঙ্গ সাহিত্যেও নিত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাঁহারা প্রাকৃত ভাষায় গদ্য লেখাতে আপত্তি করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে পদ্যে নির্ভীকচিত্তে প্রাকৃতের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। কেবল মাত্র তাহাই নহে,—কবিতায় ইঁহাদের হস্তে প্রাকৃত অতি-প্রাকৃত হইয়া দাঁড়ায়।—শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় গদ্যে মৌখিক ভাষা প্রচলনের সব্যসাচী শত্রু। তিনি মৌখিক ভাষার মুখবন্ধ করিবার জন্য যুগপৎ অস্ত্র এবং শাস্ত্র ধারণ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার রচিত একটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

মানভঞ্জনের পূর্ব্বাভাস।

কৃষ্ণ—কি লাগি বদন ঝাঁপসি রূপসী ?
রাধা—চলে যারে কেলে ডেক্‌রা!
কৃষ্ণ—পুরুখ বধের ভয় না করোসি ?
রাধা—এত জ্ঞান তুমি নেক্‌রা ?
কৃষ্ণ—দাসখত লিখে দেবে লো কানাই,
রাধা—কর অন্য গোপী পাক্‌ড়া।

কৃষ্ণ—শ্রীকর-কমল পরশিয়ে যাই,
রাধা—একি চীনে জোঁক কাঁকড়া।
কৃষ্ণ—শরণ লইনু চরণ তলায়,
রাধা—পা ছাড়! করো না নেঙ্গড়া।
কৃষ্ণ—মরি যে বিরহ বিষের জ্বালায়।
রাধা—(রহ) আনি বিষ-ঝাড়া থেঙ্গরা!

বলা বাহুল্য যে এ ভাষা "রাজার মেয়ে রাজার ঝির" মৌখিক ভাষা নয়। প্রবাদ যে বৃকভানুনন্দিনী দুগ্ধ বিক্রয় করিতেন, কিন্তু তিনি যে মৎস্য বিক্রয় করিতেন তাঁহার সম্বন্ধে এ অপবাদ ইতিপূর্ব্বে কেহই কখন শুনেন নাই।

সে যাহাই হউক পূর্ব্বোক্ত চতুস্পদীটির সর্ব্বপ্রধান গুণ এই যে—ইহার ভাষার ন্যায় ইহার ভাবও খাঁটি স্বদেশী। এ চতুস্পদী ইংরাজি কবিতার অনুকরণে রচিত হয় নাই; ইহার ভিতর Shelley কিম্বা Browningএর কবিতার লেশমাত্রও প্রভাব নাই। ইহার ভিতর যে সুর পাওয়া যায়, তাহা নির্জ্জলা মেঠো সুর।—এ কবিতা বাঙ্গলার বনফুল, দেশের মাটির বুক ফুঁড়িয়া এ কবিতা উত্থিত হইয়াছে। অন্ততঃ এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকেরা এ কাবতাকে রবীন্দ্র নাথের কবিতার অপেক্ষা উচ্চ আসন দিতে বাধ্য।—

তাহার পর ইহার মিলগুলি নিখুঁত।—আমড়ার সহিত চামড়ার মিল কি চমৎকার!! আমার বিশ্বাস ৺ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ মিল জোড়ার সাক্ষাৎ পাইলে তাহা চুরি করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না।

তাহার পর আমড়াকে খেজুরের বড় ভাই বলাতে কবি তাঁহার নব-নব-উন্মেষ-শালিনী বুদ্ধির কি আশ্চর্য্য প্রমাণ দিয়াছেন। এ উপমার

নূতনত্ব ও বাস্তবতা কি অপূর্ব্ব !! এ উপমার দ্বারা কবি যে কেবল মাত্র তাঁহার বহির্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে,—সেই সঙ্গে তিনি তাঁহার সহৃদয়তারও পরিচয় দিয়াছেন।—আমড়া এবং খেজুরকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা, এক বাঙ্গালী কবি ব্যতীত অপর কাহার দ্বারাও সাধিত হইত না। ইউরোপের Fraternity শুধু মানবের জন্য। কিন্তু আমাদের দেশে গাছপালা ফুলফল সব ঠাঁই ঠাঁই হইলেও সব ভাই ভাই।

তাহার পর, যাঁহার আমড়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে, তিনিই জানেন যে, উক্ত কবিতাতে বস্তুতন্ত্রতা কতদূর পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে; বস্তুতন্ত্রতা ইহার উর্দ্ধে আর উঠিতে পারে না।

কিন্তু নব্য আলঙ্কারিক মতে সকল গুণের সমবায়েও রচনা কাব্য হয় না, যদি তাহাতে সকল গুণের অতিরিক্ত রস নামক পদার্থ না থাকে। এ কবিতাটি যে আমাদের কাব্যজগতের অমূল্য রত্নস্বরূপে পরিগণিত হয় নাই, তাহার একমাত্র কারণ ইহাতে রস নাই—যাহা আছে তাহা শুদ্ধ আঁঠি আর চামড়া, অর্থাৎ নিরেট বস্তুতন্ত্রতা।—ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন যে, কবি যখন "হায়রে" বলিয়াছেন, তখনই তিনি করুণরসের অবতারণা কারয়াছেন—আর করুণরসই বাঙ্গলার অন্তরের রস; তাহা হইলে প্রত্যুত্তরে আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ উক্ত রস আমার নিকট খাট্টা।

পাঠক সমাজের নিকট আমার এই "সোদাহরণ অলঙ্কার" যদি আদৃত হয়, তাহা হইলে আমি ভবিষ্যতে নব নব উদাহরণের সাহায্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের যাথার্থ্য এবং মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতে প্রয়াস পাইব।

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মৈত্র

পত্র।

——ঃ৹ঃ——

বিরহতাপিত বিশ্বে সান্ত্বনার অমৃত সমান,
কবে তুমি হ'লে মূর্ত্তিমান্ ?
কোন্ বিরহীর উগ্র তপস্যার সিদ্ধিরূপ ধরি,
স্বর্গ হ'তে নেবে এলে, আশাপূর্ণ আনন্দলহরী—
বহিয়া অন্তরে তব হৃদয়ের নিভৃত উচ্ছ্বাস,
ব্যথাভরা গোপন নিঃশ্বাস !

কাতর প্রাণের ভাব বক্ষোমাঝে আকুলি বিকুলি,
সহসা পিঞ্জর-দ্বার খুলি
মুক্ত বিহগের মত যেইদিন পত্রাকার লয়ে,
প্রথম প্রবাস হ'তে প্রিয়ের বারতা বুকে ব'য়ে
উড়িল উদ্দেশে তার, সেই দিন হইল প্রকাশ
প্রণয়ের নব ইতিহাস।

নূতন অধ্যায়ে তার, মরাল পবন মেঘ-দূত—
বিরহীর কল্পনা-প্রসূত—
লুপ্ত হ'ল সেইদিন, অকপটে অসঙ্কোচমনে
ক্লান্তিহীন পত্রদূতে --সব কথা নিবেদি যতনে—
লক্ষ নরনারী আজ পাঠাইছে শৈল-সিন্ধু-পার ;
পত্র,—সে যে মূক, নির্ব্বিকার

হে লেখনী-বিনিঃসৃত মসীময় দিব্যদেহধারি!
হে সুন্দর বিমানবিহারি!
কমল পলাশে কভু হয়েছিলে নখর-রচিত,
কখনো ভূর্জ্জের পাতে হৃদয়ের শোণিতে খচিত,
অলক্ত-রসেতে কভু বিলিখিত বসন-অঞ্চল,
হে বিবর্ত্ত-বিকাশ-চঞ্চল!

ওই যে তোমার লাগি প্রত্যাশার পথ নিরখিয়া,
এখনো রয়েছে কোটি প্রিয়া—
উৎসুক ব্যাকুল নেত্রে; সলজ্জিত সচকিত মতি,
শত সংসারের কাজে থেকে থেকে হয় শ্লথগতি,
এখনো প্রমাদ, ভুল, তরুণ-জীবনে পদে পদে,
পান করি প্রতীক্ষার মদে।

আর কতদিন! বুঝি এইবার হবে তব শেষ—
বিশ্বব্যাপী ভ্রমণের ক্লেশ।
এসেছে নূতন দূত, বিদ্যুৎবাহিনী বার্ত্তা যার,
যার কণ্ঠে বেজে উঠে অশ্রুরুদ্ধ বাণীটি পিয়ার,—
ব্যবধান ঘুচাইয়া আনে সে যে মিলন হরষ—
তুমি আন সুদূর পরশ।

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘটক।

স্বপ্ন-তত্ত্ব।

——ঃ০ঃ——

লোকে বলে আমরা দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখি। এ অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। রুচিভেদে কেহবা বিক্রমাদিত্যের সভায় তানসেনের গানের রেশে মুগ্ধ, কেহবা এবার ম'লে সাহেব হবার আশায় আহ্লাদিত। প্রত্নতাত্ত্বিক যদি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে সে সময়ে 'তানসেন জন্মানিক মোটে' অথবা নৃতাত্ত্বিক যদি সতর্ক করিয়া দেন যে 'স্বভাব যায় না ম'লে' তাহাতে আমরা বিশেষ বিরক্তি বোধ করি, এমন কি বড্ড চটি। ভূত ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের বর্ত্তমানের কর্ম্মভূমি স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা না হইলেও অধিকাংশ স্থলে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি। ইহার কারণ আমরা জাতীয় জীবনে প্রয়োজনের তাগিদ্ মানি না।

আপাতত সম্পাদক মহাশয়ের স্বপ্ন-তত্ব আলোচনার হুকুম তামিল করিতে গিয়া দেখিতেছি যে স্বপ্ন, জাতীরই হৌক আর ব্যক্তিরই হৌক, স্বপ্নাবস্থার লক্ষণ একই, অর্থাৎ প্রয়োজন মানা না-মানাতেই জাগ্রত জীবনের সহিত স্বপ্নাবস্থার প্রভেদ। এই ভেদ-তত্ত্ব আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মানুষের মন ভাবরূপ হরেক রকম মালের গুদাম ও কারখানা। ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া এক পত্তন কাঁচা মালের আমদানী চলে, ঢুকিবার পথে শরীর যন্ত্রাদির ক্রিয়ার (বা কখনো বিকৃতির) ফলে সে গুলিতে

নানা রঙের ছাপ পড়ে, অবশেষে যাচাই বাছাই করিয়া যোড়া তাড়া দিয়া সে গুলি হইতে রকমারি দ্রব্য তৈয়ারী হইয়া তাহা স্মৃতিরূপে গুদামজাত থাকে, ও পরে গুদামের মালে বাহিরের মাল মিলাইয়া কারিগরী ফলাইবার আরও সুবিধা ঘটে। এই ত আমাদের চৈতন্যের বা জীবনের সচেতন অংশের মোটামুটি বিবরণ।

সকাল বেলা উঠিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারা খবর পাওয়া গেল যে ঝম্‌ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, ইহাতে মন ময়ূরের মত নাচিয়া উঠিবে কি ভিজা বিড়ালের মত দমিয়া যাইবে তাহা পূর্ব্ব রাত্রের আহার পরিপাক হওয়া না-হওয়ার উপর অনেকটা নির্ভর করে। ফুস্‌ফুসের রোগে আশার বৃদ্ধি, যকৃতের রোগে হলুদে দেখা, পিত্তাধিক্যে মেজাজ গরম প্রভৃতি নিত্য ঘটনায় দেখা যায় কি ভাবে আমাদের দেহযন্ত্র ইন্দ্রিয়ের আমদানীর উপর রং বেরঙের ছাপ মারে।

নিদ্রিত অবস্থায় মনের গুদাম ও কারখানার অবস্থা কি? অভিধানের হিসাবে তন্দ্রা হইতে সুষুপ্তি পর্য্যন্ত সবই নিদ্রার অন্দরে কিন্তু আমাদের সমস্যার হিসাবে তন্দ্রা ও সুষুপ্তি উভয়কেই নিদ্রার কোটা হইতে বাদ দেওয়া চলে। সুষুপ্তির সময় ত বুঝাই যাইতেছে যে পূজা, ইদ্ ও বড়দিনের ত্র্যহস্পর্শ; আপিসও বন্ধ, গুদামও বন্ধ কারখানা ও অচল। এ অবস্থায় যখন স্বপ্ন দর্শনই হয় না তখন স্বপ্ন-তত্ত্বের বিচার স্থলে উহার প্রবেশ নিষেধ। যে কেরাণী বাবু সাহেবের চোখ-রাঙানীর ধাঁদা চোখে লইয়া বাড়ি আসেন ও তাহার আসন্ন-বজ্ররবের তালা কাণে লইয়া আপিস যান, শালগ্রামের শোয়া-বসার মত তাহার পক্ষে কি বা খোলা কি বা বন্ধ। তেমনি হাল্কা ঘুমের যে স্বপ্ন তাহা জাগ্রত অবস্থার ঘটনারই চর্ব্বিত-চর্ব্বণ,

তাহাকে স্বপ্ন না বলিলেও চলে, অন্তত তাহা আমাদের সমস্যা-মীমাংসার কোন কাজে লাগিবে না।

স্বপ্নটা আর যাই হোক্ জাগ্রত মানসিক জীবনের একটা ছায়া মাত্র নয়। যে ব্যক্তি দিবাভোগে ট্রামে চড়িতে দুইবার ভাবে সেও রাত্রে স্বপ্নযোগে æroplane-এ বেড়ায়। স্বপ্নে আশাতীত ধনই বা অযাচিত ভাবে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে কেন, আবার একজামিন দিতে বসিয়া হাতই বা সরে না, ভূতে তাড়া করিলে পাই বা চলে না কেন?

নিদ্রাবস্থায় মনের কারখানা যে বন্ধ থাকে না স্বপ্নই তাহার পরিচয়। মালমসলার আমদানিরই বা এমন কি নূতনত্ব দেখা যায়? নাক কান ত খোলাই। চোখের পাতা ফেলা থাকিলেও আলো-অন্ধকার সে বেশ ধরিতে পারে। মশা গায়ে বসিলে ঘুমের ঘোরে গাত্র কণ্ডুয়ন কামাই যায় না। অজীর্ণতার বদ্‌রস বা জ্বরে রগের ধক্‌ধক্ স্বপ্নলোকে কিরূপ উৎপাত বাধায় ভুক্তভোগী মাত্রই তাহার সাক্ষী দিবে। স্মৃতি-গুদামের মাল ও নিদ্রার সময় ফেলা যায় না। পরিচিত দৃশ্য বা লোকজন, স্বীয় আশা আকাঙ্ক্ষা ভয় ভাবনা, সবই স্বপ্নের উপকরণ স্বরূপে কাজে লাগে। তবেই ত দেখা যাইতেছে—সেই ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বহির্জ্জগতের প্রবেশ, সেই শারীরিক যন্ত্রাদির প্রকৃত বা বিকৃত ক্রিয়ার প্রভাব, সেই উপস্থিতের সহিত পূর্ব্ব-সঞ্চিতের সম্মিলনে নব নব ভাব গঠন। তবে গঠন-প্রণালীর এত পরিবর্ত্তন কেন? কারখানা ও মালমসলা সমান থাকিতে যাচাই বাছাই ভাঙ্গা গড়ার এ উলট্‌পালট্ কিসে?

নিদ্রাবস্থায় মানব-মনের মুনীবের অভাবেই যত গণ্ডগোল। মনের এই মুনীব বা নিয়ন্তা কে?—প্রয়োজন। কিসের প্রয়োজন?

যে লাভে লোভ আছে তাহাকে নিকটে আনার প্রয়োজন, যে ক্ষতিতে ভয় আছে তাহাকে দূরে রাখার প্রয়োজন। সে প্রয়োজন অবসর না পাইলে মন বেচারী ঘুমাইতে পায় না। মানব-জীবনের উপর একাধিপত্ব রক্ষার উপর তাহার এত মায়া যে, নিজে অবসর লইলেও প্রহরী রাখিয়া যাইতে প্রায়ই ভুল হয় না, তাই সুষুপ্তির অবস্থা এত দুর্ঘট।

সচরাচর প্রহরীই দ্বার-রক্ষক। কিন্তু এ স্থলে দ্বার প্রহরীকে আশ্রয় দিতে গিয়া বাজে লোকের পক্ষেও অবারিত হইয়া থাকে। যে সে ঢুকিয়া পড়িয়া যা তা মাল যেমন তেমন করিয়া কলের স্থানে অস্থানে প্রয়োগ করিতে থাকিলে স্বপ্নজীবনের উপাদানগুলি যে অদ্ভুত বেহিসাবী আকার ধারণ করিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? পাড়াগাঁয়ে রাত্রে কুকুর ডাকিয়া উঠিলে গৃহস্থ একবার বাড়ীর চারি-দিকে কেও? কে ও? করিয়া ঘুরিয়া আসা আবশ্যক বিবেচনা করে। সহরে এরূপ কোন আবশ্যকতা নাই তবুও কুকুরের ডাক কাণে ঢুকিতে ছাড়ে না। টাউনহলের বক্তা মহাশয়দের নিদ্রিত মস্তিষ্কে এরূপ ঘেউ-ঘেউ শব্দ পৌঁছিলে, তাহা সম্ভবত মধুর করতালি ধ্বনির স্বপ্নে পরিণত হয়; কিন্তু ঐ একই শব্দে, সভায় দাঁড়াইয়া যেন Get out! Get out! রবে পুরস্কৃত হইতেছি, এরূপ একটা স্বপ্ন আমার মনে পড়ে।

স্বপ্নের উপাদানের গঠনকে বেহিসাবী বলিলাম। তাহার মানে প্রয়োজনের লাভ-লোকসানের হিসাবের সহিত তাহার মিল নাই। তাই বলিয়া কোন রকমের হিসাব যে তাহার ভিতর পাওয়া যায় না তাহা নহে। যে সকল বাজে-লোক রাত্রিযোগে মনের কারখানায়

ঢুকিয়া কল চালাইয়া মাল তৈয়ারী করে, তাহারা মুনীবের হিসাব না মানিলেও নিজ নিজ প্রকৃতির হিসাব এড়াইতে পারে না। একবার কতকগুলি আন্‌কোরা আফ্রিদীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলাম। টেনিস খেলা চলিতেছে দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন এক হাত খেলিতে চাহিল। তাহার bat-এর এক ঘায়ে গোলা বাড়ীর মাঠ ত পার হইলই, সামনের সরকারী মাঠশুদ্ধ পার হইয়া অদৃশ্য হইল। ইহাতে টেনিসের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আফ্রিদী-স্বভাবের নিয়ম বজায় ছিল।

যদিও খোলা দ্বার দিয়া যে সে ঢুকিতে পারে তবুও ঘটনাক্রমে দেখা যায় যে, মনের কারখানায় রাত্রের অভ্যাগতদের মধ্যে কতকগুলি বারোমেসে। তাই কারখানার রাত্রের বিচিত্র সৃষ্টির সকল অদ্ভুদত্বের মধ্যে কতকগুলি পরিচিত কারিগরের হস্তচিহ্ন ক্রমান্বয় ফুটিয়া বাহির হয়। জাগ্রত-জীবনের নানাবিধ অবস্থা পরম্পরা ও কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে যেমন আহার পরিচ্ছদাদি কতকগুলি জিনিষ নিজ নিজ স্থান অধিকার করিয়া থাকে, তেমনি নিদ্রাবস্থারও কতকগুলি বাঁধা সঙ্গী আছে। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে অভ্যাসরূপ কুলির দল যে সূত্রেই মাল হাতে পাউক্, তাহা বাঁধা দস্তুরেই তাহারা সাজাইয়া থাকে। তাই ভিন্ন লোকের স্বপ্নের মধ্যেও ঐক্য পাওয়া যায়।

ভাসা বা ওড়া জিনিষ যেমন জল বা হাওয়ার ঠেলায় তোলা থাকে, ঘুমন্ত-মানুষও সেই রকম বিছানার আশ্রয়ে লম্বিত ও নিশ্চেষ্টভাবে ধরা থাকে। এইজন্য লোকে প্রায়ই জলে ভাসিয়া বা আকাশে উড়িয়া চলার স্বপ্ন দেখে। কর্ম্মজীবনে হাত পা যে ভাবে নাড়ার প্রয়োজন

হয় সেই ভাবেই মাংসপেশী প্রভৃতি নাড়িবার অস্ত্রগুলি সাজান। শোয়া অবস্থায় সেই সাজানোর সুবিধাটা পাওয়া যায় না বলিয়া, হাত পা তুলিতে একটু বিশেষ ভার বোধ হয়। অভ্যাসের দরুণ ভারের সহিত জড়তার ভাব সহজে আসে বলিয়া স্বপ্নে হাত পা চালাইবার কারণ উপস্থিত হইলেই সঙ্গে সঙ্গে অক্ষমতা আসিয়া পড়ে। ইহা ছাড়া প্রত্যেকের ঘরে আলোছায়ার কতকগুলি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবস্থা থাকে যাহার প্রভাব আপন আপন স্বপ্নের মধ্যে খুঁজিলে নিশ্চয়ই বাহির করা যাইতে পারে।

জাগ্রত ও স্বপ্ন-জীবনের চাল বা তালের গতি বা লয়ভেদও একটি কৌতুকের বিষয়। এই তথ্যটি কিন্তু আমাকে গভীর গবেষণার দ্বারা আবিষ্কার করিতে হয় নাই। ইস্কুলে পিছনের বেঞ্চিই আমার বেশী পছন্দসই ছিল। সামনে বই খাড়া করিয়া তাহার আড়ালে ডেস্কের উপর মাথা রাখিলে ঘুম ও বেশ জমিত, পড়ায় মনোযোগের সুনামটাও হইবার যোগাড় হইতেছিল, এমন সময় এক দিন তন্দ্রা আসিতেই এক স্বপ্ন দেখিলাম। সে কি স্বপ্ন! তার অদ্ভুত অস্ফুরণ ঘটনাবলীর কাছে bioscope-এর গল্পচ্ছবি হার মানে। বিষম দাঙ্গা হাঙ্গামা হুড়া হুড়ির পর আমি এক বাড়ীর কার্ণিশে উঠিয়া পড়ায় তাহা ধড়াস্ করিয়া খসিয়া আমাকে শূন্যে ফেলিয়া দিল। বুক ধড়্ ধড়্ করিতে করিতে চমকিয়া জাগিয়া দেখি বইখানি আমার ঢুলুনির চোটে পড়িয়া গিয়াছে, এবং আমার ফ্যাল্‌ফ্যালে হতভম্ব ভাব দেখিয়া ক্লাশ শুদ্ধ হাসিয়া অস্থির! ইহার মধ্যে ভাবিবার কথাটুকু এই যে, যে ছেলের গুন্ গুন্ শব্দে reading পড়ায় আমার তন্দ্রা আসিয়াছিল, ইতিমধ্যে সে যে দুই-এক ছত্রমাত্র পড়িয়াছে তাহাতে দুই তিন

বারের বেশী ঢুলিবার অবসর থাকিতেই পারে না, অথচ বহির্জ্জগতে যাহা অর্দ্ধ মিনিট মাত্র সে কালটুকুর মধ্যে স্বপ্নলোকে কত কাণ্ড কারখানাই হইয়া গেল। এ ঘটনা যদি আমার একার ঘটিত, তবে নিশ্চয়ই মনে সন্দেহ হইত যে আমার কাল গণনার কিছু ভুল হইয়াছে, কিন্তু পরে অনুসন্ধানে জানিয়াছি যে অনেকেই এরূপ অসম্ভব-অল্প সময়ের মধ্যে সুদীর্ঘ স্বপ্ন দর্শনের বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারেন।

পদে পদে প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে হওয়ায় আমাদের জাগ্রত জীবনের চালটাই যে ঢিমা হইয়া গিয়াছে এবং এই বাধা দূর করিতে পারিলে যে গতিবেগ বিস্তর বাড়িয়া যাইতে পারে ইহা একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা আমি বুঝিবার কতক সাহায্য পাইয়াছি। পশ্চিমে আল বাঁধিয়া চক্ কাটিয়া বাগান তৈয়ারী করা হয়। বাগানের এক কোণে ইন্দারার জল একটি বৃহৎ হৌজে আসিয়া পড়ে। হৌজ হইতে প্রত্যেক চক্ পর্য্যন্ত জলের প্রণালীর জাল চলিয়াছে, প্রত্যেকের সঙ্গে অপরটির যোগ। মাটি চাপা দিয়া প্রণালীতে প্রণালীতে যোগ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় এবং এই উপায়ে চক্ বিশেষে জল যোগান যায় বা চক্ বিশেষকে বাদ রাখা যায়। গাছের প্রকৃতি ও প্রয়োজন বুঝিয়া মালি এটা বন্ধ করিতেছে, ওটা খুলিতেছে, হৌজের মুখ ছোট বড় করিতেছে, এবং এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া সেই হৌজের জল যথাক্রমে ও যথাপরিমাণে এ-চক্ ও-চকে জোগাইতেছে। মালির অনুপস্থিতে যদি কোন ছোক্রা আসিয়া এ যন্ত্রটি লইয়া ছেলেখেলা করে, এবং আবশ্যক নির্ব্বিচারে সব প্রণালীর মুখ খুলিয়া হৌজের জল একেবারে ছাড়িয়া দেয়, তবে দেখিতে দেখিতে বাগান প্লাবিত হইতে পারে।

আমাদের মনে ত স্মৃতির ও অভ্যাসের প্রণালী কাটাই রহিয়াছে, যাহার মধ্য দিয়া সকল ভাবোচ্ছাস ও কর্ম্মোদ্যম চলিতে বাধ্য হয়। হোঁচটের ভয়ে পা তুলিয়া, নিন্দার ভয়ে ঠোঁট চাপিয়া সর্ব্বদাই এত সন্তর্পণে চলা বলা করিতে হয় ; এটায় আগে হাত দিব না পাছে ওটায় ব্যাঘাত ঘটে, এ কাজে এখন ক্ষান্ত দিই নইলে ওটার বেলা বহিয়া যায়, ইত্যাদি এত রকমের বিপদ বাঁচাইয়া চলিতে হয় ; যে, আমাদের জাগ্রত জীবনে একটি ব্যবহারিক ঢিমে-তেতালার চাল দাঁড়াইয়া গিয়াছে, —স্বপ্নরাজ্যে যাহার নিয়ম খাটে না বলিয়াই সেখানকার অপ্রতিহত জলদ্ লয়ে এক মুহূর্ত্তে চব্বিশ ঘণ্টার কাজ করিয়া ফেলা যায়।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন ডানহাত যাহা দান করে, তাহা বাঁহাত যেন টের না পায়। কিন্তু ডান হাত বোবা হইলেও বাঁ হাতের জানিবার ক্ষমতা যে কত অদ্ভুত রকমের তাহার এক পরীক্ষার কথা বলি। এক ব্যক্তির ডান হাত পক্ষাঘাতে পড়িয়া গিয়াছিল তাহাতে কোন সাড় ছিল না। পরীক্ষার জন্য সে ব্যক্তির দৃষ্টি হইতে এই ডান হাতকে পর্দ্দার দ্বারা সম্পূর্ণ আড়াল করা হইল। সে হাতে আলপিন্ ফুটাইয়া বুঝা গেল সে ব্যক্তি বেদনা বোধ করা দূরে থাক্ তাহা জানিতেই পারিতেছে না। তখন একটি পেন্সিলের ছুঁচাল মুখ দিয়া সেই ডান হাতের চামড়ার উপর একটি চক্রাকার দাগ কাটিয়া তাহাকে বাঁহাত দিয়া একটি কাগজে কিছু লিখিতে অনুরোধ করা হইল। বাঁহাত ও সেই কাগজে একটি চক্র কাটিল! পরে পরে নানা অক্ষর ডান হাতের উপর সেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে লেখা হইল, কিন্তু যথেচ্ছায় লিখিতে গিয়া বাম হাত সেই সেই অক্ষর (বা তদনুরূপ গঠনের দাগ) কাগজে লিখিতে লাগিল। ইহা হইতে

এই টুকু অন্তত বুঝা যায় যে মন সচেতন না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের সংবাদ গ্রহণ করিতে পারে এবং তদনুসারে চলিতে ও কাজ চালাইতে পারে।

'ভোরের স্বপ্ন ফলে' এই চলিত কথাটির একটি ব্যাখ্যার চেষ্টা (কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে) করিব বলিয়া এই শেষ বৃত্তান্তটির উল্লেখ করিলাম। রাত্রের ঘুমের পর বুদ্ধিবৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি তাজা ও সতেজ থাকে এ কথাটি সর্ব্ববাদীসম্মত। এই তেজের চূড়ান্ত প্রকাশ সম্ভবত সেই ভোরের সময়ে যখন নিদ্রা ও জাগরণের মাঝখানে চিত্ত দুলিতেছে।

এক দিন এমনি এক ভোরের বেলা বাড়ীর দরজায় আমার এক প্রবাসী বন্ধু আসিয়া উপস্থিত। তিনি কলিকাতায় আসিয়াছেন বা আসিবেন এমন কোন সংবাদই আমি পাই নাই। তাঁহার পরিবারের হঠাৎ অসুখ করাই এই আগমনের কারণ, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি মনস্থির করিয়া রওনা হইতে হইয়াছে যে, আমাকে কেন, কলিকাতায় কাহাকেও তিনি কোন খবর দিতে পারেন নাই। ভোরের ট্রেণ হইতে নামিয়া স্ত্রীকে তাঁহার মা'র নিকট রাখিয়া তখনি চিকিৎসার পরামর্শ করার জন্যই আমার কাছে তাঁহার এত সকালে আসা। গাড়ি দরজায় থামিতেই মুনীবের পরম বন্ধুকে পুরাতন চাকর অভ্যর্থনা করিতে গেল, বন্ধুও নামিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিতে করিতে চাকরকে উপরোক্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলেন।

গাড়ী থামিবার স্থান আমার শোবার ঘরের জানলার নীচে হইলেও সেখানে সহজ গলায় কথাবার্ত্তা হইলে তাহার শব্দমাত্র আমার বিছানা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে বলিয়া কেহ বিশ্বাস করিতে পারে না। অথচ ইতিমধ্যে গাড়ীর আওয়াজ, চাকরের

মুখে বন্ধুর নাম, এবং তাঁহাদের কথোপকথনের মর্ম্মটা, আমার চিত্তবৃত্তির সেই টন্‌টনে অবস্থায়, অলক্ষিতে শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বার লঙ্ঘন করিয়া, চেতনাকে পাশ কাটাইয়া, আমার মনের কারখানায় প্রবেশ করিয়াছে এবং বন্ধুর সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ স্বপ্নের সৃষ্টি করিয়াছে। বন্ধুর রোগক্লিষ্টা সহধর্ম্মিণীকে শয্যাশায়ী দেখিলাম—চিন্তান্বিত হইয়া তাঁহাদের বিচার বিবেচনার এদিক ওদিক সকল দিক শুনিলাম—জিনিষপত্র বাঁধা, গাড়ী ঠিক করা, ষ্টেশনের দৌড়াদৌড়ী হুটোপাটি, সবই যেন আমার সম্মুখেই ঘটিল। কত স্নেহভরে তাঁহারা আমার কথা তুলিলেন—বিলম্ব না করিয়া ভোরেই চিকিৎসা সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পরামর্শ করা স্থির হইল—রেলগাড়ি হইতে নামা দেখিলাম, ঘোড়ার গাড়িতে চড়া দেখিলাম। এমন সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখি—আমার সেই বন্ধু সশরীরে আমার সচেতন চর্ম্মচক্ষুর সম্মুখে হাজির। আমি লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম—

"কি হে! তুমি কোত্থেকে? ঘণ্টাখানেক ধরে' যে তোমাকেই স্বপ্নে দেখ্‌ছিলাম।"

"বটে! অনেক দিন বাঁচব দেখ্‌ছি! আমার বিষয়ে কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলে ভাই?"

তখন আমি যে অচেতন অবস্থায় তাঁর গাড়ির আওয়াজ অন্তরে পাইয়াছি (শুনিয়াছি কেমন করিয়া বলি?) এবং যে মিনিটখানেক ধরিয়া তিনি সিঁড়ি উঠিয়া আসিয়াছেন তারই মধ্যে এত বড় লম্বা একটা স্বপ্ন দেখিয়া ফেলিয়াছি, তার কিছুমাত্র জ্ঞাত না থাকায়, শাদা মনেই তাঁহার নিকট স্বপ্নটিকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া ঘণ্টাখানেকের স্বপ্ন যেমন করিয়া বলিতে হয় তেমনি করিয়া বলিলাম।

"কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! অক্ষরে অক্ষরে মিল! আমি ত এ কথা কাউকে জানাই নি!" বলিয়া বন্ধু ও পত্নীর রোগ-সম্বন্ধে অলৌকিক স্বপ্নাবির্ভাবে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার আগমন কাহিনী ফুলাইয়া ফলাইয়া আমাকে পাণ্টা দিলেন।

এতক্ষণে বাড়ীর সকলে সেই ঘরে আসিয়া জমিয়াছেন। সকলেই চমকিত, বিস্মিত, স্তম্ভিত।

"সাধে বলে প্রভাতের স্বপ্ন।"

"সেকেলে বচন,—মাহাত্ম্য যাবে কোথায়?"

"তবু লোকে পাঁজি পুঁথি মানতে চায় না!"

ইত্যাকার মন্তব্যে ঘর ধ্বনিত হইতে লাগিল। আমারও সেই সময় হইতে মতিগতি ফিরিবার উপক্রম হইয়াছিল। যদি না ফরাসী-দার্শনিক Bergsonএর গ্রন্থপাঠে এই সকল বৈজ্ঞানিক-তত্ত্ব মনে উদয় হইয়া আমাকে রক্ষা করিত, তাহা হইলে আমি সম্ভবত তদবধি পঞ্জিকাগত-প্রাণ হইয়া থাকিতাম।

স্বপ্ন-তত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাতের অধিক কিছু করিবার আমার অধিকার নাই সুতরাং এ আলোচনা চালাইবার ভার অপরের উপর দিয়া বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম। যদি স্বপ্নসম্বন্ধে কাহারো কৌতূহল জাগাইয়া থাকি, তবে তাঁহাকে স্বপ্নসাধনের একটা হিক্‌মৎ বাৎলাইয়া দিই। বাঁশ-বাজিকর যদি পায়ে সিং বাঁধিয়া দড়ির উপর চলিতে পারে, বা বাঁশের আগায় মানুষ চড়াইয়া সেটা চিবুকের উপর সোজা ভাবে দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে, তবে শিক্ষিত ব্যক্তি অভ্যাস করিলে চিত্তকে ভোর বেলায় সেই নিদ্রা ও জাগরণের

মাঝখানের জায়গাটাতে কিছুক্ষণ স্থির করিয়া নাই বা রাখিতে পারিবে কেন? যে সময়ে বুঝিবার ও মনে রাখিবার মত চেতনা আসিয়াছে, অথচ চেতনার পূর্ণ আলোকে স্বপ্নলোক সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই, সেই ব্রহ্মমুহূর্ত্তই স্বপ্ন-তত্ত্ব আবিষ্কার ও অনুশীলনের পক্ষে প্রশস্ত।

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঠাকুর।

টীকা ও টিপ্পনি

——:০:——
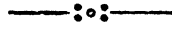
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্প্রতি দুঃখ করে বলেছেন যে, সেকালে সবে তিন চারখানি মাসিক পত্র ছিল, এবং তার এক-খানিও মাসে মাসে বেরোত না; থেকে থেকেই তার একটি না একটি বিনা নোটিসে বন্ধ হয়ে যেত।

এ দুঃখ আমাদের নেই। একালে অন্ততঃ এমন ত্রিশ চল্লিশ খানি মাসিক পত্র আছে যা মাসে মাসে বেরোয়, আর তার একখানিও বন্ধ হয়ে যায় না।

শাস্ত্রে বলে "অধিকন্তু ন দোষায়," ইংরাজিতে বলে "The more the merrier"। সুতরাং পূর্ব্ব-পশ্চিম যে দিক্ থেকেই দেখ, মাসিক পত্রের এই আধিক্যে আমাদের খুসি হবারই কথা।

তবে মাসিকপত্রের অতিবাড় বাড়াটা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর কি অকল্যাণকর, সে বিষয়ে সকলে একমত নন্। স্বনামধন্য ইংরাজ লেখক Oscar Wilde-এর মতে সাহিত্য এবং সাময়িক সাহিত্য এ দুয়ের ভিতর একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। তিনি বলেন Literature is not read এবং Journalism is unreadable.

পূর্ব্বোক্ত বচনের প্রথমাংশ যে অনেক পরিমাণে সত্য, সে কথা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। চণ্ডীদাস থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত, যে-সকল লেখক নিয়ে আমরা মহা গৌরব করি, তাঁদের রচিত কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাঁর পরিচয় আছে এমন সাহিত্যিক শতেকে জনেক মেলে কি না, সে বিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।

"লাখে না মিলল এক," এ দুঃখের কথা, আমার বিশ্বাস বিদ্যাপতি ঠাকুর ভবিষ্যৎ পাঠক সমাজের প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে সকল সমালোচকের যে পরিচয় নেই, এর প্রমাণ আমি সম্প্রতি পেয়েছি। বঙ্গ-সরস্বতীর জনৈক ধনাঢ্য পৃষ্ঠ-পোষক সম্প্রতি কলিকাতার সাহিত্যসভায় প্রকাশ্যে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার দৈন্য এবং ভাবের দৈন্য গোপন করবার জন্যই মৌখিক ভাষার আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। এ কথা বলাও যা, আর দুয়ে দুয়ে পাঁচ করবার অক্ষমতা বশতঃই শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে দুয়ে দুয়ে চার করেন,—এ কথা বলাও তাই!

সরস্বতীর পৃষ্ঠপোষক হবার জন্য অবশ্য কারও তাঁর মুখদর্শন করবার কোনও দরকার নেই। তবে উক্ত সভাস্থ সমবেত বিদ্বন্মণ্ডলী যে পূর্ব্বোক্ত অত্যুক্তির কোনও প্রতিবাদ করেন নি, তার থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সভ্যদের কারও বিশেষ পরিচয় নেই। না পড়ে পণ্ডিত হওয়ায় বাঙ্গালী ত তার অসাধারণ বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়।

না পড়ে পণ্ডিত হওয়া সম্ভব হলেও, না লিখে লেখক হওয়া যায় কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে;—এবং সেই জন্যই মাসিকপত্রের বংশবৃদ্ধিটি সুখের কিম্বা দুঃখের বিষয়, সে বিষয়ে, আমি মনস্থির করে উঠতে পারি নি।

সাময়িক সাহিত্য যে অপাঠ্য, Oscar Wilde-এর এমত আমাদের গ্রাহ্য কর্‌বার দরকার নেই। মাসিক, সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র সম্বন্ধে Oscar Wilde যে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁর চাইতে ঢের বড় লেখক Charles Lamb সাহিত্য সম্বন্ধে সেই একই মত প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন—"একখানি নতুন বই প্রকাশিত হলে, একখানি পুরোণো বই পড়ো।" এর থেকে বোঝা যায় যে, সেকালের মায়ায় আমরা স্বকালের মর্য্যাদা বুঝতে পারি নে। কারও কারও মতে নব-সাহিত্য রচনা করা আর সরস্বতীর শ্রাদ্ধ করা একই কথা,—তা সে মাসিকই হোক, আর সাংবাৎসরিকই হোক।

তবে বইয়ের সঙ্গে মাসিকপত্রের যে একটা প্রভেদ আছে, তা আমরা সকলেই মান্‌তে বাধ্য। বই লেখে একজনে, আর মাসিকপত্র অনেকে মিলে। এক কথায়, মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরস্বতীর বারোয়ারি পূজো করা। কাজেই ব্যাপারটা অনেক সময়ে গোলে হরিবোলে পরিণত হয়। তারপর, যেখানে চাঁদা করে কার্য্য উদ্ধার কর্‌তে হয়, সেখানে জাতিবিচার করা চলে না—ব্রাহ্মণ শূদ্র সকলের পক্ষে সে উৎসবে যোগদান কর্‌বার সমান অধিকার আছে। গোল ত এই নিয়েই।

সকলে কথা কইতে পারলেও যে গান গাইতে পারে না, হাঁটতে পারলেও যে নাচতে পারে না, এ কথা সকলেই জানেন এবং সকলেই মানেন; কিন্তু অনেকে লিখ্‌তে পারলেও যে "লিখ্‌তে" পারে না—এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি।

"হারিয়ে বসে আছি" বলবার কারণ এই যে, সঙ্গীতের মত লেখা জিনিষটেও যে একটি আর্ট—এ জ্ঞান আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের ছিল। সকল আলঙ্কারিক একবাক্যে বলে গেছেন যে, কাব্য রচনা কর্‌বার জন্য দুটি জিনিষ চাই—প্রথমতঃ প্রাক্তন সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা।

এ কালের অনেক লেখকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যিক হবার জন্য এক-মাত্র প্রাক্তন সংস্কারই যথেষ্ট, শিক্ষা দীক্ষার কোনরূপ আবশ্যক নেই; কেননা তাঁদের লেখা পড়ে বোঝা যায় না, তাঁরা তাঁদের নৈসর্গিকী প্রতিভা ব্যতীত অপর কিসের উপর নির্ভর করেন। মহর্ষি চরকের শিষ্য অগ্নিবেশ বলেছেন যে, যে-সকল চিকিৎসকের গুরুর নাম কেউ জানে না, যাঁদের কোনও সতীর্থ নেই, তাঁরা "দ্বিজিহ্ব বায়ু-ভক্ষকাঃ"। এই শ্রেণীর সাহিত্য-চিকিৎসকের দল যে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই—এবং মাসিকপত্রসকল এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য।

বাঙলাদেশে আজকাল যদিও বা লেখক থাকে ত লেখবার বিষয় বড় একটা নেই। লেখবার সামগ্রীর যে বিশেষ অনটন ঘটেছে তার প্রমাণ, আজকাল কি লেখা উচিত, কি ভাষায় লেখা উচিত, কি ধরণে

লেখা উচিত, এই সব নিয়ে সংগলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। কি সহুরে, কি পাড়াগেঁয়ে, এমন মাসিকপত্র নেই, যা এই পণ্ডিতের বিচারে যোগদান করে নি।

এ সকল তর্কবিতর্কের যে কোনও সার্থকতা নেই—এ কথা আমার মুখে শোভা পায় না। তবে এই সব আলঙ্কারিক-তত্ত্ব নিয়ে এতটা দেশ-জোড়া আন্দোলন হওয়াটাই আক্ষেপের বিষয়। কেননা, এ সব সমস্যার বিচার করতে হলে, প্রথমতঃ—সে বিচার কর্বার শিক্ষা এবং শক্তি থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, যুক্তিযুক্ত তর্ক কর্বার অভ্যাস থাকা আবশ্যক।

কিন্তু ঘটনা হয়েছে অন্যরূপ। নিত্যই দেখ্তে পাই যে, যাঁরা দু ছত্র সোজা করে লিখ্তে পারেন না, তাঁরাও রচনারীতি নিয়ে মস্ত মস্ত আঁকা বাঁকা প্রবন্ধ লেখেন। তারপর দেখ্তে পাই, এই সব লেখকদের ধৈর্য্যের অপেক্ষা বীর্য্য ঢের বেশী। এঁরা যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না,—উপদেশ দেন, আদেশ করেন। সম্ভবতঃ এঁদের বিশ্বাস যে, রাগের মাথায় যে কথা বলা যায়, তা সত্য হতে বাধ্য। এঁরা ভুলে যান যে, ক্রোধান্ধ হ'লে মানুষের দিগ্‌বিদিক্‌জ্ঞান থাকে না।

ফলে, এঁরা সাহিত্যের যে-সব ইঁটপাটকেল কুড়িয়ে পান, তা মাতৃভাষার উপর নিক্ষেপ কর্তে সুরু করেছেন। আমার সুমুখে তিন খানি মাসিকপত্র খোলা রয়েছে—তার একখানিতে মাতৃভাষাকে "কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা (সাহিত্য-সংহিতা), আর একখানিতে "পেত্নিভাষা"

(ভারতী), আর একখানিতে "চণ্ডালী-ভাষা" (উপাসনা) বলা হয়েছে এরকম কথা যাঁরা মুখে আনতে পারেন, তাঁদের কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন, কেননা তাঁরা যে বঙ্গ-সরস্বতীর কতদূর সুসন্তান, তার পরিচয় নিজমুখেই দেন। কিন্তু আমাদের মাসিকপত্রসকল যে এই সব অকথা কুকথা প্রচারের সহায়তা করেন—তার থেকে বোঝা যায় যে, বাঙ্গলার বন্দেমাতরং-যুগ চলে গিয়েছে।

আমাদের লেখবার বিষয় যে বড় একটা নেই, তার অপর প্রমাণ,—বাংলা মাসিকে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য। প্রত্নতত্ত্ব আর যাই হোক—সাহিত্য নয়। ও বস্তু মূল্যবান, এই হিসেবেই যদি প্রত্নতত্ত্বকে মাসিকপত্রে স্থান দেওয়া হয়, তাহলে রত্নতত্ত্বই বা বাদ যায় কেন ?—তবে যদি সম্পাদক মহাশয়েরা বলেন, বাংলার সাহিত্যওয়ালাদের মধ্যে কোনও জহুরি নেই, তাহলে অবশ্য আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে।

মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোট গল্প। এই ছোট গল্প কি ভাবে লেখা উচিত, সে বিষয়েও আজকাল আলোচনা সুরু হয়েছে। এও আর একটি প্রমাণ যে, লেখবার বিষয়ের অভাববশতঃই লেখবার পদ্ধতির বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়।

এ সম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোট-গল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তার পরে ছোট হওয়া চাই,—এ ছাড়া আর কিছুই হওয়া চাই নে।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে "গল্প" কাকে বলে—তার উত্তর "লোকে যা শুন্তে ভালবাসে।" আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন "ছোট" কাকে বলে—তার উত্তর "যা বড় নয়"।

এর উত্তরে পাঠক আপত্তি কর্তে পারেন যে definitionটি তেমন পরিস্কার হ'ল না। এস্থলে আমি ছোট গল্পের তত্ত্ব নির্ণয় কর্বার চেষ্টা কর্‌ছি। এবং আশা করি সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্য দুঃখ কর্‌বারও কোনও কারণ নেই, কেননা সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্য রচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তারপরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাক্‌লেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাক্‌লে সাহিত্য-জগৎ শূন্য হয়ে যায়। এ বিপদ যে সুমুখে নেই, তাও ভরসা করে বলা চলে না। কেননা মাসিকপত্রে লেখবার লোক অনেক থাক্‌লেও, তাঁদের লেখবার বিষয় অনেক নেই,—আর লেখবার বিষয় অনেক থাক্‌লেও, তা লেখবার অনেক লোক নেই। ফল কথা সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি হয় যোগে, আর তার শ্রীবৃদ্ধি হয় গুণে।

বীরবল।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী, এম্, এ, বার-য়্যাট্-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

জাপান-যাত্রীর পত্র।

——:০:——

সেই খিদিরপুরের ঘাট থেকে আরম্ভ করে আর এই হংকং-এর ঘাট পর্য্যন্ত, বন্দরে বন্দরে বাণিজ্যের চেহারা দেখে আসচি! সে যে কি প্রকাণ্ড, এমন করে তাকে চোখে না দেখ্‌লে বোঝা যায় না—শুধু প্রকাণ্ড নয়, সে একটা জবড়জঙ্গ ব্যাপার। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে ব্যাধের আহারের যে বর্ণনা আছে,—সে এক-এক গ্রাসে এক-এক তাল গিল্‌চে, তার ভোজন উৎকট, তার শব্দ উৎকট,—এও সেই রকম। এই বাণিজ্য-ব্যাধটাও হাঁসফাঁস্‌ কর্‌তে কর্‌তে এক-এক পিণ্ড মুখে যা পুরচে, সে দেখে ভয় হয়,—তার বিরাম নেই, আর তার শব্দই বা কি! লোহার হাত দিয়ে মুখে তুলচে, লোহার দাঁত দিয়ে চিবচ্চে, লোহার পাকযন্ত্রে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলে হজম কর্‌চে, এবং লোহার শিরা উপশিরার ভিতর দিয়ে তার জগৎজোড়া কলেবরের সর্ব্বত্র সোণার রক্তস্রোত চালান করে দিচ্চে।

এ'কে দেখে মনে হয় যে এ একটা জন্তু, এ যেন পৃথিবীর প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলোর মত। কেবলমাত্র তার ল্যাজের আয়তন দেখ্‌লেই শরীর আঁৎকে ওঠে! তারপরে সে জলচর হবে, কি স্থলচর হবে, কি পাখী হবে, এখনো তা স্পষ্ট ঠিক হয় নি,—সে খানিকটা সরীসৃপের মত, খানিকটা বাদুড়ের মত, খানিকটা গণ্ডারের মত।

অঙ্গসৌষ্ঠব বল্‌তে যা বোঝায়, তা তার কোথাও কিছুমাত্র নেই। তার গায়ের চামড়া ভয়ঙ্কর স্থূল; তার থাবা যেখানে পড়ে, সেখানে পৃথিবীর গায়ের কোমল সবুজ চামড়া উঠে গিয়ে একেবারে তার হাড় বেরিয়ে পড়ে; চলবার সময় তার বৃহৎ বিরূপ ল্যাজটা যখন নড়তে থাকে, তখন তার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে সংঘর্ষ হয়ে এমন আওয়াজ হতে থাকে যে, দিগঙ্গনারা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে। তারপরে, কেবলমাত্র তার এই বিপুল দেহটা রক্ষা কর্‌বার জন্যে এত রাশি রাশি খাদ্য তার দরকার হয় যে, ধরিত্রী ক্লিষ্ট হয়ে ওঠে। সে যে কেবলমাত্র থাবা থাবা জিনিস খাচ্চে তা নয়, সে মানুষ খাচ্চে,—স্ত্রী পুরুষ ছেলে কিছুই সে বিচার করে না।

কিন্তু জগতের সেই প্রথম যুগের দানব-জন্তুগুলো টিঁক্‌ল না। তাদের অপরিমিত বিপুলতাই পদে পদে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়াতে, বিধাতার আদালতে তাদের প্রাণদণ্ডের বিধান হল। সৌষ্ঠব জিনিসটা কেবলমাত্র সৌন্দর্য্যের প্রমাণ দেয় না, উপযোগিতারও প্রমাণ দেয়। হাঁসফাঁসটা যখন অত্যন্ত বেশী চোখে পড়ে, আয়তনটার মধ্যে যখন কেবলমাত্র শক্তি দেখি, শ্রী দেখিনে,—তখন বেশ বুঝতে পারা যায় বিশ্বের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য নেই; বিশ্বশক্তির সঙ্গে তার শক্তির নিরন্তর সংঘর্ষ হতে হতে, একদিন তাকে হার মেনে হাল ছেড়ে তলিয়ে যেতে হবেই। প্রকৃতির গৃহিণীপনা কখনই কদর্য্য অমিতাচারকে অধিক দিন সইতে পারে না—তার ঝাঁটা এসে পড়ল বলে! বাণিজ্য-দানবটা নিজের বিরূপতায়, নিজের প্রকাণ্ড ভারের মধ্যে নিজের প্রাণদণ্ড বহন কর্‌চে। একদিন আসচে যখন তার লোহার কঙ্কালগুলোকে আমাদের যুগের স্তরের মধ্যে থেকে আবিষ্কার

করে পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা এই সর্ব্বভুক দানবটার অদ্ভুত বিষমতা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ কর্‌বে।

প্রাণীজগতে মানুষের যে যোগ্যতা, সে তার দেহের প্রাচুর্য্য নিয়ে নয়! মানুষের চামড়া নরম, তার গায়ের জোর অল্প, তার ইন্দ্রিয় শক্তিও পশুদের চেয়ে কম বই বেশী নয়। কিন্তু সে এমন একটি বল পেয়েচে যা চোখে দেখা যায় না, যা জায়গা জোড়ে না, যা কোনো স্থানের উপর ভর না করেও সমস্ত জগতে আপন অধিকার বিস্তার কর্‌চে। মানুষের মধ্যে দেহ-পরিধি দৃশ্যজগৎ থেকে সরে গিয়ে অদৃশ্যের মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেচে। বাইবেলে আছে, যে নম্র সেই পৃথিবীকে অধিকার কর্‌বে—তার মানেই হচ্চে নম্রতার শক্তি বাইরে নয়, ভিতরে; সে যত কম আঘাত দেয়, ততই সে জয়ী হয়; সে রণক্ষেত্রে লড়াই করে না; অদৃশ্যলোকে বিশ্বশক্তির সঙ্গে সন্ধি করে সে জয়ী হয়।

বাণিজ্য-দানবকেও একদিন তার দানব-লীলা সম্বরণ করে মানব হতে হবে। আজ এই বাণিজ্যের মস্তিষ্ক কম, ওর হৃদয় ত একেবারেই নেই, সেইজন্যে পৃথিবীতে ও কেবল আপনার ভার বাড়িয়ে চলেচে। কেবলমাত্র প্রাণপণ শক্তিতে আপনার আয়তনকে বিস্তীর্ণতর করে করেই ও জিত্‌তে চাচ্চে। কিন্তু যে একদিন জয়ী হবে; তার আকার ছোট, তার কর্ম্মপ্রণালী সহজ; মানুষের হৃদয়কে, সৌন্দর্য্যবোধকে, ধর্ম্মবুদ্ধিকে সে মানে; সে নম্র, সে সুশ্রী, সে কদর্য্যভাবে লুব্ধ নয়; তার প্রতিষ্ঠা অন্তরের সুব্যবস্থায়, বাইরের আয়তনে না; সে কাউকে বঞ্চিত করে বড় নয়, সে সকলের সঙ্গে সন্ধি করে বড়। আজকের দিনে পৃথিবীতে মানুষের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে

এই বাণিজ্যের অনুষ্ঠান সব চেয়ে কুশ্রী, আপন ভারের দ্বারা পৃথিবীকে সে ক্লান্ত করচে, আপন শব্দের দ্বারা পৃথিবীকে বধির করচে, আপন আবর্জ্জনার দ্বারা পৃথিবীকে মলিন করচে, আপন লোভের দ্বারা পৃথিবীকে আহত করচে। এই যে পৃথিবীব্যাপী কুশ্রীতা, এই যে বিদ্রোহ,—রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ এবং মানব-হৃদয়ের বিরুদ্ধে,—এই যে লোভকে বিশ্বের রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার কাছে দাসখত লিখে দেওয়া, এ প্রতিদিনই মানুষের শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বকে আঘাত করচেই, তার সন্দেহ নেই। মুনফার নেশায় উন্মত্ত হয়ে এই বিশ্বব্যাপী দ্যূত-ক্রীড়ায় মানুষ নিজেকে পণ রেখে কতদিন খেলা চালাবে? এ খেলা ভাঙতেই হবে। যে খেলায় মানুষ লাভ করবার লোভে নিজেকে লোকসান করে চলেচে, সে কখনই চলবে না!

৯ই জ্যৈষ্ঠ। মেঘ বৃষ্টি, বাদল, কুয়াশায় আকাশ ঝাপসা হয়ে আছে—হংকং বন্দরের পাহাড়গুলো দেখা দিয়েছে, তাদের গা বেয়ে বেয়ে ঝরনা ঝরে পড়চে। মনে হচ্চে দৈত্যের দল সমুদ্রে ডুব দিয়ে তাদের ভিজে মাথা জলের উপর তুলেচে, তাদের জটা বেয়ে দাড়ি বেয়ে জল ঝরচে। এণ্ড্রুজ সাহেব বলচেন দৃশ্যটা যেন পাহাড়-ঘেরা স্কটল্যাণ্ডের হ্রদের মত, তেমনিতর ঘন-সবুজ বেঁটে বেঁটে পাহাড়, তেমনিতর ভিজে কম্বলের মত আকাশের মেঘ, তেমনিতর কুয়াসার ন্যাতা বুলিয়ে অল্প অল্প মুছে-ফেলা জলস্থলের মূর্ত্তি। কাল সমস্ত রাত বৃষ্টি বাতাস গিয়েচে—কাল বিছানা আমার ভার বহন করে নি, আমিই বিছানাটাকে বহন করে ডেকের এধার থেকে ওধারে আশ্রয় খুঁজে খুঁজে ফিরেচি। রাত যখন সাড়ে দুপুর হবে, তখন এই বাদলের সঙ্গে মিথ্যা বিরোধ করবার চেষ্টা না করে তাকে প্রসন্ন মনে মেনে

নেবার জন্যে প্রস্তুত হলুম। একধারে দাঁড়িয়ে ঐ বাদ্‌লার সঙ্গে তান মিলিয়েই গান ধরলুম "শ্রাবণের ধারার মত পড়ুক ঝরে।" এমনি করে ফিরে ফিরে অনেকগুলো গান গাইলুম,—বানিয়ে বানিয়ে একটা নতুন গানও তৈরি করলুম,—কিন্তু বাদলের সঙ্গে কবির লড়াইয়ে এই মর্ত্ত্যবাসীকেই হার মান্‌তে হল। আমি অত দম পাব কোথায়, আর আমার কবিত্বের বাতিক যতই প্রবল হোক না, বায়ুবলে আকাশের সঙ্গে পেরে উঠব কেন ?

কাল রাত্রেই জাহাজের বন্দরে পৌঁছবার কথা ছিল, কিন্তু এই-খানটায় সমুদ্রবাহী জলের স্রোত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল, এবং বাতাসও বিরুদ্ধ ছিল, তাই পদে পদে দেরি হতে লাগল। জায়গাটাও সঙ্কীর্ণ এবং সঙ্কটময়। কাপ্তেন সমস্ত রাত জাহাজের উপরতলায় গিয়ে সাবধানে পথের হিসাব করে চলেচেন। আজ সকালেও মেঘবৃষ্টির বিরাম নেই। সূর্য্য দেখা দিল না, তাই পথ ঠিক করা কঠিন। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বেজে উঠ্‌চে, এঞ্জিন থেমে যাচ্চে, নাবিকের দ্বিধা স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে। আজ সকালে আহারের টেবিলে কাপ্তেনকে দেখা গেল না। কাল রাত দুপুরের সময় কাপ্তেন একবার কেবল বর্ষাতি পরে নেমে এসে আমাকে বলে গেলেন, ডেকের কোনো দিকেই শোবার সুবিধা হবে না, কেননা বাতাসের বদল হচ্চে।

এর মধ্যে একটি ব্যাপার দেখে আমার মনে বড় আনন্দ হয়েছিল। জাহাজের উপর থেকে একটা দড়িবাঁধা চামড়ার চোঙে করে মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তোলা। কাল বিকেলে এক সময়ে মুকুলের হঠাৎ জান্‌তে ইচ্ছা হল, এর কারণটা কি ? সে তখনি উপরতলায় উঠে গেল। এই উপরতলাতেই জাহাজের হালের চাকা, এবং

এখানেই পথনির্ণয়ের সমস্ত যন্ত্র। এখানে যাত্রীদের যাওয়া নিষেধ। মুকুল যখন গেল, তখন তৃতীয় অফিসার কাজে নিযুক্ত। মুকুল তাঁকে প্রশ্ন করতেই, তিনি ওকে বোঝাতে সুরু করলেন। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি স্রোতের ধারা বইচে, তাদের উত্তাপের পরিমাণ স্বতন্ত্র। মাঝে মাঝে সমুদ্রের জল তুলে তাপমান দিয়ে পরীক্ষা করে সেই ধারা-পথ নির্ণয় করা দরকার। সেই ধারার ম্যাপ বের করে তাদের গতি-বেগের সঙ্গে জাহাজের গতিবেগের কি রকম কাটাকাটি হচ্চে, তাই তিনি মুকুলকে বোঝাতে লাগ্‌লেন। তাতেও যখন সুবিধা হল না, তখন বোর্ডে খড়ি দিয়ে এঁকে ব্যাপারটাকে যথাসম্ভব সরল করে দিলেন।

কোনো বিলিতি জাহাজে মুকুলের পক্ষে এটা কোনোমতেই সম্ভবপর হত না। সেখানে মুকুলকে অত্যন্ত সোজা করেই বুঝিয়ে দিত যে, ও জায়গায় তার নিষেধ। মোটের উপরে জাপানী অফিসরের সৌজন্য, কাজের নিয়মবিরুদ্ধ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেচি, এই জাপানী জাহাজে কাজের নিয়মের ফাঁক দিয়ে মানুষের গতিবিধি আছে। অথচ নিয়মটা চাপা পড়ে যায় নি, তাও বারবার দেখেচি। জাহাজ যখন বন্দরে স্থির ছিল, যখন উপরতলার কাজ বন্ধ, তখন সেখানে বসে কাজ কর্‌বার জন্যে আমি কাপ্তেনের সম্মতি পেয়েছিলুম। সেদিন পিয়ার্সন সাহেব দুজন ইংরেজ আলাপীকে জাহাজে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ডেকের উপর মাল তোলার শব্দে এগুজ সাহেব বিরক্ত হয়ে হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, উপরের তলায় যাওয়া যাক। আমি বিনা সম্মতিতে এঁদের নিয়ে যাওয়া অন্যায় মনে করে, প্রধান অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলুম,—তিনি তখনি বল্লেন, "না।" নিয়ে

গেলে কাজের ক্ষতি হত না, কেননা কাজ তখন বন্ধ ছিল। কিন্তু নিয়মভঙ্গের একটা সীমা আছে, সে সীমা বন্ধুর পক্ষে যেখানে, অপরিচিতের পক্ষে সেখানে না। উপরের তলা ব্যবহারের সম্মতিতেও আমি যেমন খুসি হয়েছিলুম, তার বাধাতেও তেমনি খুসি হলুম। স্পষ্ট দেখতে পেলুম, এর মধ্যে দাক্ষিণ্য আছে, কিন্তু দুর্ব্বলতা নেই।

বন্দরে পৌঁছবামাত্র জাপান থেকে কয়েকখানি অভ্যর্থনার টেলিগ্রাম ও পত্র পাওয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান অফিসার এসে আমাকে বল্লেন, এ যাত্রায় আমাদের সাঙ্ঘাই যাওয়া হল না, একেবারে এখান থেকে জাপান যাওয়া হবে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন? তিনি বল্লেন, জাপানবাসীরা আপনাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েচে, তাই আমাদের সদর আফিস থেকে টেলিগ্রামে আদেশ এসেচে, অন্য বন্দরে বিলম্ব না করে চলে যেতে। সাঙ্ঘাইয়ের সমস্ত মাল আমরা এই খানেই নামিয়ে দেব—অন্য জাহাজে করে সেখানে যাবে।

এই খবরটি আমার পক্ষে যতই গৌরবজনক হোক, এখানে লেখবার দরকার ছিল না। কিন্তু আমার লেখবার কারণ হচ্চে এই যে, এই ব্যাপারের একটু বিশেষত্ব আছে, সেটা আলোচ্য। সেটা পুনশ্চ ঐ একই কথা। অর্থাৎ ব্যবসার দাবী সচরাচর যে পাথরের পাঁচিল খাড়া করে আত্মরক্ষা করে, এখানে তার মধ্যে দিয়েও মানব সম্বন্ধের আনাগোনার পথ আছে। এবং সে পথ কম প্রশস্ত নয়।

জাহাজ এখানে দিন দুয়েক থাক্‌বে। সেই দু'দিনের জন্যে সহরে নেবে হোটেলে থাকবার প্রস্তাব আমার মনে নিলে না। আমার মত কুঁড়ে মানুষের পক্ষে আরামের চেয়ে বিরাম ভাল;

আমি বলি, সুখের ল্যাঠা অনেক, সোয়াস্তির বালাই নেই। আমি মাল তোলা-নামার উপদ্রব স্বীকার করেও, জাহাজে রয়ে গেলুম। সে জন্যে আমার যে বক্‌শিস্ মেলেনি, তা নয়।

প্রথমেই চোখে পড়ল জাহাজের ঘাটে চীনা-মজুরদের কাজ। তাদের একটা করে নীল পায়জামা পরা এবং গা খোলা। এমন শরীরও কোথাও দেখি নি, এমন কাজও না। একেবারে প্রাণসার দেহ, লেশমাত্র বাহুল্য নেই। কাজের তালে তালে সমস্ত শরীরের মাংসপেশী কেবলি ঢেউ খেলাচ্চে। এরা বড় বড় বোঝাকে এমন সহজে এবং এমন দ্রুত আয়ত্ত কর্‌চে যে, সে দেখে আনন্দ হয়। মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কোথাও অনিচ্ছা, অবসাদ বা জড়ত্বের লেশমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না। বাইরে থেকে তাদের তাড়া দেবার কোন দরকার নেই। তাদের দেহের বীণাযন্ত্র থেকে কাজ যেন সঙ্গীতের মত বেজে উঠ্‌চে। জাহাজের ঘাটে মাল তোলা-নামার কাজ দেখতে যে আমার এত আনন্দ হবে, একথা আমি পূর্ব্বে মনে কর্‌তে পারতুম না। পূর্ণ শক্তির কাজ বড় সুন্দর; তার প্রত্যেক আঘাতে আঘাতে শরীরকে সুন্দর কর্‌তে থাকে, এবং সেই শরীরও কাজকে সুন্দর করে তোলে। এইখানে কাজের কাব্য এবং মানুষের শরী-রের ছন্দ আমার সাম্‌নে বিস্তীর্ণ হয়ে দেখা দিলে। এ কথা জোর করে বল্‌তে পারি, ওদের দেহের চেয়ে কোন স্ত্রীলোকের দেহ সুন্দর হতে পারে না,—কেননা শক্তির সঙ্গে সুষমার এমন নিখুঁৎ সঙ্গতি মেয়েদের শরীরে নিশ্চয়ই দুর্লভ। আমাদের জাহাজের ঠিক সাম্‌নেই আর একটা জাহাজে বিকেলবেলায় কাজকর্ম্মের পর সমস্ত চীনা মাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান কর্‌ছিল,—মানুষের

শরীরের যে কি স্বর্গীয় শোভা, তা আমি এমন করে আর কোনদিন দেখতে পাই নি।

কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূত ভাবে একত্র দেখতে পেয়ে, আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা সমস্ত দেশ জুড়ে সঞ্চিত হচ্চে। এখানে মানুষ পূর্ণপরিমাণে নিজেকে প্রয়োগ করবার জন্যে বহুকাল থেকে প্রস্তুত হচ্চে। যে-সাধনায় মানুষ আপনাকে আপনি ষোলো-আনা ব্যবহার করবার শক্তি পায়, তার কৃপণতা ঘুচে যায়, নিজেকে নিজে কোন অংশে ফাঁকি দেয় না,—সে যে মস্ত সাধনা। চীন সুদীর্ঘকাল সেই সাধনায় পূর্ণভাবে কাজ করতে শিখেচে, সেই কাজের মধ্যেই তার নিজের শক্তি উদারভাবে আপনার মুক্তি এবং আনন্দ পাচ্চে ;—এ একটি পরিপূর্ণতার ছবি। চীনের এই শক্তি আছে বলেই আমেরিকা চীনকে ভয় করেচে—কাজের উদ্যমে চীনকে সে জিত্‌তে পারে না, গায়ের জোরে তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়।

এই এতবড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে, অর্থাৎ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন্ শক্তি আছে? তখন তার কর্ম্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে। এখন যে-সব জাতি পৃথিবীর সম্পদ ভোগ করচে, তারা চীনের সেই অভ্যু-ত্থানকে ভয় করে, সেই দিনকে তারা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে চায়। কিন্তু যে জাতির যে দিকে যতখানি বড় হবার শক্তি আছে, সে দিকে তাকে ততখানি বড় হয়ে উঠ্‌তে দিতে বাধা-দেওয়া যে স্বজাতিপূজা থেকে জন্মেছে, তার মত এমন সর্ব্বনেশে পূজা জগতে আর কিছুই

নেই। এমন বর্ব্বর-জাতির কথা শোনা যায়, যারা নিজের দেশের দেবতার কাছে পরদেশের মানুষকে বলি দেয়,—আধুনিক কালের স্বজাতীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশী ভয়ানক জিনিস, সে নিজের ক্ষুধার জন্যে এক-একটা জাতিকে-জাতি দেশকে-দেশ দাবী করে।

আমাদের জাহাজের বাঁ পাশে চীনের নৌকার দল। সেই নৌকাগুলিতে স্বামী স্ত্রী এবং ছেলে মেয়ে সকলে মিলে বাস কর্‌চে এবং কাজ কর্‌চে। কাজের এই ছবিই আমার কাছে সকলের চেয়ে সুন্দর লাগ্‌ল। কাজের এই মূর্ত্তিই চরম মূর্ত্তি, একদিন এরই জয় হবে। না যদি হয়,—বাণিজ্যদানব যদি মানুষের ঘর ঘরকর্‌না, স্বাধীনতা সমস্তই গ্রাস করে চল্‌তে থাকে, এবং বৃহৎ এক দাস-সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করে তুলে তারই সাহায্যে অল্প কয়জনের আরাম এবং স্বার্থ সাধন কর্‌তে থাকে, তাহলে পৃথিবী রসাতলে যাবে। এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে, সকলে মিলে কাজ কর্‌বার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখ্‌তে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারোআনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্চে। এমন সব নিয়মের জাল, যাতে মানুষ কেবলি বেধে-বেধে গিয়ে জড়িয়ে-জড়িয়ে পড়েই নিজের অধিকাংশ শক্তির বাজে খরচ করে এবং বাকি অধিকাংশকে কাজে খাটাতে পারে না;—এমন বিপুল জটিলতা এবং জড়তার সমাবেশ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। চারিদিকে কেবলি জাতির সঙ্গে জাতির বিচ্ছেদ, নিয়মের সঙ্গে কাজের বিরোধ, আচার-ধর্ম্মের সঙ্গে কাল-ধর্ম্মের দ্বন্দ্ব।

তোসা-মারু

চীন-সমুদ্র

*১৬ জ্যৈষ্ঠ। আজ জাহাজ জাপানের "কোবে" বন্দরে পৌঁছবে। কয়দিন বৃষ্টিবাদলের বিরাম নেই। মাঝে মাঝে জাপানের ছোট ছোট দ্বীপ আকাশের দিকে পাহাড় তুলে সমুদ্র যাত্রীদের ইসারা কর্‌চে—কিন্তু বৃষ্টিতে কুয়াশাতে সমস্ত ঝাপসা ;—বাদ্‌লার হাওয়ায় সর্দ্দিকাশি হয়ে গলা ভেঙে গেলে তার আওয়াজ যেরকম হয়ে থাকে, ঐ দ্বীপগুলোর সেইরকম ঘোরতর সর্দ্দির আওয়াজের চেহারা। বৃষ্টির ছাঁট এবং ভিজে হাওয়ার তাড়া এড়াবার জন্যে, ডেকের এধার থেকে ওধারে চৌকি টেনে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চি।

আমাদের সঙ্গে যে জাপানী যাত্রী দেশে ফির্‌চেন, তিনি আজ ভোরেই তাঁর ক্যাবিন ছেড়ে একবার ডেকের উপর উঠে এসেচেন, জাপানের প্রথম অভ্যর্থনা গ্রহণ কর্‌বার জন্যে। তখন কেবল একটি মাত্র ছোট নীলাভ পাহাড় মানসসরোবরের মস্ত একটি নীল পদ্মের কুঁড়িটির মত জলের উপরে জেগে রয়েচে। তিনি স্থির নেত্রে এই-টুকু কেবল দেখে নীচে নেবে গেলেন, তাঁর সেই চোখে ঐ পাহাড়টুকুকে দেখা আমাদের শক্তিতে নেই—আমরা দেখচি নূতনকে, তিনি দেখ্‌চেন তাঁর চিরন্তনকে, আমরা অনেক তুচ্ছকে বাদ দিয়ে দিয়ে দেখচি, তিনি ছোট বড় সমস্তকেই তাঁর এক বিরাটের অঙ্গ করে দেখ্‌চেন,—এই জন্যেই ছোটও তাঁর কাছে বড়, ভাঙাও তাঁর কাছে জোড়া ; অনেক তাঁর কাছে এক। এই দৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি।

জাহাজ যখন একেবারে বন্দরে এসে পৌঁছল, তখন মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য্য উঠেচে। বড় বড় জাপানী অপ্সরা নৌকো, আকাশে পাল উড়িয়ে দিয়ে, যেখানে বরুণদেবের সভাপ্রাঙ্গণে সূর্য্যদেবের

নিমন্ত্রণ হয়েচে, সেইখানে নৃত্য করচে। প্রকৃতির নাট্যমঞ্চে বাদলার যবনিকা উঠে গিয়েচে,—ভাবলুম এইবার ডেকের উপরে রাজার হালে বসে, সমুদ্রের তীরে জাপানের প্রথম প্রবেশটা ভাল করে দেখে নিই।

কিন্তু সে কি হবার জো আছে? নিজের নামের উপমা গ্রহণ করতে যদি কোনো অপরাধ না থাকে, তাহলে বলি আমার আকাশের মিতা যখন খালাস পেয়েচেন, তখন আমার পালা আরম্ভ হল। আমার চারিদিকে একটু কোথাও ফাঁক দেখতে পেলুম না। খবরের কাগজের চর তাদের প্রশ্ন এবং তাদের ক্যামেরা নিয়ে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কোবে সহরে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় বণিক আছেন, তার মধ্যে বাঙ্গালীর ছিটেফোঁটাও কিছু পাওয়া যায়। আমি হংকং সহরে পৌঁছেই এই ভারতবাসীদের টেলিগ্রাম পেয়েছিলুম, তাঁরাই আমার আতিথ্যের ব্যবস্থা করেচেন। তাঁরা জাহাজে গিয়ে আমাকে ধরলেন। ওদিকে জাপানের বিখ্যাত চিত্রকর টাইকন এসে উপস্থিত। ইনি যখন ভারতবর্ষে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। কাট্‌সুটাকেও দেখা গেল, ইনিও আমাদের চিত্রকর বন্ধু। সেই সঙ্গে সানো এসে উপস্থিত,—ইনি এককালে আমাদের শান্তিনিকেতন আশ্রমে জুজুৎসু ব্যায়ামের শিক্ষক ছিলেন। এর মধ্যে কাওয়াগুচিরও দর্শন পাওয়া গেল। এটা বেশ স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, আমাদের নিজের ভাবনা আর ভাবতে হবে না। কিন্তু দেখতে পেলুম সেই ভাবনার ভার অনেকে মিলে যখন গ্রহণ করেন, তখন ভাবনার আর অন্ত থাকে না। আমাদের প্রয়োজন অল্প, কিন্তু আয়োজন তার চেয়ে অনেক বেশী হয়ে উঠল। জাপানী পক্ষ থেকে তাঁদের ঘরে নিয়ে যাবার জন্যে

আমাকে টানাটানি করতে লাগলেন—কিন্তু ভারতবাসীর আমন্ত্রণ আমি পূর্ব্বেই গ্রহণ করেচি। এই নিয়ে বিষম একটা সঙ্কট উপস্থিত হল! কোনো পক্ষই হার মানতে চান না। বাদ বিতণ্ডা বচসা চলতে লাগল। আবার এরই সঙ্গে সঙ্গে সেই খবরের কাগজের চরের দল আমার চারিদিকে পাকখেয়ে বেড়াতে লাগল। দেশ ছাড়বার মুখে বঙ্গসাগরে পেয়েছিলুম বাতাসের সাইক্লোন, এখানে জাপানের ঘাটে এসে পৌঁছেই পেলুম মানুষের সাইক্লোন! দুটোর মধ্যে যদি বাছাই করতেই হয়, আমি প্রথমটাই পছন্দ করি। খ্যাতি জিনিসের বিপদ এই যে, তার মধ্যে যতটুকু আমার দরকার কেবলমাত্র সেইটুকুই গ্রহণ করেই নিষ্কৃতি নেই, তার চেয়ে অনেক বেশী নিতে হয়; সেই বেশীটুকুর বোঝা বিষম বোঝা। অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টির মধ্যে কোনটা যে ফসলের পক্ষে বেশী মুস্কিল জানিনে।

এখানকার একজন প্রধান গুজরাটি বণিক মোরারজি—তাঁরই বাড়ীতে আশ্রয় পেয়েচি। সেই সব খবরের কাগজের অনুচররা এখানে এসেও উপস্থিত। বহুকষ্টে ব্যূহ ভেদ করে বেড়াতে পেরেচি।

এই উৎপাতটা আশা করিনি। জাপান যে নতুন মদ পান করেচে, এই খবরের কাগজের ফেনিলতা তারই একটা অঙ্গ। এত ফেনা আমেরিকাতেও দেখি নি। এই জিনিসটা কেবলমাত্র কথার হাওয়ার বুদ্বুদপুঞ্জ;—এতে কারো সত্যকার প্রয়োজনও দেখি নে, আমোদও বুঝিনে;—এতে কেবলমাত্র পাত্রটার মাথা শূন্যতায় ভর্ত্তি করে দেয়, মাদকতার ছবিটাকে কেবল চোখের সামনে প্রকাশ করে। এই মাৎলামিটাই আমাকে সব চেয়ে পীড়া দেয়। যাক্‌গে।

মোরারজির বাড়ীতে আহারে আলাপে অভ্যর্থনায় কাল রাত্তিরটা কেটেচে। এখানকার ঘরকন্নার মধ্যে প্রবেশ করে' সব চেয়ে চোখে পড়ে জাপানী দাসী! মাথায় একখানা ফুলোওঠা খোঁপা, গাল দুটো ফুলো ফুলো, চোখ দুটো ছোট, নাকের একটুখানি অপ্রতুলতা, কাপড় বেশ সুন্দর, পায়ে খড়ের চটি; কবিরা সৌন্দর্য্যের যেরকম বর্ণনা করে থাকেন, তার সঙ্গে অনৈক্য ঢের; অথচ মোটের উপর দেখতে ভাল লাগে; যেন মানুষের সঙ্গে পুতুলের সঙ্গে, মাংসের সঙ্গে মোমের সঙ্গে মিশিয়ে একটা পদার্থ; আর সমস্ত শরীরে ক্ষিপ্রতা, নৈপুণ্য, বলিষ্ঠতা। গৃহস্বামী বলেন, এরা যেমন কাজের, তেমনি এরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমি আমার অভ্যাস বশতঃ ভোরে উঠে জানালার বাইরে চেয়ে দেখলুম, প্রতিবেশীদের বাড়ীতে ঘরকন্নার হিল্লোল তখন জাগ্‌তে আরম্ভ করেচে—সেই হিল্লোল মেয়েদের হিল্লোল। ঘরে ঘরে এই মেয়েদের কাজের ঢেউ এমন বিচিত্র বৃহৎ এবং প্রবল করে সচরাচর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা দেখলেই বোঝা যায় এমন স্বাভাবিক আর কিছু নেই। দেহযাত্রা জিনিসটার ভার আদি থেকে অন্ত পর্য্যন্ত মেয়েদেরই হাতে,—এই দেহযাত্রার আয়োজন উদ্যোগ মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক এবং সুন্দর। কাজের এই নিয়ত তৎপরতায় মেয়েদের স্বভাব যথার্থ মুক্তি পায় বলে শ্রীলাভ করে। বিলাসের জড়তায় কিম্বা যে কারণেই হোক্, মেয়েরা যেখানে এই কর্ম্মপরতা থেকে বঞ্চিত হয়, সেখানে তাদের বিকার উপস্থিত হয়, তাদের দেহমনের সৌন্দর্য্য হানি হতে থাকে, এবং তাদের যথার্থ আনন্দের ব্যাঘাত ঘটে। এই যে এখানে সমস্তক্ষণ ঘরে ঘরে ক্ষিপ্রবেগে মেয়েদের

হাতের কাজের স্রোত অবিরত বইচে, এ আমার দেখতে ভারি সুন্দর লাগ্‌চে। মাঝে মাঝে পাশের ঘর থেকে এদের গলার আওয়াজ এবং হাসির শব্দ শুন্‌তে পাচ্চি, আর মনে মনে ভাব্‌চি মেয়েদের কথা ও হাসি সকল দেশেই সমান। অর্থাৎ সে যেন স্রোতের জলের উপরকার আলোর মত একটা ঝিকিমিকি ব্যাপার, জীবন-চাঞ্চল্যের অহেতুক লীলা।

কোবে।

জাপান। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বড়বাবুর বড়দিন।

—:০:—

বড়দিনের ছুটিতে বড়বাবু যে কেন থিয়েটার দেখ্‌তে যান,—যে কাজ তিনি ইতিপূর্ব্বে এবং অতঃপর কখনও করেন নি, সেই একদিনের জন্য সে কাজ তিনি যে কেন করেন,—তার ভিতর অবশ্য একটু রহস্য আছে। তিনি যে আমোদপ্রিয় নন্, এ সত্য এতই স্পষ্ট যে, তাঁর শক্রুরাও তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ত। তিনি বাঁধাবাঁধি নিয়মের অতিশয় ভক্ত ছিলেন, এবং নিজের জীবনকে বাঁধা নিয়মের সম্পূর্ণ অধীন করে নিয়ে এসেছিলেন। পোনেরো বৎসরের মধ্যে তিনি একদিনও আপিস কামাই করেন নি, একদিনও ছুটি নেন্ নি, এবং প্রতিদিন দশটা পাঁচটা ঘাড়গুঁজে একমনে খাতা লিখে এসেছেন। আপিসের বড়সাহেব Mr. Schleiermacher বল্‌তেন, " 'ফবানী' মানুষ নয়—কলের মানুষ; ও দেহে বাঙ্গালী হলেও, মনে খাঁটি জর্ম্মাণ"। বলা বাহুল্য যে, "ফবানী" হচ্ছে ভবানীরই জর্ম্মাণ সংস্করণ। এই গুণেই, এই যন্ত্রের মত নিয়মে চলার দরুণই, তিনি অল্প বয়সে আপিসের বড়বাবু হয়ে ওঠেন। সে সময়ে তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের বেশী ছিল না, যদিচ দেখ্‌তে মনে হত যে, তিনি পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। চোখের এরকম ভুল হবার কারণ এই যে, অপর্য্যাপ্ত এবং অতিপ্রবৃদ্ধ দাড়িগোঁফে, তাঁর মুখে বয়সের অঙ্ক সব চাপা পড়ে গিয়েছিল। বড়বাবু যে সকলপ্রকার সখসাধ আমোদআহ্লাদের প্রতি শুধু বীতরাগ নয়, বীতশ্রদ্ধও ছিলেন, তার কারণ আমোদ

জিনিসটে কোনরূপ নিয়মের ভিতর পড়ে না। বরং ও বস্তুর ধর্ম্মই হচ্ছে, সকলপ্রকারের নিয়ম ভঙ্গ করা। "রূটীন" করে আমোদ করা যে কাজ করারই সামিল, এ কথা সকলেই মানতে বাধ্য। উৎসব ব্যাপারটি অবশ্য নিত্যকর্ম্মের মধ্যে নয়, এবং যে কর্ম্ম নিত্যকর্ম্ম নয় এবং হতে পারে না, তাকে বড়বাবু ভালবাসতেন না, ভয় করতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সুচারুরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌বার একমাত্র উপায় হচ্ছে জীবনটাকে দৈনন্দিন করে তোলা; অর্থাৎ সেই জীবন আদর্শ জীবন, যার দিনগুলো কলে-তৈরি জিনিসের মত, একটি ঠিক আর একটির মত।

বৈচিত্র্য না থাক্‌লেও, বড়বাবুর জীবন যে নিরানন্দ ছিল, তা নয়। তাঁর গৃহের কৌটায় এমন একটি অমূল্য রত্ন ছিল, যার উপর তাঁর হৃদয় মন দিবারাত্র পড়ে থাক্‌ত। তাঁর স্ত্রী ছিল পরমা সুন্দরী। বাপ মা তার নাম রেখেছিলেন পটেশ্বরী। এ নামের সার্থকতা সম্বন্ধে তার পিতৃকুলের তার মাতৃকুলের কেউ কখন সন্দেহ প্রকাশ করেন নি; তাঁরা সকলেই একবাক্যে বল্‌তেন, এ হেন রূপ পটের ছবিতেই দেখা যায়, রক্তমাংসের শরীরে দেখা যায় না,—এমন কি চাকরদাসীরাও পটেশ্বরীকে আরমানির বিবির সঙ্গে তুলনা কর্‌ত। বড়বাবুর তাদৃশ সৌন্দর্য্যবোধ না থাক্‌লেও, তাঁর স্ত্রী যে সুন্দরী—শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী,— এ বোধ তাঁর যথেষ্ট ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তিনি অবশ্য তাঁর স্ত্রীর রূপবর্ণনা কর্‌তে পার্‌তেন না, কেননা বড়বাবু আর যাই হ'ন,—কবিও নন্, চিত্রকরও নন্। তা ছাড়া বড়বাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনও ভাল করে খুঁটিয়ে দেখেন নি। একটি প্রাকৃত কবি বলেছেন যে, তাঁর প্রিয়ার সমগ্ররূপ কেউ কখন দেখ্‌তে পায় নি; কেননা যার চোখ তার যে অঙ্গে প্রথম পড়েছে, সেখান থেকে আর উঠতে পারে নি।

সম্ভবতঃ ঐ কারণে বড়বাবুর মুগ্ধনেত্রে পটেশ্বরীর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত কখন আয়ত্ত করতে পারে নি। বড়বাবু জানতেন যে, তাঁর স্ত্রীর গায়ের রঙ কাঁচা সোনার মত, আর তার চোখদুটি সাত রাজার ধন কালো মাণিকের মত। এই রূপের অলৌকিক আলোতেই তাঁর সমস্ত নয়ন মন পূর্ণ করে রেখেছিল। বড়বাবুর বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলেই তিনি এ হেন স্ত্রীরত্ন লাভ করেছেন। এই শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা যে পথ ভুলে তাঁর হাতে এসে পড়েছে এবং তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি হয়েছে, এ মনে করে' তাঁর আনন্দের আর অবধি ছিল না।

কিন্তু মানুষের যা অত্যন্ত সুখের কারণ, প্রায়ই তাই তার নিতান্ত অসুখের কারণ হয়ে ওঠে। এ স্ত্রী নিয়ে বড়বাবুর মনে সুখ থাকলেও সোয়াস্তি ছিল না। দরিদ্রের ঘরে কোহিনুর থাকলে তার রাত্তিরে ঘুম হওয়া অসম্ভব। বড়বাবুর অবস্থাও ঠিক তাই হয়েছিল। এ রত্ন হারাবার ভয় মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁর মনকে ছেড়ে যেত না, তাই তিনি সকালসন্ধ্যা কিসে তা রক্ষা করা যায়, সেই ভাবনা সেই চিন্তাতে-মগ্ন থাকতেন। আপিসের কাজে তন্ময় থাকাতে, কেবলমাত্র দশটা-পাঁচটা তিনি এই দুর্ভাবনা থেকে অব্যাহতি লাভ করতেন। বড়বাবুর যদি আপিস না থাকত, তাহলে বোধহয় তিনি ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতেন।

বড়বাবুর মনে তাঁর স্ত্রীর সম্বন্ধে নানরূপ সন্দেহের উদয় হত। অথচ সে সন্দেহের কোনও স্পষ্ট কারণ ছিল না। কিন্তু তার থেকে তিনি কোনরূপ সান্ত্বনা পেতেন না,—কেননা অস্পষ্ট ভয় অস্পষ্ট ভাবনাই আমাদের মনকে সব চাইতে বেশী পেয়ে বসে এবং বেশী চেপে ধরে। তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহ করবার কোনরূপ বৈধ কারণ না থাকলেও, বড়বাবুর মনে

তার স্বপক্ষে অনেকগুলি ছোটখাট কারণ ছিল। প্রথমতঃ, সাধারণত স্ত্রী-জাতির প্রতি তাঁর অবিশ্বাস ছিল। "বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ" এ বাক্যের প্রথম অংশ তিনি বেদবাক্য স্বরূপে মানতেন। তারপর তাঁর ধারণা ছিল যে, রূপ আর চরিত্র প্রায় একাধারে পাওয়া যায় না। তারপর তাঁর শ্বশুরপরিবারের অন্ততঃ পুরুষদের চরিত্রবিষয়ে তেমন সুনাম ছিল না। পাটের কারবারে হঠাৎ অগাধ পয়সা করায়, সে পরিবারের মাথা অনেকটা বিগড়ে গিয়েছিল; ফলে, তাঁর শ্বশুরবাড়ীর হালচাল অসম্ভবরকম বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর শ্যালক তিনটি যে আমোদ আহ্লাদ নিয়েই দিন কাটাতেন, এ কথা ত সহরসুদ্ধ লোক জানত,—এবং এদের ভাইবোনের ভিতর যে পরস্পরের অত্যন্ত মিল ছিল, সে সত্য বড়বাবুর নিকট অবিদিত ছিল না। ভাইদের সঙ্গে দেখা হলে পটেশ্বরীর মুখ হাসিতে ভরে উঠত, তাদের সঙ্গে তার কথা আর ফুরত না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে অনর্গল বকে যেত, আর হেসে কুটি কুটি হত। এ সব সময়ে বড়বাবু অবশ্য উপস্থিত থাকতেন না, তাই এদের কি যে কথা হত, তা তিনি জানতেন না। কিন্তু তিনি ধরে রেখেছিলেন যে, তখন যা বলা কওয়া হত, সে সব নেহাৎ বাজে কথা। ভাইদের সঙ্গে এই হাসি তামাসা, তিনি পটেশ্বরীর চরিত্রের আমোদ-প্রিয়তার লক্ষণ বলেই মনে করতেন। এ অবশ্য তাঁর মোটেই ভাল লাগত না। বড়বাবুর স্বভাবটি যেমন চাপা, পটেশ্বরীর স্বভাব ছিল তেমনি খোলা। তার চালচলন কথাবার্ত্তার ভিতর প্রাণের যে সহজ সরল স্ফূর্ত্তি ছিল—বড়বাবু তাকে চঞ্চলতা বলতেন, এবং এই চঞ্চলতাকে তিনি বিশেষ ভয় করতেন। তারপর পটেশ্বরীর কোনও সন্তানাদি হয় নি, সুতরাং তার যৌবনের কোনও ক্ষয় হয় নি। যদিচ তখন তার বয়স চব্বিশ বৎসর,

তবুও দেখ্‌তে তাকে ষোলোর বেশী দেখাত না, এবং তার স্বভাব ও মনোভাবও ঐ ষোলো বৎসরের অনুরূপই ছিল। বড়বাবুর পক্ষে বিশেষ কষ্টের বিষয় এই ছিল যে, এই সব ভয় ভাবনা তাঁকে নিজের মনেই চেপে রাখ্‌তে হ'ত। পটেশ্বরীর কোন কাজে বাধা দেওয়া কিম্বা তাকে কোনও কথা বলা, বড়বাবুর সাহসে কখনও কুলোয় নি। এমন কি, বাঙ্গালী ঘরের মেয়ের পক্ষে, বিশেষতঃ ভদ্রমহিলার পক্ষে, শিশ্‌ দেওয়াটা যে দেখ্‌তেও ভাল দেখায় না, শুন্‌তেও ভাল শোনায় না,—এই সহজ কথাটাও বড়বাবু তাঁর স্ত্রীকে কখনও মুখফুটে বল্‌তে পারেন নি! তার প্রথম কারণ, পটেশ্বরী বড়মানুষের মেয়ে,—শুধু তাই নয়, একমাত্র কন্যা। বাপ মা ভাইদের আদর পেয়ে পেয়ে, সে অত্যন্ত অভিমানী হয়ে উঠেছিল—একটি রূঢ় কথাও তার গায়ে সইত না, অনাদরের ঈষৎ স্পর্শে তার চোখ জলে ভরে আস্‌ত। আর পটেশ্বরীর চোখের জল দেখবার শক্তি আর যারই থাক্‌—বড়বাবুর দেহে ছিল না। তা ছাড়া দেবতার গায়ে হস্তক্ষেপ করতে মানুষমাত্রেরই সঙ্কোচ হয়, ভয় হয়,—এবং তাঁর শ্যালকদের বিশ্বাস অন্যরূপ হলেও, তিনি মনুষ্যত্ববর্জ্জিত ছিলেন না। সে যাই হোক, বড়বাবুর মনে শান্তি ছিল না বলে যে সুখ ছিল না,—এ কথা সত্য নয়। বিপদের ভয় না থাক্‌লে মানুষে সম্পদের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই সব ভয় ভাবনাই বড়বাবুর স্বভাবতঃ-ঝিমন্ত মনকে সজাগ, সচেতন ও সতর্ক করে রেখেছিল। তা ছাড়া পটেশ্বরা সম্বন্ধে তাঁর ভয় যে অলীক এবং তাঁর সন্দেহ যে অকারণ, এ জ্ঞান অন্ততঃ দিনে একবার করেও তাঁর মনে উদয় হত—এবং তখন তাঁর মন কোজাগর পূর্ণিমার রাতের মত প্রসন্ন ও প্রফুল্ল হয়ে উঠত।

বড়বাবুর মনে শুধু দুটি ভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল, স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ, আর ব্রাহ্মসমাজের প্রতি রাগ। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি অবশ্য তাঁর কোনরূপ বিদ্বেষ ছিল না, কেননা তিনি ধর্ম্ম নিয়ে কখনও মিছে মাথা বকান নি। দেবতা এক কি বহু, ঈশ্বর আছেন কি নেই,—যদি থাকেন, তাহলে তিনি সাকার কি নিরাকার, ব্রহ্ম সগুণ কি নির্গুণ, দেহাতিরিক্ত আত্মা নামক কোনও পদার্থ আছে কি না, থাকলেও তার স্বরূপ কি,—এ সকল সমস্যা তাঁর মনকে কখনও ব্যতিব্যস্ত করে নি, তাঁর নিদ্রার এক রাত্তিরের জন্যও ব্যাঘাত করে নি। তিনি জানতেন যে, বিশ্বের হিসাবের খতিয়ান করবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নি। তবে এর থেকে অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন। আমাদের অধিকাংশ লোকের ভূতপ্রেত সম্বন্ধে যে মনোভাব, ঠাকুর দেবতা সম্বন্ধে বড়বাবুর ঠিক সেইরূপ মনোভাব ছিল; অর্থাৎ তিনি তাদের অস্তিত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, পূরো ভয় করতেন। আফিসের হয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে হলে, তিনি কালিঘাটে আগে পূজো দিয়ে পরে আদালতে আস্‌তেন,—এই উদ্দেশ্যে যে মা কালী তাঁকে জেরার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

ব্রাহ্ম সমাজের ধর্ম্মমত নয়, সামাজিক মতামতের বিরুদ্ধেই তাঁর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা, যৌন-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ—এ সকল কথা শুনে তিনি কাণে হাত দিতেন। এ সব মত যারা প্রচার করে, তারা যে সমাজের ঘোর শত্রু—সে বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। তাঁর নিজের পক্ষে কি ভালমন্দ, তারই হিসেব থেকে তিনি সমাজের পক্ষে কি ভালমন্দ তাই স্থির করতেন। স্ত্রী-স্বাধীনতা? তাঁর স্ত্রীকে স্বাধীনতা

দিলে কি প্রলয় কাণ্ড হবে, সে কথা মনে করতেও তাঁর আতঙ্ক উপস্থিত হ'ত! যিনি নিজের স্ত্রীরত্নকে সামলে রাখবার জন্য ছাদের উপরে ছ-হাত উঁচু দরমার বেড়ার ঘের দিয়েছিলেন, যাতে করে তাঁর বাড়ীর ভিতর পাড়াপড়শির নজর না পড়ে—তাঁর কাছে অবশ্য স্ত্রীকে স্বাধীনতা দেওয়া আর ঘরভাঙ্গা—দুইই এক কথা। তার পর স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধেও তাঁর ঘোরতর আপত্তি ছিল। স্ত্রী জাতির শরীরের অপেক্ষা মনকে স্বাধীনতা দেওয়া যে কম বিপজ্জনক, এ ভুল ধারণা তাঁর ছিল না। তিনি এই সার বুঝেছিলেন যে, স্ত্রীলোককে লেখাপড়া শেখানোর অর্থ হচ্ছে, বাইরের লোকের এবং বাজে লোকের মনের সঙ্গে তার মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিয়ে দেওয়া। পটেশ্বরী যে সামান্য লেখাপড়া জানত, তার কুফল ত তিনি নিত্যই চোখে দেখতে পেতেন। তিনি তাকে যত ভাল ভাল বই কিনে দিতেন, যাতে নানারূপ সদুপদেশ আছে—পটেশ্বরী তার দুই এক পাতা পড়ে ফেলে দিত; আর সে বাপের বাড়ী থেকে যে সব বাজে গল্পের বই নিয়ে আসত—দিনমান বসে বসে তাই গিলত। সে সব কেতাবে কি লেখা আছে তা না জানলেও, বড়বাবু এটা নিশ্চিত জানতেন যে, তাতে যা আছে, তা কোনও বইয়ে থাকা উচিত নয়। স্ত্রীলোকের অল্প লেখাপড়ার ভোগ যদি মানুষকে এইরকম ভুগতে হয়, তাহলে তাদের বেশী লেখাপড়ার ফলে যে সর্ব্বনাশ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি?—তারপর যৌন বিবাহ। যৌন বিবাহের প্রচলনের সঙ্গে যে স্বেচ্ছাবিবাহের প্রবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী, এ জ্ঞান বড়বাবুর ছিল। আমাদের সমাজে যদি স্বেচ্ছাবিবাহের প্রথা প্রচলিত থাকত, তাহলে বড়বাবুর দশা কি হ'ত! পটেশ্বরী যে স্বয়ংবরা সভায় তাঁর গলায় মালা দিতেন না, এ বিষয়ে বড়-

বাবু নিঃসন্দেহ ছিলেন। বড়বাবুর যে রূপ নেই, সে জ্ঞান তাঁর ছিল,—কেননা তাঁর সর্ব্বাঙ্গ সেই অভাবের কথা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা কর্‌ত; এবং পটেশ্বরী যে মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা বোঝে না—এ সত্যের পরিচয় তিনি বিবাহাবধি পেয়ে এসেছেন। পটেশ্বরী যে মানুষের চাইতে কুকুর বিড়াল, লাল-মাছ, সাদা-ইঁদুর, ছাই-রঙের কাকাতুয়া, নীল-রঙের পায়রা বেশী ভালবাসত, তার প্রমাণ ত তাঁর গৃহাভ্যন্তরেই ছিল। বাপের পয়সায় তাঁর স্ত্রী তাঁর অন্দরমহলটি একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানায় পরিণত করেছিল। তারপর বিধবা-বিবাহের কথা মনে কর্‌তে বড়বাবুর সর্ব্বাঙ্গ শিউরে উঠত। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি স্বর্গারোহণ কর্‌লে পটেশ্বরী যদি পত্যন্তর গ্রহণ করে, আর সে সংবাদ যদি স্বর্গে পৌঁছয়, তাহলে সেই মুহূর্ত্তে স্বর্গ নরক হয়ে উঠবে।

(২)

বড়বাবুর মনের এই দুটি প্রধান প্রবৃত্তি, এই অনুরাগ আর এই বিরাগ, একজোট হয়ে তাঁকে বড়দিনে থিয়েটারে নিয়ে যায়; নচেৎ সখ করে তিনি অর্থ এবং সময়ের ওরূপ অপব্যয় কখনও কর্‌তেন না।

বড়দিনের ছুটিতে পটেশ্বরী তার বাপের বাড়ী গিয়েছিল। আপিসের কাজ নেই, ঘরে স্ত্রী নেই,—অর্থাৎ বড়বাবুর জীবনের যে দুটি প্রধান অবলম্বন, দুই এক সঙ্গে হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে, তাঁর কাছে পৃথিবী খালি হয়ে গিয়েছিল। স্ত্রী ঘরে থাকলেও ছুটির দিনে বড়বাবু অবশ্য বাড়ীর ভিতর বসে থাক্‌তেন না। তবে এক ঘরে ফুল থাকলে তার পাশের ঘরটিকে তার সৌরভে যেমন পূর্ণ করে রাখে,

তেমনি—পটেশ্বরী অন্তঃপুরে থাকলেও—অদৃশ্য ফুলের গন্ধের মত তার অদৃশ্য দেহের রূপে বড়বাবুর গৃহের ভিতর বার পূর্ণ করে রাখ্‌ত। প্রতিমা অন্তর্হিত হলে মন্দিরের যে অবস্থা হয়—পটেশ্বরীর অভাবে তাঁর গৃহের অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

বড়বাবু এই শূন্য মন্দিরে কি করে দিন কাটাবেন, তা আর ভেবে পেতেন না। প্রথমতঃ, তাঁর কোনও বন্ধুবান্ধব ছিল না,—তিনি কারও সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন না। গল্পকরা কিম্বা তাস পাশা খেলা, এ সব তাঁর ধাতে ছিল না। তারপর তাঁর বাড়ীতে কোনও ভদ্রলোক আসা তিনি নিতান্ত অপছন্দ করতেন। তাঁর স্ত্রীর স্বভাবে কৌতূহল জিনিসটে কিঞ্চিৎ বেশীমাত্রায় ছিল; তার স্বামীর কাছে কোনও লোক এলে, পটেশ্বরী খড়খড়ের ভিতর দিয়ে উঁকিঝুঁকি না মেরে থাকতে পার্‌ত না।

তারপর সময় কাটাবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়—বই পড়া—তাঁর কোন কালেই অভ্যাস ছিল না। তাঁর বাড়ীতেও এমন কেউ ছিল না, যার সঙ্গে তিনি বাক্যালাপ করতে পারতেন। তাঁর পরিবারের মধ্যে ছিল—তাঁর স্ত্রী আর তিনি। তিনি গাঁ-সম্পর্কের যে মাসিটিকে পটেশ্বরীর প্রহরীস্বরূপে বাড়ীতে এনে রেখেছিলেন, তার সঙ্গে কথা কইতে বড়বাবু ভয় পেতেন। কেননা ঐ ধারকরা মাসিমাটি, তাঁর সাক্ষাৎ পেলেই দুঃখের কান্না কাঁদ্‌তে বস্‌তেন, এবং সর্ব্বশেষে টাকা চাইতেন। বড়বাবু টাকা কাউকেও দিতে ভালবাসতেন না,—আর উক্ত মাসিমাতাটিকে ত নয়ই,—কারণ তিনি জানতেন যে, সে টাকা মাসির গুণধর ছেলেটির মদের খরচে লাগবে। এই সব কারণে বড়বাবু নিরুপায় হয়ে ছুটি গোটা দিন খবরের কাগজ পড়ে কাটিয়ে ছিলেন। ওরি মধ্যে এক

খাধিতে একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোখে পড়ল। তাতে তিনি দেখলেন যে, সাবিত্রী থিয়েটারে খৃষ্ট্‌মাস রজনীতে "সংস্কারের কেলেঙ্কার" নামক প্রহসনের অভিনয় হবে। বলা বাহুল্য উক্ত প্রহসনের নাম শুনেই সেটির প্রতি তাঁর মন অনুকূল হয়ে উঠল। তারপর তিনি সেই বিজ্ঞাপন হতে এই জ্ঞানসঞ্চয় কর্‌লেন যে, উক্ত প্রহসনে সংস্কারকদের উপর বেশ এক হাত নেওয়া হবে। এই বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে তাঁর মন "সংস্কারের কেলেঙ্কারের" অভিনয় দেখবার জন্য নিতান্ত উৎসুক হয়ে উঠল। কিন্তু থিয়েটারে যাওয়া সম্বন্ধে তিনি সহসা মনস্থির করে উঠতে পার্‌লেন না।

তার প্রধান কারণ, তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও থিয়েটারে যান নি,—শুধু তাই নয়, তাঁর স্ত্রীর সুমুখে তিনি বহুবার থিয়েটারের বহুনিন্দা করেছেন। থিয়েটারের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রোশের কারণ এই ছিল যে, সেখানে ভদ্র-ঘরের মেয়েরাও যাতায়াত করে। তাঁর মতে অন্তঃপুরবাসিনীদের থিয়েটারে যেতে দেওয়াও যা, আর পত্র-আব-ডাল দিয়ে স্ত্রীস্বাধীনতা দেওয়াও তাই। ওর চাইতে মেয়েদের গড়ের-মাঠে হাওয়া খেতে যেতে দেওয়া শতগুণে শ্রেয়ঃ। আর তিনি যে, সময়ে অসময়ে তাঁর স্ত্রীর কাছে এ-বিষয়ে তাঁর কড়াকড়া মতামত সব প্রকাশ কর্‌তেন, তার কারণ তিনি শুনেছিলেন যে, থিয়েটার দেখা তাঁর শ্যালাজগণের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে হয়ে উঠেছিল। পাছে তাঁর স্ত্রী, তার বৌদিদিদের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, এই ভয়ে তিনি পটেশ্বরীকে শুনিয়ে শুনিয়ে থিয়েটারের বিরুদ্ধে যত কটূকথা প্রয়োগ কর্‌তেন। তাঁর মনোগত অভিপ্রায় ছিল, শ্বশুরকুলের বৌকে মেরে ঝিকে শেখানো। এর ফলে পটেশ্বরীর মনে, থিয়েটার সম্বন্ধে এমনি একটি

বিশ্রী ধারণা জন্মেছিল যে, তার বৌদিদিদের হাজার পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও, সে কখনও কোন থিয়েটারের চৌকাঠ ডিঙ্গয় নি। অন্ততঃ সে ত তার স্বামীকে তাই বুঝিয়েছিল। বড়বাবু তাঁর স্ত্রীর এ কথা বিশ্বাস কর্‌তেন, কেননা তা না কর্‌লে তিনি জানতেন যে, তাঁর মুখের ভাত গলা দিয়ে নামবে না, রাত্তিরে চোখের পাতা পড়্‌বে না, আফিসের খাতায় ঠিক নামাতে ভুল হবে,—এক কথায় তাঁর বেঁচে আর কোনও সুখ থাক্‌বে না। এর পর তিনি নিজে যদি সেই পাপ থিয়েটার দেখতে যান, তাহলে তাঁর স্ত্রী কি আর তাঁকে ভক্তি কর্‌বে? বলা বাহুল্য তাঁর স্ত্রীর স্বামীভক্তির উপরে তিনি তাঁর জীবনের সকল আশা, সকল ভরসা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছিলেন।

একদিকে স্বচক্ষে সংস্কারকদের লাঞ্ছনা দেখবার অদম্য কৌতুহল, অপরদিকে স্ত্রীর ভক্তি হারাবার ভয়—এই দুটি মনোভাবের মধ্যে তিনি এতদূর দোলাচলচিত্তবৃত্তি হয়ে পড়েছিলেন যে, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁর আর মনস্থির করা হ'ল না। এক্ষেত্রে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি উভয়েরই বল সমান ছিল বলে, এর একটি অপরটিকে পরাস্ত কর্‌তে পারছিল না।

অতঃপর সূর্য্য যখন অস্ত গেল, তখন "সংস্কারের কেলেঙ্কারের" অভিনয় দেখাটা যে তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য, এই ধারণাটি হঠাৎ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে গেল! একা বাড়ীতে দিনটা বড়বাবু কোনমত প্রকারে কাটালেও, ও অবস্থায় সন্ধ্যেটা কাটানো তাঁর পক্ষে বড়ই কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। সেই গোধুলিলগ্নে পটেশ্বরী সম্বন্ধে যতরকম দুশ্চিন্তা, সংশয়, ভয় ইত্যাদি চামচিকে বাদুড়ের মত এসে তাঁর সমস্ত মনটাকে অধিকার করে বস্‌ত। তিনি দুদিন এ উপদ্রব সহ্য করে-

ছিলেন,—তৃতীয় দিন সহ্য কর্‌বার মত ধৈর্য্য ও বীর্য্য বড়বাবুর দেহে থাক্‌লেও, মনে ছিল না। তিনি স্থির কর্‌লেন থিয়েটার যাবেন, এবং সে কথা পটেশ্বরীর কাছে চেপে যাবেন। তিনি না বল্‌লে, পটেশ্বরী কি করে জান্‌বে যে তিনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন,—সে ত আর ও সব জায়গায় যায় না? এক ধরাপড়্‌বার ভয় ছিল তাঁর শ্যালাজদের কাছে। যদি তারাও সে রাত্তিরে ঐ একই থিয়েটারে যায়, এবং সেখানে বড় বাবুকে দেখ্‌তে পায়, তাহলে সে খবর নিশ্চয়ই পটেশ্বরীর কাণে পৌঁছবে। যদি তা হয়, তাহলে তিনি অম্লানবদনে সে কথা অস্বীকার কর্‌বেন, এইরূপ মনস্থ কর্‌লেন; চিকের-আড়াল থেকে দেখ্‌লে যে লোক চিন্‌তে ভুল হওয়া সম্ভব—এ সত্য, তাঁর স্ত্রীও অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না।

(৩)

সে রাত্তিরে বড়বাবু সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে,—অর্থাৎ একরকম না খেয়েই—গায়ে আল্‌ষ্টার চড়িয়ে, গলায় কম্‌ফার্টার জড়িয়ে, মাথা মুখে শাল ঢাকা দিয়ে, সাবিত্রী থিয়েটারের অভিমুখে পদব্রজে রওনা হলেন। পাছে পাড়ার লোক তাঁকে দেখ্‌তে পায়, পাছে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের সুনাম একদিনে নষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি নীল নিচোলাবৃত অভিসারিকার মত ভীত চকিত চিত্তে, অতি সাবধানে অতি সন্তর্পণে পথ চল্‌তে লাগলেন। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, তাঁর আল্‌ষ্টারের বর্ণ ছিল ঘোর নীল, আর নিচোল-পদার্থটি শাড়ি নয়—ওভারকোট। অনাবশ্যক রকম শীতবস্ত্রের ভার বহন করাটা অবশ্য তাঁর পক্ষে মোটেই

আরামজনক হয় নি; বিশেষতঃ কম্ফার্টার নামক গলকম্বলটি, তাঁর গলদেশের ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল, তার শোভা সে পরিমাণে বৃদ্ধি করে নি। পাঁচহাত লম্বা উক্ত পশমের গলাবন্ধটি কণ্ঠে ধারণ করা তাঁর পক্ষে একান্ত কষ্টকর হলেও, প্রাণ ধরে তিনি সেটি ত্যাগ কর্‌তে পার্‌তেন না; তার কারণ পটেশ্বরী সেটি নিজ হাতে বুনে দিয়েছিল। বড়বাবুর বিশ্বাস ছিল, পাঁচরঙা উলে-বোনা ঐ বস্তুটির তুল্য সুন্দর বস্তু পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। কারুকার্য্যের ওই হচ্ছে চরম ফল। সৌন্দর্য্যে, আকাশের ইন্দ্রধনুর সঙ্গে শুধু তার তুলনা হতে পারত। স্ত্রীহস্তরচিত এই গলবস্ত্রটি ধারণ করে তাঁর দেহের যতই অসোয়াস্তি হোক, তাঁর মনের সুখের আর সীমা ছিল না। তিনি মর্ম্মে চর্ম্মে অনুভব কর্‌ছিলেন যে, পটেশ্বরীর অন্তরের ভালবাসা যেন সাকার হয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেছে।

অবশেষে বড়বাবু থিয়েটারে উপস্থিত হয়ে দেখেন, সে জায়গা প্রায় ভর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। এই লোকারণ্যে প্রবেশ কর্‌বামাত্র তিনি এতটা ভেব্‌ড়ে গেলেন যে, নিজের "সীটে" যাবার পথে এক ব্যক্তির গায়ে ধাক্কা মারলেন, আর এক ব্যক্তির পা মাড়িয়ে দিলেন। তার জন্য তাঁকে সম্বোধন করে যে সব কথা বলা হয়েছিল, তাকে ঠিক স্বাগত সম্ভাষণ বলা যায় না!

তখনও Dropscene ওঠে নি, সবে কন্‌সার্ট সুরু হয়েছিল; বেয়ালাগুলো সব সমস্বরে চিঁ চিঁ কর্‌ছিল, Cello গ্যাঙরাচ্ছিল, Bass viola থেকে থেকে হুঙ্কার ছাড়ছিল, এবং Double bass দ্বিগুণ উৎসাহে হাঁকাহোঁকা কর্‌ছিল। তবে ঐ ঐক্যতান সঙ্গীতের প্রতি বড় কেউ যে কাণ দিচ্ছিলেন না, তার প্রমাণ—দর্শকবৃন্দের

আলাপের গুঞ্জনে ও হাসির ঝঙ্কারে রঙ্গভূমি একেবারের কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

তারপর Dropscene যখন পাক্ খেয়ে খেয়ে শূন্যে উঠে গেল, তখন ডজন দুয়েক অভিনেত্রী,—লালপরী, নীলপরী, সবজাপরী, জরদাপরী প্রভৃতিরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে, খামকা অকারণ নৃত্যগীত সুরু করে দিলে। বড়বাবুর মনে হল তাঁর চোখের সুমুখে স্তবকে স্তবকে সব পারিজাত ফুটে উঠ্‌ল, আর এই সব স্বর্গের ফুল যেন নন্দন-বনের মন্দ পবনের স্পর্শে কখন জড়িয়ে, কখন ছড়িয়ে, ঈষৎ হেল্‌তে, ঈষৎ দুল্‌তে লাগল। ক্রমে এই সকল নর্ত্তকীদের কম্পিত ও আন্দোলিত দেহ ও কণ্ঠ হতে উচ্ছ্বসিত নৃত্য ও গীতের হিল্লোল, সমগ্র রঙ্গালয়ের আকাশে বাতাসে সঞ্চারিত হ'ল,—সে হিল্লোলের স্পর্শে দর্শকমণ্ডলী শিহরিত পুলকিত হয়ে উঠল। মিনিট পাঁচেকের জন্য অর্দ্ধচন্দ্রাকারে অবস্থিতি করে এই পরীর দল যখন সবেগে চক্রাকারে ভ্রমণ করতে লাগল, তখন চারিদিক থেকে সকলে মহা-উল্লাসে Encore Encore বলে চীৎকার কর্‌তে লাগল। এত আলো, এত রঙ, এত সুরের সংস্পর্শে বড়বাবুর ইন্দ্রিয় প্রথম থেকেই ঈষৎ সচকিত উত্তেজিত হয়েছিল, তারপর সমবেত দর্শকমণ্ডলীর এই তরঙ্গিত আনন্দ তাঁর দেহমনকে একটি সংক্রামক ব্যাধির মত আক্রমণ কর্‌লে। পান করা অভ্যাস না থাক্‌লে একপাত্র মদও যেমন মানুষের মাথায় চড়ে যায়, আর তাকে বিহ্বল করে ফেলে,—এই নাচগান বাজনাও তেমনি বড়বাবুর মাথায় চড়ে গেল। আমোদের নেশায় তাঁর ইন্দ্রিয় একসঙ্গে বিকল হয়ে পড়ল, ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অতঃপর নেচে নেচে শ্রান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হয়ে নর্ত্তকীর দল যখন নৃত্যে ক্ষান্ত দিলে, তখন একটি স্থূলাঙ্গী

বয়স্কা গায়িকা, অতি-মিহি অতি-নাকী এবং অতি-টানা সুরে একটি গান গাইতে আরম্ভ কর্‌লেন। সে ত গান নয়, ইনিয়ে বিনিয়ে নাকে-কান্না। বড়বাবু যে কতদূর কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন, তার প্রমাণ,—সেই গান যেমনি থামা, অমনি তিনি বড়গলায় encore encore বলে দু-তিনবার চীৎকার কর্‌লেন। তাই শুনে তাঁর এপাশে ওপাশে যে সব ভদ্রলোক বসেছিলেন—তাঁরা বড়বাবুর দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইতে লাগলেন।

এ গানের যে সুরতালের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে জ্ঞান অবশ্য বড়বাবুর ছিল না; তাই উক্ত ভদ্রলোকদের মধ্যে একটি রসিক ব্যক্তি যখন তাঁকে এই প্রশ্ন কর্‌লেন যে, "ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি লাগে, এ কথা কি মহাশয় কখনও শোনেন নি? আর এটাও কি মালুম হ'ল না যে, উনি যে পুরিয়া উদ্গার কর্‌লেন, সেটি সরপুরিয়া নয়—ক্যাল-মেলের পুরিয়া?" তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন ও নিরুত্তর হয়ে রইলেন। নৃত্যগীত সমাধা হবার পর আবার Drop-scene পড়ল, আবার কনসার্ট বেজে উঠল। তাঁতের ছোট বড় মাঝারি বিলাতি যন্ত্রগুলো, বাদকদের ছড়ির তাড়নায় গ্যাঁ গোঁ ক্যাঁ কোঁ প্রভৃতি নানারূপ কাতর ধ্বনি কর্‌তে লাগল; ক্লারিওনেট ও কর্‌নেট পরস্পরে জ্ঞাতি-শত্রুতার ঝগড়া সুরু করে দিলে, এবং অতি কর্কশ আর অতি তীব্র কণ্ঠে, যা মুখে আসে তাই বল্‌লে; তারপর ঢোলকের মুখ দিয়ে ঝড় বয়ে গেল; শেষটা করতাল যখন কড়্‌কড়্‌ কড়াৎ করে উঠলে, তখন কনসার্টের দম ফুরিয়ে গেল। বড়বাবু ইতিমধ্যে এ সব গোলমালে কতকটা অভ্যস্ত হয়ে এসেছিলেন, সুতরাং ঐ ঐক্যতান সঙ্গীতের বিলিতি মদ তাঁর অন্তরাত্মাকে ততটা ব্যতিব্যস্ত কর্‌তে পার্‌লে না।

• এর পর নলদময়ন্তীর অভিনয় সুরু হল। বড়বাবু হাঁ করে তাই দেখ্‌তে লাগলেন। এ যে অভিনয়, এ জ্ঞান দু'মিনিটেই তাঁর লোপ পেয়ে এল,—তাঁর মনে হল নলদময়ন্তী প্রভৃতি সত্যসত্যই রক্তমাংসের দেহ ধারণ করে, সাবিত্রী থিয়েটারে অবতীর্ণ হয়েছেন। তারপর রঙ্গ-মঞ্চের উপরে যখন স্বয়ংবরা-সভার আবির্ভাব হ'ল-তখন, থিয়েটারের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ একটা মহা গোলযোগ উপস্থিত হ'ল। পুরুষদের মাথার উপরে চিকের অপর পারে, রঙ্গালয়ের যে প্রদেশ মেয়েরা অধিকার করে বসেছিলেন, সেই অঞ্চল থেকে একটা ঝড় উঠল। কোনও অজ্ঞাত কারণে সমবেত স্ত্রীমণ্ডলী ঐক্যতানে কলরব কর্‌তে সুরু কর্‌লেন। ফলে আকাশে স্ত্রী-কণ্ঠের কনসার্ট বেজে উঠল, তার ভিতর ক্লারিওনেট কর্‌নেট প্রভৃতি সবরকমেরই যন্ত্র ছিল, এবং তাদের পরস্পরের ভিতর কারও সঙ্গে কারও সুরের মিল ছিল না। তারপর সেই কনসার্ট যখন দুন্ থেকে পরদুনে গিয়ে পৌঁছুল,—তখন অভিনয় অগত্যা বন্ধ হল। এই কলহ শুনে দময়ন্তীর বড় মজা লাগল, তিনি ফিক্ করে হেসে দর্শকমণ্ডলীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর সখীরা সব অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢাকলেন, আর ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি অভ্যাগত দেবতা-গণ তটস্থ হয়ে রইলেন। অমনি silence ! silence ! শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত হতে লাগল, তাতে গোলযোগের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। অতঃপর দর্শকদের মধ্যে অনেকে দাঁড়িয়ে উঠে, আকাশের দিকে মুখ করে, গলবস্ত্রে যোড়করে, উক্ত স্ত্রী-সমাজকে সম্বোধন করে—"মা লক্ষ্মীরা চুপ করুন" এই প্রার্থনা কর্‌তে লাগলেন ; তাতে মা লক্ষ্মীদের চুপ করা দূরে থাকুক, তাঁদের কোলের ছেলেরা জেগে উঠে কোকিয়ে কাঁদতে সুরু কর্‌লে। তখন দর্শকদের মধ্যে দু'চার জন ইয়ারগোছের

লোক, অতি সাদা বাংলায় ছেলেদের মুখবন্ধ কর্‌বার একটা সহজ উপায় বাৎলে দিলে, তা শুনে দময়ন্তী ও তাঁর সখীরা অন্তরুর্দ্ধ হাসির বেগে ধুঁক্‌তে লাগলেন। বড়বাবু যদিচ জীবনে কখন কারও প্রতি কোনরূপ অভদ্র কথা ব্যবহার করেন নি, তথাচ তিনি ভদ্রমহিলাদের এই অপমানে খুসি হলেন্। কেননা, তাঁর মতে যারা থিয়েটারে আস্‌তে পারে, সে সব স্ত্রীলোকের মানই বা কি, আর অপমানই বা কি? মিনিট দশেক পরে, এই গোলযোগ বৈশাখী ঝড়ের মত যেমন হঠাৎ এসেছিল, তেমনি হঠাৎ থেমে গেল।

অভিনয় যেখানে থেমে গিয়েছিল, সেইখান থেকে আবার চল্‌তে সুরু করল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বড়বাবু সেই অভিনয়ে তন্ময় হয়ে গেলেন। এই অভিনয় দর্শনে তিনি এতটা মুগ্ধ হয়ে গেলেন যে, তাঁর মনে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হ'ল, তাঁর কাছে রঙ্গালয় তীর্থস্থান হয়ে উঠল। তারপর নলদময়ন্তীর বিপদ যখন ঘনিয়ে এল, তখন তাঁর মন নায়ক নায়িকার দুঃখে একেবারে অভিভূত দ্রবীভূত হয়ে পড়্‌ল। নলের দুঃখই অবশ্য তিনি বেশী করে অনুভব কর্‌ছিলেন, কেননা পুরুষমানুষের মন পুরুষমানুষেই বেশী বুঝতে পারে। নলের প্রতি তাঁর এতটা সহানুভূতির আর একটি কারণ ছিল। তিনি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গে ঐ রঙ্গমঞ্চের নলের যথেষ্ট আকৃতিগত সাদৃশ্য আছে; কিন্তু পটেশ্বরীর সঙ্গে দময়ন্তীর কোন সাদৃশ্যই ছিল না। নল রাজবেশ পরিত্যাগ কর্‌বার সময় সে সাদৃশ্য এতটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল যে, মধ্যে মধ্যে বড়বাবুর মনে ভুল হচ্ছিল যে উক্ত নল তিনি ছাড়া আর কেউ নয়। সুতরাং নল যখন নিদ্রিতা দময়ন্তীর অঞ্চলপাশ মোচন করে, "হা হতোস্মি হা দগ্ধোস্মি" বলে, রঙ্গমঞ্চ হতে সবেগে নিষ্ক্রমণ

করলেন, তখন বড়বাবু আর অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না ;—তাঁর চোখ দিয়ে, তাঁর নাক দিয়ে দরবিগলিতধারে জল তাঁর দাড়ী চুঁইয়ে তাঁর কমফার্টারের অন্তরে প্রবেশ করলে,—ফলে সেই গলকম্বলটি ভিজে ন্যাতা হয়ে তাঁর গলায় নেপ্‌টে ধরলে। বড়বাবুর ভ্রম হ'ল যে, কলি তাঁর গলায় গামছা দিয়ে,—শুধু গামছা নয়, ভিজে গামছা দিয়ে—টেনে নিয়ে যাচ্ছে !

(৪)

ঠিক এই সময়ে, একটি জেনানা-বক্স থেকে, একটি হাসির আওয়াজ তাঁর কাণে এল। সে ত হাসি নয়, হাসির গিটকারি ; জলতরঙ্গের তানের মত, সে হাসি থিয়েটারের এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্য্যন্ত সাত স্থুরের বিদ্যুৎ খেলিয়ে গেল। অভিনয়ের দোষে, নলের সজোরে পলায়নটি যে ঈষৎ হাস্যকর ব্যাপার হয়ে উঠেছিল, তা যাঁর চোখ আছে তিনিই স্বীকার করতে বাধ্য—কিন্তু সেই হাসিতে বড়বাবুর মাথায় বজ্রাঘাত হ'ল। তাঁর কাণে সে হাসি চিরপরিচিত বলে' ঠেক্‌ল—এ যে পটেশ্বরীর হাসি ! যে অঞ্চল থেকে এই হাসির তরঙ্গ ছুটে এসেছিল, সেই অঞ্চলে মুখ ফিরিয়ে, ঘাড় উঁচু করে নিরীক্ষণ করে' তিনি দেখলেন যে, চিকের গায়ে মুখ দিয়ে যে বসে আছে, তার দেহের গড়ন ও বসবার ভঙ্গী ঠিক পটেশ্বরীর মত। অবশ্য চিকের আড়াল থেকে যা দেখা যাচ্ছিল, সে হচ্ছে একটী রমণী-দেহের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র, কারণ সে বক্সের ভিতরে কোনও আলো ছিল না। তাই নিজের মনের সন্দেহ ঘোচাবার জন্য, তাকে একবার

ভাল করে দেখে নেবার জন্য, বড়বাবু দাঁড়িয়ে উঠে সেই বক্সের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে রইলেন। এবারও তিনি সে স্ত্রীলোকটির মুখ দেখতে পান্‌ নি, তাঁর চোখে পড়েছিল শুধু কালো কস্তাপেড়ে একখানি সাদা সুতোর শাড়ী। বড়বাবু জানতেন যে, ওরকম শাড়ী তাঁর স্ত্রীরও আছে। এর থেকে তাঁর ধারণা হ'ল যে, ও শাড়ী যার গায়ে আছে, সে নির্ঘাত পটেশ্বরী। তারপর তাঁর মনে পড়ে গেল যে, ও শাড়ীর "আঁচরে উজোর সোণা" লুকানো আছে। সেই তপ্ত-কাঞ্চনের আভায় তাঁর চোখ ঝল্‌সে গেল, তার আঁচে তাঁর চোখের তারা দুটি যেন পুড়ে গেল, তিনি চোখ চেয়ে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

ও ভাবে দণ্ডায়মান বড়বাবুকে সম্বোধন করে চারদিক থেকে লোকে Sit down, Sit down বলে চীৎকার করতে লাগল। তাঁর পাশের ভদ্রলোকটি বল্‌লেন—"মশায় থিয়েটার দেখতে এসেছেন থিয়েটার দেখুন, মেয়েদের দিকে অমন করে' চেয়ে রয়েছেন কেন? আপনি দেখছি অতিশয় অভদ্র লোক!" এই ধমক খেয়ে তিনি বসে পড়্‌লেন। বলা বাহুল্য তাঁর পক্ষে অভিনয়ে মনোনিবেশ করা আর সম্ভব হ'ল না। তাঁর চোখের উপরে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে যাচ্ছিল, আর বুকের ভিতর কত কি তোলপাড় করছিল, ছটফট্‌ করছিল। এক কথায়, তাঁর হৃদয়মন্দিরে দক্ষযজ্ঞের অভিনয় সুরু হয়েছিল।

তারপর অভিনয়ের টুক্‌রো টাক্‌রা যা তাঁর চোখে পড়্‌ছিল, তাতে তিনি আরও কাতর হয়ে পড়্‌লেন, এই মনে করে—কোথায় দময়ন্তী, আর কোথায় পটেশ্বরী! তারপর তাঁর মনে হ'ল যে, পটেশ্বরী যদি তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বল্‌তে পারে, বিশ্বাসঘাতিনী

হতে পারে, তাহলে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কোন্ স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যে বিশ্বাস করা যেতে পারে? তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন যে, নলদময়ন্তীর কথা মিথ্যা, মহাভারত মিথ্যা, ধর্ম্ম মিথ্যা, নীতি মিথ্যা, সব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা!—মানুষের কষ্টই হচ্ছে এ পৃথিবীতে একমাত্র সত্য বস্তু। তখন তাঁর কাছে ঐ অভিনয় একটা বীভৎস কাণ্ড হয়ে দাঁড়াল। এদিকে তাঁর হাত পা সব হিম হয়ে এসেছিল, তাঁর মাথা ঘুর্‌ছিল, তাঁর সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে অনবরত ঘাম পড়্‌ছিল—অর্থাৎ তাঁর দেহে মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণ সব দেখা দিয়েছিল। তিনি আর ভিতরে থাকতে পার্‌লেন না—থিয়েটার থেকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নীচে দাঁড়ালেন। বড়বাবু উপরে চেয়ে দেখলেন যে, অনন্ত আকাশ জুড়ে অগণ্য নক্ষত্র তাঁর দিকে তাকিয়ে সব চোখটিপে হাস্‌ছে। এ বিশ্ব যে কতদূর নির্ম্মম, কতদূর নিষ্ঠুর,—এই প্রথম তিনি তার সাক্ষাৎ পরিচয় পেলেন। তারপর এই আকাশদেশের অসীমতা তাঁর কাছে হঠাৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল, এই নীরব নিস্তব্ধ মহাশূন্যের ভিতর দাঁড়িয়ে তাঁর বড় একা একা ঠেক্‌তে লাগল;—তাঁর মনে হল, এই বিরাট বিশ্বের ভিতরে কি বাইরে কোথাও প্রাণ নেই, মন নেই, হৃদয় নেই, দেবতা নেই;—যা আছে তা হচ্ছে আগাগোড়া ফাঁকা, আগাগোড়া ফাঁকি। সেই সঙ্গে তিনি যেন দিব্যচক্ষে দেখ্‌তে পেলেন যে, ওই সব গ্রহ, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি আকাশ-প্রদীপগুলো ঐ থিয়েটারের বাতির মত দুদণ্ড জ্বলে' যখন নিবে যাবে, তখন সংসার-নাটকের অভিনয় চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে,—আর থাকবে শুধু অসীম অনন্ত অখণ্ড অন্ধকার! অমনি ভয়ে তাঁর বুক চেপে ধরলে, তিনি এই অনন্ত বিভীষিকার মূর্ত্তি চোখের আড়াল কর্‌বার জন্য

থিয়েটারে পুনঃপ্রবেশ কর্‌বার সংকল্প কর্‌লেন—অমনি তাঁর মনশ্চক্ষু হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরে গেল, আর তার জায়গায় পটেশ্বরী এসে দাঁড়ালে। অসংখ্য অপরিচিত অসভ্য ও আমোদপ্রিয় লোকের মধ্যে তাঁর স্ত্রী একা বসে রয়েছে—এই মনে করে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। তিনি যেন স্পষ্টই দেখতে পেলেন যে, চিকের আবরণ ভেদ করে শত শত লুব্ধনেত্রের রক্তদৃষ্টি পটেশ্বরীর দেহকে, স্পর্শ কর্‌ছে অঙ্কিত কর্‌ছে, কলঙ্কিত কর্‌ছে। এর পর বড়বাবুর পক্ষে আর এক মুহূর্ত্তও বাইরে থাকা সম্ভব হল না, তিনি পাগলের মত ছুটে গিয়ে আবার থিয়েটারের ভিতরে প্রবেশ কর্‌লেন। এবার তাঁর আর অভিনয় দেখা হ'ল না; তাঁর চোখের সুমুখে কোত্থেকে যেন একটি ঘন কুয়াশা উঠে এসে, চারদিক ঝাপসা করে দিলে। দেখতে না দেখতেই অভিনয় ছায়াবাজি হয়ে দাঁড়াল। অভিনেতা অভিনেত্রীদের কতক কথা তাঁর কাণে ঢুকলেও, তার একটি কথাও তাঁর মনে ঢুকল না। কেননা সে মনের ভিতর শুধু একটি কথা জাগছিল, উঠছিল, পড়ছিল। যে স্ত্রীলোক খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল, সে পটেশ্বরী—কি পটেশ্বরী নয়? এই ভাবনা, এই চিন্তাই তাঁর সমস্ত মনকে অধিকার করে বসেছিল। তিনি বারবার সেই জেনানা-বক্সের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন, এবং প্রতিবার তাঁর মনে হ'ল যে, এ পটেশ্বরী না হয়ে আর যায় না। শুধু তাই নয়, তিনি রঙ্গালয়ের অন্দরমহলের যেদিকে দৃষ্টিপাত কর্‌লেন—সেই দিকেই দেখলেন পটেশ্বরী বসে আছে। ক্রমে এই দৃশ্য তাঁর কাছে এত অসহ্য হয়ে উঠল যে, তিনি চোখ বুজ্‌লেন। তাতেও কোন ফল হল না। তাঁর বোঁজা চোখের সুমুখেও পটেশ্বরী এসে

উপস্থিত হ'ল,—পরণে সেই কালা কস্তাপেড়ে শাড়ী, আর মুখ সেই চিকে ঢাকা। তখন তাঁর জ্ঞান হ'ল যে, তাঁর মনে যে সন্দেহের উদয় হয়েছে তা দূর কর্‌তে না পারলে, তিনি সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাবেন। তাই তিনি শেষটা মনস্থির কর্‌লেন যে, থিয়েটার ভাঙ্গবার মুখে, যে দরজা দিয়ে মেয়েরা বেরোয়, সেই দরজার সুমুখে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। কেননা একবার সামনাসামনি স্বচক্ষে না দেখলে, তাঁর মনের এ সন্দেহ আর কিছুতেই দূর হবে না।

তারপর যা ঘটেছিল, তা দু'কথায় বলা যায়। থিয়েটার ভাঙ্গবার মিনিট দশেক পরে থিয়েটারের খিড়কি-দরজায় একখানি জুড়িগাড়ী এসে দাঁড়াল। বড়বাবুর মনে হ'ল, এ তাঁর শ্বশুরবাড়ীর গাড়ী; যদিচ কেন যে তা মনে হল, তা তিনি ঠিক বল্‌তে পারতেন না। তারপর তিনটী ভদ্রমহিলা আর একটি দাসী অতি দ্রুতপদে এসে সেই গাড়ীতে চড়্‌লে—অমনি সহিস তার কপাট বন্ধ করে দিলে। বড়বাবু এঁদের কারও মুখ দেখতে পান নি, কেননা সকলেরি মুখ ঘোমটাঢাকা ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একজন মাথায় পটেশ্বরীর সমান উঁচু; তাই দেখে বড়বাবু বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়ে, পা-দানের উপর লাফিয়ে উঠে, দু'হাত দিয়ে জোর করে গাড়ীর দরজা ফাঁক কর্‌লেন। মেয়েরা সব ভয়ে হাঁউ-মাউ করে চেঁচিয়ে উঠলো, আর রাস্তার লোকে সব "চোর চোর" বলে চীৎকার করতে লাগল! বড়বাবু অমনি গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে আরম্ভ কর্‌লেন, আর পিছনে অন্ততঃ পঞ্চাশজন লোক "পাহারাওয়ালা পাহারাওয়ালা" বলে হাঁক দিতে দিতে ছুটতে লাগল। এই ঘোর বিপদে পড়ে বড়বাবুর বুদ্ধি খুলে গেল। তিনি যেন বিদ্যুতের আলোতে দেখতে

পেলেন যে, এ বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে মাতলামির ভাণ করা। তাতে নয় দু'দশ টাকা জরিমানা হবে, কিন্তু গাড়ী চড়াও করে ভদ্রমহিলাকে বে-ইজ্জত কর্‌বার চার্জ্জে, জেল নিশ্চিত। মদ না খেয়ে মাতলামির অভিনয় করা, যখন দেহের কলকব্জাগুলো সব ঠিক ভাবে গাঁথা থাকে, তখন সে দেহকে বাঁকানো চোরানো দোমড়ানো কোঁকড়ান, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোকে এক মুহূর্ত্তে জড় করা, আর তার পরমুহূর্ত্তে ছড়িয়ে দেওয়া,—অতিশয় কঠিন এবং কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু হাজার কষ্টকর হলেও আত্মরক্ষার্থে—যতক্ষণ না তিনি পাহারাওয়ালা কর্ত্তৃক ধৃত হন,—ততক্ষণ বড়বাবুকে এই কঠিন পরিশ্রম স্বীকার কর্‌তে হয়েছিল। তারপর অজস্র চড় চাপড় রুলের গুঁতো খেতে খেতে তিনি যখন গারদে গিয়ে হাজির হলেন, তখন রাত প্রায় চারটে বাজে। সেখান থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি শ্বশুরালয়ে সংবাদ পাঠাতে বাধ্য হলেন। ভোর হ'তে না হ'তেই, তাঁর বড়-শ্যালক তথায় উপস্থিত হয়ে, বেশ দু'পয়সা খরচ করে, তাঁকে উদ্ধার করে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় তিনি বড়বাবুকে নানারূপ গঞ্জনা দিলেন। তিনি বল্‌লেন—"এতদিন শুনে আসছিলুম আমরাই খারাপ লোক, আর তুমি অতি ভাল লোক। ডুবে ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না—কিন্তু তুমি ভুলে গিয়েছিলে যে, ডুবে ডুবে মদ খেলে পুলিশে টের পায়!" তারপর, তিনি শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলে, তাঁর সঙ্গে তাঁর শ্বশুর কোন কথা কইলেন না। শুধু তাঁর ছোট-শ্যালক বল্‌লেন, "Beauty and the Beast-এর কথা লোকে বইয়ে পড়ে; পটেশ্বরীর কপাল দোষে

আমরা তা বরাবর চোখেই দেখে আস্‌ছি। তবে তুমি চরিত্রেও যে beast,—এ কথা এতদিন জানতুম না; আমরা ভাবতুম "পটের" ঘাড়ে বাবা একটা জড় পদার্থ চাপিয়ে দিয়েছেন।" তারপর তিনি বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখেন পটেশ্বরী মেজেয় শুয়ে আছে। তার গায়ে একখানিও গহনা নেই—সব মাটিতে ছড়ানো রয়েছে। তার পরণে শুধু একখানা কালো কস্তাপেড়ে সাদা সুতোর শাড়ী। কেঁদে কেঁদে তার চোখ দুটি যেমন লাল হয়েছে, তেমনি ফুলে উঠেছে। সে স্বামীকে দেখে নড়্‌লও না চড়্‌লও না, কথাও কইলে না; মরার মত পড়ে রইল। তাঁর সোণার প্রতিমা ভুঁয়ে লোটাচ্ছে দেখে, সে থিয়েটারে গিয়েছিল, কি যায় নি,—এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে বড়বাবুর আর সাহস হ'ল না। তারপর তিনি যে কোন দোষে দোষী নন, এবং তাঁর নির্ম্মল চরিত্রে যে কোনরূপ কলঙ্ক ধরে নি,—এই সত্য কথাটাও তিনি মুখফুটে বল্‌তে পারলেন না। তিনি বুঝলেন যে, আসল ঘটনাটি যে কি, ইহজীবনে তিনিও তা জানতে পারবেন না—তাঁর স্ত্রীও তা জানতে পাবে না—মধ্যে থেকে তিনি শুধু চিরজীবনের জন্য মিছা অপরাধী হয়ে থাকলেন। ফলে তিনি মহা অপরাধীর মত মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। এ গল্পের moral এই যে, পৃথিবীতে ভাল লোকেরই যত মন্দ হয়;—এই হচ্ছে ভগবানের বিচার!

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

একটি জরুরী প্রস্তাব।

—:০:—

কি উপায়ে বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে আমি বহুদিন যাবৎ বহু চিন্তা, বহু গবেষণা করিয়াছি ; কিন্তু উক্তরূপ মস্তিষ্কচালনার দ্বারায় আমি কোন উপায়ই আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই। বরং ঐরূপ দুশ্চিন্তার ফলে আমার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে শুধু অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে। সে অন্ধকারের বক্ষে যে-সকল দোদুল্যমান জ্যোতির্বিন্দুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি, তাহারা নক্ষত্র নহে—সরিষার ফুল।

যে সত্যের সন্ধানে আমি এতদিন বৃথা কালাতিপাত করিয়াছি, দিনের আলোকে যাহার দর্শন পাই নাই, রাত্রির অন্ধকারে সৌভাগ্যক্রমে তাহা আমার হস্তগত হইয়াছে।

গত রজনীতে স্বপ্নে আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, মা সরস্বতী আমার নিকট আবির্ভূতা হইয়াছেন, এবং স্বকর্ণে শুনিলাম, তিনি কহিতেছেন— "বৎস! বঙ্গ-সাহিত্যকে তোমরা ভুলপথে চালাইবার চেষ্টা করিতেছ, সেই কারণ তাহা ক্ষীণ ও খিন্ন হইয়া পড়িতেছে। গদ্যের পথ ত্যাগ করিয়া আবার পদ্যের পথ অবলম্বন কর, তাহা হইলে অচিরে বঙ্গ-সাহিত্য স্বর্গলাভ করিবে।"

উক্ত উপদেশ শ্রবণ করা মাত্র, আমার জ্ঞান হইল যে, উহা কত সত্য, কত শিব, কত সুন্দর।

' যেমন স্বপ্নলব্ধ ঔষধ কখনও ব্যর্থ হয় না, তেমনি স্বপ্নলব্ধ জ্ঞানও যে কখনও মিথ্যা হয় না—এ কথা হিন্দুসন্তানমাত্রেই জানেন, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার দোষে মানেন না। সুতরাং গদ্যকে সাহিত্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার স্বপক্ষে যে সকল সুযুক্তি আছে, নিম্নে তাহা প্রকটিত করিতেছি। চিন্তাশীল পাঠকমাত্রেই দেখিতে পাইবেন যে, তাহার একটিও উদ্ভ্রান্ত নহে, প্রতিটিই অভ্রান্ত। সাহিত্য কি প্রকাশ করে? না, জাতীয় আত্মা। কি উপায়ে তাহা প্রকাশ করে? না, জাতীয় রীতিতে।

বাঙ্গালীজাতির আত্মপ্রকাশের আত্মরীতি যে পদ্যের রীতি, এ কথা তিনিই অস্বীকার করিতে পারেন, যিনি চণ্ডীদাস এবং ভারতচন্দ্রের নাম পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন নাই।

ইহা ধ্রুবসত্য যে, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে বঙ্গসাহিত্যে এক ছত্রও গদ্য লিখিত হয় নাই, সে যুগে পদ্যের একছত্র রাজত্ব ছিল। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রাক্‌ব্রিটীশ যুগের গদ্যের যে সকল নিদর্শন সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার সহিত সাহিত্যের কোনই সম্পর্ক নাই।

পাট্টা, কবুলিয়ৎ, দানপত্র, ছাড়পত্র প্রভৃতি সাহিত্যজগতের বস্তু নয়, অপর এক জগতের,—কর্ম্মজগতের।

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, গদ্য কর্ম্মকথার বাহন, কাব্যকথার নহে—অন্ততঃ বাঙ্গলাদেশে তাই। সুতরাং গদ্য আমাদের কাব্য-জগতে প্রবেশ করিয়া, কেবলমাত্র স্বাধিকার-প্রমত্ততার পরিচয় দিয়াছে; অতএব তাহাকে সাহিত্যের অলকাপুরী হইতে নির্ব্বাসিত করা আমাদের পক্ষে যুগপৎ শ্রেয়ঃ এবং কর্ত্তব্য।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে,

আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। এমন সত্যকথা শাস্ত্রী মহাশয় আর কখনও বলেন নাই। যেহেতু বাঙ্গালীজাতি আত্মবিস্মৃত, সেই কারণে তাহাদিগকে পদে পদে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়—অর্থাৎ ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত স্বজাতির নিকট আমরা কোন কথাই সপ্রমাণ করিতে পারি না। অতএব এ স্থলে বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রাজনীতির দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধ নবাবের বিরুদ্ধে কোম্পানীর যুদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে দেখা যায় যে, উক্ত ঘটনা পদ্যের বিরুদ্ধে গদ্যের যুদ্ধ।

সকলেই অবগত আছেন যে, গৌড়ের পাঠান বাদশাহদিগের আদেশক্রমেই বঙ্গসাহিত্য রচিত হয়। এবং সে সাহিত্য পদ্য-সাহিত্য; যথা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি। চণ্ডীদাসাদি অবশ্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদের পদাবলী রচনা করেন। কিন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, সেকালে উক্ত পদাবলী সাহিত্য বলিয়া পরিগণিত হইত না। উক্ত বস্তু পূর্ব্বোক্তকালে, কাব্যের নয়, সঙ্গীতের অধিকারভুক্ত ছিল। এবং সঙ্গীত ও কাব্য যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, এ জ্ঞান একালের আমাদের না থাকিলেও, সেকালের তাঁহাদের ছিল। এ কথা যে সত্য, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ অভিনবগুপ্তের ধ্বন্যালোক নামক সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কারগ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। পূর্ব্বাচার্য্যেরা কহিয়া গিয়াছেন যে, কাব্যের প্রাণ চমৎকারিত্ব, এবং সঙ্গীতের প্রাণ ঝণৎকারিত্ব!

তাহার পর ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গেই গদ্য বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। বাঙ্গলার আদিম গদ্যগ্রন্থসকল, হয় ইংরাজরাই রচনা করেন, নয়

তাঁহাদের আদেশক্রমেই রচিত হয়। ইংরাজগণ এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইলেও, প্রধানত ফোর্ট-উইলিয়ামের বিত্তভোগী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণই বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। গদ্যের জন্মস্থানের কথা স্মরণ করিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, চিরাগত পদ্য-সাহিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্যই তাহার সৃষ্টি।

কথায় বলে হিক্‌মতে চীন, হুজ্জুতে বাঙ্গালী; কাজেই বাঙ্গালী এই গদ্যের হুজুগে মাতিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগের পদানুসরণ করিয়া শত শত অপণ্ডিত-ব্রাহ্মণ এবং পণ্ডিত-অব্রাহ্মণগণ গদ্য রচনা করিতে লাগিলেন। ফলে কাদম্বরী হইতে হাতেমতাই, বৃহৎকথা হইতে টম-কাকার-কুটীর পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব পশ্চিমের এমন কোনই কথা রহিল না, যাহা বঙ্গদেশে বঙ্গ-গদ্যাকারে না আবির্ভূত হইল। এই যুগে পদ্যকাব্য জগত হইতে তাড়িত হইয়া, সঙ্গীতের অধিকারে কবি পাঁচালি ইত্যাদি রূপে চিঁ চিঁ করিতে লাগিল। দেখা গেল যে, বাঙ্গলার কোম্পানীর আমল, গদ্যের আমল।

তাহার পর আসিল মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিল বঙ্গসাহিত্যের ভিক্টোরীয় যুগ অর্থাৎ Victorian-age।

এই নব যুগের সুযোগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামক জনৈক অসমসাহসী এবং অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যক্তি পদ্যকে আবার সাহিত্যের ভিতর টানিয়া আনিলেন,—কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ রূপান্তর করিয়া। তাঁহার হস্তে পদ্য প্রায় গদ্য হইয়া দাঁড়াইল। অর্থাৎ তিনি গদ্যের সহিত পদ্যের, পূর্ব্বের সহিত পশ্চিমের, জোর জবরদস্তি করিয়া একটা আপোষ মীমাংসা করাইয়া, বঙ্গসাহিত্যে তাহার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

ফলে তাঁহার কাব্য টিঁকিল, কিন্তু তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতি টিঁকিল না। ইহার কারণ স্পষ্ট। আমরা পদ্য অর্থে বুঝি সেই রচনা, যাহা ছন্দোবদ্ধ এবং মিলনান্ত। মাইকেলের কাব্য ছন্দোবদ্ধ হইলেও বিয়োগান্ত, অতএব তাহা বাঙ্গালীর প্রাণে লাগিলেও, কাণে বসিল না।

আমার মতে বাঙ্গলা পদ্য হইতে মিল বাদ দিলে—পদ্য লেখার যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, তাহাই বাদ পড়িয়া যায়।—মিলের সংস্কৃত নাম অন্তঃ-অনুপ্রাস। এই নামের অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, মিল করিবার উদ্দেশ্যই হইতেছে—বাক্যকে শেষ করা। পয়ারের উদ্দেশ্য বক্তব্যকথা দুই ছত্রে শেষ করা, আর লাচাড়ির উদ্দেশ্য ছ-ছত্রে শেষ করা। গদ্য অনন্ত, অর্থাৎ নিরাকার। অপর পক্ষে পদ্য সান্ত বলিয়াই সাকার। এ স্থলে আপনাদিগকে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দিতে চাই। বাঙ্গলা দেশে যিনি মূর্ত্তিপূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তিনিই বঙ্গসাহিত্যে গদ্যের প্রথম না হউন, প্রধান প্রবর্ত্তক—রামমোহন রায়।

কর্ম্ম-জগৎ অবশ্য কাব্য-জগৎও নয়, বাক্য-জগৎও নয়; কেননা সে দেশে হস্তপদাদি চালনার যথেষ্ট অবকাশ থাকিলেও, রসনা চালনার তাদৃশ অবসর নাই। যদিচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, "তাবচ্চ শোভতে কর্ম্মী যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে," তথাচ আমি সে জগৎ হইতে গদ্যকে উচ্ছেদ করিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নহি। তবে আমার মতে, কর্ম্ম-জগৎ যখন মৌনতার মাহাত্ম্য এতদিনেও বুঝিল না, তখন সে জগতের কোনও কোনও প্রদেশ পদ্যের অধিকারে আসিলে কর্ম্মেরও মঙ্গল, দেশেরও মঙ্গল হইবে। ধরুন যদি আদালতে ও লাটদরবারে গদ্যের পরিবর্ত্তে পদ্যে বক্তৃতা করিবার নিয়ম প্রচলিত হয়, বক্তারা যদি তাঁহাদের বক্তব্য কথা দ্বিপদী

ত্রিপদী এবং চতুস্পাদীতে আবদ্ধ করিতে বাধ্য হন—তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে কয়জন চতুস্পাদের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন? সুতরাং ঐরূপ হওয়াতে আইন আদালত অবশ্য বন্ধ হইবে না—বন্ধ হইবে শুধু সময়ের অজস্র অপব্যয়। যাঁহারা সময়ের মূল্য জানেন, তাঁহারাই বুঝিবেন ইহাতে দশের এবং দেশের কি প্রভূত লাভ।

সে যাহাই হউক, মাইকেলের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর বাঙ্গলা-সাহিত্যে স্থায়ী হইল না। মেঘনাদবধের অনুকরণে দুইখানিমাত্র মহাকাব্য রচিত হইয়াছে; তাহার একখানির ("ছুছুন্দরী বধ" কাব্যের) বর্ত্তমান সাহিত্যের উপর কোনই প্রভাব লক্ষিত হয় না—অপরখানির ("ভারতউদ্ধার" কাব্যের) প্রভাব রাজনীতি ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সাহিত্যে নয়। ফলে গদ্য টিঁকিয়া গেল। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার বলে গদ্য বঙ্গসাহিত্যের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া বসিল। এক কথায়, গদ্যের জয় হইল; এবং তদবধি গদ্য বঙ্গসাহিত্যের উপর আধিপত্য করিয়া আসিতেছে। তবে ইহা হইতে এ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে যে, বাঙ্গালী জাতির মানসিক পরিবর্ত্তনের ফলেই গদ্য কর্ত্তৃক পদ্য তিরস্কৃত হইয়াছে।

আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী পদ্যপ্রাণ বলিয়াই বঙ্কিমের গদ্য বাঙ্গালীকে এত মুগ্ধ করিয়াছে। সে গদ্য, সংস্কৃত আলঙ্কারিক ভাষায় বলিতে গেলে, "বৃত্তগন্ধী গদ্য।" বাঙ্গলা ভাষায় ইহার কোনও প্রতিবাক্য নাই। তবে ইংরাজীতে যাহাকে poetic prose কহে—বৃত্তগন্ধী গদ্য কতকটা সেই জাতীয়। এবং বঙ্কিমের গদ্যে পদ্যের গন্ধ থাকাতেই, বাঙ্গালী পাঠকের নিকট তাহা এতাদৃশ আদরের সামগ্রী হইয়াছে। মাইকেল পদ্যকে গদ্যের কোঠায় তুলিতে যাওয়াতে,

অমিত্রাক্ষর একঘরে ছন্দ হইয়া রহিয়াছে; অপরপক্ষে বঙ্কিম গদ্যকে পদ্যের কোঠায় লইয়া যাওয়াতে, তাহা সাহিত্যসমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

"আলালের ঘরের দুলাল" যে বঙ্গসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে উক্ত গ্রন্থের ভাষা খাঁটি বাঙ্গলা,—ইহার আসল কারণ এই যে, তাহা খাঁটি গদ্য।

অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যায় যে, পদ্যই হইতেছে বাঙ্গালী-জাতির আত্মপ্রকাশের স্বকীয় রীতি। এই কারণেই গত একশত বৎসর-ব্যাপী গদ্যের রাজত্ব সত্ত্বেও—বাঙ্গলায় বর্ত্তমানে গদ্যলেখক অপেক্ষা পদ্যলেখকের সংখ্যা অনেক বেশী। এ কালের যুবকমাত্রেই বলেন যে, তাঁহারা লেখনী স্পর্শ করামাত্র তাঁহাদের বুকের ভিতর পদ্য ঠেল মারিয়া ওঠে, এবং সে লেখনী তৎক্ষণাৎ কবিত্বরসের Fountain pen-য়ে পরিণত হয়।

অবস্থা যখন এইরূপ,—গদ্য যখন আমাদের ধাতে সহিল না,—তখন গদ্যকে স্পষ্টাস্পষ্টি ত্যাগ করিয়া, আমাদের পদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। গদ্য সাহিত্য-ক্ষেত্রের রবিশস্য,—বাঙ্গলাদেশের ভিজে মাটি ও জলো হাওয়ায় তাহা তেমন জোর করিতে পারে না। একটু মাথা তুলিতে গেলেই তাহা পদ্যাক্রান্ত হইয়া পড়ে।

পদ্যের চর্চ্চা করিলে যে কি সুফল হইবে, নিম্নে তাহা বিবৃত করিতেছি।

বর্ত্তমানে বাঙ্গলাদেশে সরস্বতীর অবস্থিতি এক স্কুলকলেজে, আর এক পুস্তকে পত্রিকায়।

একালের বিদ্যালয়ে আমরা পাঠ করিতে যাই না—পাস করিতে যাই; অর্থাৎ Universityর বাঙ্গলা নাম পাঠশালা নয়—পাস-শালা। পাস করিতে হইলে প্রশ্নের মুখামুখি জবাব দিতে হয়, এবং সে জন্য সে জবাব মুখস্থ রাখিতে হয়। গদ্য অপেক্ষ পদ্য যে কণ্ঠস্থ করা ঢের সহজ, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ে সকল বিদ্যা—মায় গণিতশাস্ত্র—যদি পদ্যে অভ্যস্ত করিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ছেলেরা যে শতকরা একশ'জন পাস হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা আশা করি,. আমার এ প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করিবেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদের কোনও হাত নাই, কেননা আমরা মাত্র-সাহিত্যিক।

কিন্তু যেহেতু আমরা সাহিত্যিক, সে কারণ পুস্তক পত্রিকার উপর আমাদের সম্পূর্ণ হাত আছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই অন্ততঃ সাহিত্যে অনায়াসে পদ্যকে পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

এ যুগে কেবলমাত্র চার শ্রেণীর রচনা সাহিত্য-পদবাচ্য—কবিতা, ছোটগল্প, প্রত্নতত্ত্ব এবং সমালোচনা।

বলা বাহুল্য, কবিতা যে পদ্যে লেখা সম্ভব, শুধু তাহাই নহে,—কর্ত্তব্যও বটে। গদ্যে কবিত্ব করিলে তাহা যে কবিতা হয় না, ইহা ত সর্ব্ববাদীসম্মত।

গল্প যে পদ্যে লেখা যায়, তাহার প্রমাণ পৃথিবীর সকল দেশের সকল মহাকাব্য। তবে এস্থলে এ আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, ও সব বড়লোকের বড় কথা, ছোট গল্প যে পদ্য-দেহধারণ করিতে পারে, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "কথা" ও

"কাহিনী"। পদ্যস্থ হইয়াই ও-সকল গল্প শতদলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরাও যদি ছোটগল্প পদ্যে লিখি, তাহা হইলে সে গল্প আর কিছু না হউক, ছোট হইতে বাধ্য।

তাহার পর প্রত্নতত্ত্ব যে গদ্যের অধিকারভুক্ত, অনেকের মনে এই ভুল ধারণা আছে। তাহার কারণ আমরা আত্মবিস্মৃত। যাহার উপর আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত,—কুলপঞ্জিকা ও শিলালিপি—তাহা যে আগাগোড়া পদ্যে লিখিত, ইহা ত প্রত্যক্ষ সত্য। সুতরাং প্রত্নতত্ত্ব গদ্যে লিখিলে, অতীতের সহিত বর্ত্তমানের যোগ রক্ষা করা হয় না। অর্থাৎ প্রত্নতত্ত্ব গদ্যে লেখার অর্থ, ঐতিহাসিক বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া ইতিহাসের চর্চ্চা করা।

অতঃপর বাকি রহিল এক সমালোচনা। আমি জানি যে, পদ্যে সমালোচনা লিখিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিক হইতে ঘোরতর আপত্তি উত্থিত হইবে, কেননা উক্ত পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে, বহু সমালোচককে হাত গুটাইয়া বসিতে হইবে। কিন্তু আমি নবীন প্রবীন সকল সাহিত্যিককে জিজ্ঞাসা করি যে, সমালোচনার পরিমাণ কমিয়া যাওয়াতে বঙ্গ-সাহিত্যের কি কিছু ক্ষতি হইবে? এ প্রশ্নের উত্তরে "হাঁ" শব্দ কয়জনে নাদস্বরে উচ্চারণ করিতে পারেন? বলা বাহুল্য যে, নাদস্বর কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত হয় না, বক্ষ হইতে উত্থিত হয়।

আমি ধরিয়া লইতেছি যে, ভবিষ্যতে কবিতা, গল্প ও প্রত্নতত্ত্ব পদ্যেই লিখিত হইবে; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে যিনি পদ্য লিখিতে পারেন না, তাঁহার যে সমালোচনা করিবার অধিকার আছে, এ কথা কোনও কবি, গল্পলেখক কিম্বা প্রত্নতাত্ত্বিক স্বীকার করিবেন না।

এ প্রস্তাব সম্বন্ধে যদি কেহ এই আপত্তি-সূচক প্রশ্ন করেন যে,

তবে কি সমালোচককে কবি হইতে হইবে ?—তাহার উত্তরে আমি বলিব, অবশ্য না। কবিত্বে "ফেল" না করিলে যে সমালোচনায় পাস করা যায় না, এ কথা আমি জানি। আমি সমালোচককে কবি হইতে পরামর্শ দিই না, কবিতাকার হইতে বলি।

"কবিতাকার" শব্দটি আমাকর্ত্তৃক উদ্ভাবিত নহে। রামমোহন রায়ের যুগে ও-শব্দের বিশেষ প্রচলন ছিল। তাঁহারই নাম "কবিতাকার", যিনি কবি নন, অথচ পদ্য লিখিতে পারেন ; এ শ্রেণীর লেখকের বাঙ্গলা-দেশে ত কোনই অভাব নাই। সংক্ষেপে আমার প্রস্তাব এই যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর লেখকেরা সমালোচনায় মনোনিবেশ করুন, তাহা হইলে সমালোচনা সংক্ষিপ্ত হইবে, এবং সংহত হইবে, অর্থাৎ পাঠ্য হইবে। উদাহরণস্বরূপে আমার কোনও কবিতাকার বন্ধুর একটি পদ্য-সমালোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"লিখিয়াছে মহাকাব্য জন্ মিল্‌টন।
সে কাব্যে মিলের দেখি মহা অনটন ॥
তাহার নায়ক যে, সে মহা সয়তান।
মোরা কি ডরাই তারে, হিঁদুর সন্তান ?
তার তক্তে বসাইনু লঙ্কার রাবণ।
মেঘনাদে ভরে গেল কাব্যের শ্রাবণ ॥
সে শব্দে ভাগিল ভয়ে দেশ ছেড়ে মিল।
খুলে গেল কবিতার হাতে পায়ে খিল ॥"

পূর্ব্বোক্ত বন্ধুর সহিত অবশ্য আমার মতের মিল নাই। কিন্তু এ কথা আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, অমিত্রাক্ষরের স্বপক্ষে বন্ধুবর যাহা বলিয়াছেন, মিলনান্ত ছন্দোবন্ধের গুণে, তাহা গ্রাহ্য না হউক, পাঠ্য হইয়াছে।

সে যাহাই হউক, সমালোচনা অর্থে আমরা বুঝি নিন্দা ও প্রশংসা। স্তুতি যে স্তোত্র আকারেই পরিস্ফুট হয়, আর ছড়া কাটিলে নিন্দার যে কাট্তি হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিবে?

আর একটি কথা বলিয়াই আমি এ প্রবন্ধ শেষ করিব। পাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন যে, ইংরাজীশিক্ষিত সমালোচকেরা বঙ্গ-সাহিত্য বিলাতি সাহিত্যের তুলনায় সমালোচনা করেন। বঙ্কিমী-যুগে ইংরাজী-সাহিত্যের সহিত তুলনা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল। ইদানীন্তন, দিনেমার আলেমান ওলন্দাজ-সাহিত্যের সহিতই আমরা বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনা করি। Ibsen, Bjornsen, Hauptmann, Sudermann-এর দোহাই আমরা কথায় কথায় দিই। সমালোচনার এ পদ্ধতি আমার মনোমত নহে, কেননা আমাদের ন্যায় অর্দ্ধশিক্ষিত লোকের ও-সকল লেখকের সহিত পরিচয় নাই, সুতরাং তুলনাটি ঠিক হইল কিনা, তাহা আমরা বলিতে পারি না। পদ্যে সমালোচনা লিখিবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইলে, এরূপ তুলনায় সমালোচনা বন্ধ হইবে; কেননা নরওয়ে সুইডেনের সেনবংশীয়, ও জার্ম্মাণীর মানবংশীয় কবিদিগের পূরা নাম বাঙ্গলা পয়ারে প্রবেশ করানো একপ্রকার অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পূর্ব্বোক্ত কবিতাকার বন্ধুটিকে আমি পূর্ব্বোক্ত কবিদিগের নামসম্বলিত একটি সমালোচনা লিখিতে অনুরোধ করি; ফলে তিনি বহুকষ্টে একটিমাত্র শ্লোক রচনা করিয়াছেন।

পড় নাই সুধর্ম্মান কিম্বা হপ্তমান।
কাব্যের স্বধর্ম্ম বঙ্গে ভাই হতমান॥

আমার বন্ধু আরও বলেন যে—কোনও রুসীয় কবির নাম বাঙ্গলা পদ্যে কিছুতেই প্রবেশ করানো যায় না। Dostoieffskyর সহিত যদি কেহ কোনও বাঙ্গলা কিম্বা সংস্কৃত শব্দের মিল করিতে পারেন, তাহা হইলে আমার বন্ধুটি এক টাকা বাজি হারিতে রাজি আছেন! অবশ্য সে মিল Double rhyme হওয়া চাই—অর্থাৎ কেবলমাত্র কি'তে কি'তে মিল করিলে চলিবে না। কি'র সহিত কি মিলাইলে যদি তাহা কাব্য হয়, তাহা হইলে ছি'র সহিত ছি মিলাইলে তাহা কেননা সমালোচনা হইবে?—

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ মৈত্র।

কবির বিদায় *

——:•:——

তখন শীতের শেষে বসন্ত এসে উপস্থিত হয়েছে, তাই সহরের বাইরে আকাশ নির্ম্মল নীল, গাছের পাতা সবুজ, নতুন ঘাস পীত,—কিন্তু সহরে সে খবর এখনও পৌঁছয় নি ; সেখানকার আকাশ চিম্‌নির ধোঁয়ায় কালো হবার উপক্রম হয়েছে, বড় বড় বাড়ীর ভিতর এমন একটা সবুজ গাছ ছিলনা যেখানে পাখীরা এসে আশ্রয় পেতে পারে।

সে যখন সহরে ঢুকল, তখন ভাল করে ভোর হয়নি ; সবে মাত্র সহরের প্রকাণ্ড কালো লোহার দরজা খোলা হয়েছে। আগের দিন অবিশ্রাম বৃষ্টি হওয়াতে কালিমা-ধৌত আকাশ কোমল নীল দেখাচ্ছিল, আর খণ্ড খণ্ড হাল্‌কা রঙীন মেঘ কালকের ঝড়ে-ওড়া গোলাপের পাপড়ির মত মনে হচ্ছিল। সে যখন সহরের ফটকের নীচে দিয়ে এল, তখন নিদ্রালু প্রহরীরা তার দিকে তাকিয়ে দেখলে ; তার চুল লম্বা, চোখ দুটি কালো ও গভীর, তার পোষাক অদ্ভুত, আর তার হাতে ছোট্ট একটি বীণা। তাই তারা তাকে বাধা দিল না। রাস্তার পাশে বৃহৎ বিপনি খুলে বণিক বসেছিল। সকালবেলা উঠে সহরের লোকের ঘুম ভাঙ্গবার আগে, তার জিনিসপত্র গুছিয়ে খরিদ্দারের জন্যে প্রস্তুত হবে

---

* Richard Miltonএর Poet's Allegory অবলম্বনে লিখিত।

বলে বণিক রাত থাক্‌তে উঠেছিল; কিন্তু আজকের ভোরের পাগলা বাতাস তার মনের সঙ্কল্পগুলোকে যেন এলোমেলো করে দিল। সে রাস্তার দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিল। নূতন লোকটিকে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে সে চেঁচিয়ে ডাকল—ওহে তোমাকে নূতন লোক দেখছি; কি চাও তুমি এ সহরে?

সে বল্‌লে, আমি কাজ চাই।

—কাজ! কি কাজ তুমি পার? কোন দিন তুমি কোন কাজ করেছ?

সে উত্তর কর্‌লে, সহরের বাইরে বনের ভিতর গাছের তলায় লম্বা লম্বা কচি ঘাসের উপর জ্যোৎস্নারাত্রে পরীরা যখন হাত ধরাধরি করে নাচে, আমি তাদের মাঝখানে বীণাটি বাজিয়ে গান গাই।

বণিক ভেবেছিল এই সুন্দর কিশোর লোকটি বুঝি চাকরী চায়, কিন্তু তা যখন চাইলনা, এবং তার কথাও যখন বণিকের কাছে দুর্বোধ বলে মনে হল, তখন সে নিরুৎসাহে বল্‌লে—ওহো! তুমি বুঝি অন্য কোন সহর থেকে কোন খবর এনেছ? আগন্তুক বল্‌লে—না, আমি শুধু গান গাই। আমি একজন কবি।

বণিক।—আমাদের এখানেও ত একজন কবি আছে, কিন্তু সেত তোমার মত নয়—সে যা বলে, তা ত আমরা সবাই বুঝতে পারি; আমাদের সহরে কোন বিখ্যাত লোকের মৃত্যু হ'লে, কিম্বা কোন বিশেষ ঘটনা হ'লে, সে তাই নিয়ে ছড়া বাঁধে।

কবি।—আমি ঘটনা নিয়ে ছড়া বাঁধিনে, আমি গান গাই।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, গান ত গাও,—কিন্তু তার ভিতর কিছু আছে ত, খবর টবর কিছু দাও ত বটে? আমি তোমাকে একটা পরামর্শ দি, শুধু গান গাইলে হবে না, গানের ভিতর যদি এমন একটা ঘটনা বর্ণনা কর্‌তে

পার, যা শুনে লোকের লোমহর্ষণ হবে, তবে তোমার গান শুনতে আমাদের ভাল লাগবে।

কবি।—আমার কাছে কোনই খারাপ খবর নেই।

—কিন্তু খবর না থাকলে চলবে কেন ?

—খবর ! আচ্ছা এইত খবর,—আজকের সকাল বেলাটি বড় মধুর। আস্‌তে আস্‌তে সহরের বাইরে দেখলুম একটা গাছের ডালে নানা বর্ণের একটা মাছরাঙ্গা বসে আছে। আর আকাশের গায়ে উড়ে উড়ে একটা কোকিল ডেকে বল্‌ছে 'বসন্ত এসেছে ! ধরায় বসন্ত এসেছে'।

বণিক বিস্মিত হয়ে খানিকক্ষণ কবির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বল্‌লে, বাপু এ ত রোজই হচ্ছে ! এটাত একটা বিশেষ কিছু খবর নয়। তুমি পৃথিবী ঘুরে বেড়াও,—এমন কি কিছুই জাননা, যা আমাদের শোনা উচিত ? ধর কোন যুদ্ধ বিগ্রহ, কি ভূমিকম্প, কি দুর্ভিক্ষ,—এসব খবর তুমি বুঝি রাখনা ?

কবি মাথা নেড়ে বল্‌লে না ; আর যদি রাখতুমও,—তাহলেও তোমাদের বল্‌তুম না। আমি তোমাদের আনন্দ দিতে চাই, অসুখী কর্‌তে চাই নে। বণিক বল্‌লে, তাহলে তোমার এখানে কিছু হবে না বাপু। তুমি কি ভাব যে আমরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে তোমার এই মাছরাঙ্গা আর কোকিলের কথা শুনব আর গোল্লায় যাব ? উন্নতি চাই হে,—উন্নতি চাই। তোমার কথা শুনলে আলসেমি বেড়ে যাবে। বাপু। তুমি নিতান্তই পাগল দেখছি। ভাবছ যে আকাশ নীল আর মাছরাঙ্গা মানান রঙে রঙীন, এই খবর দিয়ে তুমি সহরের লোকদের ভোলাবে ? তোমাকে পয়সা দেওয়া দূরে থাকুক, তোমাকে চারটি খেতেও কেউ দেবে না। তার চেয়ে তুমি আমার এখানে খেয়ে যাও।

কবি আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌লে, তবে তুমি আমাকে তোমার বাড়ীতে রাখতে চাচ্ছ কেন ?

—বল্‌তে পারি না বাবা, তোমার মুখটী আমার মনে ধরেছে।

কবি বল্‌লে, কিন্তু তুমি যদি আমার গানগুলো ভালবেসে আমায় ডাকতে, তাহলে আমি এর চেয়ে সুখী হতুম। সকালবেলা সেই বণিকের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে, কবি বীণাটি নিয়ে আবার সহরে বেরিয়ে পড়ল। সে চলে গেলে বণিক বল্‌লে, আহা! তার মাথাটায় একটু গোল ছিল, কিন্তু ছেলেটি বড় ভাল। বণিকের স্ত্রী বল্‌লে, হ্যাঁ, দেখেছ তার চোখ দু'টি ঠিক আমার সেই ছেলের মত ? বণিকের একটী ছেলে কিছুদিন হ'ল মারা গেছে।

(২)

বণিকের বাড়ী ছেড়ে কবি মহাপাত্রের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল, কিন্তু দ্বারীরা প্রথমে ঢুক্‌তে দিলনা। মহাপাত্র তখন ঘুম থেকে সদ্য উঠে, বন্ধুদের সঙ্গে গতরাত্রের ভোজের এবং নর্ত্তকীর নাচের সমালোচনা কর্‌ছিলেন ;—খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, গানওয়ালাকে ডাক। কবি তাঁর সামনে এলে তিনি বল্‌লেন, তুমি একটি গান গাও। কবি বিনীত ভাবে বল্‌লে, কি গান গাইব ? মহাপাত্র বল্‌লেন, সব চেয়ে হাল ফ্যাসানের একটা গান গাও। তরুণ কবি বীণাটি বাজিয়ে, জলাশয়ের ধারে মাছরাঙ্গা আর সেই উন্মাদ কোকিলটার গান গাইল। মহাপাত্র রেগে বল্‌লেন, কিহে! তুমি আমাদের বোকা পেয়েছ নাকি ? একে তুমি নূতন গান বল ? তুমি যদি কোন নূতন খবর নাই রাখ,

তাহ'লে তুমি গান গাইতে এসো কেন? আমরা শুনতে চাই—আমাদের এই পাড়াপড়শীদের কথা, তারা কি করে, তাদের স্ত্রীরাই বা কে কি করে। ওই যে রাস্তার ধারে মোটা বণিকটা বাস করে, শুনতে পাই ও বেজায় লোক ঠকায়। আরও কিছু দূরে একজন মস্ত মহাত্মা আছেন, গোপনে গোপনে তিনি অনেক কুকাণ্ড করেন। এই সব নিয়ে তুমি একটি গান রচনা কর, তবে ত বুঝি তুমি একটী কবি। কবি বল্‌লে, এত পঙ্কিলতার ভিতর থেকেও তোমার পঙ্কিলতার সাধ মিটলনা, গানেও তুমি তাই চাও! মহাপাত্র রেগে বল্লেন, বেয়াদব! ঠক্ কোথাকার! তোমার কোকিল আর তোমার মাছরাঙ্গা, না তোমার মাথা! বেরিয়ে যাও তুমি আমার বাড়ী থেকে! কবি আবার রাস্তায় বেরল। ধীরে ধীরে গিয়ে পণ্ডিতের কুটীরের দাওয়ায় বসে, তার বীণাটিতে ঝঙ্কার দিতে লাগল। পণ্ডিত তখন চশমা চোখে দিয়ে পুঁথি লিখছিলেন, তিনি বিরক্ত হয়ে বল্‌লেন, বৎস! তুমি অন্যত্র যাও, আমি এখন ব্যস্ত আছি। কবি বল্‌লে, আপনাকে আমি গান শোনাতে এসেছি, আপনি একটী গান শুনুন—তারপর সেই গানটী গাইল। পণ্ডিত গান শুনে বিশেষ চিন্তান্বিত হ'লেন, তারপর বল্‌লেন, বৎস! একটু অপেক্ষা কর, আমি তোমার ভ্রান্তি দেখিয়ে দিচ্ছি।—এই বলে তিনি তাঁর এক জীর্ণ পুঁথি দেখিয়ে বল্‌লেন, দেখ বইয়েতেই লিখেছে যে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গান যে যুগে লেখা উচিত ছিল, সে হচ্ছে মধ্যযুগ। আজকাল বাস্তবের যুগ চল্‌ছে। অবশ্য তোমার কবিতাতে যে প্রশংসনীয় কিছু নেই, আমি তা বল্‌ছিনে। তোমার কবিতার সঙ্গে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস না জানাতে, তুমি ভুল বিষয় নির্ব্বাচন করেছ। আজ আমি বিশেষ কাজে ব্যস্ত

আছি, অন্য একদিন এলে এ সম্বন্ধে তোমাকে ভাল করে বুঝিয়ে দেব। এই বলে আশীর্ব্বাদ করে' কবিকে তিনি বিদায় দিলেন। পণ্ডিতের বাড়ী ছেড়ে কবি অনেক ঘুর্‌ল,—দেখ্‌লে কেউ তার গান শুনতে চায় না। সবাই বল্‌লে—ওহে গানওয়ালা! এখন কাজের সময়, ওসব ছেলেমানুষেমির সময় নয়—তুমি অন্য জায়গায় যাও।

(৩)

বিকেল হয়ে এল। বিষন্ন মনে, ক্লান্ত পদে, কবি সহরের প্রান্তে গিয়ে বসে আপন মনে বীণাটি বাজাতে লাগ্‌ল; তার বীণার সুরে তার চোখের জল যেন উথ্‌লে উঠতে লাগ্‌ল। তখন পাঠশালা থেকে প্রত্যাগত ছেলেরা একে একে অনেকে এসে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে, তার গান শুনতে লাগ্‌ল। তারা বল্‌লে কে ভাই তুমি? সে বল্‌লে আমি ভাই কবি। তারা বল্‌লে, ভাই কবি, তুমি কেবল এমন গান গাও কেন, যাতে চোখে জল আসে? এমন একটা গান গাও, যা শুনে আমাদের আনন্দ হবে। সে তখন আর একটা গান ধর্‌ল, আর তারা তাদের মোটা মোটা বেল ফুলের মত হাত ধরাধরি করে কবিকে ঘিরে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। কবির মুখে আবার হাসি ফিরে এল। এমন সময় সহরের লোকেরা এসে গান থামিয়ে দিল, আর ছেলেদের খুব বক্‌তে লাগ্‌ল—বল্‌লে, তোরা বুঝিস্‌না, শুঝিস্‌না যা শুনিস্‌ তাতেই লাফাস্‌; ওতে শেখবার কিছুই নেই। তারা কবিকে বল্‌তে লাগল—তুমি যদি তত্ত্ব কথা জান ত বল, নাহলে চুপ করে থাক। কবি বল্‌লে, আমি তোমাদের এই তত্ত্বকথা বল্‌তে চাই যে, তোমাদের মাথার উপরকার এই আকাশ

কত নীল, আর তোমাদের পায়ের নীচের ঘাস কত সবুজ। তারা চেঁচিয়ে উত্তর কর্‌ল,—ও আমরা অনেককাল জানি। কবি অনেক অপমান সহ্য করেছে, তাই রেগে বল্‌লে—জাননা! তোমরা তা জাননা! যদি তোমরা জানতে আজ নীলাকাশে কি স্নিগ্ধতা, আজ এই বসন্তের আলোতে কি মাদকতা, আজ এই পাগলা হাওয়ায় কি কাজ-ভোলানো আহ্বান,—তাহলে তোমরা আজ কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারতেনা। জানলে তোমরা গান গাইতে গাইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দূর সবুজ পাহাড়ে চলে যেতে! তারা ঠাট্টা করে বল্‌লে, আর আমাদের কাজ কে করে দিত? কবি বল্‌লে, কাজের কথা তাহ'লে মনেই থাক্‌ত না! সহরের লোকেরা যখন কবিকে ভর্ৎসনা করে চলে গেল, তখন কবি আপন মনে তার সেই দুঃখের গানটি গাইতে লাগল। এমন সময় মহাপাত্রের মেয়ে অলকা ধীরে এসে তাঁর পিঠে হাত দিল,—বল্‌ল, ভাই কবি, তোমার জন্য আমি কিছু ফল এনেছি। কবি দুই হাত পেতে আঙুর আপেল নিয়ে খেতে লাগল, আর অলকা মায়ের মত যত্নে তাকে খাওয়াতে লাগল। যখন খাওয়া শেষ হয়ে গেল, তখন অলকা তার দু'খানি ছোট হাত দিয়ে কবির হাত ধরে, নীচু হয়ে কবির কপালে চুমো খেলে। তার খোলা কালো চুল কবির চোখ বুক ঢেকে ফেল্‌লে। কবি বল্‌ল সুন্দর! তুমি সুন্দর! কালো ঘন অন্ধকারের মত তোমার চুল, কালো শ্রাবণের মেঘের মত কালো তোমার আঁখি! অলকা তার সুডোল দুইখানি বাহু দিয়ে কবির গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌লে, আমি তোমাকে ভালবাসি! কবি বল্‌ল, আমার গান—সে কি তুমি ভালবাসনা? অলকা উত্তর দিল—বাসি! কিন্তু তার চেয়ে তোমাকে আমি বেশী ভালবাসি। কবি তাকে দু'হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে বল্‌ল, তুমিও আর

সবারই মত—আমার কবিতাই যে আমার সব, তা কেন তুমি বোঝনা? অলকা চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে বসে রইল। তার চোখ জলে ভরে এল। কবি অনুতপ্ত হয়ে, তার দুটি হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিলে, তাকে চুমো খেয়ে বল্‌ল—তুমি যদি আমার গান ভাল-বাস্‌তে!—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস তার বুকটা চেপে ধরল। অলকা বল্‌লে, তুমি যে তোমার গানের চেয়েও বড়—আমি গান শুনব কি করে, আমি কেবল তোমায় দেখি। কবি বল্‌লে,—হায়রে! আমার গান, তোমারও তা ভাল লাগল না?—উপরের আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে এল, আর একটী একটী করে তারা ফুটে উঠল। অলকা চলে গেল। কবি আবার বীণাটি নিয়ে বস্‌ল, পাড়ার লোক শুন্‌ল সারা-রাত কে যেন বীণা বাজিয়ে গান করছে।

(৪)

সকালবেলা প্রহরীরা কবিকে ধরে বিচারকের কাছে নিয়ে গেল। বল্‌লে, প্রভু! এ সমস্ত রাত ধরে গান করেছে, আর ছেলেদের ক্ষেপিয়ে তুলেছে; একে কঠোর সাজা দিতে হ'বে। এ ব্যক্তি নিষ্কর্ম্মা, ছেলে ঠকিয়ে পয়সা নেবার চেষ্টা করে।

কবি বল্‌ল,—প্রভু! আমি কর্ম্মহীন বটে, কিন্তু ঠক্ নই,—আমি গান গাই। বিচারক বল্‌লেন,—ওহো! তুমি গানওয়ালা, কি গান তুমি কর, কি তত্ত্ব তুমি জান, আমাকে বোঝাও দেখি?

—আমাকে যদি গান গাইবার অনুমতি দেন, তাহ'লে বোঝাতে পারি। বিজ্ঞ বিচারক মাথা নেড়ে বল্‌লেন,—আচ্ছা গাইতে পার; কিন্তু আগে

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্‌, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্‌ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জাপানের পত্র।

——:o:——

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোণোকে দেখতে হলে, ভাল করে চোখ মেলতেই হয় না। সেই জন্যে নতুনকে যত শীঘ্র পারে দেখে নিয়ে, মন আপনার অতিরিক্ত বাতিগুলো নিবিয়ে ফেলে। খরচ বাঁচাতে চায়, মনোযোগকে উস্‌কে রাখতে চায় না।

মুকুল আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছিল,—দেশে থাকতে বই পড়ে, ছবি দেখে জাপানকে যেরকম বিশেষভাবে নতুন বলে মনে হত, এখানে কেন তা হচ্চে না?—তার কারণই এই। রেঙ্গুন থেকে আরম্ভ করে, সিঙাপুর, হংকং দিয়ে আসতে আসতে মনের নতুন দেখার বিশেষ আয়োজনটুকু ক্রমে ক্রমে ফুরিয়ে আসে। যখন বিদেশী সমুদ্রের এ-কোণে ও-কোণে ন্যাড়া ন্যাড়া পাহাড়গুলো উঁকি মারতে থাকে, তখন বলতে থাকি, বাঃ! তখন মুকুল বলে, ঐখানে নেবে গিয়ে থাকতে বেশ মজা! ও মনে করে এই নতুনকে প্রথম দেখার উত্তেজনা বুঝি চিরদিনই থাকবে; ওখানে ঐ ছোট ছোট পাহাড়গুলোর সঙ্গে গলা-ধরাধরি করে সমুদ্র বুঝি চিরদিনই এই নতুন ভাষায় কানাকানি করে; যেন ঐখানে পৌঁছলে পরে সমুদ্রের চঞ্চলনীল, আকাশের শান্তনীল আর ঐ পাহাড়গুলোর ঝাপ্‌সানীল ছাড়া আর কিছুর দরকারই হয় না। তারপরে বিরল ক্রমে অবিরল হতে

লাগল, ক্ষণে ক্ষণে আমাদের জাহাজ এক একটা দ্বীপের গা ঘেঁষে চল্‌ল ; তখন দেখি দূরবীন টেবিলের উপর অনাদরে পড়ে থাকে, মন আর সাড়া দেয় না। যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে, তখন দেখাটাই কমে যায়। নতুনকে ভোগ করে করে নতুনের ক্ষিদে ক্রমে মরে যায়।

হপ্তাখানেক জাপানে আছি, কিন্তু মনে হচ্চে যেন অনেক দিন আছি। তার মানে, পথঘাট, গাছপালা, লোকজনের যেটুকু নতুন, সেটুকু তেমন গভীর নয়,—তাদের মধ্যে যেটা পুরোণো সেইটেই পরিমাণে বেশী। অফুরান নতুন কোথাও নেই ; অর্থাৎ যার সঙ্গে আমাদের চিরপরিচিত খাপ খায় না, জগতে এমন অসঙ্গত কিছুই নেই! প্রথমে ধাঁ করে চোখে পড়ে, যেগুলো হঠাৎ আমাদের মনের অভ্যাসের সঙ্গে মেলে না।—তারপরে পুরোণোর সঙ্গে নতুনের যে যে অংশের রঙে মেলে, চেহারায় কাছাকাছি আসে, মন তাড়াতাড়ি সেইগুলোকে পাশাপাশি সাজিয়ে নিয়ে তাদের সঙ্গে ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়। তাস খেল্‌তে বসে আমরা হাতে কাগজ পেলে রং এবং মূল্য অনুসারে তাদের পরে পরে সাজিয়ে নিই,—এও সেই রকম। শুধু ত নতুনকে দেখে যাওয়া নয়, তার সঙ্গে যে ব্যবহার কর্‌তে হবে ; কাজেই মন তাকে নিজের পুরোণো কাঠামোর মধ্যে যত শীঘ্র পারে গুছিয়ে নেয়। যেই গোছানো হয়, তখন দেখতে পাই, তত বেশী নতুন নয়, যতটা গোড়ায় মনে হয়েছিল ; আসলে পুরোণো, ভঙ্গীটাই নতুন।

তারপরে আর এক মুস্কিল হয়েচে এই যে, দেখতে পাচ্চি পৃথিবীর সকল সভ্য জাতই বর্ত্তমান কালের ছাঁচে ঢালাই হয়ে, একই রকম চেহারা অথবা চেহারার অভাব ধারণ করেচে। আমার এই জানলায়

বসে কোবে সহরের দিকে তাকিয়ে, এই যা দেখচি, এ ত লোহার জাপান,—এ ত রক্তমাংসের নয়। একদিকে আমার জানালা, আর এক দিকে সমুদ্র, এর মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সহর। চীনেরা যেরকম বিকটমূর্ত্তি ড্রাগন আঁকে—সেইরকম। আঁকাবাঁকা বিপুল দেহ নিয়ে সে যেন সবুজ পৃথিবীটিকে খেয়ে ফেলেচে। গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি লোহার চালগুলো ঠিক যেন তার পিঠের আঁশের মত রৌদ্রে ঝক্‌ঝক্‌ কর্‌চে। বড় কঠিন, বড় কুৎসিত,—এই দরকার নামক দৈত্যটা। প্রকৃতির মধ্যে মানুষের যে অন্ন আছে, তা ফলে শস্যে বিচিত্র এবং সুন্দর; কিন্তু সেই অন্নকে যখন গ্রাস কর্‌তে যাই, তখন তাকে তাল পাকিয়ে একটা পিণ্ড করে তুলি; তখন বিশেষত্বকে দরকারের চাপে পিষে ফেলি। কোবে সহরের পিঠের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, মানুষের দরকার পদার্থটা স্বভাবের বিচিত্রতাকে একাকার করে দিয়েচে। মানুষের দরকার আছে, এই কথাটাই ক্রমাগত বাড়তে বাড়তে, হাঁ করতে কর্‌তে পৃথিবীর অধিকাংশকে গ্রাস করে ফেল্‌চে। প্রকৃতিও দরকারের সামগ্রী, মানুষও দরকারের মানুষ হয়ে আস্‌চে।

যে দিন থেকে কল্‌কাতা ছেড়ে বেরিয়েচি, ঘাটে ঘাটে দেশে দেশে এইটেই খুব বড় করে দেখতে পাচ্চি। মানুষের দরকার মানুষের পূর্ণতাকে যে কতখানি ছাড়িয়ে যাচ্চে, এর আগে কোনদিন আমি সেটা এমন স্পষ্ট করে দেখতে পাই নি। এক সময়ে মানুষ এই দরকারকে ছোট করে দেখেছিল।। ব্যবসাকে তারা নীচের জায়গা দিয়েছিল; টাকা রোজগার করাটাকে সম্মান করে নি। দেবপূজা করে', বিদ্যাদান করে', আনন্দ দান করে' যারা টাকা নিয়েচে, মানুষ তাদের ঘৃণা করেচে। কিন্তু আজকাল জীবনযাত্রা এতই বেশী দুঃসাধ্য, এবং টাকার আয়তন

ও শক্তি এতই বেশী বড় হয়ে উঠেছে যে, দরকার এবং দরকারের বাহনগুলোকে মানুষ আর ঘৃণা করতে সাহস করে না। এখন মানুষ আপনার সকল জিনিসেরই মূল্যের পরিমাণ, টাকা দিয়ে বিচার করতে লজ্জা করে না। এতে করে সমস্ত মানুষের প্রকৃতির বদল হয়ে আস্‌চে—জীবনের লক্ষ্য এবং গৌরব, অন্তর থেকে বাইরের দিকে, আনন্দ থেকে প্রয়োজনের দিকে অত্যন্ত ঝুঁকে পড়্‌চে। মানুষ ক্রমাগত নিজেকে বিক্রি করতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করচে না। ক্রমশই সমাজের এমন একটা বদল হয়ে আস্‌চে যে, টাকাই মানুষের যোগ্যতারূপে প্রকাশ পাচ্চে। অথচ এটা কেবল দায়ে পড়ে ঘটচে, প্রকৃতপক্ষে এটা সত্য নয়। তাই এক সময়ে যে মানুষ মনুষ্যত্বের খাতিরে টাকাকে অবজ্ঞা করতে জানত, এখন সে টাকার খাতিরে মনুষ্যত্বকে অবজ্ঞা করচে। রাজ্যতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, ঘরে বাইরে, সর্ব্বত্রই তার পরিচয় কুৎসিত হয়ে উঠ্‌চে। কিন্তু বীভৎসতাকে দেখ্‌তে পাচ্চি নে, কেননা লোভে দুই চোখ আচ্ছন্ন।

জাপানের সহরের চেহারায় জাপানিত্ব বিশেষ নেই, মানুষের সাজ সজ্জা থেকেও জাপান ক্রমশঃ বিদায় নিচ্চে। অর্থাৎ, জাপান ঘরের পোষাক ছেড়ে আপিসের পোষাক ধরেচে। আজকাল পৃথিবী-জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েচে, সেটা কোনো বিশেষ দেশ নয়। যেহেতু আপিসের সৃষ্টি আধুনিক য়ুরোপ থেকে, সেই জন্যে এর বেশ আধুনিক য়ুরোপের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই বেশে মানুষের বা দেশের পরিচয় দেয় না, আপিস-রাজ্যের পরিচয় দেয়। আমাদের দেশেও ডাক্তার বল্‌চে,—আমার ঐ হ্যাট্ কোটের দরকার আছে; আইনজীবীও তাই বল্‌চে, বণিকও তাই বল্‌চে। এমনি করেই দরকার জিনিসটা

বেড়ে চলতে চলতে, সমস্ত পৃথিবীকে কুৎসিতভাবে একাকার করে দিচ্চে।

এই জন্যে জাপানের সহরের রাস্তায় বেরলেই, প্রধানভাবে চোখে পড়ে জাপানের মেয়েরা। তখন বুঝতে পারি, এরাই জাপানের ঘর, জাপানের দেশ। এরা আপিসের নয়। কারো কারো কাছে শুনতে পাই, জাপানের মেয়েরা এখানকার পুরুষের কাছ থেকে সম্মান পায় না। সে কথা সত্য কি মিথ্যা জানিনে, কিন্তু একটা সম্মান আছে সেটা বাইরে থেকে দেওয়া নয়—সেটা নিজের ভিতরকার। এখানকার মেয়েরাই জাপানের বেশে জাপানের সম্মানরক্ষার ভার নিয়েচে। ওরা দরকারকেই সকলের চেয়ে বড় করে খাতির করেনি, সেই জন্যেই ওরা নয়নমনের আনন্দ।

একটা জিনিস এখানে পথে ঘাটে চোখে পড়ে। রাস্তায় লোকের ভিড় আছে, কিন্তু গোলমাল একেবারে নেই। এরা যেন চেঁচাতে জানে না। লোকে বলে জাপানের ছেলেরা সুদ্ধ কাঁদে না। আমি এ পর্য্যন্ত একটি ছেলেকেও কাঁদতে দেখিনি। পথে মোটরে করে যাবার সময়ে, মাঝে মাঝে যেখানে ঠেলাগাড়ি প্রভৃতি বাধা এসে পড়ে, সেখানে মোটরের চালক শান্তভাবে অপেক্ষা করে,—গাল দেয় না, হাঁকা-হাঁকি করে না। পথের মধ্যে হঠাৎ একটা বাইসিক্‌ল্ মোটরের উপরে এসে পড়বার উপক্রম করলে—আমাদের দেশের চালক এ অবস্থায় বাইসিক্‌ল্-আরোহীকে অনাবশ্যক গাল না দিয়ে থাকতে পারত না। এ লোকটা ভ্রূক্ষেপমাত্র করলে না। এখানকার বাঙ্গালীদের কাছে শুনতে পেলুম যে, রাস্তায় দুই বাইসিক্লে, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে বাইসিক্লের ঠোকাঠুকি হয়ে যখন রক্তপাত হয়ে যায়, তখনো

উভয়পক্ষ চেঁচামেচি গালমন্দ না করে, গায়ের ধুলো ঝেড়ে চলে যায়।

আমার কাছে মনে হয়, এইটেই জাপানের শক্তির মুল কারণ। জাপানী বাজে চেঁচামেচি ঝগড়াঝাঁটি করে নিজের বলক্ষয় করে না। প্রাণশক্তির বাজে খরচ নেই বলে, প্রয়োজনের সময় টানাটানি পড়ে না। শরীর মনের এই শান্তি ও সহিষ্ণুতা, ওদের স্বজাতীয় সাধনার একটা অঙ্গ। শোক দুঃখে, আঘাতে উত্তেজনায়, ওরা নিজেকে সংযত করতে জানে। সেই জন্যেই বিদেশের লোকেরা প্রায় বলে— জাপানীকে বোঝা যায় না, ওরা অত্যন্ত বেশী গূঢ়। এর কারণই হচ্চে, এরা নিজেকে সর্ব্বদা ফুটো দিয়ে, ফাঁক দিয়ে গলে পড়তে দেয় না।

এই যে নিজের প্রকাশকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করতে থাকা,—এ ওদের কবিতাতেও দেখা যায়। তিন লাইনের কাব্য জগতের আর কোথাও নেই। এই তিন লাইনই ওদের কবি, পাঠক, উভয়ের পক্ষেই যথেষ্ট। এই জন্যেই এখানে এসে অবধি, রাস্তায় কেউ গান গাচ্চে, এ আমি শুনি নি। এদের হৃদয় ঝরনার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ। এ পর্য্যন্ত ওদের যত কবিতা শুনেচি, সবগুলিই হচ্চে ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়। হৃদয়ের দাহ এবং ক্ষোভ প্রাণকে খরচ করে, এদের সেই খরচ কম। এদের অন্তরের সমস্ত প্রকাশ সৌন্দর্য্য-বোধে। সৌন্দর্য্য-বোধ জিনিসটা স্বার্থনিরপেক্ষ। ফুল, পাখী, চাঁদ, এদের নিয়ে আমাদের কাঁদাকাটা নেই। এদের সঙ্গে আমাদের নিছক সৌন্দর্য্যভোগের সম্বন্ধ—এরা আমাদের কোথাও মারে না, কিছু কাড়ে না—এদের দ্বারা আমাদের

জীবনে কোথাও ক্ষয় ঘটে না। সেই জন্যেই তিন লাইনেই এদের কুলোয়, এবং কল্পনাটাতেও এরা শান্তির ব্যাঘাত করে না।

এদের দুটো বিখ্যাত পুরোণো কবিতার নমুনা দেখলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে :—

পুরোণো পুকুর,
ব্যাঙের লাফ,
জলের শব্দ।

বাস্! আর দরকার নেই। জাপানী পাঠকের মনটা চোখে ভরা। পুরোণো পুকুর মানুষের পরিত্যক্ত, নিস্তব্ধ, অন্ধকার। তার মধ্যে একটা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়্তেই শব্দটা শোনা গেল। শোনা গেল—এতে বোঝা যাবে পুকুরটা কিরকম স্তব্ধ। এই পুরোণো পুকুরের ছবিটা কি ভাবে মনের মধ্যে এঁকে নিতে হবে, সেইটুকু কেবল কবি ইসারা করে দিলে—তার বেশী একেবারে অনাবশ্যক।

আর একটা কবিতা :—

পচা ডাল,
একটা কাক,
শরৎকাল।

আর বেশী না! শরৎকালে গাছের ডালে পাতা নেই, দুই একটা ডাল পচে গেছে, তার উপরে কাক বসে'। শীতের দেশে শরৎকালটা হচ্চে গাছের পাতা ঝরে যাবার, ফুল পড়ে যাবার, কুয়াশায় আকাশ ম্লান হবার কাল—এই কালটা মৃত্যুর ভাব মনে আনে। পচা ডালে কালো কাক বসে আছে, এইটুকুতেই পাঠক শরৎকালের সমস্ত

রিক্ততা ও ম্লানতার ছবি মনের সামনে দেখতে পায়। কবি কেবল সূত্রপাত করে দিয়েই সরে দাঁড়ায়। তাকে যে অত অল্পের মধ্যেই সরে যেতে হয়, তার কারণ এই যে, জাপানী পাঠকের মনের দৃষ্টিশক্তিটা প্রবল।

এই খানে একটা কবিতার নমুনা দিই, যেটা চোখে দেখার চেয়ে বড়ঃ—

স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য হচ্চে ফুল, দেবতারা এবং বুদ্ধ হচ্চেন ফুল,—

মানুষের হৃদয় হচ্চে ফুলের অন্তরাত্মা।

আমার মনে হয়, এই কবিতাটিতে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষের মিল হয়েচে। জাপান স্বর্গমর্ত্ত্যকে বিকশিত ফুলের মত সুন্দর করে দেখ্‌চে—ভারতবর্ষ বল্‌চে, এই যে একবৃন্তে দুই ফুল,—স্বর্গ এবং মর্ত্ত্য, দেবতা এবং বুদ্ধ,—মানুষের হৃদয় যদি না থাকত, তবে এ ফুল কেবলমাত্র বাইরের জিনিস হত;—এই সুন্দরের সৌন্দর্য্যটিই হচ্চে মানুষের হৃদয়ের মধ্যে।

যাই হোক্, এই কবিতাগুলির মধ্যে কেবল যে বাক্‌সংযম তা নয়—এর মধ্যে ভাবের সংযম। এই ভাবের সংযমকে হৃদয়ের চাঞ্চল্য কোথাও ক্ষুব্ধ করচে না। আমাদের মনে হয়, এইটেতে জাপানের একটা গভীর পরিচয় আছে। এক কথায় বল্‌তে গেলে, এ'কে বলা যেতে পারে হৃদয়ের মিতব্যয়িতা।

মানুষের একটা ইন্দ্রিয়শক্তিকে খর্ব্ব করে আর-একটাকে বাড়ানো চলে, এ আমরা দেখেচি। সৌন্দর্য্যবোধ এবং হৃদয়াবেগ, এ দুটোই হৃদয়বৃত্তি। আবেগের বোধ এবং প্রকাশকে খর্ব্ব করে, সৌন্দর্য্যের

বোধ এবং প্রকাশকে প্রভূত পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা যেতে পারে,—এখানে এসে অবধি এই কথাটা আমার মনে হয়েচে। হৃদয়োচ্ছ্বাস আমাদের দেশে এবং অন্যত্র বিস্তর দেখেছি, সেইটে এখানে চোখে পড়ে না। সৌন্দর্য্যের অনুভূতি এখানে এত বেশী করে' এবং এমন সর্ব্বত্র দেখতে পাই যে, স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, এটা এমন একটা বিশেষ বোধ যা আমরা ঠিক বুঝতে পারি নে। এ যেন কুকুরের ঘ্রাণশক্তি ও মৌমাছির দিক্-বোধের মত, আমাদের উপলব্ধির অতীত। এখানে যে লোক অত্যন্ত গরীব, সেও প্রতিদিন নিজের পেটের ক্ষুধাকে বঞ্চনা করেও এক আধ পয়সার ফুল না কিনে বাঁচে না। এদের চোখের ক্ষুধা এদের পেটের ক্ষুধার চেয়ে কম নয়।

কাল দুজন জাপানী মেয়ে এসে, আমাকে এ দেশের ফুল সাজানোর বিদ্যা দেখিয়ে গেল। এর মধ্যে কত আয়োজন, কত চিন্তা, কত নৈপুণ্য আছে, তার ঠিকানা নেই। প্রত্যেক পাতা এবং প্রত্যেক ডালটির উপর মন দিতে হয়। চোখে দেখার ছন্দ এবং সঙ্গীত যে এদের কাছে কত প্রবলভাবে সুগোচর, কাল আমি ঐ দুজন জাপানী মেয়ের কাজ দেখে বুঝতে পার্‌ছিলুম।

একটা বইয়ে পড়্‌ছিলুম, প্রাচীন কালে বিখ্যাত যোদ্ধা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা অবকাশকালে এই ফুল সাজাবার বিদ্যার আলোচনা কর্‌তেন। তাঁদের ধারণা ছিল, এতে তাঁদের রণদক্ষতা ও বীরত্বের উন্নতি হয়। এর থেকেই বুঝতে পার্‌বে, জাপানী নিজের এই সৌন্দর্য্য-অনুভূতিকে সৌখীন জিনিস বলে মনে করে না; ওরা জানে গভীরভাবে এতে মানুষের শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই শক্তিবৃদ্ধির মূল কারণটা হচ্চে শান্তি; যে সৌন্দর্য্যের আনন্দ নিরাসক্ত আনন্দ, তাতে জীবনের ক্ষয় নিবারণ

করে, এবং যে উত্তেজনাপ্রবণতায় মানুষের মনোবৃত্তি ও হৃদয়-বৃত্তিকে মেঘাচ্ছন্ন করে তোলে, এই সৌন্দর্য্যবোধ তাকে পরিশান্ত করে।

সেদিন একজন ধনী জাপানী তাঁর বাড়িতে চা-পান অনুষ্ঠানে আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তোমরা ওকাকুরার Book of Tea পড়েচ, তাতে এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। সেদিন এই অনুষ্ঠান দেখে স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম, জাপানীর পক্ষে এটা ধর্ম্মানুষ্ঠানের তুল্য। এ ওদের একটা জাতীয় সাধনা। ওরা কোন্ আইডিয়ালকে লক্ষ্য কর্‌চে, এর থেকে তা বেশ বোঝা যায়।

কোবে থেকে দীর্ঘ পথ মোটর যানে করে গিয়ে, প্রথমেই একটি বাগানে প্রবেশ কর্‌লুম—সে বাগান ছায়াতে, সৌন্দর্য্যে এবং শান্তিতে একেবারে নিবিড়ভাবে পূর্ণ। বাগান জিনিসটা যে কি, তা এরা জানে। কতকগুলো কাঁকর ফেলে আর গাছ পুঁতে, মাটির উপরে জিয়োমেট্রি কষাকেই যে বাগান করা বলে না, তা জাপানী-বাগানে ঢুকলেই বোঝা যায়। জাপানীর চোখ এবং হাত দুইই প্রকৃতির কাছ থেকে সৌন্দর্য্যের দীক্ষালাভ করেচে—যেমন ওরা দেখতে জানে, তেমনি ওরা গড়তে জানে। ছায়াপথ দিয়ে গিয়ে এক জায়গায় গাছের তলায় গর্ত্ত-করা একটা পাথরের মধ্যে স্বচ্ছ জল আছে, সেই জলে আমরা প্রত্যেকে হাত মুখ ধুলুম। তারপরে একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে বেঞ্চির উপরে ছোট ছোট গোল গোল খড়ের আসন পেতে দিলে, তার উপরে আমরা বসলুম। নিয়ম হচ্ছে এইখানে কিছুকাল নীরব হয়ে বসে থাকতে হয়। গৃহস্বামীর সঙ্গে যাবামাত্রই দেখা হয় না। মনকে শান্ত করে স্থির কর্‌বার জন্যে, ক্রমে ক্রমে

নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যাওয়া হয়। আস্তে আস্তে দুটো তিনটে ঘরের মধ্যে বিশ্রাম কর্‌তে কর্‌তে, শেষে আসল জায়গায় যাওয়া গেল। সমস্ত ঘরই নিস্তব্ধ, যেন চিরপ্রদোষের ছায়াবৃত—কারো মুখে কথা নেই। মনের উপর এই ছায়াঘন, নিঃশব্দ নিস্তব্ধতার সম্মোহন ঘনিয়ে উঠতে থাকে। অবশেষে ধীরে ধীরে গৃহস্বামী এসে নমস্কারের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনা কর্‌লেন।

ঘরগুলিতে আসবাব নেই বল্লেই হয়, অথচ মনে হয় যেন এ সমস্ত ঘর কি-একটাতে পূর্ণ, গম্‌গম্‌ কর্‌চে। একটিমাত্র ছবি কিম্বা একটি-মাত্র পাত্র কোথাও আছে। নিমন্ত্রিতেরা সেইটি বহুযত্নে দেখে দেখে নীরবে তৃপ্তিলাভ করেন। যে জিনিস যথার্থ সুন্দর, তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মত। ক্রমে ক্রমে অপেক্ষা করে করে, স্তব্ধতা ও নিঃশব্দতার দ্বারা মনের ক্ষুধাকে জাগ্রত করে তুলে, তার পরে এইরকম দুটি একটি ভালো জিনিস দেখালে, সে যে কি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, এখানে এসে তা স্পষ্ট বুঝতে পার্‌লুম। আমার মনে পড়্‌ল, শান্তিনিকেতন আশ্রমে যখন আমি এক-একদিন এক-একটি গান তৈরী করে সকলকে শোনাতুম, তখন সকলেরই কাছে সেই গান তার হৃদয় সম্পূর্ণ উদ্‌ঘাটিত করে দিত। অথচ সেই সব গানকেই তোড়া বেঁধে কল্‌কাতায় এনে যখন বান্ধব-সভায় ধরেচি, তখন তারা আপনার যথার্থ শ্রীকে আবৃত করে রেখেচে। তার মানেই কল্‌কাতার বাড়ীতে গানের চারদিকে ফাঁকা নেই—সমস্ত লোকজন ঘরবাড়ী, কাজকর্ম্ম, গোলমাল, তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়েছে।

যে আকাশের মধ্যে তার ঠিক অর্থটি বোঝা যায়, সেই আকাশ নেই।

তারপরে গৃহস্বামী এসে বল্লেন,—চা তৈরি, এবং পরিবেশনের ভার বিশেষ কারণে তিনি তাঁর মেয়ের উপরে দিয়েচেন। তাঁর মেয়ে এসে. নমস্কার করে, চা তৈরিতে প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর প্রবেশ থেকে আরম্ভ করে, চা তৈরির প্রত্যেক অঙ্গ যেন কবিতার ছন্দের মত। ধোওয়া মোছা, আগুন-জ্বালা, চা-দানির ঢাকা খোলা, গরম জলের পাত্র নামানো, পেয়ালায় চা ঢালা, অতিথির সম্মুখে এগিয়ে দেওয়া, সমস্ত এমন সংযম এবং সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত যে, সে না দেখলে বোঝা যায় না। এই চা-পানের প্রত্যেক আসবাবটি দুর্লভ এবং সুন্দর। অতিথির কর্ত্তব্য হচ্চে, এই পাত্রগুলিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একান্ত মনোযোগ দিয়ে দেখা। প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র নাম এবং ইতিহাস। কত যে তার যত্ন, সে বলা যায় না।

সমস্ত ব্যাপারটা এই। শরীরকে মনকে একান্ত সংযত করে, নিরাসক্ত প্রশান্ত মনে সৌন্দর্য্যকে নিজের প্রকৃতির মধ্যে গ্রহণ করা। ভোগীর ভোগোন্মাদ নয়—কোথাও লেশমাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা বা অমিতাচার নেই;—মনের উপর-তলায় সর্ব্বদা যেখানে নানা স্বার্থের আঘাতে, নানা প্রয়োজনের হাওয়ায়, কেবলি ঢেউ উঠ্‌চে,—তার থেকে দূরে, সৌন্দর্য্যের গভীরতার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করে দেওয়াই হচ্চে এই চা-পান অনুষ্ঠানের তাৎপর্য্য।

এর থেকে বোঝা যায়, জাপানের যে সৌন্দর্য্যবোধ, সে তার একটা সাধনা, একটা প্রবল শক্তি। বিলাস জিনিসটা অন্তরে বাহিরে কেবল খরচ করায়, তাতেই দুর্ব্বল করে। কিন্তু বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য

বোধ মানুষের মনকে স্বার্থ এবং বস্তুর সংঘাত থেকে রক্ষা করে। সেই জন্যেই জাপানীর মনে এই সৌন্দর্য্যরসবোধ পৌরুষের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেচে।

এই উপলক্ষ্যে আর একটি কথা বল্‌বার আছে। এখানে মেয়ে পুরুষের সামীপ্যের মধ্যে কোনো গ্লানি দেখ্‌তে পাইনে। অন্যত্র মেয়েপুরুষের মাঝখানে যে একটা লজ্জা সঙ্কোচের আবিলতা আছে, এখানে তা নেই। মনে হয় এদের মধ্যে মোহের একটা আবরণ যেন কম। তার প্রধান কারণ, জাপানে স্ত্রী-পুরুষের একত্র বিবস্ত্রহয়ে স্নান করার প্রথা আছে। এই প্রথার মধ্যে যে লেশমাত্র কলুষ নেই, তার প্রমাণ এই—নিকটতম আত্মীয়েরাও এতে মনে কোনো বাধা অনুভব করে না। এমনি করে, এখানে স্ত্রীপুরুষের দেহ, পরস্পরের দৃষ্টিতে কোনো মায়াকে পালন করে না। দেহ সম্বন্ধে উভয় পক্ষের মন খুব স্বাভাবিক। অন্য দেশের কলুষদৃষ্টি ও দুষ্টবুদ্ধির খাতিরে আজকাল সহরে এই নিয়ম উঠে যাচ্চে। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এখনো এই নিয়ম চলিত আছে। পৃথিবীতে যত সভ্য দেশ আছে, তার মধ্যে কেবল জাপান মানুষের দেহসম্বন্ধে যে মোহমুক্ত,—একটা আমার কাছে খুব একটা বড় জিনিস বলে মনে হয়।

অথচ আশ্চর্য্য এই যে, জাপানের ছবিতে উলঙ্গ স্ত্রীমূর্ত্তি কোথাও দেখা যায় না। উলঙ্গতার গোপনীয়তা ওদের মনে রহস্যজাল বিস্তার করে নি বলেই এটা সম্ভবপর হয়েচে। আরো একটা জিনিস দেখ্‌তে পাই। এখানে মেয়েদের কাপড়ের মধ্যে নিজেকে স্ত্রীলোক বলে বিজ্ঞাপন দেবার কিছুমাত্র চেষ্টা নেই। প্রায় সর্ব্বত্রই মেয়েদের বেশের মধ্যে এমন কিছু ভঙ্গী থাকে, যাতে বোঝা যায় তারা বিশেষভাবে পুরুষের

দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য কর্‌চ। এখানকার মেয়েদের কাপড় সুন্দর, কিন্তু সে কাপড়ে দেহের পরিচয়কে ইঙ্গিতের দ্বারা দেখাবার কোনো চেষ্টা নেই। জাপানীদের মধ্যে চরিত্র-দৌর্ব্বল্য যে কোথাও নেই তা আমি বল্‌চি নে, কিন্তু স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধকে ঘিরে তুলে প্রায় সকল সভ্য-দেশেই মানুষ যে একটা কৃত্রিম মোহ-পরিবেষ্টন রচনা করেচে, জাপানীর মধ্যে অন্ততঃ তার একটা আয়োজন কম বলে মনে হল, এবং অন্ততঃ সেই পরিমাণে এখানে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ স্বাভাবিক এবং মোহমুক্ত।

আর একটি জিনিস আমাকে বড় আনন্দ দেয়, সে হচ্চে জাপানের ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। রাস্তায় ঘাটে সর্ব্বত্র এত বেশী পরিমাণে এত ছোট ছেলেমেয়ে আমি আর কোথাও দেখি নি। আমার মনে হল, যে কারণে জাপানীরা ফুল ভালবাসে, সেই কারণেই ওরা শিশু ভালবাসে। শিশুর ভালবাসায় কোন কৃত্রিম মোহ নেই— আমরা ওদের ফুলের মতই নিঃস্বার্থ নিরাসক্তভাবে ভালবাসতে পারি।

কাল সকালেই ভারতবর্ষের ডাক যাবে, এবং আমরাও টোকিয়ো যাত্রা কর্‌ব। একটি কথা তোমরা মনে রেখো—আমি যেমন যেমন দেখচি, তেম্‌নি তেম্‌নি লিখে চলেচি। এ কেবল একটা নতুন দেশের উপর চোখ বুলিয়ে যাবার ইতিহাস মাত্র। এর মধ্যে থেকে তোমরা কেউ যদি অধিক পরিমাণে, এমন কি, অল্প পরিমাণেও “বস্তুতন্ত্রতা” দাবী কর ত নিরাশ হবে। আমার এই চিঠিগুলি জাপানের ভূবৃত্তান্তরূপে পাঠ্য-সমিতি নির্ব্বাচন কর্‌বেন না, নিশ্চয় জানি! জাপান সম্বন্ধে আমি যা কিছু মতামত প্রকাশ করে চলেচি, তার মধ্যে

জাপান কিছু পরিমাণে আছে, আমিও কিছু পরিমাণে আছি, এইটে তোমরা যদি মনে নিয়ে পড়—তাহলেই ঠক্‌বে না। ভুল বল্‌ব না, এমন আমার প্রতিজ্ঞা নয়;—যা মনে হচ্চে তাই বল্‌ব, এই আমার মৎলব।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৩।
কোবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নভেল—কেন পড়ি।

—:o:—

উপন্যাস, নবন্যাস, কথাসাহিত্য, আখ্যায়িকা, যাই কেন বলুন না, কোনটাই আমাদের সাহিত্যে এখনও এতটা খ্যাতি বা অখ্যাতি লাভ করে নি, যাতে আমরা 'নভেল' বল্লে যা' বুঝি, তা' বোঝাতে পারে। 'কথা সাহিত্য', 'আখ্যায়িকা', এরা সব সমাস-তদ্ধিতের পোষাকে সেজে গুজে এমন বনিয়াদি ঢংএ অভিধান আলো করে' বসে' আছে যে, দেখ্‌লে সহসা মনে হয়, এরা বুঝি 'সূর্য্য-সংহিতা', 'আরণ্যক', এদেরই সমশ্রেণীর! এই সব ভেবে চিন্তে আমরা ওসব পোষাকী নাম ছেড়ে দিয়ে, ওর ডাকনাম 'নভেল'ই আমাদের এ প্রবন্ধে ব্যবহার কর্‌ব। 'নভেল' বলার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা যেন আপনা হ'তেই অসম্ভ্রমে ভরে' ওঠে!

এটা সর্ব্ববাদীসম্মত যে, নভেল জিনিসটা নিঃসন্তই একটা অবজ্ঞার বিষয়। অনেকের মতে নভেল পড়াটা অত্যন্ত দোষের কাজ। আর, যাঁরা নভেল পড়ায় ততটা দোষ ধরেন না, তাঁরাও মনে করেন ওটা নিতান্তই সময়ের বাজে খরচ, আর মস্তিস্কের অপব্যবহার। এত সব বিজ্ঞ এবং বিরুদ্ধ অভিমত সত্ত্বেও, নভেল আর নভেল-পাঠকের সংখ্যা দিন দিন—আমাদের বিশ্বাস—বাড়্‌ছে বই কম্‌ছে না! সংখ্যা যতই বাড়্‌ছে, অবজ্ঞা আর সমালোচনা ততই বিস্তৃত আর তীব্র হচ্ছে। সব চেয়ে মজা এই যে, যাঁরা খুব নভেল পড়েন, তাঁরাও নভেল-পড়ার

দোষ দেখাতে শতমুখ। এমন কি দু'য়েকখানা নভেলেও নভেল-পড়ার দোষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেখেছি!

অতদূর যাওয়ারই বা দরকার কি? নিজের অভিজ্ঞতাতেই আমি দেখেছি, এক একখানা নভেল শেষ হয় আর মনে হয়—"এইবার একটু কাজের পড়া পড়্‌ব, বাজে পড়া আর না।" কিন্তু এ সঙ্কল্পের প্রথম অংশ প্রায়ই কাজে পরিণত হয় না, আর শেষাংশ ততদিনই ঠিক থাকে, যতদিন হাতের কাছে আর একখানা না আসে!

দেখে শুনে মনে হয় আমাদের স্বভাবের মধ্যেই এমন একটা কিছু আছে, যা নভেল দ্বারা আকৃষ্ট আর তুষ্ট হয়। আমাদের স্বভাবের সেই যে আকাঙ্খা, সেটা আমাদের সৃষ্টি নয়, তার বীজ বাইরের আমদানী নয়—সেটা ক্ষুধা-তৃষ্ণার মতই ঈশ্বরদত্ত। আমাদের মনে একটা সনাতন ইচ্ছে আছে—সেটা হচ্ছে যা' জানিনে তা, জান্‌বার, যা' দেখিনি তা' দেখবার, যা' নই তা হবার! মানব-সভ্যতার যতকিছু উন্নতি, যা' কিছু পরিবর্ত্তন,—সবারই মূলে এই অনাগতের জন্য প্রয়াস, এই অলব্ধের জন্য লোভ, এই অজানিতের জন্য ঔৎসুক্য রয়েছে। প্রয়াসের সফলতায়, লোভের সার্থকতায়, ঔৎসুক্যের পরিতৃপ্তিতেই ত সুখ—আর সুখই ত মানুষের চরম লক্ষ্য। আমাদের মনের উপরে নভেলের যে দাবী, সেটা তখনই গ্রাহ্য হবে, যখন প্রমাণ হবে যে নভেল অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও আমাদের সেই সুখের তৃষ্ণা মেটায়।

সুচিত্রিত ছবি দেখলে তৃপ্ত হই কেন?—কারণ সাধনালব্ধ প্রতিভা-বলে শিল্পী সুনিপুণ তুলিকাস্পর্শে পটে যে দৃশ্যটী ফুটিয়ে তুলেছেন—ওটীর জোড়া কলিটী যে এতদিন আমারই বুকের কোণে অর্দ্ধ-মুকুলিত

অবস্থায় ছিল, আজ সহানুভুতির হিল্লোলে ফুটে, হেসে, নেচে উঠেছে! তাই না আমি আজ এই অনাঘ্রাতের ঘ্রাণে মুগ্ধ হয়ে উঠেছি? শিল্পীর শিল্পে যে আমি আমারই স্বপ্নের সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি! কবির কাব্যে কেন মুগ্ধ হই?—কবি যে আত্ম-নিবেদনের ছলে, প্রতিভার মায়াদণ্ডের স্পর্শে আমারই হৃদয়ের নিভৃত কোণের গুপ্ত দ্বারের অর্গল খুলে দিয়েছেন। তাই ত আমি আজ নিজের গোপন আলোর ছটায় আত্মহারা! ও আলো যদি আমার মনে না থাক্‌ত, তবে কবির মায়া-দণ্ডে কেবল রক্তা-রক্তিই হতো! তাঁর ফুৎকারে কেবল ছাই-ই উড়্‌ত। সুকণ্ঠ সঙ্গীতে কেন সুখ পাই? সুরে-বাঁধা যে তন্ত্রীটি এতদিন অনাহত, আমার মনের কোণে নিদ্রিত ছিল, আজ গানের সাড়া পেয়ে তালে তালে নেচে উঠেছে,—তারি উচ্ছ্বাসেই না আজ আমার এ সুখ!

এম্নি করে তলিয়ে দেখ্‌লে বোঝা যাবে যে, সব সুখেরই মুল-উৎস আমাদের মনে। আমাদের সামর্থ্য আর সম্ভাবনা অনন্ত। এই সম্ভাবনার আবিষ্কারে সুখ, অনুশীলনে সুখ, সফলতায় সুখ। নভেল আমাদের ভালো লাগে, তার কারণ,—তা আমাদের মনে সম্ভাবনার আকাশে ক্ষণেক্ষণে নানান্ বর্ণে অনুরঞ্জিত, নানান্ রকমের বিচিত্র ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করে। আমরা পাঠক সাধারণ, যখন নভেল পড়ি, তখন সমালোচকের চোখ নিয়ে পড়িনে, কাজেই একেবারে তন্ময় হয়ে পড়ি!—নায়ক নায়িকার সাথে অভিন্ন হয়ে যাই। তাদের সুখে হাসি, দুঃখে কাঁদি, তাদের বিপদের সম্ভাবনায় আমাদের বুক দুরুদুরু করে। তাদের মিলনে আমরাও মিলনানন্দ পাই। এই যে এতটা প্রাপ্তি,—সমালোচক হয়ত বলবেন, এর প্রতিষ্ঠা নিছক্ মিথ্যার উপরে।

তাঁদের এ মত আমরা সত্য বলে মেনে নিতে পারিনে। নভেল মিথ্যা নয়—অসত্য! সত্যের আভাষ ওতে পুরামাত্রায় থাকে। তা যদি না থাকত,—নভেল যদি কেবল অসম্ভব, অস্বাভাবিক, যা-নয়-তাইতে ভরা থাকত, তবে কি সমাজে ওর এত প্রভাব, এত প্রতিষ্ঠা হতো? আয়নাতে যে মুখ দেখি—সেটাও ত সত্য নয়। তাই বলে কি আয়না আমরা ফেলে দিয়েছি? যে সংস্কারের বশে কারণে অকারণে, যখন তখন, এসে আয়নার সামনে দাঁড়াই, নভেল পড়ার প্রবৃত্তি তারই অন্যতর পরিণতি।

আয়নায় আমাদের শরীরের প্রতিবিম্ব দেখি, আর নভেলে আমরা আমাদের মনের ছায়া দেখতে পাই। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেমন দেখায়, সেটী দেখবার সুযোগ আয়নায় পাই। আর, বিভিন্ন কার্য্যকারণের সমাবেশে, ঘাতে প্রতিঘাতে, মনের অবস্থা কেমন হয়,—সেটী অনুধাবন এবং উপভোগ কর্‌বার সুযোগ নভেলে প্রচুর আছে। শরীরের পরিবর্ত্তন নিতান্তই সীমাবদ্ধ, কিন্তু মনের লীলা অসীম। কাজেই নভেলের ভিতর দিয়ে আমাদের দেখবার জিনিস অনন্ত! শরীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হওয়া যতটা দরকার, মনের সঙ্গেও তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। শরীরের গঠন আর বলবিধানের জন্যে যেমন ব্যায়াম-চর্চ্চা দরকার, মানসিক বৃত্তি সকলের স্ফুর্ত্তির জন্যেও তেম্নি তাদের অনুশীলন আবশ্যক। কিন্তু এই অনুশীলন ব্যাপারটী খুব সহজসাধ্য নয়। দরকারমত পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সব সময়ে আমাদের সকলের ভাগ্যে মেলে না, কাজেই হৃদয়বৃত্তির বাস্তব অনুশীলন সব সময়ে সম্ভবপর হয় না। এই অভিযোগের পরেই নভেলের প্রতিষ্ঠা। কাজেই আমরা দেখছি, নভেল একাধারে আমাদের সুখ ও শিক্ষা দুইই দেয়।

বর্ত্তমান যুগে নভেলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক। সেকালে যাত্রা, পাঁচালী, কথকতা, ভাসান, জারি, কবিগান আদি করে' লোকশিক্ষার বিস্তর বাহন ছিল। এখন পাশ্চাত্য শিক্ষা আর সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদের সবারই গতি মন্থর থেকে মন্থরতর হ'তে চলেছে; আর এদের সবাইকে পিছনে ফেলে দ্রুত গর্ব্বিত-গতিতে অগ্রসর হচ্ছে নভেল! এ কিছু আমাদের দেশে নূতন নয়—একালে সব দেশেই এই ব্যাপার। সাহিত্য বল্‌তেই আজকাল নভেল-নাটক, গল্প-গাথা—এই সবই প্রধানতঃ বুঝায়।

আমাদের দেশের কাল আর পাত্র বিবেচনা কর্‌লে, নভেলের এই দ্রুত প্রতিপত্তি কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলে' মনে হয় না। আগেকার যাত্রা-জারি, ও-সব ছিল ধর্ম্মমূলক। তখন ধর্ম্ম ছিল সর্ব্ব-ব্যাপী। তখন ধর্ম্মের ভিতরে কি যে ছিল, আর কি যে ছিল না, তা' বলা শক্ত! একলব্যের গুরুপূজা থেকে জন্মেজয়ের সাপমারা পর্য্যন্ত—সবই ছিল ধর্ম্মের অর্থ! ধর্ম্মশাস্ত্র আমাদের ইতর সাধারণের শিক্ষার ভার নিয়ে, নিজে অনেক অবনত হয়ে পড়েছিল। লোক শিক্ষার জন্যে ঐহিক-পারলৌকিক, সাত্ত্বিক-রাজসিক, দাস্য-সখ্য প্রভৃতি আদর্শ চিত্র কর্‌তে কর্‌তে, আমাদের শাস্ত্র এক বিরাট জগা-খিচুড়িতে পরিণত হয়েছিল। পৌরাণিক ধর্ম্মশাস্ত্র, ধর্ম্মমূলক-নভেল ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে এখনকার নভেলের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে, তাতে আধুনিক "আর্ট" জিনিসটার একান্ত অভাব। সে-সব অস্বাভাবিকতায় ভরা। এই জন্যেই আমাদের নব্য রুচি পুরাণের স্বাদে মোটেই তৃপ্ত হয় না। আমাদের নভেল চাই!

আমার কথায় কেউ যেন মনে না করেন—আমি পুরাণে ভক্তি-

হীন। ভক্তি আমার কারো চেয়ে কম নয়। পুরাণকারগণ চিরদিনই আমাদের নমস্য। লোকশিক্ষার জন্যে তাঁদের যে প্রচেষ্টা, তা' জগতে অতুলনীয়। সে বিষয়ে আমার সার্টিফিকেট না হ'লেও তাঁদের চলবে!—আর তাঁদের হ'য়ে এ বিষয়ে ওকালতিও ধৃষ্টতা। আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁদের যে সেই পুরাকালীন লোকশিক্ষার উপায়, সেটা এখন বাতিল হয়ে গেছে। তাঁদের উদ্দেশ্য আর বিধেয়ের উপর পুরো ভক্তি রেখেই এ কথা বলা চলে।

এই ধরুন, প্রহ্লাদ-চরিত্র উপাখ্যানটী আমার খুবই ভালো লাগে। ছেলেমেয়েদের কাছে সুযোগ পেলেই বলেও থাকি। তার কারণ, এর শিক্ষাটী বড়ই সুন্দর। সেটি হচ্ছে এই যে,—ঈশ্বরে নির্ভর থাকলে, বিপদ যতই গুরুতর হো'ক না,—কিছুতেই ভক্তকে অভিভূত কর্‌তে পারে না। শিক্ষা হিসাবে এর জোড়া পাওয়া ভার। কিন্তু এর আখ্যান-বস্তু চিত্তাকর্ষক নয়—আমাদের পক্ষে! যতই ধর্ম্মের ছাপমারা থাক না—কিছুতেই এ অবিশ্বাসী মনের প্রত্যয় হয় না যে, "করীর পদচাপনে" কেউ "প্রাণে" বাঁচতে পারে! প্রাণে ত ভালো, পায়ের নখ থেকে চুলের আগা পর্য্যন্ত কোথাও ত' বাঁচবার সম্ভাবনা দেখি নে! তা, সে হাতীর বাড়ী গুজরাটেই হোক, আর ব্রহ্মদেশেই হোক,—বিয়ের শোভাযাত্রায় না হ'লেই হ'ল! আর একটা দৃষ্টান্ত দেখুন,—লক্ষ্মণের ঐকান্তিক ভ্রাতৃপরায়ণতা, কঠোর ব্রহ্মচর্য্য, অতুলনীয় বীরত্ব,—এ সবই কবি লোক-শিক্ষার জন্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে—এমন কি অত্যুক্তিরও! সে সীমা ছাড়ালে, সহানুভুতি আর আসে না। হো'ক না সেটা ত্রেতাযুগ, আহারের প্রথা যখন সেকালে প্রচলিত ছিল, সে

অবস্থায় লক্ষ্মণ কি করে' চোদ্দটা বছর না খেয়ে রইলেন? যাক্, খোলা দরজায় আর বারে বারে ঘা দিয়ে কি হবে?—মোটের উপর কথা হচ্ছে এই যে, শিক্ষার গুণেই বলুন, আর দোষেই বলুন, আমাদের বুদ্ধির ছিদ্র সেকালের চেয়ে অনেক সূক্ষ্ম হয়ে' গেছে। কাজেই সেকালের শাস্ত্রের অত মোটা সূতা কিছুতেই আর আমাদের বুদ্ধিতে প্রবেশ করতে পারে না। সেকেলে গ্রন্থসকল যতই শিক্ষাপ্রদ আর হিতকারী হো'ক্ না—একালের আমাদের কাছে তারা মনোহারী নয়। স্বাভাবিকতার নিতান্তই তাতে অভাব! সেকেলে নায়ক নায়িকারা মোটেই আমাদের ধাতের নয়। আমরা চাই নায়ক নায়িকা, যারা আমাদেরই মত রক্তমাংসে গঠিত, যারা আমাদেরই মত ভুলভ্রান্তির অনতীত, আমাদেরই মত সুখ-দুঃখের অধীন।

নভেলই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের পুরাণ। আমাদের ব্যক্তিগত, সমাজগত আর জাতিগত রীতিনীতির সমালোচনা ও সংস্কার, এখন নভেলের মধ্যে দিয়েই হচ্ছে। ব্যক্তিগত ও জাতিগত সাধনা ও লক্ষ্য এযুগে অনেকাংশে নভেল দ্বারাই নির্দ্দিষ্ট আর প্রচারিত হচ্ছে। নভেলের একটা খুব বড় কাজ এই যে, সে পৃথিবীর বিভিন্ন শিক্ষিত সমাজের মনকে জ্ঞাতিত্ব-বন্ধনে বেঁধে এনে, ধীরে ধীরে এক বিরাট বিশ্বমানবের মণ্ডলীতে পরিণত করতে চলেছে। জাতীয় চিন্তা নভেলের ভিতর দিয়ে প্রতিফলিত হয়ে, তার সমস্ত বিশেষত্বগুলোকে বিশ্লিষ্ট করে' সভ্যজগতের সামনে ধরছে। কিছুই আর লুকোনো ছাপানো নেই। কাজেই, দেখে শুনে ঠেকে সবাই নিজ নিজ জাতীয় আদর্শ গড়েপিটে নেবার সুযোগ পাচ্ছে। বিশ্ব-সাহিত্যের অন্তঃসলিল স্রোতে সমাজের বহুকালের সঞ্চিত, স্তূপীকৃত আবর্জ্জনারাশির নীচে

অনেক জায়গায় অলক্ষিতে ভাঙ্গন ধরেছে। এম্নি করে শিক্ষা আর অভিজ্ঞতা দিয়ে, নভেল সতত সমাজের সংস্কারসাধনে নিরত রয়েছে। মনোযোগ দিয়ে ভালো নভেল পড়া মানেই নিজের মনকে সংদৃষ্টান্ত দিয়ে অনুপ্রাণিত করা, অসং বিষয়ে বিতৃষ্ণ করা; সংস্কার সাধন বা গ্রহণ কর্‌বার জন্যে ব্যগ্র করা, প্রস্তুত করা।

অবশ্য এ কথা স্বীকার আমাকে কর্‌তেই হবে যে, সব নভেল কিছু নভেলের মর্য্যাদা রক্ষা করে চলে না। সব নভেল, নভেলের উচ্চতর আদর্শ পর্য্যন্ত পৌঁছতেও পারে না। আবার অনেক নভেল বিপথগামীও হয়। কিন্তু তাতে কি?—ঠিক যেমনটী চাই, তেমনটী ত আমরা অনেক জিনিসই পাইনে! তাই বলে কি, যা' পাই তা' ফেলে দিই? না, যা' পাইনে, তা' আর চাইনে, খুঁজিনে? নভেল যদি কখনো আমাদের আনন্দ দিয়ে থাকে, সুখ দিয়ে থাকে, শিক্ষা দিয়ে থাকে,—তবে তার দেওয়া দুঃখ বা নৈরাশ্য নিতে আপত্তি কর্‌লে চলবে না; অতিরিক্ত অসহিষ্ণু হ'লে তার পরে অন্যায় করা হবে।

বর্ত্তমান কালটাকে খুব হাতের কাছে, চোখের সামনে পাই বলে', অনেক সময়ই আমরা তারপরে অবিচার করে' থাকি। এমন কি, তার যেটা প্রাপ্য সেটাও তাকে দেওয়া অনেক সময়ে বাহুল্য, অনাবশ্যক বলে' মনে করি। মনে করি তাহ'লে বুঝি তাকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া হবে। কিন্তু মনে রাখা উচিত, অযত্নে কোনো জিনিসই বাড়ে না; আর অশ্রদ্ধায় অনাদরে ভালো জিনিসও আস্তে আস্তে খারাপের দিকে যায়। কৃতবিদ্য, বয়ঃপ্রাপ্ত সম্প্রদায় অনেক সময়ে নভেল পড়াটাকে নিতান্ত "ছেলেমানুষি" বলে' মনে করেন। তার ফলে, নভেলের একটা ঝোঁক হয়েছে—বালক-বালিকা-পাঠ্য হয়ে

পড়বার দিকে! শিক্ষার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে নভেলের পাঠকসংখ্যাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু বিস্তৃতির তুলনায় তার গভীরতা বাড়ছে না। কাজেই লেখক যখন নভেল লেখেন, তখন তাঁর সামনে থাকে ভাব-প্রবণ, উৎসুক এক অনভিজ্ঞ সম্প্রদায়। তাদের মনোরঞ্জন আর শিক্ষা-বিধানই হয় তাঁর কাজ। এ ক্ষেত্রে নভেলের উচ্চতম আদর্শের পরিণতির সম্ভাবনা কোথায়? পুঁটুলে বঁড়্শী আর ছিটে কঞ্চির ছিপে রুই মাছের আশা করা কি সঙ্গত হবে? (তবে রুই মাছের কপালে নেহাৎ মরণ লেখা থাক্‌লে পাড়ে লাফিয়ে উঠেও ধরা দেয়।—সে কথা স্বতন্ত্র।) কাজেই নভেল আশানুরূপ হচ্ছে না বলে' বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের পক্ষে এর প্রতি একেবারে বিমুখ হওয়া মোটেই উচিত হয় না। আর আমরা,—যারা নভেল পড়ি, আর কিছুই করি নে,—আমাদেরও লজ্জিত হবার বিশেষ কারণ দেখি নে। আমরা অন্ততঃ তাদের চেয়ে ভালো, যারা নভেলও পড়ে না, আর কিছুও করে না!

শ্রীমতী ননীবালা গুপ্তা

ভাদ্র ১৩২৩।

বাংলা-সাহিত্যে বাংলা ভাষা।

তথাকথিত সাধুভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার সংযোগ কোরে সাহিত্যের কাজে লাগানো উচিত কি না, এবিষয় নিয়ে আজ-কাল আমাদের দেশে খুব আলোচনা ও আন্দোলন চলেছে। কথাটা যে নতুন, তা বলা যায় না। সব দেশেই মাঝে মাঝে ভাষা-গঠন সম্বন্ধে বাক্‌বিতণ্ডা হোয়ে থাকে; বিশেষ যখন বাইরে থেকে শব্দ-সঙ্কলন কোত্তে জনকতকের ইচ্ছে হয়। Anglo-Saxonএর সঙ্গে ফরাসী ভাষার সংমিশ্রণের সময়, ইংলণ্ডে বেশ একটু এইরকম তর্কবিতর্ক চলেছিল। সে মিশ্রণটাকে বাধা দিলে, আজ এত বড় ইংরাজী-সাহিত্যটা তৈরী হোতো না। ইউরোপের সব ভাষাই এইরকম মিশ্রিত পদার্থ; এবং সব জায়গাতেই মিশ্রণের সময় একটা হৈ-চৈ পড়েছিল।

বাংলাদেশে অধুনা একদল ভাষা-প্রবীণ লোক, কথিত ভাষাকে সাহিত্যে আমল দেওয়ার বিরুদ্ধে বহুতর যুক্তিতর্কের অবতারণা কচ্চেন। তাঁদের একটী যুক্তির এ প্রবন্ধে প্রতিবাদ কোত্তে ইচ্ছে করি। তাঁরা বলেন, আমাদের এতকালের সাধুভাষা—যা বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত থেকে আরম্ভ কোরে আজও পর্য্যন্ত জোরের সহিত চলেছে—আমরা টপ্ কোরে বদ্‌লে ফেল্‌তে পারি নে। যে ভাষায় কথা কই, সেটা কতকটা এই সাধুভাষারই অপভ্রংশ। অপভ্রংশটাকে কথার

ভিতরে আমল দিই, এই-ই যথেষ্ট; আবার সেটাকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া মূর্খতা।

পুরোনো কথা তুল্লে, বাংলা ভাষার বনেদ খুঁড়্লে, দেখতে পাওয়া যায় যে, সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ, অথবা উচ্চারণ-বিকৃত সংস্কৃত শব্দ বাংলা ভাষার গোড়া। এতে লজ্জার কারণ কিছুই নেই। ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে, উঁচুদরের সাহিত্য লাটিন ভাষার এইরূপ অপভ্রংশ বা রূপান্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ল্যাটিন যেমন রোম্যান্স-ভাষাবলীর প্রধান উৎস, তেমনি আরো চমৎকার সংস্কৃত ভাষা হচ্চে উত্তর ভারতীয় ভাষাবলীর প্রশস্ত প্রস্রবণ। সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার ও ভাব-প্রকাশ কর্‌বার ক্ষমতা উপলব্ধি কোরেই, রামমোহন রায়, ঈশ্বর বিদ্যা-সাগর, অক্ষয় দত্ত প্রভৃতি, বিভক্তিহীন সংস্কৃতটাকে বাংলা আখ্যা দিয়ে চালাতে কুণ্ঠিত হন নি। সুতরাং দেখা যায়, প্রথম প্রথম বাংলা গদ্য-সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতের আশ্রয়েই তৈরী হয়।

তথাপি, কেবল যে সংস্কৃত থেকেই তখন লিখিত-গদ্যের শব্দ-সংগ্রহ হচ্ছিল, তা নয়। কথিত ভাষাকেও যে বাংলা সাহিত্যে স্থান দেওয়া যেতে পারে,—এ কথাও তদানীন্তন লেখকদের মনে উদয় হয়েছিল। মাইকেলের নাটকগুলো একধার থেকে মৌখিক ভাষায় লেখা। এমন কি, কেউ কেউ বলেন, তাঁর মহাকাব্যগুলি রচনা কর্‌বার সময় তিনি তত ভাল বাংলা জানতেন না, সুতরাং আভিধানিক শব্দ, মামুলী ভাষা, archaisms নিয়ে কাজ চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। দীনবন্ধুর লেখা তখনকার চলিত ভাষা থেকে নেওয়া বলেই, অতটা সরল ও অকৃত্রিম মনে হয়। আজ পর্য্যন্ত আমাদের নাট্য-সাহিত্যে সেই দৃষ্টান্তেরই অনুসরণ সব চেয়ে বেশী দেখতে পাওয়া যায়। তার কারণ,

নাটক মাত্রেরই "জান্" হচ্চে কথোপকথন ; এবং কথোপকথনে সাধু-ভাষার প্রয়োগ অস্বাভাবিক। অবশ্য অমিত্রাক্ষর ছন্দেও অনেক নাটক লিখিত হয়েছে এবং সুখ্যাতিও পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তাদের মিল নেই ; কারণ সত্যিকার মানুষ এরূপ ছন্দে কথা কয় না।

উপন্যাসেও চলিত কথা চালাবার চেষ্টা হয়েছিল। দুটী প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেওয়া যায়ঃ—টেক্‌চাঁদ ঠাকুরের "আলালের ঘরের দুলাল", আর কুমার উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের "আমার গুপ্তকথা"—যা' এখন "হরিদাসের গুপ্তকথা" বলেই লোকে জানে। উপন্যাসেও নাটকের মতন কথোপকথন থাকে—বাস্তবিকপক্ষে দুই-ই গল্প-বলা—কিন্তু বর্ণনারও প্রয়োজন হয়। আবার তখন Scott পড়া রেওয়াজ ছিল বোলে, বর্ণনার একটু আতি-শয্যই লোকে পছন্দ কোর্‌তো। ফলে, এই দুটী বইয়ের বর্ণনা-ভাগেও চলিত কথার প্রয়োগ হোয়ে, মৌখিক ভাষা ব্যবহার কর্‌বার সীমা বেড়ে গেল। ভাষার দিক্ থেকে বই দুটী মনোহর, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার সংসর্গ একেবারে ত্যাগ কোত্তে গিয়ে একঘরে হোয়ে পড়্‌লো, আর বিষয়-নির্ব্বাচন খারাপ হয়েছিল বোলে টিক্‌লো না।

"হুতুম-প্যাঁচার নক্সায়" ছোট গল্প ও চরিত্র-চিত্র দুই-ই ছিল। এতেও চলিত কথার যথেষ্ট সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু রঙ্গ-ব্যঙ্গ কৌতুকই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য। ভাবের রাজ্যে মৌখিক ভাষা তখনো প্রবেশ কোত্তে পারে নি, কেবল দরজায় ঘা মারছিল। "হুতুম প্যাঁচা"-প্রণেতা নিজেই "মহাভারতে" চলিত কথা ব্যবহার কোত্তে সাহসী হন নি ; যদিচ তিনি বর্দ্ধমানের মহারাজার চেয়ে কম সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার কোল্লেন।

কিন্তু, প্রবন্ধ বোলে জিনিসটা,—যেটা গদ্য সাহিত্যের চূড়ান্ত,—তখনো

সংস্কৃত-শব্দসঙ্কুল ভাষায় বদ্ধ ছিল। অক্ষয় দত্তের চেয়ে বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধগুলির ভাষা পণ্ডিতি শব্দে কম ভারাক্রান্ত বোলে বেশী সহজ বোধ্য হোলো। বঙ্কিম বাবুর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ-লেখকগণ কমবেশী তাঁর পদাঙ্কই অনুসরণ কোত্তে লাগলেন। এখনো পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের উপর তাঁরই প্রভাব সব চেয়ে বেশী। অথচ, তাঁদের সময়ের পক্ষে বঙ্কিমের ভাষা আশ্চর্য্যরকম সহজ ও কথিত ভাষা অনুযায়ী। এমন কি, তখনকার প্রধান সমালোচক শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় ভাষা হিসাবে "হুতুম পেঁচা" ও "মৃণালিনীকে" এক কোঠায় ফেলেছিলেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্যে যুগান্তর নিয়ে এলেন, প্রধানতঃ রবি বাবু, রামেন্দ্র বাবু ও প্রমথ বাবু। শুনেছি, রবি বাবু বরাবরই ডায়েরী লিখ্‌তেন "হচ্ছে" "কচ্ছে" দিয়ে; কিন্তু এরকম ভঙ্গী প্রবন্ধে নিবন্ধে চালাতে তিনি সম্প্রতি ব্রতী হয়েছেন। রামেন্দ্র বাবু অবশ্য ততদূর যান নি; কিন্তু তাঁর প্রথম সংস্করণ "জিজ্ঞাসা"র ভাষা থেকে এখন অনেকদূর মৌখিক ভাষার দিকে এগিয়েছেন। তার ফলে তাঁর বক্তব্য অতি সহজেই বুঝিয়ে দিতে পারছেন। তা তো হবারই কথা। কারণ অনেক সময় দেখেছি,—যখন সোজা কথায় ভাবি, তখন বাঁকা বুলিতে লিখতে গেলে ভাবের শৃঙ্খল ছিঁড়ে যায়। রবি বাবু এখনো বোধ হয় ঠিক কোরে উঠতে পারেন নি, বীরবলী ঢঙ্‌টা সকল প্রবন্ধে লাগানো যায় কি না।

প্রমথ বাবুর ভাষাটী যে আদৌ ভুঁইফোঁড় নয়, পরন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্যের গোড়াপত্তনের সময়েই উপন্যাস, নাটক ও বঙ্গ-সাহিত্যে গজিয়েছিল, তা তো দেখালুম। কিন্তু আওতায় সেটী এতদিন বড় হোতে পায় নি। যে চারাগুলো নাটকের রোদ আর কথার জল

পেয়েছিল, সেইগুলোই কেবল একটু মাথা তুলতে পেরেছে। আমার মনে হয়, নাট্যসাহিত্যে মৌখিক ভাষার ধারাবাহিকতা, ঐ ভাষার অমরত্ব প্রতিপন্ন কচ্ছে। ব্যাঙের ছাতা বা জল-বুদ্‌বুদ্‌ হোলে, চল্লিশ বৎসর আগেই আয়ু ফুরোতো।

কিন্তু একটী কথা সমালোচকেরা সময় সময় ভুলে যান যে, প্রমথ বাবুর লেখাতে চলিত কথার চেয়ে সংস্কৃত শব্দই বেশী। তিনি বাংলা থেকে সংস্কৃতকে তাড়াতে উদ্যত হন্‌নি. বরং উচিত আদরে অভ্যর্থনা কোরে বসাচ্ছেন; আমরা এতদিন সংস্কৃতটাকে পৃথক আসনে বস্‌তে দিয়েছিলুম। এখন আবার, যে ভাষায় কথা কই, তার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে আপনার কোরে নিতে পারবো;—কথিত ভাষার expressive idioms-এর সঙ্গে সংস্কৃতের শব্দ-ঝঙ্কনার সমন্বয় কোত্তে সমর্থ হবো।

তা ছাড়া ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ই এখন বাংলা সাহিত্য গড়ে তুল্‌ছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে ইউরোপীয় সাহিত্যে নূতন তথ্য খুঁজ্‌তে গিয়ে, ভাল করে সংস্কৃত শেখবার সময় পান না, অথচ অনেক নতুন কথা বল্‌তে পারেন। মৌখিক ভাষায় লেখাটা সাহিত্য বোলে' মঞ্জুর হোলে, এঁদের কথা আমরা শুনতে পাবো। "হে বসুন্ধরে, তুমি দ্বিধা হও, আমি ঢুকে পড়ি!"—এই anticlimax-এর দোহাই দিয়ে বহুত লোকে সাধুভাষার সঙ্গে মৌখিক ভাষার মিলনের পথে কাঁটা দিয়েছেন। প্রমথ বাবু আজ সেই পথ নিষ্কণ্টক কোত্তে প্রবৃত্ত হয়েছেন।

১৭ই ভাদ্র, ১৩২৩।

শ্রীহারিতকৃষ্ণ দেব।

ফরাসী ও জার্ম্মাণ। *

(ভাষার কথা)।

——:০:——

সমস্ত জার্ম্মাণ জাতটার মনে যে ধারণা দিনের দিন বদ্ধমূল হয়েছে, যার বলে তারা পৃথিবীর একাধিপত্যকেও নেহাৎ অন্যায় দাবী বলে' মনে করে না, সে হচ্ছে এই—তারা মনে করে যে তারা শরীরে, মনে, চরিত্রে অন্য সব জাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জ্জিত নয় ভগবৎ-দত্ত। তারা যে অন্য দেশবাসীর উপর আপনাদের শাসন দণ্ড স্থাপন কর্‌তে চায় সেত ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। তাতে কারো কিছু আপত্তি কর্‌বার নেই,—যারা কর্‌বে তাদের অধর্ম্মের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

যে জাত যত বড় তার মধ্যে জাতীয়তা জিনিসটাও তত বেশী। জার্ম্মাণমতে এ জাতীয়তা কেবল মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এর মূলে কতকগুলি বাহ্য পদার্থ আছে এবং ভাষা সেই বাহ্য পদার্থের অন্যতম। ভাষা যে জাতীয়তার একটি দৃঢ় ভিত্তি এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই, কারণ যে সব লোক এক ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে তাদের মধ্যে চিন্তা, সহানুভূতি ও কার্য্যকলাপের নৈকট্য, এক কথায় একত্ব-জ্ঞান, অত্যন্ত বেশী।

---

* ফরাসী দার্শনিক Bontrouxর Philosophy and War নামক গ্রন্থের একটি প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত।

ভাষা ও জাতীয়তার মধ্যে এই সামান্য সম্পর্ক-সূত্র অবলম্বন করে' জার্ম্মাণ দার্শনিক ফিক্টে এক অপূর্ব্ব মত রচনা করেচেন। তাঁর মতে জাতীয়তা ও জাতির অদৃষ্ট অনেক পরিমাণে তার ভাষার উপরেই নির্ভর করে। যার ভাষা শ্রেষ্ঠ সে জাতিও শ্রেষ্ঠ আর যার ভাষা নিকৃষ্ট সে জাতিও নিকৃষ্ট।

ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব কিসে—এই তত্ত্বের আলোচনায় তিনি বলেছেন যে জগতে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ভাষা আছে, মূল ও অপভ্রষ্ট। অর্থাৎ শুদ্ধ ও বিকৃত। মূল ভাষা হতেই অপভ্রষ্ট ভাষার উৎপত্তি, সুতরাং মূল ভাষা অপভ্রষ্ট ভাষা হতে শ্রেষ্ঠ এবং যারা মূল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলে তারা সেই সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ যাদের ভাষা হচ্ছে অপভ্রষ্ট। জর্ম্মাণ-ভাষা মূল ভাষা অতএব জর্ম্মাণেরা শ্রেষ্ঠ জাতি।

অপভ্রষ্ট ভাষাই যে অপকৃষ্ট এটা বোঝাবার জন্যে ফিক্টে জার্ম্মাণ ভাষার সঙ্গে রোমান্স ভাষার তুলনা দিয়েছেন। জার্ম্মাণ ভাষা একটী মূল ভাষা বলে, জার্ম্মাণরা ফরাসী-প্রমুখ রোমান্স ভাষাবলীকে যত শীঘ্র আয়ত্ত করতে পারবে এবং তার ভিতরকার রহস্য যত শীঘ্র বুঝতে পারবে, এত তারাও পারবে না যাদের ঐগুলিই হচ্ছে মাতৃভাষা। ফরাসী ভাষা ল্যাটিন ভাষা হতে উৎপন্ন, সুতরাং ফরাসী বুঝতে হলে ল্যাটিন বোঝা চাই। কিন্তু জার্ম্মাণদের মতে ফরাসীরা ল্যাটিনও ভাল করে বুঝতে পারবে না, কারণ ল্যাটিন হচ্ছে একটী মূল ভাষা। মূল ভাষা যার মাতৃভাষা নয়, সে ব্যক্তি সব ভাষাতেই কাঁচা, মূল ভাষাতেত বটেই; তা ছাড়া সেই বিকৃত স্ব-ভাষাতেও যা মূল ভাষা হতে পল্লবিত। জীবন থেকেই জীবন সংক্রমিত হয়, দীপ থেকেই দীপ প্রজ্বলিত হয়।

ফিক্টের মতে মূল ভাষাই হচ্ছে শুদ্ধ অতএব জীবন্ত এবং অপভ্রষ্ট ভাষা বিকৃত অতএব মৃত। পূর্ব্বোক্ত মতের সারবত্তা সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচারের অবসর আছে। জার্ম্মাণ ভাষা ফরাসী ভাষার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কি না এ মীমাংসা কর্‌তে হলে প্রথমত ভাষার উদ্দেশ্য কি তা দেখা উচিত। ভাষার উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ, বা জ্ঞানের আদান প্রদান। কিন্তু মানুষের ভাব বা জ্ঞান একটা চিরন্তন স্থির পদার্থ নয়। মানব মনের গতি আছে, বিকাশ আছে, উন্নতি আছে। আমাদের ভাবের ও জ্ঞানের প্রসার দিন দিন বেড়ে চলেছে; সুতরাং জার্ম্মাণ ভাষা অন্য ভাষার চেয়ে নূতন নূতন ভাব প্রকাশের পক্ষে অধিক উপযোগী কি না তাই হচ্ছে বিবেচ্য।

জার্ম্মাণদের মতে অবশ্য এ বিবেচনার কোন আবশ্যকতা নেই, কারণ তর্কে যার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে, তা বস্তুত তাই কি না এ দেখতে যাওয়া মূর্খতা মাত্র। তারা নিশ্চয়ই জানে যে, তাদের ভাষায় যে শব্দ-সম্পদ সঞ্চিত রয়েছে, তা দিয়ে তারা প্রকাশ কর্‌তে পারে না এমন বস্তু জড়জগতেও নেই মনোজগতেও নেই, এবং এ দুই জগতের কোথাও কখনো থাক্‌তে পারে না। তারা সেইজন্যে কেবল নিজের ভাষার চারিদিকে এমন প্রাচার তুলতে ব্যস্ত, যাতে অন্য ভাষার মলিন আবর্জ্জনা তার ভিতর প্রবেশ করে' তাকে কলুষিত না কর্‌তে পারে। কিন্তু এত সতর্কতা সত্বেও মাঝে মাঝে দু একটা বিজাতীয় শব্দ তাদের ভাষার মধ্যে অনিমন্ত্রিত অবস্থায় ঢুকে পড়ে, সুতরাং ঐ সব দুষ্ট রবাহুতের অনধিকার প্রবেশকে প্রশ্রয় না দিয়ে তাদের লগুড়াঘাতে বহিষ্কৃত করে দেওয়াই হচ্ছে জার্ম্মাণদের পক্ষে কর্ত্তব্য। এই দুই উপায় ভিন্ন জার্ম্মাণ ভাষার সতীত্ব রক্ষার অন্য উপায় নেই—এবং এই

অবরোধ ও অসংমিশ্রণের ফলে তার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টি আপনা হতেই হবে।

যতদিন কোন দেশের সাংসারিক প্রয়োজন অল্প থাকে, ততদিন আভ্যন্তরীন কৃষিশিল্পের দ্বারাই তার অভাব মোচন হতে পারে, কিন্তু সেই প্রয়োজন যতই বেড়ে যায়, ততই বাণিজ্যের প্রয়োজন হয়—তখন বহির্জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করা একান্ত আবশ্যক। ভাষাতেও ঠিক তাই। যে ভাষা, আপনাকে চিরদিন স্বসমৃদ্ধ বলে' মনে করে, তার দৈন্য একদিন না একদিন প্রকাশ হয়ে পড়্‌বেই, তখন সে বিশুদ্ধিহানির ভয়ে বিদেশীয় ভাষার সঙ্গে বাণিজ্য কর্‌তে না গেলেও, বিদেশীয় ভাষার পণ্য-দ্রব্য তার অজ্ঞাতসারে তার মধ্যে প্রবেশ কর্‌বে, এবং একবার পরগাছার মত বিশুদ্ধ ভাষার অঙ্গে শিকড় বসালে, তাদের বেছে বেছে তুলে ফেলা কষ্টকর,—শুধু কষ্টকর নয়, অনেক সময় অসাধ্যই হয়ে দাঁড়ায়।

জার্ম্মাণ-ভাষার দশা অনেকটা এই। তার অন্তরে হরেকরকম ফরাসী শব্দ কখন যে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে, তা কেউ দেখতে পায় নি, কিন্তু এখন সেই সব শব্দকে সবংশে বিনাশ কর্‌তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে, যে কুঠার দিয়ে তা করা হবে, সেই কুঠারের বাঁটও ফরাসী-বৃক্ষের কাষ্ঠে প্রস্তুত। কোন কোন জার্ম্মাণ-হোটেলে বৈদেশিক শব্দ ব্যবহারের জন্য অর্থদণ্ড সংগৃহীত হয় কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে, যে পেটিকায় উহা নিক্ষিপ্ত হয়, তার উপরে "fremdenworter-strafkasse" শব্দটা লিখিত থাকে এবং ঐ যুক্তশব্দের kasse এই অংশটুকু জার্ম্মাণ নয়, ফরাসী।

যদি ফিক্টের মত সত্য হয় অর্থাৎ জার্ম্মাণ ভাষা যদি যথার্থই সজীব ও স্বসমৃদ্ধ হয় তা হলে দাঁড়ায় এই, যে কতকগুলি প্রাচীন মূল

ধাতু হতে সে ভাষা সকল প্রকার নূতন ভ'ব প্রকাশের উপযোগী শব্দ তৈরি করে নেবে। ঐ ভাষার ভিতর যে সব শব্দ ও ধাতু বিদ্যমান তারই নূতন নূতন সংযোগ ও সংঘটনে এবং তারই সনাতন গঠন প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক নূতন ভাবের নামকরণ করা যাবে। কিন্তু এরূপ যোড়াতাড়া দিয়ে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে কি না, এই হচ্ছে সমস্যা। সুদূর অতীতের নিকট যা ওয়ারিস-সূত্রে পাওয়া গেছে তা দিয়ে ভবিষ্যতের সমস্ত অজ্ঞাত অভাব দূর করা কি সম্ভব? নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক উপাদান দিয়ে ভবিষ্যতের অনন্ত উদর কি পূর্ণ করা যায়? এ চেষ্টা করার সঙ্গে সেই বৈজ্ঞানিকের চেষ্টার কি প্রভেদ যিনি বাজী রেখে বলেছিলেন যে কেবল জড় পদার্থ ও জড় শক্তির সাহায্যে তিনি জীবজগতের সকল মূর্ত্তি, সকল শক্তির সৃষ্টি করবেন।

যখন এয়ারোপ্লেনের প্রথম সৃষ্টি হয় তখন জার্ম্মাণেরা তার নাম দিলেন 'flugmaschinen' (উড়ন্ত-যন্ত্র) কিন্তু ও নাম ঠিক জ্ঞাপক নয় বলে তাঁরা 'Taube', 'Aviatik' 'Albatros' প্রভৃতি নাম ব্যবহার করতে লাগলেন। এই শেষোক্ত তিনটি নামই সাদৃশ্য-মূলক। এই সাদৃশ্য-মূলক শব্দ-গঠন-প্রণালী, সংযোগ-মূলক শব্দ-গঠন-প্রণালী হতে শ্রেষ্ঠতর।

নূতন ভাব প্রকাশের জন্য জার্ম্মাণ ভাষায় যে নূতন সংযুক্ত-শব্দ গঠিত হয় তার আর একটী দোষ আছে। ঐ সব যুক্তপদের অর্থ প্রায়ই বড় অস্পষ্ট হয়। অর্থাৎ ওদের প্রকৃত অর্থ প্রায়ই বোধগম্য হওয়া দুরূহ। এর কারণ এই যে সংযুক্ত পদের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে, এবং যার জন্য তারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট, তার স্বরূপ প্রায়ই প্রকটিত হয় না। অঙ্কশাস্ত্রে যুক্ত সংখ্যার

মধ্যে কেবল একটী সম্বন্ধ আছে—যোগের সম্বন্ধ; কিন্তু ভাষায় যুক্ত শব্দের মধ্যে নানা প্রকারের সম্বন্ধ থাকে—যথা কর্ত্তৃত্ব, করণত্ব, কার্য্যকারণত্ব, অধিকারত্ব, ইত্যাদি। সুতরাং যে ভাষায় 'inflexion' (বিভক্তি) বা 'preposition'এর লোপ হয়ে দুটী পদ একত্র সংযুক্ত বা সমস্ত হয়, সে ভাষায় ঐ দুই পদের মধ্যস্থ সম্পর্ক-বন্ধন অদৃশ্য হয়ে যায়—ফলে; যে-কোন সম্পর্ক কল্পনা করা যায় বলে' অন্বয়ের সাহায্য ব্যতিরেকে অর্থগ্রহের ব্যাঘাত ঘটে, এমন কি অনেক সময় অন্বয়ের সাহায্যেও প্রকৃত অর্থের নির্ব্বাচন অসম্ভব হয়ে উঠে।

সংস্কৃত ভাষার নানা গুণ থাকা সত্বেও ঐ ভাষা সমাস-বহুল বলে তার অর্থ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে এত মারামারি উপস্থিত হয়। সমাসের সাহায্যে যুক্ত মনোভাবকে ব্যক্ত করা ভাষার আদিম পদ্ধতি সুতরাং প্রাচীন ভাষাতেই এর প্রাদুর্ভাব অধিক। আধুনিক কোন ভাষাই ওরকম দুর্ব্বোধ জটিলতার প্রশ্রয় দেয় না, বা দেওয়াকে ভাষার সমৃদ্ধির কারণ বলে বিবেচনা করে না। একমাত্র সংক্ষিপ্ততাই ভাষাকে সহজ বা শক্তিসম্পন্ন করে না। প্রাচীন যুগের গৃহ-নির্ম্মাণ-প্রণালীও এই সত্যের সাক্ষ্য দেয়। পুরাকালে পাথরের উপর পাথর চাপিয়েই গৃহের প্রাচীর এমন কি ছাদ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হত, কারণ গাঁথবার মসল্লা তখনো উদ্ভাবিত হয় নি। মসল্লা তৈরি হবার পর উক্ত উপায়ে গৃহনির্ম্মাণ করা অবশ্য কেউ বুদ্ধির কাজ বলে মনে কর্‌বেন না।

একটী উদাহরণ নেওয়া যাক্। 'আলোক' শব্দটীর সঙ্গে চিকিৎসা আবরণ, যন্ত্র, চিত্র, ছিদ্র প্রভৃতি বহুশব্দের সমাস হতে পারে, কিন্তু ঐ সমস্ত পদগুলি দেখতে এক প্রকারের হলেও তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সম্বন্ধ অন্তর্নিহিত। আলোক-চিকিৎসা অর্থে—আলোকের

সাহায্যে চিকিৎসা, আলোকাবরণ অর্থে—আলোকের বিরুদ্ধে আবরণ, আলোক-মান অর্থে—আলোক পরিমাণ কর্‌বার যন্ত্র, আলোক-চিত্র অর্থে—আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত চিত্র এবং আলোক-ছিদ্র অর্থে—আলোক প্রবেশ কর্‌বার ছিদ্র। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ প্রত্যেক শব্দটীর ব্যবহারিক অর্থ পূর্ব্ব হতে অবগত না আছেন তিনি কি দৃষ্টিমাত্র ওদের যথাযথ অর্থ নির্ণয় কর্‌তে-সমর্থ হবেন? এই আলোক যোগে জার্ম্মাণ-ভাষার ভিতর অনেকটা অন্ধকার এনে ফেল্‌া হয়েছে।

জার্ম্মাণ-দার্শনিক কাণ্টের ব্যবহৃত 'Vernunftglaube' শব্দটীরও ঐ দশা। ওর অর্থ—জ্ঞানের বিশ্বাস, বা জ্ঞানের অনুযায়ী বিশ্বাস, বা জ্ঞান কর্ত্তৃক আরোপিত বিশ্বাস, বা জ্ঞান হতে উৎপন্ন বিশ্বাস, এই নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে প্রচণ্ড বাক্‌বিতণ্ডা চলেছে, এবং ফলে চারটী ভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় সমুদ্ভূত হয়েছে।

উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা কিছুতেই বোঝা যায় না যে, যেহেতু জার্ম্মাণ-ভাষা একটা মূল ভাষা, সেই হেতু তা জীবত। তার ভিতরকার জীবনী-শক্তিকে রাসায়নিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে উৎপন্ন শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু সে শক্তির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে না যা জীবশরীরে স্ফূর্ত্ত। জার্ম্মাণ-ভাষা তার কঠিন অনমনীয় উপাদান দিয়ে জীবনের সূক্ষ্ম-কোমল আলো-ছায়া ও অনন্ত কার্য্যবৈচিত্র্য আয়ত্ত কর্‌বার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌ছে কিন্তু সে যতই জোর-জাবরি করুক না কেন, তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হচ্ছে না ও কস্মিন-কালেও হবে না।

অপরদিকে, যেহেতু ফরাসী-ভাষা বিকৃত ও অপভ্রষ্ট সেই জন্যই যে তা মৃত এটাও কিছুতেই প্রতিপন্ন হয় না। ফরাসী-ভাষার শব্দ

ধাত্বর্থ হতে অনেকটা দূরে সরে পড়েছে কিন্তু তা হলেও একেবারে তা হতে বিচ্ছিন্ন নয়। ল্যাটিন ধাতুর মূলের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ কতকটা স্বাভাবিক, কতকটা কৃত্রিম। এরা প্রায়ই যৌগিক নয়, যোগরূঢ়। যৌগিক শব্দ ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয়ের, বা শব্দের সঙ্গে ধাতুর, বা শব্দের সঙ্গে শব্দের Physical Mixture, তাতে উভয় অংশের ধর্ম্ম অবিকৃত ও অপরিবর্ত্তিত থাকে, কিন্তু যোগরূঢ় শব্দে ধাতু প্রত্যয়ের অর্থই সব নয় ; সে তা ছাড়া আরো কিছু—তার একটু স্বাধীন বিশেষত্ব আছে—সে যেন জীব হতে উৎপন্ন জীব—সে পিতামাতার ধর্ম্মও কিছু পায় কিন্তু তার নিজেরও কিছু স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এইরূপ শব্দ প্রাচুর্য্য ভাষার মৃত্যুর লক্ষণ নয়, জীবনেরই লক্ষণ, সুতরাং ফরাসী-ভাষা জার্ম্মাণ-ভাষার চেয়ে বেশী প্রাণবন্ত।

(২)

ফরাসী ও জার্ম্মাণ-ভাষার এই পার্থক্যটুকু বাংলা ও সংস্কৃত-ভাষার মধ্যেও পরিদৃষ্ট হয়। বহু সংস্কৃত শব্দ ধাতুর অর্থকে আঁকড়ে ধরে' বসে' আছে, উদ্ভিদ যেমন মাটীকে আঁকড়ে ধরে' বসে' থাকে, কিন্তু বাংলা ভাষার শব্দ Wordsworth-এর 'Sky lark'-এর মত মাটী ছেড়ে আকাশে উঠেছে, কিন্তু নজর রেখেছে মাটীতে। 'চণ্ডাল' শব্দ চণ্ড ধাতু হতে উৎপন্ন ; চণ্ড ধাতুর অর্থ ক্রোধ করা সুতরাং সংস্কৃতে চণ্ডাল শব্দের অর্থ অতি কোপনস্বভাব, বাংলায় 'চণ্ডাল' শব্দের অর্থ—একটী বিশিষ্ট জাতি। সংস্কৃতে 'প্রসঙ্গ' শব্দের অর্থ প্রসক্তি, কেননা সন্‌জ ধাতুর অর্থ আসক্ত হওয়া, বাংলায় প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ প্রস্তাব।

এইরূপ বিষয়, ব্যবসায়, প্রণয়, স্নেহ, বাসনা, কাম, শত্রু, হিংসা প্রভৃতি শব্দের সংস্কৃত অর্থ ধাত্বর্থের অনুগামী বলে অতিশয় ব্যাপক, কিন্তু ঐ সব শব্দের বাংলা অর্থ ধাত্বর্থের সঙ্গে দূর-সংস্পৃষ্ট বলে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ।

শব্দের আলঙ্কারিক প্রয়োগ সাদৃশ্য মূলক। এইরূপ প্রযুক্ত শব্দই নূতন ভাব প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী কারণ এতে শব্দার্থ ধাত্বর্থ মাত্র নয়। ধাত্বর্থ বজায় রেখে নূতন শব্দ গঠন করলে বস্তুর বিশেষত্ব মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় না। তার ভিতর প্রাণ থাকে না—তাতে খণ্ড খণ্ড ভাবের খণ্ডত্বটুকু বিলুপ্ত হয় না—বিচ্ছিন্ন শব্দমূলের সমষ্টি দিয়ে ভাবের একীকরণ অসম্ভব।

আগ্নেয় পর্ব্বত হতে উদ্গীর্ণ পদার্থকে “ধাতু-নিস্রাব” বলা হয়ে থাকে। এই শব্দটীতে যে ভাব মনের মধ্যে এনে দেয়, সে হচ্ছে ‘ধাতু’ ও ‘নিস্রাব’ এই দুটী শব্দের মূল ধাত্বর্থ। কলের মুখ হতে যে লৌহ-দ্রব নির্গত হয়, তার প্রতিও ঐ শব্দ প্রযুক্ত হতে পারে, অর্থাৎ ঐ শব্দে মনের মধ্যে কোন বিশেষ বস্তুর চিত্র এনে দেয় না, কিন্তু মনে করুন যদি বমন-ক্রিয়ার সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতের সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ওকে “অগ্নিবমন” নামে অভিহিত করা যায়, তা হলে বমন করা ধাতুর অর্থ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হলেও ওতে বস্তুর চিত্র মনের মধ্যে স্পষ্ট উদিত হয়।

জার্ম্মাণ-ভাষা, শব্দ হতে ভাবের দিকে অগ্রসর হয় বলে’ ধাত্বর্থকে অক্ষুণ্ণ রাখে এবং এর ফলে সে অনেক স্থলেই ভাবকে ঠিক আয়ত্ত করতে পারে না। ফরাসী-ভাষা, ভাব হতে শব্দের দিকে অগ্রসর হয় বলে’ সে নিজের বা অন্যভাষার শব্দ-ভাণ্ডার হতে বেছে এমন একটী শব্দ বের করে—যা প্রস্তুত-বিষয়ের সব চেয়ে উপযুক্ত চিহ্ন। শব্দ

যে, ভাবের চিহ্নমাত্র এ তারা ভুলে যায় না—তাদের শব্দ ধাত্বর্থদ্বারা গৌণত নিরূপিত হয়, কিন্তু মুখ্যত নিরূপিত হয় ব্যবহারিক প্রয়োজন সুবিধা ও সুরুচির বলে।

ভাষা সাধারণত তিন প্রকার। এক প্রকার ভাষায় বস্তুর নাম বীজগণিতের চিহ্নের ন্যায় রূপকমাত্র, অর্থাৎ যুক্তিহীন স্বেচ্ছাই তার জন্মের কারণ – যেমন 'ঢেঁকি', 'কুলো'। অপর প্রকার ভাষায় বস্তুর নাম সম্পূর্ণরূপে ধাত্বর্থ-শাসিত যেমন 'অশ্ব' (যে বেগে গমন করে) 'মার্জ্জার' (যে মুখ মার্জ্জনা করে)। আর এক প্রকার ভাষায় স্বেচ্ছা ও ধাত্বর্থ-শাসন পাশাপাশি বিদ্যমান, অর্থাৎ তা পূর্ব্বোক্ত দু প্রকার ভাষার ঠিক অন্তর্ব্বর্ত্তী। ফরাসী-ভাষা এইরূপ একটী অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাষা। ধাত্বর্থ-শাসিত ভাষা, শব্দের মধ্য দিয়ে ভাবের ভিতর প্রবেশ কর্‌তে চেষ্টা করে কিন্তু যেহেতু শব্দ অতীতের গাত্রে সংলগ্ন এবং ভাব ভবিষ্যতের চঞ্চল স্রোতে ভাসমান, সেই জন্য সে বারবার বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। ফরাসী-ভাষার মত মধ্যপন্থী ভাষায় কিন্তু সে বিপদ নেই। কেননা ভাব হতে শব্দের মধ্যে প্রবেশ কর্‌বার প্রচেষ্টায়, সে চঞ্চলের গাত্র হতে সূতো টেনে এনে যতটা সম্ভব নিশ্চলের গাত্রে জড়িয়ে দেয়—নিশ্চলের গা থেকে সূতো টেনে চঞ্চলকে বাঁধতে চেষ্টা করে না। সে আগে ধরে আত্মাকে, তারপর তাকে দেহের মধ্যে পুর্‌তে চায়—তাই আত্মার প্রভাবে দেহের যথা-যথ পরিবর্ত্তন আপনি হয়ে যায়, তাই আত্মার নিত্য নূতন অভাব পূর্ণ কর্‌তে দেহও নিত্য নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে। জার্ম্মাণ-ভাষায় দেহের উপাদান অহঙ্কারের কাঠিন্যে এমন দৃঢ় হয়ে বসে আছে যে, সে নিজে পরিবর্ত্তিত না হয়ে আত্মাকে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে চায়, কিন্তু তাতে সে

আত্মার নিত্য-বিকসোন্মুখ প্রতিভাকে জড়ের মতই গতিহীন করে' রাখে; তাকে এতটুকুও প্রসারলাভ করতে দেয় না। সে প্রাচীন যুগে যেটুকু আত্মাকে অধিকার করেছিল, সেইটুকুই তার সর্ব্বস্ব হয়ে দাঁড়ায় এবং আত্মারও অনন্ত অভিব্যক্তির চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জার্ম্মাণ ও ফরাসী-ভাষা সম্বন্ধে যা যা বলা হয়েছে, তা যে সংস্কৃত ও বাংলা-ভাষা সম্বন্ধে অনেকটা খাটে তা বোধ হয় সকলেই বুঝতে পেরেছেন। জার্ম্মাণরা তাঁদের মূল-ভাষার শুদ্ধতা রক্ষা করবার জন্য যে সব উপায় অবলম্বন করছেন—আমরা আমাদের অপভ্রষ্ট ভাষাকে শুদ্ধ করবার জন্যে সেই সব উপায়ই অবলম্বন করছি; এই যা প্রভেদ। ফলে আমরা উভয়েই মাতৃ-ভাষার ইভলিউসানের পথ আগলে দাঁড়িয়েছি। প্রাচীন যুগের সংস্কৃত-ভাষা দিয়ে, এ যুগের সমস্ত অভাব দূর হতে পারে না। সেঁ ভাষা যখন জীবিত ছিল, তখন তার অভিধান হয়ত আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন আর তা নয়—এখন বাংলা-ভাষার শব্দকোষ আমাদের কাছে তার চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান। 'চট্ করে মাথায় একটা মতলব এল' 'সে একদম্ নীরেট' 'নদীর জল তর্‌তর্ কর্‌ছে', 'টল্‌মল্ কর্‌ছে', 'ছল্‌ছল্ কর্‌ছে' প্রভৃতি বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত শব্দ অতি অল্প, কিন্তু তা হলেও এটা নিশ্চয় যে, কোন সংস্কৃত বাক্য দিয়ে ঐ অর্থগুলি অত দ্রুত করে, অত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করা যেত না। মৃতের শক্তি ও জীবিতের শক্তিতে ঢের প্রভেদ। খাঁটি বাংলা-ভাষায় মনের সম্মুখে একটা স্পষ্ট ছবি এনে দেয়। সংস্কৃত-ভাষা বস্তুর সঙ্গে মনের ব্যবধান দূর করতে পারে না। তাকে মনে মনে আবার সাদা বাংলায় তর্জ্জমা করে' নিতে হয়—তাই সংস্কৃত-বাংলা ক্রমশঃ অচল হয়ে আসছে—

তাতে মনোভাব ব্যক্ত করা যেন কাঁটা চামচে দিয়ে ভাত খাওয়া কিম্বা পরদার আড়াল থেকে মুখ দেখা।

অনেকের নিকট শ্রুতিকটু হলেও একথা আমি বল্‌তে বাধ্য যে সংস্কৃত-ভাষা এক হিসেবে অধিকাংশ আধুনিক ভাষার চেয়ে শব্দ-সম্পদে দরিদ্র। সংস্কৃত অভিধানে পর্য্যায়-শব্দ অর্থাৎ একার্থবোধক শব্দই অধিক। যে অভিধানে সূর্য্যেরই সহস্র নাম আছে সে অভিধান নিঙ্‌ড়ালে কতটুকু সার জিনিস দাঁড়ায়? অবশ্য স্বীকার করি সূর্য্যের ঐ প্রত্যেক নামের একটু বিশেষত্ব আছে, কিন্তু ঐ সূক্ষ্ম তারতম্য প্রকাশ করে' কি সাহিত্য বড় বেশী উন্নত হয়েছে, না মনোরাজ্যের পথে ভাবের যাত্রা বড় বেশীদূর অগ্রসর হয়েছে?

পুরানো বাড়ীর ইট খসিয়ে নিয়ে নূতন বাড়ী গড়্‌লে গাঁথনি বড় পাকা হয় না এ কথা সকলেই জানেন—মজবুত নূতন বাড়ী গড়্‌তে হলে নূতন ছাঁচে নূতন ইট তৈরী করতে হয় এবং নূতন করে পোড়াতে হয়। যাঁরা বলেন নূতন ভাবের জন্য সংস্কৃত ভেঙ্গে নূতন শব্দ তৈরী কর তাঁদের কথার ঐ উত্তর। যদি সংস্কৃত শব্দকে অভিধান থেকে খুলে নিয়ে তার ধাতু, প্রত্যয়, অর্থকে এক সঙ্গে গুঁড়িয়ে নেওয়া চলতো তা হলে বরং তা দিয়ে নূতন কিছু করা যেতো, কিন্তু তা যখন তা করা চলে না তখন যে টুকু নূতন গাঁথতে হবে, তার জন্য চাই ততটুকু নূতন মাল ও মসল্লা। এ মাল এ মসল্লা আমরা রোজই নিজেরা তৈরী কচ্ছি, কতকটা রুচি, কতকটা সুবিধা কতকটা অভ্যাস অনুসারে; এবং এর কতকটা আমদানী হচ্ছে পাশাপাশি ভাষার কারখানা থেকে। যদি চল্‌তি ভাষার এই সব মালমসল্লাকে আমরা এই বলে' বাদ দিই যে এগুলো আমাদের নিজেদের হাতেই তৈরী তা হলে আমরা বড় বুদ্ধির কাজ

কর্‌বো না। আমরা 'motor-car' কে যদি 'হাওয়া-গাড়ী' না বলে "গতি-রথ" বলি কিম্বা 'photograph' কে ফটোগ্রাফ্ না বলে আলোক-চিত্র বলি তা হলে অন্য লোকে না হাসুক মা সরস্বতী নিশ্চয়ই হাস্‌বেন।

আর এক কথা—সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। উভয়েরই উদ্দেশ্য মনের সম্মুখে একটী সৌন্দর্য্যের চিত্র স্থাপিত করা। কিন্তু বর্ণ ও তুলিকার দোষে যেমন অনেক সময় পট-চিত্র জীবন্ত হয় না, তেমনি ভাষার দোষেও অনেক সময় কাব্যচিত্র-জীবন্ত হয় না। সংস্কৃত-সাহিত্যের কাব্য-চিত্রগুলি চিত্রকরের নিপুণতা ও প্রতিভা-সত্বেও অনেক সময় ভাষার দোষে জীবন্ত বলে অনুভুত হয় না।

সংস্কৃত-ভাষায় বিশেষ-সংজ্ঞক শব্দের চাইতে সামান্য-সংজ্ঞক শব্দের প্রাধান্য বেশী। সংস্কৃত-ভাষার এই দোষে সে ভাষা সাহিত্যের পক্ষে অনুপযোগী, কিন্তু এই সাহিত্যের পক্ষে অনুপযোগিতাই আবার এর দর্শনের পক্ষে উপযোগিতার কারণ। যা একদিক দিয়ে দোষ তাই অন্য দিক দিয়ে গুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করা দরকার। 'সংস্কৃত' ভাষা নামটী শুনলেই বোঝা যায় যে, এ ভাষা অন্য ভাষা হতে সংস্কৃত, অর্থাৎ পরিশোধিত! এ অন্য ভাষা যে, বৈদিক প্রাকৃত ভাষা ছাড়া আর কিছুই নয় তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দলের পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন। বৈদিক প্রাকৃত ভাষাকে এক সময় সংস্কৃত লিখিত ভাষায় পরিণত কর্‌বার প্রয়োজন হয়েছিল। এ প্রয়োজন বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই হোক্ আর যাই হোক্, এ ভাষা বৈদিক ভাষার চেয়ে দার্শনিক পরি-

ভাষায় পরিপুষ্ট ও দার্শনিক তর্কবিতর্কের উপযোগী। যখন এ ভাষার সংস্কার করা হয়—তখন ঈশ্বর আর 'সহস্র-পানিপাদ' 'সহস্রশীর্ষ' পুরুষ ন'ন, তিনি একেবারে নিরাকার।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্ছে এই যে সংস্কৃত-ভাষায় বিশিষ্ট শব্দের (concrete terms) চেয়ে সাধারণ শব্দের (general terms) প্রাধান্য অধিক এবং দর্শনশাস্ত্রে এই শেষোক্ত প্রকার শব্দেরই বেশী প্রয়োজন।

সাহিত্যের কার্‌বার কিন্তু বিশিষ্ট শব্দ নিয়ে, কারণ তার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিশিষ্ট ভাব প্রকাশ করা, সাধারণ ভাব প্রকাশ করা নয়। সে চায় বস্তুকে প্রত্যক্ষ করাতে, মত নিয়ে যুদ্ধ কর্‌তে নয়। প্রাকৃত ভাষা-মাত্রেই বস্তুর সঙ্গে দিনরাত মেলামেশা করে, এইজন্য প্রকৃত সাহিত্যের সৃষ্টি তাদের দ্বারাই হয়। বাংলা-ভাষা একটী প্রাকৃত ভাষা, সুতরাং খাঁটী বাংলা-ভাষায় ভাল দার্শনিক পুস্তক না রচিত হলেও ভাল কাব্য-গ্রন্থ রচিত হতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা মনে হল। বাংলা-ভাষা সম্বন্ধে আর কিছু বলবার পূর্ব্বে সে কথাটী বলা নিতান্ত অবান্তর হবে না। আমাদের দেশে আজকাল এক ভাষা প্রচলিত নয়। প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃত ভাষা ভারতবর্ষে প্রচলিত। সুতরাং ফিক্টের মতে অবশ্য এ দেশে এক-জাতীয়তা অসম্ভব। স্বীকার করি ভাষার ঐক্য জাতীয়তা-জ্ঞানের একটি প্রধান অবলম্বন, কিন্তু তা যে অপরিহার্য্য এ কথা বলতে পারি না। যারা নৈসর্গিক বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত তারা অবশ্য ভাষার সাহায্যে একত্র হয়—বিভাষী ব্যক্তিকে শত্রু বলেই গণ্য করে, কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তির সম্বন্ধে এ কথা কখনই সত্য নয়। তাদের মন এতটা ভাষার দাস নয় যে তারা অন্য কারণে পরস্পর একত্র হতে পারে না। তাদের

ভাষা যতই বিভিন্ন হোক্ না কেন তারা এক রুচি, এক স্মৃতি, এক ধর্ম্ম বা এক আদর্শেরদ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে এক হতে পারে। সুতরাং সভ্যজাতির-জাতীয়তা ভাষার দ্বারা সম্পূর্ণ সীমাবদ্ধ নয়।

এইবার আমার শেষ কথা। আমার মতে কেবল বাংলার মাটী বাংলার জল বলে কাঁদলে বরং স্বদেশ-সেবক হওয়া যেতে পারে কিন্তু বাঙ্গালী হওয়া যায় না। বাঙ্গালী হতে হলে বাংলা-ভাষার আদর করা চাই; কিন্তু তা কি সকলে করেন? অনেকেই ত বাংলা-ভাষাকে দুগ্ধপোষ্য অর্ব্বাচীন বলে ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করেন। তাঁদের মতে সংস্কৃত ভাষাই হচ্ছে আদর্শ পরিণত ভাষা; কারণ সে হচ্ছে 'গীর্ব্বাণবাণী' অর্থাৎ দেবতাদের ভাষা—সে ভাষার কোন জায়গায় কোন খুঁত নেই--সে ভাষা যেমন মধুর তেমনি উন্নত, তেমনি দুরূহ। সে ভাষার ব্যাকরণ আছে, অলঙ্কার আছে, অর্থাৎ তার পাইক বরকন্দাজ কিছুরই অভাব নেই, তার গায় হাত দেওয়া যার তার কাজ নয়। সে যেমন সুন্দর তেমনি তার চাল চলন হাব ভাব ভঙ্গী সব কলের মত বাঁধা, সে নিজের গর্ব্বে নিজের ঐশ্বর্য্যে শক্ত হয়ে বসে আছে, পরের কাছে সে কিছুরই প্রার্থী নয়। তার অক্ষয়-ভাণ্ডার হতে ভাব ভাষা চুরি করে' বাংলার মত কত শত প্রাকৃত ভাষা দাঁড়িয়ে গেল, কিন্তু তা হলেও তারা কখন সংস্কৃতের সমকক্ষ হতে পারবে না কারণ তারা সংস্কৃতেরই সন্তান। এই জন্যে অনেকে বৈষয়িক বা সাংসারিক কথাবার্ত্তা বাংলাতে বল্লেও চিন্তার রাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে হলেই সংস্কৃতের লৌহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁদের মতে সংস্কৃত চাবি ভিন্ন কাব্য-দর্শনের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয় না।

একটু চিন্তা কর্‌লেই দেখা যায় যে, তাঁদের এই ধারণা নিতান্তই

গা-জুরী—এর ভিতর কোন যথাযথ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। সংস্কৃত-ভাষায় কি এমন যাদুমন্ত্র আছে, যাতে মনের ক্ষুধা মেটাতে হলে তারই নিকটে আমাদের দৌড়ে যেতে হবে? আমাদের নিত্য নূতন জীবনের দাবী কি সে এখনো পরিপূর্ণ কর্‌তে পারবে? সে যে ল্যাটিন-ভাষার মতই প্রাচীন—সে যে অনেক দিন থেকে মরে 'মমি' হয়ে রয়েছে। তার আড়ষ্ট দেহের ভার বহন করে, আমাদের তরল কোমল ভাবগুলি কি সাহিত্যের পথে বেশী দূর অগ্রসর হবে? কেন সংস্কৃতের উপর আমাদের এ অযথা পক্ষপাত? সন্তানের গুণ কি কখনো মাতার গুণকে অতিক্রম করে যেতে পারে না?

জগৎ সর্ব্বত্রই উন্নতির পথে যাচ্ছে এই যদি Evolution-এর অর্থ হয়, তবে ভাষাই কি কেবল অবনত হচ্ছে? স্বীকার করি সংস্কৃতের উপর আমাদের একটা স্বাভাবিক ভক্তি আছে, কারণ সংস্কৃত নাকি সকল ভাষার আদি জননী, কিন্তু এ আদিজননী বাংলা-ভাষার মাতাই হোক্ আর মাতামহীই হোক্—আমাদের মাতৃভাষা ত বাংলা। আমাদের কাছে সে ত সব চেয়ে বেশী প্রীতির দাবী কর্‌তে পারে। তার ব্যাকরণ অলঙ্কার না থাক্, তার জীবন আছে—সে দশ হাতে আমাদের জন্য যেখান থেকে যা ভাল, তাই কুড়িয়ে এনে দিচ্ছে, আর আমরা কিনা তাকে চোর বলে, ভিখারিণী বলে নিন্দে কর্‌ছি? এটা ঠিক মাতৃভক্তির পরিচয় দেয়?

আমার শেষ নিবেদন এই যে, আমরা যেন, আমাদের অতীতের গৌরবের চাপে আমাদের বর্ত্তমানকে কাবু না করি—স্বজাতীয়তার জার্ম্মাণ মদ ও জার্ম্মাণ মোহ যেন আমাদের মনকেও আচ্ছন্ন ও অবসন্ন না করে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক।

হিন্দু সঙ্গীত।

(প্রশ্ন)

———:০:———

শ্রীযুক্ত 'সবুজপত্র' সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

মহাশয়,—

সেদিন গতবৎসরের পুরাতন সবুজপত্রগুলি পড়িতে পড়িতে জ্যৈষ্ঠের সংখ্যায় হঠাৎ দেখিলাম আপনারা সঙ্গীত সম্বন্ধে কিছু বাদ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে; আশা করি আপনাদের আগামী সংখ্যায় তাহার উত্তর দিবেন। আপনারা বলিতে চান ইংরাজী বা বিদেশীয় সুরের সংস্পর্শে আমাদের দেশী সঙ্গীত শ্রীসম্পন্ন হইয়াই উঠিবে, সৌষ্ঠব-হীন হইয়া পড়িবে না, এবং এই মতের সমর্থনের জন্য আপনারা যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সত্যকে পাইতে হইলে তাহাকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রাখাটা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। এ কথা খুবই সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি বিদেশী সুরের সহযোগে আমরা কি সঙ্গীত জিনিসটাকে সত্যই সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারিব? আমার বোধ হয় তাহা নয়। একদিক রাখিতে গিয়া অপর দিকের ধস্‌ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বিলাতী সুরের ঘাত-প্রতিঘাতে দেশী সুরগুলি ধস্‌ভাঙ্গা বালুচরের মত দিন দিন খসিয়া পড়িতে থাকিবে, এবং পড়িতেছেও তাই। আপনারা মনে করিতেছেন দেশী এবং বিলাতী সুরের মিলন ক্ষেত্রে আপনারা এক বিরাট সম্পূর্ণতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবেন; কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে

বুঝিতে পারিবেন, সেই মিলনক্ষেত্র অচিরে একটি করুণ বিচ্ছেদ সঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। খাঁটী দেশী-সুর বিলাতী-সুরের পূতিগন্ধ সহ্য করিতে না পারিয়া মিলনের সুখ অপেক্ষা চিরবিরহের দুঃখকেই বরণ করিয়া লইবে; আর তাহার ফলে এই দাঁড়াইবে যে বিলাতী মিশ্রিত সুরই একদিন আমাদের দেশের সুর হইয়া দাঁড়াইবে, দেশী সুরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত দেশের লোকে ভুলিয়া যাইবে। মাঝে হইতে সম্পূর্ণতা সম্পাদন ত হইলই না, পরন্তু নিজের যে আধখানা ছিল তাহার স্থানে পরের আধখানা আসিয়া আসন গাড়িয়া বসিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৫০ কি ৬০ বৎসরের মধ্যেই আমাদের খাঁটী দেশী-সুর গুলি লুপ্ত হইয়া যাইবে। এখনও তবু দু'এক জনকে খাঁটী দেশী সঙ্গীতের সুর, তাল, লয় প্রভৃতির চর্চ্চা করিতে দেখা যায় কিন্তু আমার বিশ্বাস এইভাবে যদি আপনারা কেবল নিজ নিজ যুক্তিকে সমর্থন করিবার জন্য, একটা প্রকাণ্ড সত্যকে ক্রমাগতক বিধ্বস্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তাহার ফল দাঁড়াইবে এই যে আপনাদের তর্ক শক্তি দিন দিন আলোচনার দ্বারা প্রবল হইয়া উঠিবে, কিন্তু অন্যদিকে সঙ্গীতের যে মহাসর্ব্বনাশ হইবে তাহার ক্ষতিপূরণ হওয়া দুষ্কর।

সে দিন আমার একজন বিশিষ্ট গায়কবন্ধু দুঃখ করিয়া বলিতেছেন, "আমার রাগিণী আলাপ শুনে আজকালকার ছেলেরা হাসে আর বলে লোকটা যেন বিকারের ঝোঁকে প্রলাপ বক্‌ছে।" আমি জিজ্ঞাসা করি এরূপ 'প্রলাপ' বকিতে ছেলেদের কাহারা উত্তেজিত করিতেছে? একজন বালককে যদি প্রণয়ের রসাল কবিতা পড়িতে দেওয়া হয়, এবং তাহার পর কোন জটীল প্রবন্ধের মধ্যে মনোনিবেশ করিতে বলা হয়, তবে সে তাহা শত চেষ্টাতেও পারিবে কিনা সন্দেহ। সে বলিবে

এটাও সাহিত্য ওটাও সাহিত্য যে দিক দিয়েই যাই সাহিত্য ত পেলাম তবে যেটাতে আনন্দ পাই সেইটাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিব না কেন? আপনাদের মত ও কি তাই? একথা অবশ্য স্বীকার করি যে রবিবাবু এবং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে সকল সুরের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা সকলের পক্ষে উপভোগ্য এবং সহজে বোধগম্য কিন্তু সকলের পক্ষে বোধগম্য হওয়া বা না হওয়ার উপর কি এতবড় একটা প্রকাণ্ড সত্য নির্ভর করে?

আপনারা বলিবেন, সত্যকে পাইতে হইলে বীরের মত সত্যের নিকট মাথা নত করিতে হয়। যেখানেই সঙ্গীতের পুষ্টিকর উপাদান পাইব সেই স্থান হইতেই তাহা মাথা নত করিয়া লইতে হইবে। আমার যাহা আছে তাহা লইয়া আর সমুদায় সত্যকে অগ্রাহ্য করিয়া গর্ব্বোন্নত মস্তকে বসিয়া থাকিলে সে গর্ব্ব সার্থক হয় না। কিন্তু যদি দেখি যে পরের নিকট হইতে আদান করিতে করিতে সমস্তই পরের হইয়া যায়, নিজের নিজস্ব হারাইয়া ফেলি তখন নিজের যাহা আছে তাহা লইয়া থাকাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়? আজকাল দেখিতে পাই কোন যুবককে গান গাহিতে বলিলেই তাহারা হয় দ্বিজেন্দ্রবাবু না হয় রবিবাবুর মিশ্র, ভাঙ্গাচোরা সুরে নাকিসুরে এমন সকল গান গাহেন, যাহা সকলের পক্ষে মিষ্ট এবং উপভোগ্য হয় বটে, কিন্তু যাহা একটা প্রকাণ্ড সত্যকে, একটা সাধনার বস্তুকে আপনার ফাঁকা সৌন্দর্য্যের দ্বারা দূরে সরাইয়া রাখিতে চায়। আনন্দ পাই বলিয়াই বা সকলের পক্ষে উপভোগ্য বলিয়াই যে একটা জিনিসকে বরণ করিয়া লইতে হইবে এমন কি কোন কথা আছে?

এ জগতে অনেক জিনিস আছে যাহা সকলের পক্ষে উপভোগ্য ও

নয় এবং সকলের উপভোগের জন্য সৃষ্টও হয় নাই। দার্শনিক অনেক গ্রন্থ আছে যাহা সাধারণে উপভোগ করিতে পারে না কিন্তু এই সামান্য কারণের জন্য যে সেটাকে ছোট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে হইবে বা তার গুরুত্বটাকে লঘু করিয়া ফেলিয়া সকলের বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইবে এমন যুক্তি বোধ হয় কাহারও মনে আসিতে পারে না। সহজ পাইলে কে আর শক্তকে আমল দেয়। নভেল পাইলে কে আর দর্শনের নীরস পৃষ্ঠা উল্টাইতে চায়? কিন্তু সে প্রবৃত্তি আসিতে দেওয়া কি উচিত না যুক্তি-সঙ্গত? আপনারা সুরকে ভাঙ্গুন চুরুন তার সৌন্দর্য্য সম্পাদনের চেষ্টা করুন তাহাকে সহজ করিয়া তুলুন, ক্ষতি নাই কিন্তু এমন প্রবৃত্তি যেন আপনাদের মনে কোন দিন না আসে যে শক্ত বলিয়া একটা প্রকাণ্ড সত্যকে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। শক্তকে শক্তভাবে পাওয়াই সম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া, শক্তকে সহজ করিয়া লইলে সেটাকে সহজে পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেটা না পাওয়ারই সামিল। রবিবাবুর কথাতেই বলি, "আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।"

আপনারাই না Indian artএর মস্ত প্রবর্ত্তক! অথচ জিজ্ঞাসা করি Indian art কয়জন লোক বোঝে? কটালোকে তার art উপভোগ করে? সেটাকে সহজ করিয়া সকলের উপভোগক্ষম করিয়া তুলিয়া, তার সম্পূর্ণতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাঁহারা দ্বিধাবোধ করেন তাঁহাদের নিকট হইতে সঙ্গীত কলা সম্বন্ধে এমন উদ্ভট মত আমরা আশাই করি নাই। ইতি—

বশংবদ—

শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

হিন্দু সঙ্গীত।

(উত্তর)

——:০:——

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়, তাঁর পত্রে হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করেছেন, তার যথাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

প্রথমতঃ কৈফিয়ৎ হিসাবে দুটি একটি কথা বল্‌তে চাই।

আমরা যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে "একটা প্রকাণ্ড সত্যকে" নিজ নিজ যুক্তির সাহায্যে "বিধ্বস্ত" কর্‌তে চেষ্টা কর্‌ছি—"সবুজ পত্রে" প্রকাশিত আমাদের প্রবন্ধ-যুগলে এরকম দুরভিসন্ধির কোনই প্রমাণ নেই। পত্রলেখক মহাশয় ঈষৎ মন দিয়ে আমাদের প্রবন্ধ দুটি পড়্‌লে দেখতে পেতেন যে, আমি লিখেছি—

৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতের জাতিপাত করেছেন, এ অপবাদ যদি সত্য হয় . . . তাহলে এ কবির রচনায় কোনই মূল্য নেই, কোনই মর্য্যাদা নেই, এবং কবি হিসেবে তিনি শুধু উপেক্ষার কেন, অবজ্ঞারও পাত্র।

আর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যা লিখেছেন তা এই—

হিঁদু সঙ্গীত বলে যদি কোনও পদার্থ থাকে, তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক, কারণ তার প্রাণ নেই—তার জাতই আছে। হিন্দু সঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে।

সুতরাং আমরা যে হিন্দুসঙ্গীতের হিন্দুত্ব নষ্ট কর্‌তে উদ্যত হয়েছি, এ অভিযোগের ভিত্তি পত্রলেখক মহাশয়ের কল্পনায় ছাড়া আর কোথাও নেই।

আমার মতে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের গানের "চাল" একটু বদলে দিয়েছেন, বিগড়ে দেন নি; আর রবীন্দ্রনাথের মতে—

যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন, তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বেন্।

বলা বাহুল্য যে, সোনার কাঠির স্পর্শে সোনার পালঙ্কে যে শুয়ে আছে সে শুধু জেগে ওঠে;—রূপভ্রষ্ট হয় না।

(২০)

এস্থলে দুটি বিষয় নিয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ হতে পারে।

প্রথম—সোনার পালঙ্কে কেউ শুয়ে আছে কিনা, এবং যদি থাকে ত সে কে?

দ্বিতীয়—বিদেশী সঙ্গীত সোনার কাঠি কি রূপোর কাঠি?

এ বিচার সুরু কর্‌বার পূর্ব্বে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক। বঙ্গ-সাহিত্যে এ আলোচনায় ভুল বোঝাবার এবং ভুল বোঝবার যথেষ্ট অবসর আছে; কেননা, এ সাহিত্য নিয়ে যাঁদের কারবার—অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়—তাঁদের অনেকেরই সঙ্গীতের নামের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও, তার রূপের সঙ্গে পরিচয় নেই। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলেছি যে:—

যিনি সপ্ত স্বরকে কখনও হাতে কিম্বা গলায় আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন নি, তিনি সঙ্গীতের সমালোচক হতে পারেন না। কেননা সঙ্গীতশিক্ষা প্রয়োগসাপেক্ষ।

পূর্ব্বোক্ত মত ত্যাগ করবার আমি অদ্যাবধি কোনও কারণ দেখি নি। আজও আমার বিশ্বাস যে সঙ্গীত-বিদ্যা লাভ করতে হলে, প্রাক্তন সংস্কার এবং শিক্ষা দুই চাই। এ ক্ষেত্রে প্রথমতঃ অধিকারী-ভেদ আছে, দ্বিতীয়তঃ technique-এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে। সঙ্গীত বিদ্যায় অশিক্ষিত-পটুত্ব বলে' কোনও জিনিস নেই। গুণীর কথা দূরে থাক্, সমঝদার হওয়ার জন্যও অন্ততঃ কিঞ্চিৎ শিক্ষারও আবশ্যক। তারপর সঙ্গীতের আলোচনায় technicalities সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা একেবারে অসম্ভব। এ কারণেও সে আলোচনা সকলের নিকট সমান সহজ-বোধ্য না হতে পারে। আমি যতদূর সম্ভব সাদা কথায় আমার মতামত ব্যক্ত করতে চেষ্টা করব।

(৩)

হিন্দুসঙ্গীত বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে দেখতে পাই প্রথমতঃ সাধারণলোকের মনে কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই, দ্বিতীয়তঃ পণ্ডিতে পণ্ডিতে ভীষণ মতভেদ আছে।

অনেকের বিশ্বাস, আমরা যাকে ওস্তাদি বলি, তাই হচ্ছে খাঁটি হিন্দু-সঙ্গীত। পত্রলেখকমহাশয়ের কথার ভাবে বোঝা যায় তাঁর বিশ্বাসও তাই।

কিন্তু নানা বিভিন্ন শ্রেণীর সঙ্গীত, এই ওস্তাদি বিশেষণের দ্বারা

বিশিষ্ট ; যথা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি। শুদ্ধবাণী ধ্রুপদ ও শোরীমিয়ার টপ্পা যে এক-জাতীয় সুর নয়, আমাদের দেশের গান বাজনার যাঁরা ক-খ-মাত্র জানেন, তাঁদের কাছেও তা অবিদিত নেই। সুতরাং "ওস্তাদি" অর্থে কে কোন্‌জাতীয় সঙ্গীত বোঝেন, তা স্পষ্ট করে না জানালে, এ বিষয়ে কোনরূপ সঙ্গত বিচার করা অসম্ভব। পত্রলেখকমহাশয় লিখেছেন যে তাঁর একজন "বিশিষ্ট গায়ক বন্ধু" এই বলে দুঃখ করেন—"আমার রাগিণী আলাপ শুনে একালের ছেলেরা হাসে।" ঐ "আলাপ" শব্দের উল্লেখ থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি হিন্দু-সঙ্গীত অর্থে বোঝেন ধ্রুপদ ও খেয়াল। তাহলে কি টপ্পা, ঠুংরি, হোরি, কাজরি, ভজন, লাউনি, হিন্দু সঙ্গীত নয়? এ মত প্রকাশ কর্‌লে ছেলেরা না হোক, সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই যে হাসবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যদি কেউ জোর করে বলেন যে, হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতই হিন্দু-সঙ্গীত—তাহলে দক্ষিণাপথের ব্রাহ্মণ-সঙ্গীতাচার্য্যেরা সমস্বরে তার প্রতিবাদ করে বল্‌বেন—

না, তা কখনই নয়, কেননা উত্তরাপথের সঙ্গীত যবনদোষে দুষ্ট—অতএব হিন্দুপদবাচ্য নয়।

অপরপক্ষে মুসলমান ওস্তাদজিরা বলে থাকেন যে, রাগরাগিনী সব তাঁদের খানদানি, এমন কি সপ্তসুর পর্য্যন্ত তাঁদের ঘরানা চীজ। হিন্দুর মুখ থেকে ও সব বেরোয় না, যদি বা বেরোয় তাহলে তাতে "কড়িভাতকা বদ্‌বু" থাকে ; কিন্তু তাঁদের মুখ থেকে যা উদ্গীর্ণ হয়, তাতে "পোলাও কোরমাকো খোসবু" থাকে। একদিকে দই ভাত, অপরদিকে পেঁয়াজ রশুন—এ দুয়ের মধ্যে পত্রলেখকমহাশয়ের ভাষা ব্যবহার কর্‌তে গেলে, কোনটি যে বেশী "পুতিগন্ধময়" সে

বিচার তিনিই কর্‌তে পারেন—যিনি সঙ্গীতের রূপ চিনুন আর না চিনুন, গন্ধ চেনেন। এ দেশে গীত যে অনেক গায়কের নাসারন্ধ্র দিয়ে নির্গত হয়, তা জানি; কিন্তু তা যে শ্রোতাদেরও উক্ত ছিদ্র দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে, এ কথা পূর্ব্বে জানতুম না। ফলকথা, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত, সঙ্গীত হতে পারে; কিন্তু হিন্দু কিনা, সে বিষয়ে আচার্য্য ও ওস্তাদে মতের মিল নেই।

অতএব দেখা গেল যে, হিন্দু-সঙ্গীত বল্‌তে কি বোঝায়, তা নির্ণয় করা অসম্ভব, কেননা ও-শব্দে কোনও-এক জিনিস বোঝায় না। নানা বিভিন্ন জাতীয় নানা বিভিন্ন রীতির সঙ্গীতকে আমরা ঐ এক ছাপ-মারা মোড়কে পুরে দিই। হিন্দু-সঙ্গীত বলে সঙ্গীতের এমন কোনও একটি বিশেষ typeও নেই,—যা অচল, অটল, পরিচ্ছিন্ন ও নির্ব্বিকার। আমাদের দেশের গানবাজনাও মুখে মুখে ও হাতে হাতে নানা রূপ ধারণ করে' নানা চালে চল্‌ছে। পরিবর্ত্তনের নিয়ম এ ক্ষেত্রেও পূর্ণমাত্রায় কাজ করেছে। সুতরাং বর্ত্তমানে কেউ যদি নূতন ঢংয়ের সুর গড়েন কিম্বা পুরোণোকে নূতন চালে চালান, তাহলে তাতে করে হিন্দু-সঙ্গীতের ধর্ম্ম নষ্ট করা হবে না।

(৪)

পূর্ব্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে অনেকে এই আপত্তি উত্থাপন কর্‌বেন যে, হিন্দু-সঙ্গীতের বিশেষত্বই এই যে, তার কতকগুলি সুপরিচিত type আছে—যার নাম ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী। এবং সেই সব রাগরাগিনীর একসুর বদ্‌লালে হিন্দু-সঙ্গীত বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এ কথাটারও একটু বিচার করা আবশ্যক। প্রথমতঃ হিন্দু-সঙ্গীতে শাস্ত্রমতে রাগরাগিনী অসংখ্য, মূল ছয় এবং তার থেকে উৎপন্ন ছয় ছক্ক ছত্রিশ নয়। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে ওস্তাদজিরা যে ছক্কা ধরে বসে আছেন, তা যে ফাস কাগজ তাতে আর সন্দেহ নেই।

সত্য কথা এই যে, নামে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিনী থাক্‌লেও, আসলে আমাদের গান-বাজনায় তারা নানা মূর্ত্তিতেই দেখা দেয়। এই কারণেই ত রাগরাগিনীর শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে ওস্তাদে ওস্তাদে এত মারামারি। ভৈরবীতে কড়িমধ্যম লাগালে রাগ বজায় থাকে কিনা, এ তর্কের অবশ্য কোনও অর্থ নেই। কড়িমধ্যমের স্পর্শে যদি ভৈরবীর ভৈরবীত্ব নষ্ট হয়, তাহলে তাকে না হয় "কৈরবীই" বলা গেল—তাতে সে সুর অসুর হয়ে ওঠে না। বাংলা-বেহাগের নিখাদ কোমল ও মধ্যম শুদ্ধ, অপর পক্ষে হিন্দুস্থানী-বেহাগের নিখাদ শুদ্ধ এবং মধ্যম তীব্র। এ উভয়ের মধ্যে কোন্ সুরটি হিন্দু আর কোন্‌টি অহিন্দু— এ বিচার কোন্ আদালত কর্‌বে ?

তারপরে শুদ্ধাশুদ্ধের এই বাজে তর্ক শুনে শুনে লোকের মনে আর একটি ধারণা জন্মেছে যে, মিশ্র হলেই বুঝি সুরের সর্ব্বনাশ হয়। যেমন গীতাকারের মতে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টির বাড়া পাপ নেই, তেমনি অনেক গীতকারের মতে মিশ্র সুরের সৃষ্টির বাড়া পাপ নেই। এ ধারণা অবশ্য সম্পূর্ণ অমূলক। আমাদের ওস্তাদি ঢংয়ের টপ্পা ঠুংরির অধিকাংশ সুরই ত মিশ্র। তারপর ধ্রুপদ খেয়ালের অনেক ভারি ভারি গানের সুরও যে মিশ্র, তার পরিচয় তাদের নামেই পাওয়া যায়—যথা, মেঘ-মহ্লার, গৌড়-মহ্লার, নট মহ্লার, ইমন-কল্যাণ, ইমন-ভূপালি, বসন্ত-বাহার, আড়ানা-বাহার ইত্যাদি।

সুতরাং এই মিশ্র সুরের উপরেই আমাদের সঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠিত, এবং যে সকল পূর্ব্বাচার্য্যেরা সুরের নূতন রূপ নূতন গতি দিতে পেরেছেন যথা—গোপাল নায়ক, বাজুবৈরা, তানসেন, সদারঙ্গ ইত্যাদি,—ওস্তাদের দল অদ্যাবধি তাঁদের নাম উচ্চারণ করে' নিজের কাণ মলে' তার পরে মুখ খোলেন।

(৫)

এ সব ত গেল কালোয়াতি সঙ্গীতের কথা, শাস্ত্রে যাকে বলে "মার্গ।" এ ছাড়া ভারতবর্ষে আর এক জাতীয় সঙ্গীত বহুকাল হ'তে চলে' আসছে যার নাম "দেশী।" উদাহরণ—বাংলার কীর্ত্তন, বাউল, সারী, জারি ইত্যাদি। গাইয়ে বাজিয়েদের দেশী সঙ্গীতের ইচ্ছামত রূপান্তর করবার প্রচুর স্বাধীনতা আছে—কেন না এ শ্রেণীর সঙ্গীত কোনও বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন নয়। এ কথার প্রমাণ "রাগ বিবোধের" বক্ষ্যমান শ্লোক ঃ—

দেশে দেশে রুচ্যা যজ্জনহৃদ্রঞ্জনং তু সা দেশী।
স তু লোকরুচিবিকলিত প্রায়ো লক্ষ্যাত্র দেশী তৎ॥

টীকাকার উক্ত শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন—

যে সকল গীত অবলা-বাল-গোপাল-নৃপালগণ কর্ত্তৃক অনুরাগবশতঃ স্বেচ্ছায় স্বদেশে গীত হয়, তাহাকে দেশী কহা যায়। মার্গসঙ্গীত দ্বিবিধ—নিবদ্ধ এবং অনিবদ্ধ। যে সঙ্গীত আলাপনিবদ্ধ, তাহা মার্গ, বলিয়া প্রকীর্ত্তিত। আর যাহা আলাপাদি বিহীন, তাহাই দেশী বলিয়া প্রকীর্ত্তিত।

আর এক কথা—শাস্ত্রের নিয়মে বদ্ধ নয় বলে, দেশী সঙ্গীত যে সঙ্গীতের নিয়মে বদ্ধ নয়, অবশ্য তা নয়। রাগবিবোধ গ্রন্থের উদ্দেশ্যই এই

প্রমাণ করা যে, মার্গ এবং দেশী-সঙ্গীতে আসলে কোনও বিরোধ নেই। গ্রন্থকারের নিজের কথা এই "রাগবিবোধং বিদধে বিরোধ রোধায় লক্ষ্যলক্ষণয়ো"। উপরোক্ত বাক্যে লক্ষ্য অর্থে দেশী, এবং লক্ষণ অর্থে মার্গ। এ দুয়ের মধ্যে যে বিরোধ নেই শুধু তাই নয়,—টীকাকারের মতে দেশী সঙ্গীত মার্গ সঙ্গীতেরই একটি বিশেষ শাখা। এ শাখাকে যদি কেউ কাঁচা ডাল বলেন, তাতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু তাই বলে সেটিকে যে ভাঙ্গতেই হবে, এমন কোনও বিধি শাস্ত্রে নেই।

অতএব দেখা গেল যে শাস্ত্রমতেও দেশী-সঙ্গীত আলাপাদিবিহীন হওয়ার দরুণ বিদেশী হয়ে পড়ে না। সুতরাং ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়ের গান আলাপনিবদ্ধ নয় বলে যে তা হিন্দু-সঙ্গীত নয়, এবং জনগণের হৃদয়রঞ্জন করে বলে যে তা কোনও "প্রকাণ্ড সত্যের" বিরোধী, এ হতেই পারে না,—নচেৎ রামপ্রসাদী সুরকেও অহিন্দু বল্‌তে হয়।

সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে দেশী-সঙ্গীতও হিন্দু-সঙ্গীত, এবং সে সঙ্গীত সোনার পালঙ্কে শুয়ে নেই—কিন্তু দেশের মাটিতে নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছে, অর্থাৎ নর্ত্তনে কীর্ত্তনে সে তার প্রাণের নিত্যনূতন পরিচয় দিচ্ছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই, কেননা রাগ বিবোধের টীকাকার কল্লিনাথ—সম্ভবতঃ ইনি মল্লিনাথের সহোদর—বলেছেন, দেশী-সঙ্গীত কামচারী। এ সঙ্গীত অবশ্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এই দেশী-সঙ্গীতের হাল-চাল সম্বন্ধে বলেছেন :—

প্রথম চালটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী; কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা—যে চল্‌তে সুরু করেছে, সে বাঁধন মানছে না।

দেশী-সঙ্গীতের প্রাণ আছে বলে তার স্ফূর্ত্তি কেউ বন্ধ করতে পারবে না, এবং করাও উচিত নয়। কালক্রমে আমাদের এই দেশী-সঙ্গীত হয়ত এক অপূর্ব্ব মার্গ-সঙ্গীতে পরিণত হবে। এ আশা অন্ততঃ আমরা রাখি।

(৬)

যদি এদেশে কোনও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সঙ্গীত থাকে, আমার মতে সে হচ্ছে ঐ পূর্ব্বোক্ত মার্গ-সঙ্গীত। সকলপ্রকার দেশী-সঙ্গীতের অপেক্ষা এই মার্গ-সঙ্গীত আমার কাণে সব চাইতে বেশী মিষ্টি লাগে, আমার মনকে সব চাইতে বেশী আনন্দ দেয়, আমার হৃদয়কে সব চাইতে বেশী স্পর্শ করে। এ সঙ্গীতে ভারতবর্ষের কোনও প্রাচীন দেশী-সঙ্গীতের একটি বিশেষ ধারা পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে; প্রাকৃতের হিসাবে সংস্কৃতের যে স্থান—দেশী-সঙ্গীতের হিসাবে মার্গ-সঙ্গীতেরও সেই স্থান। এ পরিণতির অন্তরে যুগ যুগান্তরের সঙ্গীত-সাধকদের সাধনা সঞ্চিত রয়েছে। অনেকের বিশ্বাস রাজার আজ্ঞায় রাজদরবারে এর সৃষ্টি। আমার ধারণা এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। এমন পূর্ণাবয়ব এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সঙ্গীত কেউ ফরমায়েস দিয়ে রাতারাতি গড়িয়ে নিতে পারে না। বিশেষতঃ কোনও রাজারাজড়া ত নয়ই। কল্লিনাথ সঙ্গীতের জ্ঞান সম্বন্ধে নৃপালকে ত গোপালের দলেই ফেলেছেন।

এ যুগে এই উচ্চ-অঙ্গের সঙ্গীতের আদর যে ক্রমে কমে আসছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং এই দুর্গতির কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা দরকার। পত্রলেখক মহাশয় বলেছেন যে তাঁর একটি

গায়ক বন্ধুর "রাগিণী আলাপ" শুনে ছেলেরা হাসে। "রাগিণী" নয় রাগ-আলাপ শুনে একালের শুধু ছেলেরা নয়, বুড়োরাও যে হাসে—এর চাক্ষুষ পরিচয় আমরা নিত্যই পাই। কিন্তু সে কার দোষে—শ্রোতার না গায়কের? আমার বিশ্বাস এর জন্ম উভয় পক্ষই সমান দোষী।

এমন ধ্রুপদী নিত্য দেখা যায় যিনি কোনও ধ্রুপদের একপদ পর্য্যন্ত অগ্রসর না হয়েই—তালের ডন্ বৈঠক করতে সুরু করেন। কালোয়াতি ভাষায় এর নাম ভাগবাঁট করা। তখন সুর থাকে পড়ে'—আর ওস্তাদজির কণ্ঠ থেকে যা নিঃসৃত হয়, তা সঙ্গীতের হ য ব র ল ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁরা ভুলে যান যে ধ্রুপদের প্রধান গুণ হচ্ছে তার repose; গায়ক যদি ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করেন, তাহলে শ্রোতারা যদি তাঁদের গাম্ভীর্য্য রক্ষা করতে না পারেন—তাতে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না।

তারপর খেয়ালীদের কীর্ত্তিকলাপ আরও অদ্ভুত। এঁরা মুখ না খুলতেই তান বেরতে সুরু করে। আমি অবশ্য তানের বিরোধী নই। সঙ্গীতে যে সরল রেখা ব্যতীত অপর কোনও রেখার ব্যবহার দূষনীয়—এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। ধ্রুপদ ইউক্লিডের প্রথম অধ্যায় এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যেই আবদ্ধ,—খেয়াল তার থেকে মুক্তি লাভ করে তার তৃতীয় অধ্যায় অধিকার করে' বসেছে। চিত্রকলাতেও দেখা যায়—আদিম চিত্রকরদের সরলরেখাই হচ্ছে একমাত্র সম্বল। পরে উক্ত কলার ক্রমবিকাশের ফলে সে রেখা বাঁকে চোরে, ঘোরে ফেরে। আমার ধারণা এরূপ হওয়াটা উন্নতিরই লক্ষণ। এমন কি ধ্রুপদীরাও মুখে না হোক, কার্য্যতঃ এ সত্য মেনে চলেন। মিড় দেওয়ার অর্থই

হচ্ছে সুরের কোণ মেরে দেওয়া। যদিচ আমি তানের একান্ত পক্ষপাতী, তবুও একালের খেয়ালীরা তানের যেরূপ অপপ্রয়োগ এবং দুষ্টপ্রয়োগ করে থাকেন, তা আমার কাণেও অসহ্য। তান করতপ ইত্যাদিকে সঙ্গীতের অলঙ্কার বলা হয়। অলঙ্কারের উদ্দেশ্য অবশ্য দেহের শোভাবৃদ্ধি করা, ঢেকে ফেলা নয়। খেয়ালীদের প্রযুক্ত অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য এবং অসঙ্গত ও অযথা বিন্যাসের ফলে, লোকে সুরের চেহারা প্রায়ই দেখতে পায় না। কতকগুলো টুকরোর সমষ্টিতে সঙ্গীতের রূপ জন্মলাভ করে না, কেননা সে রূপ হচ্ছে অখণ্ড ও সমগ্র। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর খেয়ালীরা সঙ্গীতের রূপের সঙ্গে তার রসও নষ্ট করেন। সুতরাং সে গানে যে লোকে রস পায় না, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? সুরের কুটিমোড়া-ভাঙ্গা ও ডিগবাজি খাওয়া অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার হলেও, সঙ্গীত নয়; কেননা সঙ্গীত বাজি নয়, যাদু।

দেহীমাত্রেরই রূপ কেবলমাত্র দেহের রেখার সুষমার উপর নির্ভর করে না—তদুপরি বর্ণও চাই। বর্ণ শুধু রূপকে প্রকাশ করে না—সেই সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত প্রাণেরও পরিচয় দেয়। স্বরই হচ্ছে সঙ্গীতের বর্ণ। কেন জানিনে অধিকাংশ ওস্তাদ তাদের কণ্ঠস্বরকে অতিশয় কর্কশ করে তোলেন। বাণী বীণাপাণি প্রকৃতি মুখরা বটে, কিন্তু তিনি যে কর্কশা,—এ সত্য ওস্তাদজিরা কোথা থেকে উদ্ধার করলেন? এমন খেয়ালীও দুস্প্রাপ্য নয়, যাঁদের একটী তান বার করতে কণ্ঠের প্রসব-বেদনা উপস্থিত হয়। কেউ কেউ বা তান গাঁজার ধোঁয়ার মত নাক দিয়ে ছাড়তে বাধ্য হন। স্বরের উৎপত্তিস্থান কণ্ঠ, মূর্দ্ধা মণি-পদ্ম, নাভিপদ্ম যেখানেই হোক না, তার বহির্ভ্রমণের পথ যে নাসিকা—

এ কথা কোন শাস্ত্রেই বলে না। আর যে সঙ্গীতের নাক ডাকে, সে যে ঘুমিয়ে আছে, এ সন্দেহ মানুষের মনে সহজেই উদয় হয়—তা সে স্বর্ণ সিংহাসনেই বসে থাক্, আর সোনার পালঙ্কেই শুয়ে থাক্!

উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীতের উপর এইরূপ অত্যাচার করার প্রধান কারণ, কলাবতেরা ভুলে যান যে সঙ্গীত আর্ট, science নয়—এবং সঙ্গীতের উদ্দেশ্য শ্রোতাকে আনন্দ দেওয়া, নিজের মুখস্থ বিদ্যার দৌড় দেখানো নয়। এই সঙ্গীতের বিদ্যে দেখাতে গিয়ে তাঁদের শুধু বিদ্যেই বেরিয়ে পড়ে—ফলে আনাড়ির দল হাসে, আর সুরেলা লোকেরা চটে।

(৭)

এই pedantryর দোষে, এক pedant-এর দল ছাড়া অপর সকলের কাছে উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, হয় উপেক্ষা নয় অবজ্ঞার বস্তু হয়ে উঠেছে। এ অবশ্য অতিশয় দুঃখের বিষয়, কেননা পূর্ব্বেই বলেছি যে আমার মতে এই শ্রেণীর সঙ্গীতেই ভারতবর্ষের সঙ্গীত তার পূর্ণ-শ্রী, পূর্ণপরিণতি লাভ করেছে। সুতরাং এ সঙ্গীত শিক্ষা কর্‌তে গেলে বেশীর ভাগ লোকেই কেন আর্টিষ্ট না হয়ে pedant হয়ে ওঠে—তার কারণও নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা করা আবশ্যক।

আর্টের রাজ্যের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিগুলিকে অমর কর্‌বার ইচ্ছা মানুষের পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের কীর্ত্তিগুলি সব নিজের জোরেই দাঁড়িয়ে থাকে—কেননা ও সকল আর্টের উপাদান কঠিন জড়পদার্থ। যে আর্টের উপাদান শব্দ, সেই

আর্টকে রক্ষা কর্‌বার উপায়, হয় তাকে কণ্ঠস্থ নয় লিপিস্থ করা। যতদিন না মানুষে অক্ষরের আবিষ্কার করে, ততদিন কাব্য কিম্বা সঙ্গীত কণ্ঠস্থ করে' রাখা ব্যতীত তা রক্ষা কর্‌বার উপায়ান্তর নেই।

আমাদের দেশে স্বরলিপি ছিল না বলে', আবহমান কাল সঙ্গীত কণ্ঠস্থ করে'ই রক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং কোন একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর গীতকে উক্ত উপায়ে রক্ষা কর্‌তে হ'লে—কণ্ঠস্থকারকে তার একস্বরও বদল কর্‌বার অধিকার দেওয়া যেতে পারে না; যেমন বেদমন্ত্রের এক অক্ষরও বদল কর্‌বার অধিকার সেকালে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেওয়া হয় নি। লিপিকরকে ইচ্ছামত শকুন্তলার পরিবর্ত্তন কর্‌বার স্বাধীনতা কোনও কাব্যভক্ত লোক দিতে পারেন না। তানসেনের দরবারী-কানাড়া যদি রক্ষা কর্‌তে হয়—তাহলে তাঁর অপেক্ষা নিকৃষ্ট গায়ককে তার অঙ্গহানি কর্‌বার অধিকারে বঞ্চিত কর্‌তে হয়। সঙ্গীতকে এইভাবে কণ্ঠস্থ করে রক্ষা কর্‌বার সুফল হয়েছে এই যে, পূর্ব্বাচার্য্যদের রচিত অনেক গান আজও সশরীরে বর্ত্তমান আছে। যথার্থ আর্টিষ্টের হাতে পড়লে সে শরীরে আবার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অপর পক্ষে এর কুফল হয়েছে এই যে, আমাদের গুণীর দল সব অল্পবিস্তর pedant হয়ে পড়েছে; প্রাণ দূরে থাক, সঙ্গীতের দেহ পর্য্যন্তও তাঁদের কাছে উপেক্ষণীয়, তাঁরা শুধু তার কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচাড়া করেন।

সঙ্গীতের সঙ্গে কাব্যের প্রভেদ এই যে, কাব্য যে খুসি সেই মুখস্থ কর্‌তে পারে, কিন্তু সঙ্গীত অধিকারী ব্যতীত অপর কেউ কণ্ঠস্থ কর্‌তে

পারে না। যার ভগবদ্দত্ত গানের গলা ও সুরের কাণ নেই, সে হাজার পরিশ্রম করেও ও বস্তু, "আদায়" কর্‌তে পারে না। এ ক্ষেত্রে composer ত আর্টিষ্টই, এবং যে ব্যক্তি আর্টিষ্ট হবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় নি, সে executant হতে পারে না।

কিন্তু স্বরলিপির অভাবে এ দেশে executantকে তার সমস্ত মনটাকে নির্ভুল ভাবে কণ্ঠস্থ কর্‌বার দিকেই দিতে হয়; ফলে, তার ভিতরকার আর্টিষ্ট স্বাধীনতার অভাবে পঙ্গু হয়ে যায়, আর সেই সঙ্গে মুখস্থকার প্রবল হয়ে ওঠে। এই কারণেই রাগরাগিণীর শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার নিয়ে, ওস্তাদে ওস্তাদে এত কোস্তাকুস্তি এত ধ্বস্তাধ্বস্তি। কে কত ভাল মুখস্থ করেছে, কে কত মাছিমারা নকল কর্‌তে পারে, তার উপরেই তার কৃতীত্ব নির্ভর করে। যিনি কাব্যামৃতের রসাস্বাদ করেছেন, তাঁর কাছে ব্যাকরণের কুটতর্ক যেমন অপ্রীতিকর,—যিনি সঙ্গীতরসের রসিক, তাঁর কাছে সঙ্গীত-বিদ্যার কচ্‌কচিও তেমনি বিরক্তিকর। যারা কবি হয়ে জন্মেছে, তারা বৈয়াকরণিক হতে বাধ্য হলে কাব্যের যে সর্ব্বনাশ হয়—যারা আর্টিষ্ট হয়ে জন্মেছে, তারা ওস্তাদ হতে বাধ্য হলে সঙ্গীতেরও সেই সর্ব্বনাশ হয়। স্বরলিপি থাকার দরুণ ইউরোপের গাইয়ে বাজিয়েদের এ বিপদে পড়্‌তে হয় নি। মোজার্ট বেটোভেনের রচিত সঙ্গীত যে কি, তা নিয়ে গুণীর দলকে মারামারি কর্‌তে হয় না,—কারণ যার খুসি তিনিই তা স্বচক্ষে দেখে নিতে পারেন। সেই লিপিবদ্ধ সঙ্গীতকে সুরে অনুবাদ করা এবং সেইসঙ্গে তাকে সজীব করে তোলার ক্ষমতার উপরেই সে দেশের ওস্তাদদের কৃতীত্ব নির্ভর করে।

(৮)

কি চিত্রে, কি কাব্যে, কি সঙ্গীতে—আর্টিষ্ট মাত্রেই নবস্তুর স্রষ্টা। সুতরাং আর্টের যে শিক্ষাপদ্ধতি আর্টিষ্টকে নববস্তু স্থষ্টির পথে বাধা দেয়, সে শিক্ষা আর্টের উন্নতির পথ রোধ করে। আমাদের দুর্ভাগ্য-বশতঃ, আমাদের দেশে সঙ্গীত-শিক্ষার পূরো ঝোঁকটা পুনরাবৃত্তির উপরেই পড়েছে। সুতরাং মার্গ-সঙ্গীতে এ দেশে নব নব রাগরাগিনীর স্থষ্টি বহুকাল থেকে একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। আমরা composer হবার অধিকারে বঞ্চিত হয়েছি। শকুন্তলা সংস্কৃত নাটকের শীর্ষস্থান অধিকার করে আছে বলে', সংস্কৃত কবিরা যদি তাঁরই আবৃত্তি ও অনুবৃত্তি করাই তাঁদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলে' মনে করতেন, তাহলে উত্তররাম-চরিত রচিত হত না। আর্টিষ্টকে কিন্তু একেবারে গতানু-গতিকের দাস করা যেতে পারে না, সুতরাং সুরের নূতন মূর্ত্তি গড়বার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আমাদের দেশের গুণীর দল তাদের সকল রচনাশক্তি অলঙ্কারের বৈচিত্র্য-সাধনের উপরেই প্রয়োগ করেছে। এর সুফল হয়েছে এই যে, বাঁধা ঠাটের হাত থেকে কথঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করে' মার্গ-সঙ্গীত তরঙ্গিত হয়ে উঠেছে, অপর পক্ষে তার কুফল হয়েছে এই যে, রাগরাগিনী, কাণ্ডজ্ঞানহীন খেয়ালীর হাতে পড়ে', অলঙ্কারের অন্তরে অন্তর্হিত হবার সুযোগ পেয়েছে। ধ্রুপদে তানের স্থান নেই, সুতরাং ও গানে ওস্তাদি দেখাতে হলে তালের গুণ ভাগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অপর পক্ষে খেয়ালের তাল ঠেকায় গিয়ে দাঁড়ানোতে, সে গানে ওস্তাদি দেখাতে হ'লে—তানের যোগ বিয়োগ করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। ফলে মার্গ-সঙ্গীতের গুণীপনা এখন তাল ও সুরের আঁক-কষাতে পরিণত হয়েছে।

সে আঁক যে যত জল্‌দি কষতে পারে, সে তত মার্ক পায়। স্বরতালের শুভঙ্করী যে সঙ্গীতের পক্ষে শুভকরী নয়—এ অতি সোজা কথা।

(৯)

তবে সত্যের খাতিরে এ কথা আমাকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, গায়ক যদি পণ্ডিত না হয়ে যথার্থ আর্টিষ্টও হ'ন,—এবং গাইয়ে বাজিয়েদের দলে আর্টিষ্টের আজও কোন অভাব নেই,—তাহলেও আমাদের দেশের এ যুগের বেশীর ভাগ ছেলেবুড়ো তাঁর গান শুনে না হাস্থন, গম্ভীর হয়ে যাবেন,—অর্থাৎ তাতে তাঁরা ক্লেশ বোধ কর্‌বেন। এর জন্য দোষী অবশ্য শ্রোতার দল। এরূপ হবার কারণ কি এই নয় যে, যাকে আমরা musical feeling বলি—তাতে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত? গানবাজনায় আমাদের মনে যে feeling এনে দেয়—তা যে, আমরা যাকে স্থখদুঃখ বলি তা হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এ জ্ঞান সঙ্গীত-প্রাণ লোকমাত্রেরই আছে। যাঁদের অন্তরে musical feeling নেই, তাঁদের কাছে অবশ্য এ কথা গ্রাহ্য নয়, এবং কোনরূপ যুক্তিতর্কের দ্বারা এ মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করাও অসম্ভব। পৃথিবীতে এমন কি যুক্তি তর্ক আছে, যার সাহায্যে অন্ধকে রূপের জ্ঞান দেওয়া যেতে পারে? Musical feeling-এর স্বাতন্ত্র্য তর্কের দ্বারা প্রমাণ না কর্‌তে পারলেও, তার স্বরূপ আমরা বর্ণনা কর্‌তে পারি,—এবং আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে এই বিশিষ্টতার পরিচয় দিতে চেষ্টা কর্‌ব।

আমাদের দেশের নব্য-আলঙ্কারিক মতে—

রমণীয়ার্থ প্রতিপাদকঃ শব্দঃ কাব্যম॥

পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

রমণীয়তা চ লোকোত্তরাহ্লাদজনক—
জ্ঞানগোচরতা। লোকোত্তরত্বং চাহ্লাদগতচমৎকারত্বাপরপর্য্যায়োনুভব সাক্ষিকো জাতিবিশেষঃ। কারণং চ তদবচ্ছিন্নে ভাবনা বিশেষঃ পুনঃপুনঃ-রনুসংধানাত্মা। "পুত্রস্তে জাতঃ," "ধনং তে দাস্যামি" ইতি বাক্যার্থধিজন্য-স্যাহ্লাদস্য ন লোকোত্তরত্তম।

(রস গঙ্গাধর)

অর্থাৎ—যে শব্দ দ্বারা আমাদের মনে লোকোত্তরাহ্লাদ জন্মে, তাই কাব্য। লোকোত্তরাহ্লাদ একটি বিশেষ জাতীয় আহ্লাদ এবং সে আহ্লাদের একমাত্র সাক্ষী হচ্ছে অনুভূতি। "তোমার ছেলে হয়েছে" "তোমাকে টাকা দেব"—এ কথা শুনে লোকের মনে যে আহ্লাদ হয়—সে অবশ্য লোকোত্তরাহ্লাদ নয়। রসগঙ্গাধরের টীকাকার বলেন—"অনুভব সাক্ষিক" এই কথা বলায়, অন্য প্রমাণের নিরাস করা হয়েছে। এবং সে অনুভব কার?—না, সহৃদয় লোকের।

কাব্য হতে আমরা যে আনন্দ পাই তা যে একটি "বিশেষ জাতীয়" আনন্দ এবং তা যে আমাদের লৌকিক আনন্দের পর্য্যায়ভুক্ত নয়—এ বিষয়ে অবশ্য কোনই সন্দেহ নেই। তবে কাব্যের আনন্দ যে "বাক্যার্থধীজন্য" নয়, এ কথা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়—কেননা কাব্যে আমরা অর্থহীন শব্দ ব্যবহার করিনে; সুতরাং কাব্যের "ভাবনা" আমাদের ব্যবহারিক মনের অতিরিক্ত হলেও, সম্পূর্ণ বহির্ভূত নয়। কাব্য আমাদের লৌকিক সুখদুঃখের সঙ্গে এতটা জড়িত যে,—কাব্য-রস যে পৃথক এবং স্বতন্ত্র বস্তু, এ কথা মানুষে সহজে স্বীকারও করে না, ধরতেও পারে না।

সঙ্গীতের আনন্দ যে শুধু আংশিক ভাবে নয়, সম্পূর্ণরূপে লোকোত্তরাহ্লাদ, সঙ্গীত-রস যে আমাদের হৃদয়-রসের বিকারমাত্র নয়, এ সত্য গ্রাহ্য করবার পক্ষে তেমন কিছু বাধা নেই। সঙ্গীতেও শব্দ আছে, কিন্তু সে শব্দের কোন লৌকিক অর্থ নেই। সঙ্গীতের ভাষা আমাদের "কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করে", কিন্তু মস্তিষ্কের পথ ধরে' নয়; অর্থাৎ সঙ্গীত আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অধীনও নয়, গ্রাহ্যও নয়। সুতরাং সঙ্গীত-রস যে কেবলমাত্র অনুভূতি সাপেক্ষ, তার স্পষ্ট পরিচয় যন্ত্রসঙ্গীতে পাওয়া যায়। যাঁর বীণ কি বেহালা শুনে প্রাণ আকুল না হয়ে ওঠে, তাঁর প্রাণে সঙ্গীত নেই। গায়কের রাগরাগিনীর আলাপও ঐ যন্ত্রসঙ্গীতেরই সামিল; তফাৎ এইটুকু—এ স্থলে যন্ত্র হচ্ছে কণ্ঠ,—তাঁত কিম্বা তার নয়। গীত, আমার বিশ্বাস, যে পরিমাণে সঙ্গীত হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণে তাতে কথার প্রাধান্য কমে' আসে।

মার্গ-সঙ্গীতের চাইতে দেশী-সঙ্গীত যে ঢের বেশী লোকপ্রিয়, তার কারণ এ নয় যে দেশী-সঙ্গীত সহজ, ও মার্গ-সঙ্গীত কঠিন। দেশী-সঙ্গীতে কথার প্রাধান্য থাকার দরুণ তা এত "জনহৃদ্রঞ্জক"। যাঁরা সঙ্গীতপ্রাণ নন্ তাঁরাও লৌকিক অর্থে অতি সহৃদয় ব্যক্তি হতে পারেন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিরা দেশী-সঙ্গীতের কথার রসে মুগ্ধ হন। সে কথা সুরসংযোগে উচ্চারিত হয় বলে' সম্ভবতঃ তাঁদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারে একটু বেশী করে ঘা দেয়, আর সেই কারণ তাঁদের হৃদয়ের কপাট একটু বেশী ফাঁক হয়ে যায়। এ সত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাঙ্গলার কীর্ত্তন। কিন্তু তাঁরা যে আনন্দ অনুভব করেন, সে পূর্ণমাত্রায় সঙ্গীতগত আনন্দ নয়। জনসাধারণের মতে গান কাব্যেরই একটি অঙ্গ; কারো মতে সেটি উঁচুদরের, কারও মতে নীচুদরের, এই যা তফাৎ।

শাস্ত্রমতে সঙ্গীতকেও কাব্যের মত বীর, করুণ, শান্ত প্রভৃতি নানা রসের আধার বলে' কল্পনা ও বর্ণনা করা হয়েছে। আর বীণে ভৈরবীর আলাপ শুনলে যে চোখে জল আসে, এ বিষয়ে আমি নিজে সাক্ষী দিতে পারি। অতএব ভৈরবীকে করুণরসাত্মক বলায় আমার আপত্তি নেই—যদি আমরা মনে রাখি যে ভৈরবী শুনলে আমাদের মনে পুত্রশোক উপস্থিত হয় না, যা হয় তা বিশুদ্ধ আনন্দ। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের শোকদুঃখের সঙ্গে তার কোনই সম্পর্ক নেই। মানুষের ভাষা তার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে—এবং সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল। সুতরাং যে সকল "ভাবনা" ব্যবহারিক মনের বস্তু নয়—তার নামকরণ কর্‌তে হলে, আমরা তাদের গায়ে আমাদের জানা কথাগুলির ছাপ মেরে দিই। এ নামকরণ অবশ্য কতকটা সাদৃশ্যমূলক। তারপর সঙ্গীত-রসে করুণ বীর প্রভৃতি মনোধর্ম্মের আরোপ যে উপমামাত্র, এ কথা আমরা বিলকুল ভুলে যাই। মানুষের ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ গেরস্থালির ভাষা—সে ভাষায় সঙ্গীত-রসের কোনও নাম নেই। অভিনবগুপ্ত বলেছেন যে, কাব্যরসের একমাত্র নাম হচ্ছে "কে'পি"—অর্থাৎ "কি জানি কি।" কাব্যরস সম্বন্ধে যাই হোক, সঙ্গীত-রসের "কে'পি" ছাড়া আর নাম নেই এবং হতে পারে না। ধর্ম্মের ন্যায় আর্টেরও মর্ম্ম, "নেতি নেতি" ছাড়া অপর কোনও উপায়ে প্রকাশ করা যায় না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাদারী শিক্ষার প্রসাদে আমরা সাংসারিক লাভলোকসানের হিসেব থেকে কাব্য বলো, সঙ্গীত বলো, সবই যাচাই করে নিতে চাই। আর্টিষ্টিক-নাস্তিকতায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সুতরাং মার্গ-সঙ্গীত

লোকপ্রিয় নয় বলে' দুঃখ করার কোন ফল নেই। যারা সঙ্গীত-রসের রসিক নয়, তাদের কাছে আসলে কোন সঙ্গীতই প্রিয় নয়। এ সব কথা বলার উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, অধিকাংশ লোক সঙ্গীত-রসের রসিক নন্ বলেই মার্গ-সঙ্গীত লোকপ্রিয় নয়।

পত্রলেখক বলেছেন যে, মার্গ-সঙ্গীত কঠিন বলে' তার আদর নেই—এ বিষয়েও আমি তাঁর সঙ্গে একমত হতে পারছি নে। যদি কঠিন বলার অভিপ্রায় এই হয় যে, না শিখে কেউ তা হাতে গলায় বার করতে পারেন না—এবং সঙ্গীত-বিষয়ে নৈসর্গিক সংস্কারেব অভাবে হাজার মেহন্নত করে'ও কেউ তা যথার্থ আয়ত্ত করতে পারেন না; তাহলে আমি বলব যে দেশী-সঙ্গীত সম্বন্ধে ঐ একই কথা খাটে। কীর্ত্তন গাওয়া খেয়াল গাওয়ার চাইতে কিছু কম কঠিন নয় এবং ধ্রুপদ গাওয়ার চাইতে বেশী শক্ত। উভয় জাতীয় সঙ্গীতেরই technique আছে, এবং বিনা সাধনায় সে technique স্ববশে আনা যায় না।

আসল কথা, পৃথিবীতে এমন কোনও বিদ্যা নেই যাকে সহজ কিম্বা কঠিন বলা যেতে পারে, কারণ একজনের কাছে যা কঠিন, আর একজনের কাছে তা সহজ। পত্রলেখক মহাশয় বলেছেন যে দর্শন কাব্যের চাইতে কঠিন বলে', দর্শনের পাঠ কি উঠিয়ে দিতে হবে? এ কথার প্রথম উত্তর—দার্শনিক গ্রন্থ মাত্রেই কাব্য-গ্রন্থের চাইতে কঠিন নয়। Herbert Spencer-এর First Principles-এর অপেক্ষা Meredith-এর Egoist ঢের বেশী শক্ত—এবং Browning-এর কবিতার তুলনায় Mill-এর দর্শন জল। আর যে জিনিস বোঝা যত কঠিন তা যে তত শ্রেষ্ঠ, এ কথাও সত্য নয়,—

নচেৎ স্বীকার কর্‌তে হবে যে বেদান্তের “ভামতী টীকা” শঙ্কর ভাষ্যের অপেক্ষা ঢের শ্রেষ্ঠ। প্রকাশ কর্‌বার অক্ষমতার দরুণও অনেক সময়ে বিষয় কঠিন হয়ে ওঠে। কাব্যের সঙ্গে দর্শনের কিন্তু কোনই তুলনা হতে পারে না, কেননা এ দুই হচ্ছে মনো-জগতের বিভিন্ন রাজ্যের বস্তু। দর্শন বিজ্ঞান এক পদার্থ, আর আর্ট হচ্ছে জুদা চীজ্। সুতরাং কোন কোন কাব্যরসের রসিকের নিকট দর্শন যেমন অপ্রিয়, কোন কোন দর্শন-রসের রসিকের নিকট কাব্য তেমনি অপ্রিয়। লোকের প্রকৃতি বিভিন্ন, রুচি বিভিন্ন। ভগবান সব মানুষকে এক ছাঁচে গড়েন নি, তা বলে' কি করা যাবে? অবশ্য এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা “খোদার উপর খোদকারি” কর্‌তে চান—তাঁদের সঙ্গে তর্ক করার মজুরি পোষায় না। মোদ্দা কথা এই যে, অনধিকারীর নিকট সকল বস্তুই কঠিন।

যা বিনা আয়াসে আদায় করা যায়, যদি তারই নাম সহজ হয়, তাহলে—আমি একবার নয়, একশবার বল্‌ব—সঙ্গীত শিক্ষা সহজ নয়। কেননা অপর সকল আর্টের অপেক্ষা সঙ্গীতে techniqueএর প্রাধান্য ঢের বেশী। যে উপাদান নিয়ে আর্টিষ্টকে কারবার কর্‌তে হয়, সেই উপাদানের সকল জড়তা, সকল অবাধ্যতা অতিক্রম কর্‌বার কৌশলেরই নাম technique; যার প্রাণে সুর আছে, সেই সুরকে প্রকাশ কর্‌তে হলে কণ্ঠ ও যন্ত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিজের বাধ্য কর্‌তে হয়। যেহেতু বাহ্য জগতের উপাদানগুলি সহজে বাগ মানেনা, সুতরাং সেগুলিকে স্ববশে আন্‌তে হলে যত্ন চাই, পরিশ্রম চাই, অভ্যাস চাই,—এক কথায় সাধনা চাই। সুতরাং মানুষে musical feeling নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও, চর্চ্চার অভাবে বা দোষে তা নষ্ট

করতে পারে। বর্ত্তমানে বেশীরভাগ লোক সঙ্গীত-চর্চ্চা করেন না, সুতরাং অনেকের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত-বীজ চর্চ্চার অভাববশতঃ প্রতিকুল আবহাওয়ার মধ্যে মারা যায়। এই যত্ন পরিশ্রম কিন্তু আমাদের পক্ষে কষ্টকর জিনিস নয়—আনন্দের জিনিস। বাইরের বাধাকে অতিক্রম করা, তার উপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন কর্‌বার চেষ্টাতেই ত আমরা নিজের শক্তির পরিচয় পাই—এবং সেই সঙ্গে সুখ পাই। বাধা যত বেশী প্রবল, তাকে অতিক্রম কর্‌বার সুখও তত বেশী। সাধনার মধ্যে নিত্য নূতন আনন্দ পাওয়া যায়; সে হচ্ছে নিত্য-নূতন শক্তি উদ্বোধনের ও সঞ্চয়ের আনন্দ। সুতরাং যথার্থ সাধন-পদ্ধতি কঠিনও নয়, কষ্টকরও নয়। যিনি যে বিষয়ের সাধনাকে কষ্টকর মনে করেন—তিনি সে বিষয়ে অনধিকারী; সুতরাং তাঁর পক্ষে সে সাধনা যে পরিমাণে কষ্টকর, সে পরিমাণে ত্যাজ্য। "নায়ং আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" এ কথা আর্ট সম্বন্ধেও খাটে। দুর্ব্বলের পক্ষে সাধনামাত্রেই শুধু কঠিন নয়—ভয়াবহ; এবং আলস্য দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিসের পরিচয় দেয়? আমরা যে, কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতে অনেক জিনিস হেসে উড়িয়ে দিই—তার কারণ সে সব আমরা হেসে উড়িয়ে নিতে পারি নে।

আর একটি কথা,—আর্টকে science হিসেবে যদি শেখানো হয়, তাহলে সাধনপদ্ধতির দোষে সে শিক্ষা যে নিরানন্দ হয়ে পড়্‌বে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফলে সাধনমার্গ কঠিন না হো'ক, এ ক্ষেত্রে শুষ্ক হয়ে উঠেচে। যাঁরা ওষুধ-গেলা-গোছ করে' গান শেখেন, তাঁদের গান শুনতে লোকের ওষুধ-গেলার ভোগই ভুগতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশে সঙ্গীতের চর্চ্চা যে কমে' যাচ্ছে, তার জন্য

গুরু শিষ্য উভয়েই দোষী। কোন্ ক্ষেত্রে কে বেশী দোষী তা, কে-গুরু ও কে-শিষ্য তারই উপর নির্ভর করে। গুরু শিষ্য উভয়েই যদি আর্টিষ্ট হন, তাহলে "গজদন্ত কনকে জড়িত" হয়, নচেৎ সঙ্গীতের শুধু গজদন্ত বেরিয়ে পড়ে।

শ্রোতাদের আলস্য ও গায়কবাদকদের ব্যায়াম, এই দুয়ের প্রসাদে মার্গ-সঙ্গীত সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে না থাক্—ঝিমিয়ে পড়েছে। বিলাতি-সঙ্গীতের কাঠির স্পর্শে সে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠ্‌বে কি না—তা আমি বলতে পারি নে, কেননা সে কাঠি সোণার কি রূপোর—তা আমি জানিনে। এই মাত্র আমি জানি যে, দেশী মার্গ সকল প্রকার গানবাজনা আমার কাণে স্বদেশী বলেই ঠেকে—এবং সকল প্রকার ইউরোপীয় সঙ্গীত, বিদেশী বলেই ঠেকে। এ প্রভেদের মূল আবিষ্কার কর্‌তে না পারলে, বিলাতি-সঙ্গীতের ধাক্কায় স্বদেশী-সঙ্গীত জেগে উঠ্‌বে, কি মারা যাবে—বলা অসম্ভব। আশা করি, যাঁর উভয় জাতীয় সঙ্গীতের সঙ্গে সম্যক পরিচয় আছে, এমন কোনও সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি, এ সমস্যার মীমাংসা করে' দেবেন। তবে এ কথা নিশ্চয় যে, যে উপায়ে আমাদের নব-সাহিত্য গড়া হচ্ছে, সে উপায়ে নব-সঙ্গীত গড়বার যো নেই; কেননা সঙ্গীত জিনিসটে তর্জ্জমা করা চলে না—ওর ব্যাকরণ থাক্‌লেও, অভিধান নেই।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি—মার্গ-সঙ্গীত ঝিমচ্ছে। কিন্তু তাই বলে' ওস্তাদির আফিং ছাড়াবার উদ্দেশ্যে কেউ যে তাকে বিলাতি-সঙ্গীতের মদ ধরাতে প্রস্তুত, এর প্রমাণ ত অদ্যাবধি পাই নি। বিলাতী-সঙ্গীত যে উত্তেজক পদার্থ, সে সঙ্গীত যিনি কাণ দিয়ে পান করেছেন, তিনিই তা জানেন। সঙ্গীত বিষয়ে আমি গুণীও নই, জ্ঞানীও নই—সুতরাং

এই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, পত্রলেখক মহাশয় যে মামলা তুলেছেন তার ইষু ধার্য্য করে দেওয়া। বিচার আর পাঁচজনে করুন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

— —

বাঙ্গলার গান।

—:o:—
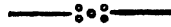
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এ যুগের গান-রচয়িতারা হিন্দু-সঙ্গীতের অবনতি ঘটাইয়াছেন, এই কথাটি ঠিক কি না, তাহা ভাবিবার এবং জানিবার বিষয় বটে। কিন্তু হিন্দু-সঙ্গীত বলিতে কি বুঝায় সেইটাই প্রথম জানিবার বিষয়। খাঁটি বাঙ্গলা গানগুলি কেন যে হিন্দু-সঙ্গীত নয়, তাহার যুক্তিযুক্ত কারণ কেহ দিতে পারেন না ও পারিবেন না। সংস্কৃত এবং প্রাকৃত লইয়া হিন্দুর ভাষা। ভারতের সকল প্রদেশেই একটি সংস্কৃত সঙ্গীত-ধারার পাশাপাশি বিশেষ বিশেষ প্রাদেশিক সঙ্গীতের ধারাসকল চিরকাল বহিয়া আসিতেছে; গানবাজনারও এই প্রাকৃত সংস্কৃত লইয়াই হিন্দুর সঙ্গীত। প্রত্যেক প্রদেশের পৃথক প্রকৃতির সহিত মিল রাখিয়া সেই সেই প্রদেশের সঙ্গীতের ধারা উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি, কোন বিষয়েই বাঁধা নিয়মে তাহাদের অন্তরাত্মা সহজে ধরা দিতে চাহে না। এই জন্য বনের পাখীর মত মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ সুরে তাহারা জাতীয় গীতি গাহিয়াছে। এদেশের কীর্ত্তন, বাউলের গান এবং ভাটিয়াল সুর ইত্যাদি বাঙ্গলার খাঁটি সুর। ভারতের সকল প্রদেশ, শাস্ত্রীয় হিন্দু-সঙ্গীতের চরণে আপন আপন প্রাণের স্বতঃউৎসারিত উল্লাসের অঞ্জলি ঢালিয়াছে, কিন্তু নিজের স্বাতন্ত্র্য

বিসর্জ্জন দেয় নাই। দেশী-সঙ্গীত স্বাভাবিক উল্লাসেই বর্দ্ধিত হইয়াছে কোনরূপ কঠিন বন্ধনের মধ্যে ধরা দেয় নাই এবং দিতেও নারাজ। এই কারণেই উচ্চ হিন্দু-সঙ্গীতের চর্চ্চা বাঙ্গলার আবহাওয়ায় ভাল করিয়া বাড়িতে পারে নাই, পারিবেও না। কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্গীতের যে এদেশে চর্চ্চা হয় না, তাহা নয়—বাঙ্গালীর নিজস্ব সঙ্গীত, কীর্ত্তন ইত্যাদির ধারায় বাঙ্গলা পরিপ্লাবিত। ইহার দ্বারা বুঝা যায় হিন্দু-সঙ্গীতের কোন্ রীতি আমাদের দেশের পক্ষে স্বাভাবিক ও উপযোগী।

রবীন্দ্রনাথ উচ্চ হিন্দু-সঙ্গীতের ধরাবাঁধা নিয়ম না মানিয়া, যদি খাঁটি বাঙ্গলার সঙ্গীতকে নূতন বল নূতন গতি দিয়া থাকেন, তবে তাহা যে অন্যায় হইয়াছে—বাঙ্গালী এ কথা বলিতে পারে না। সংস্কৃত মহাকবিগণের সকল মহাকাব্যই বাঙ্গলার অগাধ শ্রদ্ধার জিনিস, তবুও বৈষ্ণব পদাবলীই বাঙ্গালীর হৃদয়কে কেন এত জোর করিয়া টানে? বাঙ্গালীর প্রাণের সুরের প্রকৃত পরিচয় ইহা হইতেই সহজে পাওয়া যায়। যদি কেহ বলেন যে, বাঙ্গলা-সঙ্গীত বাঙ্গালীর নিকট সহজ, অতএব তাহার কোনও মূল্য নাই—তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতে হয়, পৃথিবীর কোনও জাতির মাতৃভাষারও কোনও মূল্য নাই—কেননা বিদেশীভাষা অপেক্ষা মাতৃভাষা সকল দেশে সকল জাতির পক্ষে ঢের বেশী সহজ।

আমাদের প্রকৃতি বিভিন্ন, এই জন্যই বাঙ্গলার ক্ষেত্রে উত্তর পশ্চিমের ধ্রুপদ জন্মে নাই। বিজ্ঞানের পথ অপেক্ষা ভাবের পথই এ জাতির পক্ষে বেশী প্রশস্ত। চণ্ডীদাস রামপ্রসাদের গান এই জন্যই বাঙ্গলার খাঁটি সঙ্গীত। এইগুলিকে বাদ দিয়া

শাস্ত্রীয় হিন্দু-সঙ্গীতের বাঁধনে বাঙ্গালীকে বাঁধিলে, বাঙ্গালীর প্রাণের স্বাভাবিক সুরের উৎস হয়ত চিরকালের মত পাথর চাপা পড়িয়া, তাহার প্রবাহ বন্ধ হইয়া যাইবে। হয়তো তাহাতে সাময়িক তরঙ্গভঙ্গী খেলিতে পারে, কিন্তু তাহা আনন্দের নহে,—জোরের ও ব্যথার। বাঙ্গালীর উপর ও-ভার চাপাইলে, বঙ্গ-সঙ্গীতের নির্ঝরটী কালক্রমে অন্তঃসলিলা হইয়া যাইবে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গলার সুরকে যে তাহার নিজের পথে চালনা করিয়াছেন ও তাহার স্রোত জোরে বহাইয়াছেন—তাহার কারণ তিনি বুঝিয়াছেন যে, বাঙ্গলার হিন্দু-সঙ্গীতের ধারা প্রবহমান রাখিতে হইলে, তাহাকে বাঙ্গলার মাটি দিয়াই বহিতে দিতে হইবে। হিন্দুস্থানী-সঙ্গীত যে একটি স্বতন্ত্রজাতীয় সঙ্গীত, আমরা তাহার পরিচয় ধ্রুপদে ভজনে, খেয়ালে লাউনিতে সমান পাই—ও সকলেরই মূলত ঢঙ এক, চাল এক। হিন্দি-ভাষার সহিত বাঙ্গলা-ভাষার যে প্রভেদ—হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতেরও আমাদের গানের সঙ্গে সেই প্রভেদ—অর্থাৎ উভয়ে এক জাতীয় হইলেও এক দেশের নয়, এক গোত্রের হইলেও এক বংশের নয়। সংস্কৃত-ভাষা চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া বাঙ্গলা-ভাষায় লেখা যেমন আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে—তেমনি হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের চর্চ্চা করা আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য হইলেও বাঙ্গলা সুরে বাঙ্গলা গান রচনা করা আমাদের পক্ষে অকর্ত্তব্য নহে। বাঙ্গলাগান রচনা করায় হিন্দুর হিন্দুত্ব নষ্ট হয় না—কিন্তু তাহা না করিলে বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব নষ্ট হয়।

শ্রীঅমরবন্ধু গুহ।

রাগ ও মেলডি।

(১) হৃদয়ে একাধিকের স্থান।

শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গীত-বিষয়ক প্রশ্ন উপলক্ষে সম্পাদক মহাশয় আমাকে দেশী-বিলাতী সুরের ভেদ নির্ণয় করিবার ভার দিয়াছেন। গোড়াতেই কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের হিসাবে আমি নিতান্ত বদ্‌রসিকের মধ্যে গণ্য। আমার এমনি দশা যে, কালোয়াতি গানবাজনা শুনিলেও মন নাচিয়া ওঠে; কীর্ত্তন ছাড়িয়াও উঠিতে পারি না; বাউল, চাষা, জেলে, পাহাড়ী কাহারও গানের রস ফেলিতে মন সরে না; আবার Bach, Beethoven, Mozart-এর রচিত সঙ্গীতও মস্‌গুল্‌ হইয়া শুনি।

সত্যের খাতিরে ইহাও আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, 'শ্রীরাম বলেন হে জানকি!' শুনিবামাত্রই আমার চোখ জলে ভরিয়া আসে না; দোষ স্বভাবেরই হৌক আর পাশ্চাত্য শিক্ষারই হৌক, ভাব লাগার আগে শ্রীরাম কি বলিলেন, সে কথা শোনা আমার পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়ে। কাজেই দাড়িওয়ালা ওস্তাদজী টুপি বাঁকাইয়া যন্ত্র ধরিয়া বসিবামাত্র আমার 'সোভান আল্লা' বলা পায় না। একদিকে যেমন কোন মেম-সাহেব piano-যন্ত্রের উপর নিরর্থক আওয়াজের ঝড় বহাইলে যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, অপরদিকে তেমনি কোন হিন্দুস্থানী কলাবৎ, সার্কাসের সঙের মত, খ্যাংরা-কাঠি দিয়া গম্ভীরভাবে ঘটিবাটি বাজাইতে থাকিলে বড় লজ্জা করে। বর্ত্তমানের অপরূপ সৃষ্টি

ঐক্যতান বাদনে, যখন fundamental bass-এর অনুকরণে বড় বেহালা বা ভেঁপু ঘোঁৎঘোঁৎ করে, তখন তাহা সহ্য করা দায় ত বটেই; কিন্তু তাই বলিয়া যখন সেতারী, একই পর্দ্দায় আঙুল রাখিয়া, মেজরাফের ডিরি-ডিরিতে বাঁয়াতবলার তা-ধিন্-ধিনে টক্কর লাগাইয়া ক্রমান্বয় লয়ের সঙ্গে ফাঁকা ঝন্‌ঝনানি বাড়াইয়া চলে, তখন সেখানেই কি তিষ্ঠান যায়?

যাহা হৌক, বিলাতী সুরমাত্রেই যে পূতিগন্ধ, বা কালোয়াতী-ঢঙেরই যে সৌরভ একচেটে, এই মত লইয়াই বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের সহিত আমার যাহা কিছু গরমিল; তাঁহার অপরাপর বক্তব্যের সহিত আমার বিশেষ কোন বিবাদ নাই। 'সহজ পাইলে কে আর শক্তকে আমল দেয়?'—এই লাখ কথার এক কথায় তিনি আমাদের দেশ কাল পাত্রের ব্যাধি নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। বাস্তবিকই চলা-বলা-কলা সকল বিষয়েই কিছু অতিরিক্ত সহজপন্থী হইয়া উঠায়, হিন্দুসন্তান ভারি শক্ত ফেরে পড়িয়া গিয়াছে।

এদিকে যাঁহারা শাস্ত্রের দোহাইয়ের চোটে পরের কান ঝালাফালা করিতে ব্যগ্র, তাঁহারা নিজে শাস্ত্রপাঠের অবসর পান না। ওদিকে যাঁহাদের মুখে বিজ্ঞানের বুলির খৈ ফুটিতেছে, তাঁহারা পরীক্ষাপূর্ব্বক বিচার দূরে থাক্—চোখ চাহিয়া দেখাটাও বাহুল্য বোধ করেন। এ অবস্থায় কালোয়াতী গান যে দশের হাস্যের উদ্রেক করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? এ সকল কুলক্ষণের মূলে একই রোগ—জাতীয় নিজ্জীবতা।

জীবনের ধর্ম্ম, সাধ করিয়া শ্রম স্বীকার করা, আহ্লাদ করিয়া শক্তকে বরণ করা। সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শনাদিতে যুরোপীয়েরা যথেষ্ট উন্নতি

করা সত্বেও, তাহারা ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ব কত খুঁজিয়া পাতিয়া উদ্ধার করিয়া লইয়া গেল, তাহারই ঝড়্তি-পড়্তি কুড়াইয়া আমরা মধ্যে গরবে ফুটিফাটা হইয়া উঠিয়াছিলাম! কৈ, তাহারা ত এ ভয় পাইল না যে, পরের ধন আনায় নিজস্ব সম্পত্তি খোয়া যাইবে? প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন ঘটনা হয়ও নাই; বরং প্রাচ্য জ্ঞানের আলোকে প্রতীচ্য বিদ্যাসকল উজ্জ্বলতর হইল। আমরা মুখে বলি আমাদের ধনই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সে বিষয়ে অন্তরের বিশ্বাস এতই কম যে, পরের জিনিস আমরা দেখিতে শুনিতে ছুঁইতে ভয় পাই, পাছে তাহারাই আমাদের মন টানিয়া লয়। অশ্রদ্ধার দানকে ত শাস্ত্রে দানই বলে না, তবে কি এত অবিশ্বাসের সহিত রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলে আমাদের ধন রক্ষা পাইবে?

মায়ের মনের অকারণ ভয়ের মত, বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয়ের উচ্চ-অঙ্গের স্বদেশী সঙ্গীত সম্বন্ধে দুর্ভাবনা, তাঁহার গাঢ় স্নেহেরই চিহ্ন। কিন্তু বঙ্গজননীর ন্যায় তিনি যেন লালনাতিশয্যে স্নেহের পাত্রকে দুর্ব্বল না করিয়া ফেলেন। হিন্দুজাতির, হিন্দুধর্ম্মের, হিন্দুকলার মার নাই—থাকিতে পারে না। ঐতিহাসিক কারণে আশপাশে যে-সকল আবর্জ্জনা জমিয়াছে, তাহা ঐতিহাসিক কারণেই আবার ঝরিয়া যাইতেছে ও যাইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সম্মার্জ্জনীর কাজ করিয়া প্রাচ্যের নিকট তাহার ঋণমুক্ত হইবে। তখন হিন্দুর চিরকালের সাধনা-অর্জ্জিত খাঁটি রত্নসকল নিজগুণে পৃথিবীর সমক্ষে স্বতেজে জাজ্বল্যমান থাকিবে। ইহার আর বিলম্ব নাই, আমার এ বিশ্বাস দৃঢ় থাকায়, চৌধুরী মহাশয় যাহাকে বিষবৎ দেখেন, আমি তাহা হইতেই ঔষধের আশা করি।

দেশের সৌভাগ্যক্রমে কৃত্তিবাস কাশীরামদাস প্রভৃতির মনে যদি এমন যুক্তি উদয় না হইত যে, সাধারণে যখন সংস্কৃত সাহিত্য উপভোগের

ক্ষমতা হারাইয়াছে, তখন মহাকাব্যগুলির গুরুত্বটাকে ভাষায় ও ভাবে একটু লঘু করিয়া সকলের বোধগম্য করিয়া তুলিতে হইবে,—তবে এতদিনে আমাদের সে সকল আদর্শ চরিত্রের ইতিহাস কোথায় থাকিত? দুর্দ্দিনের প্রলয়ের হাত হইতে ভগবান এই সকল বুদ্ধির প্রেরণার দ্বারাই মানবের অর্জ্জিত জ্ঞানসঞ্চয়কে বাঁচাইয়া রাখেন।

বিদেশী ডম্বেলই ভাঁজি আর দেশি মুগুরই ঘোরাই, বলবৃদ্ধি না হইয়া যায় না। দুর্ব্বলতার ঔষধ যেমন ব্যায়াম, রসজ্ঞান লাভের উপায় তেমনি চর্চ্চা। এ চর্চ্চা ও চর্চ্চা সে চর্চ্চায় কিছু কিছু তারতম্য থাকিলেও, যে-কোন চর্চ্চাদ্বারা রস-বোধ বাড়িবে বৈ কমিতে পারে না। সুতরাং যে যাহাতে আনন্দ পায়, সে তাহাই চর্চ্চা করুক। রস বোধের সঙ্গে সঙ্গেই রসভেদ-জ্ঞানও জন্মাইবে, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শ্রেষ্ঠ চিনিয়া লইতে আর গোল লাগিবে না। তখন আর ভয় কিসের? তামা-রূপার মুখ হেরিব না, পাছে সোনায় বিরাগ হয়,—এ কথা কি জহুরীর মুখে শোভা পায়?

শুনিতে পাই যে মদ ছাড়িবার জন্য আফিম ধরিলে দুই নেশাই পরমানন্দে এক শরীরে বিরাজ করে। তবে, যদি আমাদের দ্বিজু রায় স্বীয় প্রতিভাবলে বিলাতী সুরের কিছু কিছু রস আমাদের নিকট উপাদেয় করিয়া তুলিয়া থাকেন, তাহাতে কালোয়াতী সুরের রস খর্ব্ব হইবার ভয় কেমন করিয়া আসিতে পারে? বরং আমি দেখিয়াছি গান বাজনার উপক্রমে যে-ব্যক্তি ঘর ছাড়িয়া পালাইত, সেও দ্বিজু রায়ের মোহন হাসির রসে বশ মানিয়া সঙ্গীতের রাম-নামে কান পাতিতে শিখিয়াছে।

আর নব্য-বঙ্গীয় চিত্রকলার যে কথা বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় তুলিয়াছেন, তদুত্তরে আমি জিজ্ঞাসা করি—আমাদের দেশের অন্ধকার-যুগের রাত্রিশেষের সময়ে বিলাতি মাঠের মধ্যে বিলাতি গরু চরার বা প্রার্থনারতা স্থূলকায়া শ্বেতাঙ্গিণীর আকাশের দিকে চাহিয়া থাকার ছবি নকল করিয়া যদি চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চাটুকু কোনমতপ্রকারে বজায় না রাখা হইত, তবে কি আমাদের জাগরণের প্রভাত বেলায় এই নবীন চিত্রকলা জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার খাঁটি রূপে (কচি সুতরাং অস্ফুট হওয়া সত্বেও) প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ কলাবৎ জাপানী ও পাশ্চাত্যের অধুনাতন কলাগুরু ফরাসী জাতিদ্বয়কে যুগপৎ মুগ্ধ করিতে পারিত?

অতএব এ প্রসঙ্গে আমার শেষ কথা—মা ভৈঃ! বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় তাঁহার গুণী বন্ধুগণ সহ উচ্চ-অঙ্গের হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতে তাঁহাদের অনুরাগ, উৎসাহ, সাধনা ও চর্চ্চা অক্ষুন্ন রাখিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে থাকুন, এই আমার অনুরোধ। কেহ হাল্কার দিকে প্রথমটা ঝুঁকিলে ক্ষুব্ধ কেন হইবেন? লঘু পথ্যে ত ভয় নাই, ভয় অনশনে। কোনপ্রকারেই যদি চর্চ্চা না থাকে, তবে রসবোধ কি লইয়া বাঁচিবে? এবং সে বোধ একেবারে লোপ পাইলে উৎকৃষ্টতর রসপান রুচিবার আশা ও ঘুচিবে।

হইলই বা নানাস্থানে নানা অঙ্গের নানা ঢঙের সঙ্গীতের আদর; অধিকারভেদে কেহ বা শীঘ্র, কেহ বা বিলম্বে, সকলকেই অবশেষে চরমের নিকট পৌঁছিতে হইবে। যাহারা আজ হাসিয়া গিয়াছে, তাহারা অচিরে সাধিতে আসিবে—এই আমার ভবিষ্যদ্বাণী।

(২) সৃজন ও নির্ম্মাণ।

এখন তবে প্রকৃত প্রস্তাবে আসা যাক। হিন্দুস্থানী রাগরাগিনীর অন্তর্গত যে-কোন একটী সুর, এবং উহার বহির্ভূত যে-কোন একটী melody, উভয়ই স্বর-সংযোগে গঠিত; তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কেন, এবং প্রভেদ কিসে? এ বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাতের অধিক কিছু করা আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না, এবং কাহারও ক্ষমতায় একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে তদতিরিক্ত কিছু কুলান সম্ভব কি না সন্দেহ।

উক্ত কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া প্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এ প্রভেদ উপাদান ঘটিত নহে। কেহ না মনে করেন আমি বলিতেছি উভয়ের উপাদানে কোন প্রভেদ নাই। আমার বক্তব্য এই যে, উপাদানে যেটুকু প্রভেদ আছে, আমাদের আলোচ্য পার্থক্য প্রধানত তাহা হইতে উৎপন্ন নহে। আর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে ভাল করিয়া বোঝাপড়া হইয়া যাক।

আকাশ-কম্পন-প্রসূত অসংখ্য ধ্বনির মধ্য হইতে সঙ্গীতে ব্যবহৃত স্বরগুলি প্রকৃতি স্বয়ং নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য মানবকে কষ্ট করিতে হয় নাই। একটি তারকে পালকের দ্বারা হাল্কাভাবে ক্রমান্বয় ২, ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করিয়া, মেজরাফ বা ছড় দিয়া কাঁপাইলে, ষড়জ হইতে কেমন করিয়া, কোনটির পর কোনটি, অপর স্বরগুলির উৎপত্তি হয়, তাহা বুঝা যায়। এ বিষয়ের বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক বিবরণ এখানে আবশ্যক নাই। স্বরগুলি নৈসর্গিক, সুতরাং দেশভেদে ভিন্ন হইবার নহে, এইটুকু মাত্র উল্লেখ করা আমার অভিপ্রায়।

এই স্বাভাবিক স্বরগুলির পরস্পরের সহিত যে নৈসর্গিক সম্বন্ধ piano, harmonium প্রভৃতির বাঁধা ঠাটে সেগুলি ঠিকমত বার করা যায় না। এক পর্দ্দাকে সা ধরিয়া, সেই অনুসারে অন্য পর্দ্দাকে যতই ঠিক করিয়া বাঁধা হৌক, আর এক পর্দ্দাকে সা করিলে সে বাঁধা আর খাটিবে না,—কোন কোনটি অল্পবিস্তর বেসুরা হইবে। এই কারণে স্বরবিশেষকে ঈষৎ বিকৃত করিয়া, piano প্রভৃতির ঠাট এমন করিয়া বাঁধিতে হইয়াছে, যাহাতে শাদা কালো পর্দ্দার মাঝে মাঝে শ্রুতিগুলি ঠিক সমান ভাগে থাকে; ইহাতে করিয়া যে-কোনটিকে সা করা হৌক, এই বিকৃতির পরিমাণ সমান থাকিবে।

বিলাতী সঙ্গীতে harmony বা স্বরসন্ধির প্রাধান্য; তাহাদের এই সকল বাঁধা ঠাটের যন্ত্র না হইলেই নয়; সুতরাং এই বেসুরাটুকু তাহারা জানিয়া বুঝিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। কিন্তু বেহালা প্রভৃতি পর্দ্দাবিহীন যন্ত্রে তাহারা খাঁটি স্বরই বাহির করিয়া থাকে। Piano, harmoniumএ আমাদের রাগরাগিনী শুধু এই কারণেই যে অচল, তাহা নহে। আমরাও না হয় সুবিধার খাতিরে বেসুরাটুকু হজম করিয়া লইতাম, কিন্তু আমাদের অতি-কোমল অতি-তীব্র স্বর,—যাহা রাগ বিশেষে আবশ্যক,—তাহাও এ যন্ত্র গুলিতে নাই; তাহা ছাড়া মীড় প্রভৃতি যে সকল শ্রুতির খেলা আমাদের সঙ্গীতের বিশেষ মাধুর্য্য বিধান করে, তাহাও ইহাতে বার হইবার উপায় নাই।

তবে কি শ্রুতির ব্যবহারের তারতম্যই আলোচ্য পার্থক্যের কারণ? তাহাও ত নহে। প্রথমত নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, বিলাতী-সঙ্গীতে যে শ্রুতিগুলির ব্যবহার আছে, তাহা হিন্দুস্থানী-সঙ্গীতের শ্রুতি

হইতে নিশ্চয়ই ভিন্ন। বিলাতী-সঙ্গীত-শাস্ত্রে C-sharp ও D-flat ভিন্ন, দুয়ের মধ্যে কয়েক শ্রুতির তফাৎ আছে। আমাদের কোমল ও অতি-কোমল রেখাবের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা ইহারই মত কি না, ভাল করিয়া অনুসন্ধানের সুযোগ না পাওয়ায় আমি ঠিক করিয়া বলিতে পারি না। তাহা ছাড়া মীড়-জাতীয় টান দিয়া এক স্বর হইতে অপর স্বরে আরোহণ অবরোহণ বিলাতী-সঙ্গীতে যে একেবারে অজ্ঞাত বা অপ্রচলিত, তাহা নহে,—তবে এ কায়দা harmonyর সহিত ভালরকম খাপ না খাওয়ায়, উহারা ইহার বড় পক্ষপাতী নহে।

যাহা হৌক, এ সকল সূক্ষ্ম প্রভেদ লইয়া অধিক আলোচনার কারণ দেখি না, যেহেতু আমরা যে পার্থক্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত, তাহা যে ইহার উপর নির্ভর করে না, সহজ উপায়েই সে কথা বুঝা যাইতে পারে। Piano যন্ত্রে যদি একটি ভূপালি কি বিভাস, বা যাহাতে কড়িকোমলের সম্পর্ক নাই এমন যে-কোন রাগ বাজান যায়, তবে তাহাতে মীড় প্রভৃতির কোন উপদ্রব না থাকিলেও, কেহই তাহা বিলাতী সুর বলিয়া ভ্রম করিবে না; অপরপক্ষে বেহালা যন্ত্রে শাদা ঠাট অবলম্বন করিয়া, হাজার মীড়-জাতীয় টান লাগাইয়া, যদি কেহ বিলাতী সুর বিস্তার করিয়া তাহাকে দেশী বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করে, তবে বিশ্বপতি চৌধুরী মহাশয় ত প্রহার করিতে উদ্যত হইবেন। এইজন্যই বলিতেছিলাম যে, প্রভেদ আর যাহাই হৌক, উপাদান ঘটিত নহে।

উপাদানে যদি না পাওয়া গেল, তবে পার্থক্যের কারণ কাজেই গঠন প্রণালীর মধ্যে খুঁজিতে হইবে। তাহা করিতে গিয়া আমি এই দ্বিতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, ভারতবর্ষীয় রাগরাগিনীগুলি স্বর-ক্ষেত্রে, প্রাণশক্তি-বিশিষ্ট বীজের মত, বিবিধ সুররূপ সৃজন করিয়া

থাকে; এবং স্বরগুলিকে জড়বৎ প্রয়োগের দ্বারা বিলাতী মেলডি কারিগরের খেয়ালানুযায়ী নির্ম্মিত হইয়া থাকে;—উভয়ের মধ্যে এই আসল প্রভেদ। এই কথাটি পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করা যাক।

জীবসৃষ্টি করিতে হইলে ভগবান কোষবিশেষে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষান্ত হন। অবশিষ্ট কার্য্য প্রাণশক্তি নিজগুণে স্বধর্ম্মানুসারে করিয়া লয়। চতুর্দ্দিকের উপকরণ হইতে কিছু বা গ্রহণ, কিছু বা ত্যাগ, কোনটাকে মুখ্য, কোনটাকে গৌণভাবে প্রয়োগ করিয়া, তদ্দ্বারা আত্মার অনুরূপ দেহ প্রস্তুত করে। এক জাতীয় একাধিক জীবের পরস্পারের সহিত যেমন জাতিগত সাদৃশ্য থাকে, তেমনি প্রত্যেকটির ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও থাকে।

প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টির এই সকল লক্ষণ রাগরাগিনীতে দেখা যায়। ওস্তাদবিশেষের যন্ত্রে রাগবিশেষের ব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্যমাত্র লক্ষিত হয়, তাহার জাতিধর্ম্মের উপর গায়ক বা বাদকের কোন প্রভুত্ব থাকে না। যতক্ষণ ধরিয়া, বা যত বড় কলাবতের দ্বারাই কানাড়া আলাপ করা হৌক, তাহা সর্ব্বক্ষণ কানাড়াই থাকিতে বাধ্য। তাহার অন্তর্নিহিত আত্মার প্রভাবে,—তাহার আস্থায়ী বল, অন্তরা বল, তাহার তান বাঁট কর্ত্তব বল,—সকলই সেই কানাড়ার নিয়মে চালিত; কলাবতের গুণে সুরটির দেহ যতই পুষ্ট বা অলঙ্কৃত হৌক, বা উহার দোষে যতই দীনহীন শুষ্ক হৌক, উহার চেহারা সেই কানাড়ারই চেহারা থাকিবে। ইহার ঠাট, বাদী বিবাদী স্বর প্রভৃতি দুই চারিটী বাহ্যলক্ষণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে মাত্র, কিন্তু গুণীর আত্মা ইহার আত্মার দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়া ব্যতীত, কোন লিখিত পঠিত নিয়মের মধ্যে উহা ধরা দেয় না। জীবন্ত জিনিস-মাত্রেরই ন্যায়, রাগরাগিনীকে সংজ্ঞার দ্বারা আবদ্ধ করা যায় না।

অপরপক্ষে বিলাতী মেলডি বিস্তার করা যেন স্বরের মালমসলা লইয়া ইমারৎ গাঁথা। উপযুক্ত কারিগরের হাতে তাজমহলও জন্মিতে পারে, যোগ্যতার অভাবে গঠনহীন স্তূপমাত্র গজাইতে পারে। মেলডি হইল, কি হইল না,—এ কথা কাহারও কাহাকে বলিবার উপায় নাই। তবে বিলাতী-সঙ্গীতের পক্ষে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, হার্মনি সম্বন্ধে ঔৎকর্ষ লাভই য়ুরোপীয় মেলডির এই দশার কারণ।

বিলাতী-সঙ্গীতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, প্রথমে গ্রীস ও রোমের ধর্ম্মযাজকগণ স্তোত্রপাঠে উদাত্ত অনুদাত্ত সূত্রে বিভিন্ন স্বরপ্রয়োগ আরম্ভ করেন। এ রীতি উঁহারা ভারতবর্ষ হইতে পাইয়াছিলেন কি না, সে অনুসন্ধান করিবার সুযোগ পাই নাই। যাহা হৌক, ইহাতে ভাব প্রকাশের সহায়তা উপলব্ধি করিয়া, ক্রমশ স্বরসংখ্যা বাড়াইয়া এই গুলিকে নাটকের রসব্যাখ্যার কাজে লাগান হইল। এই অবস্থায় এই বিদ্যা য়ুরোপের সকল স্থানে ছড়াইয়া পড়িল। গ্রীসীয়রা মাত্র পঞ্চস্বর (চীন ও জাপানের এখনও সেই অবস্থা) জানিত, ক্রমশ সপ্তস্বর আবিষ্কৃত হইল। তথাপি এই চালকে সঙ্গীত না বলিয়া, সুরসংযোগে পাঠ বলাই সঙ্গত।

ইতিমধ্যে, সুরের এই শৈশবাবস্থা পার না হইতেই, আবালবৃদ্ধ বনিতার কণ্ঠস্বর একত্র ব্যবহার করিতে গিয়া, স্বরসন্ধি কখন্ মিষ্ট লাগে, কখন্ কর্কশ শোনায়, সে সকল তত্ত্ব ক্রমশ ধরা পড়িল। সপ্তকান্তরে স্বরের অভেদ, ষড়জে-পঞ্চমে আত্মীয়তা, নিম্ন সপ্তকের পঞ্চমের সহিত ষড়জের মধ্যম-সম্বন্ধ, ষড়জে-গান্ধারে মিত্রতা, প্রভৃতি সম্পর্ক সকল বুঝিয়া ব্যবহার করিবার নিয়মগুলি উদঘাটিত হইতে লাগিল। ক্রমশ এই স্বরসন্ধি ও সুরসংমিশ্রণ, অর্থাৎ সুরের গড়ে'মালা গাঁথার

দিকেই য়ুরোপ মনপ্রাণ ঢালিয়া দিল। কাজেই একহারা সুর বা মেলডি য়ুরোপে চির-শৈশবাবস্থায় রহিয়া গেল।

অনেক কাল হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে বাহ্যপ্রকৃতির নিয়মকে অবলম্বন ও বশ করিয়া দলবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াটাই য়ুরোপের বিশেষ ভাবনা হইয়াছে, ও য়ুরোপীয়গণ তাদৃশী সিদ্ধিও লাভ করিয়াছে। দুদিক একসঙ্গে রক্ষা হয় না, কাজেই অধ্যাত্ম চিন্তা দ্বারা আত্মার শক্তির উদ্দীপনা ও তদনুসারে ব্যক্তিগত জীবনের উৎকর্ষের দিকটা উহাদের চাপা পড়িয়া রহিয়াছে। সঙ্গীত সম্বন্ধেও তাহাই। হার্ম্মনি বিজ্ঞানের নিয়মে আবদ্ধ, যৌথ চেষ্টার বিষয়। উহার ব্যতিক্রমকে আঁক কসিয়া ধরা যায়। অথচ গুণীর গুণপনা দেখাইবার ক্ষেত্রেরও অভাব নাই। সুতরাং ইহাতেই য়ুরোপীয়গণ গীতসুধাপিপাসা মিটাইবার যথেষ্ট রস পাইয়া, অদ্যাবধি ইহাতেই সন্তুষ্ট ছিল। আজকাল এ দেশীয় সঙ্গীতের কিছু কিছু চর্চ্চার ফলে, হার্ম্মনি অপেক্ষা মেলডির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে আলোচনা সুরু হইবার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে।

এতক্ষণে তাহা হইলে গোড়াকার প্রশ্নের স্পষ্ট একটা উত্তর দিবার অবস্থায় পৌঁছান গিয়াছে।

বিলাতী সুর, দেশী রাগের ঠাটে, দেশী মীড়মুর্চ্ছনার নকলে বিন্যস্ত হইলেও তাহা বিদেশী, অর্থাৎ অর্থহীন ও অতৃপ্তিকর, বলিয়া বোধ হয় কেন? কারণ, আমরা রাগরাগিনীর যে-সকল প্রাণের লক্ষণে অভ্যস্ত, তাহা উহাতে পাই না।

অপরপক্ষে দেশী রাগ, অতি-কোমল-প্রভৃতি বা মীড়মুর্চ্ছনাদি বাদ দিয়া, piano যন্ত্রে অতি শাদা করিয়া বাজাইলেও, তাহা য়ুরোপীয়ের

নিকট খাপ-ছাড়া পাগলা-গোছের লাগে কেন? ইংরেজের উত্তর এই—

The effort of thinking away our harmonic perceptions is probably the most violent piece of mental gymnastics in all artistic experience . . . thus our inferences as to the expression intended by music that has not come under European influence are unsafe, and the pleasure we take in such music is capricious.

অর্থাৎ কোন সুরের আরোহণ অবরোহণ যদি হার্ম্মনির নিয়মের সহিত খাপ না খাইল তবে কোন্ সাহসে আমরা (য়ুরোপীয়রা) তাহাকে ভাল বলিতে পারি?

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মৈত্র মহাশয় যখন সবুজপত্রে সোদাহরণ প্রবন্ধের ফ্যাশান তুলিয়াছেন তখন আমিও একটি উদাহরণ দিই।

ভারতবাসীর মনে কোন ভাব উদয় হইলে তাহার প্রকাশের পক্ষে তাহার কত সুবিধা, দেশের চিরসঞ্চিত ভাব-ঐশ্বর্য্যের কত শত ভাণ্ডার তাহার পক্ষে অবারিত। স্নেহ প্রেম দয়া সখ্য বাৎসল্যই হৌক, পূর্ব্ব-রাগ অনুরাগ মান অভিমান আদর আবদারই হৌক, যে যেমন রস চাহে, তাহার আদর্শ, সাহিত্যে, গানে, চারিদিকে ছড়াছড়ি। কোন ভাবকে যদি সঙ্গীতে তর্জ্জমা করিতে হয় তবে ইষ্টরাগ স্মরণ করিবামাত্র তন্মধ্যে পদে পদে নিয়মের সহায়তা ও স্বেচ্ছায় বিচরণের সুযোগ ত পড়িয়াই রহিয়াছে। সুতরাং সামান্যমাত্র রসজ্ঞান থাকিলে চলনসই গান বাঁধা কিছু শক্ত কথা নহে।

কিন্তু য়ুরোপীয় প্রেমিক যদি তাহার অস্ফুট আবেগের তাড়নায় রাত্রিযোগে বেহালা-হস্তে প্রেয়সীর জানালার নীচে উপস্থিত হইয়া সঙ্গীতের সাহায্যে মনোভাব জ্ঞাপনের ইচ্ছা করে, তবে সে মহা ফাঁপরে পড়িয়া যায়! সে একা বেহালার সাহায্যে হার্মনি আর কতই বা ফলাইবে। কাজেই এ ক্ষেত্রে মেলডি তাহার ভরসা। অথচ কোন্ স্বর কোনটির পর কেন সন্নিবিষ্ট হইবে, তাহার কোন বিধি তাহার আয়ত্ত নাই। যে স্বরবিন্যাসের সহিত হার্মনি চলে না তাহা অবিধেয়, এই এক মাত্র নিষেধ তাহার সম্বল।

কল্পনা করা যাক অবশেষে মরিয়া হইয়া উক্ত প্রেমিক যুবকটি গলা ছাড়িল। অন্য হিসাব অভাবে সা-সুরে সুরু করাই স্বাভাবিক। সামনে রে ও গা পড়িয়া আছে, কাজেই না ভাবিয়া চিন্তিয়া সে পর্য্যন্ত পা বাড়ান যাইতে পারে। এ ভাবে সে ব্যক্তি প্রথম ছত্র সারিয়া ঘরে ফিরিয়া হাঁপ ছাড়িল, যথা—

॥ সা সা রা। গা - । - ।।
I want no stars * *
। গা গা গা। রা - । সা।
in heaven to guide * me

কিন্তু রচনাটি কেমন মিন্ মিন্ করিতে লাগিল। আবেগের মাত্রা আর একটু চড়াইতে না পারিলে তাহা কি জানলার ও ধারে পৌঁছিয়া আশানুরূপ ফল ফলিবে? চড়ার কথা মনে হওয়াও যা, গা হইতে মা পর্য্যন্ত উঠিবার সঙ্কল্পের তেমনি উদয়। সুতরাং দ্বিতীয় ছত্র এই আকার ধারণ করিল—

। সা রা গা। মা - া - া। মা মা গা। রা - া - া।

I need no moon * * no sun to shine * *

যুবককে আর পায় কে ? হিসাব ত মিলিয়াছে। আবেগ চড়াইতে হইলে সুর চড়াও! প্রেমিক আর ভয়ে ভয়ে পা না ফেলিয়া এক লম্ফে পঞ্চমে চড়িল এবং স্ফূর্ত্তির চোটে ডাইনে বাঁয়ে, ধৈবতে কড়ি মধ্যমে, একটু হাত পা খেলাইয়াও লইল।

। পা পা ধা। পা হ্মা পা।

While I have you, sweet heart

। - া - া ধা। পা - া পা।

* * be side * me

ছত্রে ছত্রে সাহস বাড়িতেছে! প্রথমে গা পর্য্যন্ত পা বাড়াইয়া দ্বিতীয় পাল্লা দিবার আগে সুর্ সুর্ করিয়া সা-এ ফেরা আবশ্যক হইল। দ্বিতীয় ক্ষেপে রে পর্য্যন্ত ফিরিতেই ভয় ভাঙ্গিল। তৃতীয় বারে নির্ভয়ে টঙে চড়িয়া বাঁশ-বাজি! যাহা হৌক, এত উচ্ছ্বাসের পর কাজ উদ্ধার না হইয়া যায় না এই ভরসায় প্রেমিক গদগদ চিত্তে সা হইতে গা-এ, গা হইতে সা-এ নাচিতে নাচিতে নামিয়া পদ শেষ করিল।

। - া মা সা। গা - া - া। সা গা রে। সা—া—া॥

* While I know, that you are mine.

স্বরলিপিতে যেমন আছে গানটি অবিকল তাই; লেখাতে কোন ছোটখাট খোঁচও বাদ পড়ে নাই। তদুপরি বিস্তর দরদ দিয়া কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া বেহালার লম্বা লম্বা টান্ হার্মনির সঙ্গৎরূপে সঙ্গে চলিল। আমরাও এ গান ঐ ভাবে এসরাজ বাজাইয়া গাহিবার

চেষ্টা করিলে সম্ভবত গলা ও যন্ত্র দুই কাঁপিয়া যাইবে, কিন্তু সে অন্য রসে।

গ্রামের প্রথম তিনটি স্বর শুনিয়া যদি দেশী গায়কের মনে ভূপালির রূপ আসিয়া গেল, তবে সুরটি এক গমকে তার এক্তিয়ার হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া, ষড়জে শিকড় গাড়িয়া, বাদীর দিকে ঝুঁকিয়া, বিবাদী বাঁচাইয়া, একটি সম্পূর্ণ চক্র সমাধা করিয়া, স্বস্থানে ফিরিবে; এবং সেই গতির দ্বারাই স্বীয় জীবনের প্রথম আশ্রমের চেহারা চিহ্নিত করিয়া দিবে—

॥ সা-রা গা গাঁ। গপা পা গা গা। রে রে সা-ধা। সা-রা গা-া ॥

ইহাতে অর্থযুক্ত শব্দ লাগাইলেও হয়, সার্গম দিয়া গাহিলেও হয়, শুধু বাজাইলেও হয়; ইহার জগৎ-জোড়া অর্থ হইতে যে শোনে ও যে শুনায়, উভয়ে নিজ নিজ মনোমত অর্থ গ্রহণ করিয়া তৃপ্তিলাভে সমর্থ হইবে। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে পুরুষের গঠন রেখার তেজ, নারীর লাবণ্য বা শিশুর কোমলতা analytical conicsএর বীজগণিত লিপির দ্বারা প্রকাশের বৃথা চেষ্টার ন্যায় স্বরলিপিতে রাগের লজ্জৎটুকু কিছুই ধরিয়া দেওয়া গেল না, পৃথক পৃথক লিখিত স্বরগুলির ফাঁকে ফাঁকে কত অগণ্য শ্রুতির কত সূক্ষ্ম খেলা, লেখার অতীত হইয়া, বাদ পড়িয়া গেল।

যে দুইটি সুরখণ্ডের নমুনা দেখাইলাম উভয়ই স্বর-গ্রামের প্রথম অংশ মাত্র অবলম্বনে বিনা অলঙ্কারে অতি শাদাভাবে গঠিত, তথাপি সৃষ্টি ও নির্ম্মানের মধ্যে যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ তাহা বাক্যের দ্বারা অবর্ণনীয় হইলেও সমজ্‌দারের কানে এ দুয়ের মধ্যে স্পষ্টই বিদ্যমান।

(৩) হার্ম্মনির সার্থকতা।

গোড়ায় যখন স্বীকার করিয়া ফেলিয়াছি যে কোন কোন বিলাতী সঙ্গীত রচনা আমি মস্‌গুল হইয়া শুনি, তখন উপসংহারে পাঠক কৈফিয়ৎ চাহিতে পারেন যে, তাহাতে আমি কোন্ রস পাইয়া থাকি। অতএব সে বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক।

মানুষকে আত্মা ও সংসার দুই লইয়াই কারবার করিতে হয়। মানব-আত্মা লৌকিক হিসাবে সংসারী, আধ্যাত্মিক হিসাবে পর-মাত্মার অভিন্ন অংশ। নিজ প্রকৃতি অনুসারে আত্মা সরল ও গুহ্য বা গভীর। কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রে, প্রকাশের বৈচিত্র্যের মধ্যে, উহাকে নানা সম্বন্ধের সাহায্যে নানা বিরোধের সমন্বয় করিয়া চলিতে হয়।

একহারা রাগরাগিনী, সেইজন্য, আধ্যাত্মিক ভাবের প্রকাশের উপায় বা মূর্ত্তিস্বরূপ। লৌকিক ভাবের ক্ষেত্রে তাহার ব্যবহার থাকিলেও তাদৃশ উপযোগিতা নাই।

সংসারের বিচিত্র জটিল বেদনা ও সৌন্দর্য্যের উপযুক্ত চিত্রাঙ্কন হার্ম্মনির দ্বারাই সম্ভব, এবং আমি উচ্চ অঙ্গের হার্ম্মনির সঙ্গীতে তাহাই পাইয়া থাকি। হার্ম্মনির নিয়মে জড়িত বিজড়িত সুর-গুলিতে পরস্পরের সহিত বিরোধ ভঞ্জনার্থে প্রত্যেকটির নিজস্ব অনেকটা খর্ব্ব, মিলিত-সৌন্দর্য্য বিধানার্থে ব্যক্তিগত সৌন্দর্য্য অনেকটা পরিহার করিয়া চলিতে হয়, অথচ সকলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াও মধ্যে মধ্যে এ সুর ও সুর নিজমূর্ত্তি বিকাশের সুযোগ হইতে একেবারে বঞ্চিত হয় না। এইরূপ হার্ম্মনির যৌথ সঙ্গীতের দ্বারা সুমহান সংসার স্রোতের ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীল অনিত্যতার সৌন্দর্য্য

গুণীর হাতে কিরূপে প্রকাশ ও ব্যাখ্যা হইয়া থাকে, তাহা একবার বুঝিতে শিখিলেই মুগ্ধ হইতে হয়।

রাগরাগিণীও বুঝিতে শিখিতে হয়, হার্মনিও বুঝিতে শিখিতে হয়; যে কোন উচ্চ অঙ্গের কলা হৌক তাহার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি না লাভ করিতে পারিলে তাহার রস-ভোগের অধিকার জন্মায় না। এ জন্য প্রথম শ্রুতিতে কটু বা নিরর্থক বোধ হইলেও অনভ্যস্থ কোন সঙ্গীত-কলাকে উপেক্ষা বা ঘৃণা করা সঙ্গত নহে। য়ুরোপীয়গণের নিকট আমাদের সঙ্গীত সেই-রূপই শ্রুতিকটু ও দুর্ব্বোধ হইলেও তাহারা উহার চর্চ্চা আরম্ভ করিয়াছে; আমরাই বা পিছপাও হই কেন?

এইরূপে, দেশী বিলাতী সঙ্গীতের নিজস্ব বিহারক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইলেও, উভয়ের একটি মিলনের স্থান থাকাও অসম্ভব নহে। আকাশ-কম্পন যখন সঙ্গীত-ধ্বনি আকারে অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মার মধ্যে অনুকম্পন জাগায়, তখন লৌকিক অলৌকিক দুই দিকেই তাহার প্রসার স্বতেও তাহা মূলে ত একই।

Beethovenএর Moonlight Sonata দ্বিপ্রহরের ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্রের মধ্যে উপভোগ করিতে করিতে তাহাতে সারং রাগের আধ্যাত্মিক রস পাইয়াছি। নাটকের মধ্যে রাগ রাগিণীর সামান্য ও বিশেষ লৌকিক ভাব প্রকাশের ক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি। আমাদের বৈষ্ণব কবিদের অনেক পদে এই লৌকিক অলৌকিকের বেমালুম সম্মিশ্রণ দেখিয়া এই উভয়ভাবের মিলন ক্ষেত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু সঙ্গীত সম্বন্ধে ইহাতেই বা ভয় পাইবার কারণ কোথায়?

সঙ্গীতে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হইলে তাহা দোষের হইতেই হইবে এমন কি কথা আছে? যদিও তাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কমই হয়, তাহাতে মূল সঙ্গীতদ্বয় যেমন ছিল তেমনিই থাকিবার বাধা কি?

উপসংহারে বোম্বাই অঞ্চলে প্রচলিত একটী সঙ্কর-সঙ্গীতের (অর্থাৎ সংস্কৃত পদে বিলাতী সুর বসান গানের) নমুনা দিয়া শেষ করি—

॥ সা গা সা গা । সা গা ম গা র সা ।
ম ন্দং ম ন্দং বা য়ৌ বি-চ ল তি

। ন্া রা ন্া রা । ন্া রা গ রা স ন্া ।
নী রে শী তে স্ব চ্ছে নিব হ তি

। সা গ গা স সা গা । স রা গ মা পা - া ।
গু ঞ্জ তি ভৃ ঙ্ গ চ ল তি সু খং *

। প মা গ রা প মা গ রা । সা সা সা - া ॥
ম ন সি জ ম ধু শ রঃ মু ক্তঃ কঃ *

। র্সা ন ধা পা মা । গা মা পা ধ না । র্সা ন ধা পা মা ।
শী ত ক রেঽস্মিন পি য়ু ষং ন ব প ঙ্ক জ নে ত্রে

। গ মা গ মা রা - া । র্সা ন ধা পা মা । গা মা পা - া ॥
ল ঘু ব ম তি * মা ধ ব মা সে স ম্প্রাপ্তে *

। প মা গ রা প মা গ রা । সা সা সা - া ॥
ম ন সি জ ম ধু শ রঃ মু ক্তঃ কঃ *

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপ্নহার *

——:০:——

(১)

রাজার দূরবিস্তৃত ফুলের বাগান যেখানে শেষ হয়ে মস্ত বন আরম্ভ হয়েচে, সেইখানে ছেলেটি দাঁড়িয়েছিল। তার পরিচ্ছদের অবকাশ দিয়ে চাঁদের কিরণ তার বুকের উপর, তার অনাবৃত হাত পায়ের উপর পড়াতে তার স্বাভাবিক গৌরবর্ণ আরও শুভ্র দেখাচ্ছিল। কালো কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের ছায়াতে তার মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। তার হাতে ছিল কতগুলি শিশির-ভেজা গোলাপ, যুঁই আর রজনীগন্ধা—সেগুলো সে রাজার বাগান থেকে সঞ্চয় করেছিল। তার পিছনে ঘন নীল বন, তার মাথার উপরে তরল নীল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত আকাশে অসংখ্য তারা—কিন্তু সে দিকে তার চোখ ছিল না। সে দেখ্‌ছিল তার সামনে দূরে পরীদের প্রাসাদের মত রাজার বাড়ী। সে বাড়ীর হাজার জানালায় হাজার রঙের বাতি জ্বল্‌ছিল—কোনটি লাল, কোনটি গোলাপী, কোনটি বা সোনালী। সে ভাবতে লাগল স্বপ্নে যা অনেক দিন দেখেছি আজ তা জেগে দেখলুম। তার মন বিস্ময়ে কেবলি বলতে লাগল—কি আশ্চর্য্য কি আশ্চর্য্য। তাকিয়ে তাকিয়ে তার চোখে জল এল, আর তার

* Richard Middleton এর Children of the Moon অবলম্বনে লিখিত।

জলভরা চোখের সামনে সেই আলোর মালা যেন নাচতে লাগল। আকাশের কোন কোণে যেন একটা পাখী ডাকছিল—কিন্তু সে গান তার কানে ঢুকল না; লম্বা লম্বা ঘাসের ভিতর দিয়ে খরগস-গুলো ছুটে পালাচ্ছিল কিন্তু তাদের পায়ের শব্দ সে শুনতে পেল না। সে যেন দূরাগত কোন বাঁশীর তান আকণ্ঠ ভরে পান কর্‌ছিল। সেই তানের তালে তালে তার হাতের ফুলগুলো দুলতে লাগল, তার বুক নাচতে লাগল।

বালক পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটী যখন এল সে জানতেও পারলে না। মেয়েটী খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইল তারপর আস্তে ডাকলে বন-দেব—সে এত আস্তে যেন মনে হল পাশের বেলফুলের গাছটী শিউরে উঠে চঞ্চল বাতাসকে ফিরে ডাকলে। বালকের একবার সন্দেহ হল সত্যি কেউ ডাকলে কিনা, তার পরে ফিরে মেয়েটীর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল—দেখতে পেল তার উত্তেজিত ছোট মুখখানি আর তার ফিকে নীল রঙের শাড়ীটি। বালক জিজ্ঞেস কর্‌লে তুমি কি পরী? মেয়েটী বল্লে না আমি বাণী, আর তুমি কি বনদেবতাদের ছেলে? বালক সে কথার কোন উত্তর দিলে না। সে বাণীকে দেখতে লাগল—সে ভাবতে লাগল এই চাঁদের কণার মত সুন্দর, ফুলের মত কোমল মেয়েটী কোথা থেকে হঠাৎ এখানে এল। গাছ থেকে যেমন ফুলটী পড়ে এ যেন আকাশ থেকে তেমনি করে পড়ল। বাণী বল্লে আমি পরী দেখতে এসেছি—ঐ যে বন দেখ্‌ছ ওর ভিতর একটা পরিষ্কার জায়গা আছে সেখানে ঘাসের উপর কত রঙের ফুলই যে ফুটেছে! সেখানে আমি দিনের বেলায় গেছি, ঠিক মনে হ'ল পরীরা আমাকে দেখে গাছের তলা দিয়ে

কোথায় পালিয়ে গেল। আজ রাত্রে গাছের আড়াল থেকে চুপি চুপি তাদের দেখব। তারা কেউ টেরও পাবে না—তুমি যাবে ভাই ? বালক মাথা নেড়ে ইঙ্গিত কর্‌ল সেও যাবে। সে কথা কইলে না—বাণীর সাথে কথা কইতে তার ভয় হচ্ছিল। আলো ও ছায়া খচিত বনের সরু পথ দিয়ে তারা পাশাপাশি চলতে লাগল বালকের হাতের ফুলগুলির ঠাণ্ডা পাপড়িগুলি একেকবার বাণীর চুলে, গালে লাগতে লাগল, সে বালকের দিক ফিরে শুধু একটুখানি হাসলে।

(২)

বাণী জিজ্ঞাসা কর্‌লে আমি যখন তোমাকে ডাকলুম তখন তুমি কি দেখছিলে ভাই ? বালক বল্‌লে পরীদের বাড়ী। বাণী হেসে বল্লে না, না সে পরীদের বাড়ী নয় সে আমাদের বাড়ী। বালক কম্পিত বক্ষে আবার তার দিকে তাকালে। ভাবল তবে বুঝি এই সুন্দর মেয়েটী পরীদের রাণী। যেতে যেতে বনের ভিতর একটা জলাশয়ের ধারে তারা উপস্থিত হ'ল। গভীর কালো জলের, শাদা শাদা বুদ্বুদের উপর চাঁদের আলো ঝিক্‌মিক্‌ কর্‌ছিল। বাণী বল্‌লে এইখানে পরীরা নায়। তুমি সাঁতার কাটতে পার ? বালক উত্তর কর্‌লে—না। বাণী বল্‌লে যদি জান্‌তে ত বেশ হ'ত পরীদের মত আমরাও এখানে নাইতুম। সেখান থেকে তারা, পরীরা যেখানে নাচে সেখানে গেল। সেখানে চারিদিকে গাছের মাঝখানে খোলা জায়গায় জ্যোৎস্নার জোয়ার আটকা পড়ে গেছে। তারা চুপ করে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াল। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো

তাদের মাথায় তাদের গায়ে এসে পড়ল। কিছুক্ষণ পরে বাণী ফিস্-ফিস্ করে বল্‌লে—তোমার যদি ইচ্ছে করে আমার হাত ধরতে পার। বালক হাতের ফুলগুলি ফেলে দিয়ে বাণীর হাতখানি তার মুঠোর মধ্যে নিলে। সে টের পেল তার হাতের ভিতর বাণীর ছোট্ট হাতটী আবেগে কাঁপছে। বাণী বল্লে আমার একটুও ভয় কর্‌ছে না। তারা চুপ করে অপেক্ষা কর্‌তে লাগল। এমন সময়ে একটি লোক হঠাৎ গাছের তলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এল, তার বড় বড় কালো চুল আর তার কাঁধে একটী ঝুলি। বাণী প্রায় চেঁচিয়ে উঠ্‌ছিল কিন্তু বালক নিজের অজ্ঞাতসারে তার হাতটী শক্ত করে ধরাতে সে সাহস পেল। বালক আগন্তুককে জিজ্ঞেস কর্‌লে—তুমি কে? লোকটীও তাদের সেখানে দেখে প্রথমটা আশ্চর্য্য হয়েছিল। সে বল্লে—তোমরা এত রাত্রে এখানে কি কর্‌ছো? তার গলার স্বরে একটা স্নিগ্ধতা ও আশ্বাসের সুর ছিল। বাণী বল্লে আমি পরী দেখতে এসেছি। লোকটী ছেলেটীর দিকে ফিরে বল্লে তুমিও কি পরী দেখতে এসেছ নাকি—ফুল দেখছি যে! তুমি ফুল তুলছিলে বুঝি—বেচবে নাকি? ছেলেটী বল্‌লে না আমার বোনের জন্য ফুল তুলেছি।

—তোমার বোন কি ফুল খুব ভাল বাসে?

—বালক কহিল, হ্যাঁ—কিন্তু সে বেঁচে নেই। লোকটী থম্‌কে বালকের মুখের দিকে একবার তাকালে তারপর যেন আপন মনে বল্লে—কথা! এই বয়সে কথা গাঁথতে শিখেছে? কথার গোলামির মত শাস্তি আর নেই—হ্যাঁ ভাই তোমায় কে শিখিয়েছে যে যারা মরে গেছে তারা ফুল ভালবাসে। বালক কোন উত্তর দিল

না; বাণী জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি খুঁজতে এসেছ তাত আমাদের বল্লে না। লোকটী নীরবে একটু হেসে চারদিকে তাকাল, যেন তার ভয় হ'চ্ছিল পাছে তার গোপন কথাটী কেউ শুনতে পায়, তার পরে বলল—স্বপ্ন। বাণী তার কথাটি বুঝতে পারলনা—ভ্রু তুলে জিজ্ঞেস করল—আর তোমার ঝুলিতে? লোকটী উত্তর করলে-ওতে আমার স্বপ্ন। তারা সতৃষ্ণ নয়নে সেই ঝুলিটা দেখতে লাগল। মেয়েটীর ইচ্ছা করতে লাগল ঝুলিটার মুখ খুলে দেখে কি রকম স্বপ্ন। সে বললে তোমার স্বপ্নগুলো কি রকম দেখতে? লোকটী বললে—তোমার স্বপ্নের মত, এর স্বপ্নের মত। কিন্তু, বোন, যারা জীবনে সুখী হ'তে চায় তারা ত ও দেখতে চায়না। তার চেয়ে তোমরা চুপ করে আমার পাশে বস, আমি বাঁশী বাজাচ্ছি শোন। তারা ঘাসের উপর বসে পড়ল। লোকটী তার ঝুলির ভিতর থেকে একটী বাঁশী বের করে বাজাতে লাগল। তাদের মনে হ'ল যেন বাঁশীতে ফুঁ দেওয়া মাত্র তার ফাঁক দিয়ে একটী পরী বেরিয়ে পড়ল আর তাদের চারদিকে ঘুরে ফিরে নাচতে লাগল। চাঁদের আলোতে সে পরীর বসন একবার আকাশের মত নীল, একবার কচি ঘাসের মত সবুজ, একবার ডালিমের মত লাল দেখাতে লাগল—আর প্রতিধ্বনি গুলো যেন ছোট ছোট পরীর মত তাদের শাদা শাদা পায়ে ছুটোছুটি করে বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে সেই নাচে যোগ দিতে লাগল। বাণী তার ডাগর চোখ আরও ডাগর করে বাঁশীর তান শুনছিল। বালক নিশ্চল হয়ে ছিল, যেন তার বুকের স্পন্দনও থেমে গিয়েছিল। তারপর যখন সুরের পরীটি শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল আর প্রতিধ্বনি গুলি রুদ্ধশ্বাস হয়ে বনের ভিতর ফিরে গেল তখন সেই লোকটি বাঁশীটি

নামিয়ে জিজ্ঞেস কর্‌ল,—কেমন ভাই কেমন লাগল তোমাদের। বাণী খুসী হয়ে বলিল বেশ লাগল............উঃ আমার হাতে লাগচে—তুমি এমন চেপে ধরেছ। বালক হাত ছেড়ে দিল খানিকক্ষণ তারা তিনজন স্থির হয়ে বসে রইল তারপরে বালক বলে উঠল—দেখেছ আজ রাত্রে এত জ্যোৎস্না মিছে নষ্ট হচ্ছে—এ ঘাস গুলো পর্য্যন্ত জোৎস্নায় ভিজে উঠেচে। লোকটি বল্‌লে ভাই,—তোমাকে আমার ঝুলি দেখাব না ভেবেছিলুম কিন্তু তোমার কথা শুনে আমার মনে হচ্ছে আমার স্বপ্ন দেখলে তোমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। লোকটি ঝুলির মুখের দড়ি খুলতে লাগল আর বাণী ঝুঁকে তার ভিতরে কি আছে দেখবার চেষ্টা কর্‌তে লাগল। ঝুলির ভিতর হাত দিয়ে সে একটি একটি স্বপ্ন তুলে দেখাতে লাগল—কোনটি পোখরাজের মত শুভ্র, যেন চোখের জল জমাট বেঁধেছে, কোনটি চুনির মত লাল, যেন বুকের রক্ত দিয়ে রঙান, কোনটি নীল যেন আকাশের নীল চুরি ক'রে তাই দিয়ে তৈরী, কোনটি পান্নার মত সবুজ। বাণী বল্লে—এ দিয়ে তুমি কি কর্‌বে? লোকটি বল্লে—মালা গাঁথব। বাণী বল্লে—সে মালাটি আমাকে দিও।

লোকটি বল্লে—না বোন এ মালা দিয়ে তুমি কি কর্‌বে? বালককে দেখিয়ে বল্‌লে এর চাইতে ভাল মালা এ তোমাকে একদিন গেঁথে দেবে—বাণী উৎসুক ভাবে বালকের মুখের দিকে তাকাল। বালক বল্লে—আমি ভাবছি এমন মালা আমি গাঁথতে পারব কিনা। লোকটি বল্‌লে—পারবে ভাই, পারবে—তোমার কাছে জিনিস আছে গেঁথে দিলেই হয়—বাণীর চিবুক তুলে বল্লে,—দেখত কেমন গ্রিবাটি তোমার মালা বেশ মানাবে। বালক সলজ্জভাবে চেয়ে দেখল

বাণীর গলাটি অতি সুন্দর। তারপর সেই লোকটি তার ঝুলি বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল তাদের দুজনকার হাত ধরে বল্‌ল চল এবার আমি তোমাদের বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসি, অনেক রাত হয়ে গেছে।

(৩)

বনের বাইরে যখন তারা এসে দাঁড়া'ল বাণী ছেলেটাকে বল্‌লে তুমি হচ্ছ বনদেবতাদের ছেলে কিনা, তাই তোমার আমাদের বাগানের সীমানার এদিকে আসা উচিত না......মালীরা যদি তোমায় দেখে তবে ধরে বন্ধ করে রাখবে এই বলে সে চলে যাচ্ছিল ফের ফিরে এ'ল। বালকের সামনে এসে বল্‌ল......যদি তোমার ইচ্ছে করে আমাকে একটা চুমো খেতে পার। বালক নড়লনা। চুপ করে বাণীর দিকে তাকিয়ে রইল। বাণী হেসে উঠল—যেন রূপোর ঘণ্টা বেজে উঠল, তারপর ছেলেটার গালে তার চাঁপার মত আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে বল্‌লে—ওগো বনদেবতার ছেলে, তুমি ভাই একটা পাগল। তার পরে ছুটে বাগানের পথ দিয়ে ওধারে অদৃশ্য হয়ে গেল। লোকটা জিজ্ঞাসা করল্‌—তুমি চুমো খেলে না কেন? বালক বল্‌লে ওর চুমো আমাকে দগ্ধ করে দিত। লোকটি বল্‌লে ভাই তুমি লোকালয়ের কাছে এসেছ এবার তুমি নিজেই যেতে পার। আমার বাড়ী অনেক দুর, আমি এখন বিদায়। আমার এই বাঁশীটি তোমাকে দিলাম। কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিচ্ছি এই যে আকাশ দেখ, জ্যোৎস্না দেখ, ফুল দেখ, এর পিছনে এক মায়াবিনী আছে, সে যাকে অনুগ্রহ করে তার সর্ব্বনাশ হয়। একবার তাকে

দেখলে রক্ষা নেই। কোন অবকাশে সে যে ভাল মানুষকে পাগল করে তার ঠিক নেই—হয়ত বা ফুলের গন্ধে উড়ে আসে, হয়ত বা দখিনে বাতাসে ভেসে আসে। সে যখন আসে তখন পৃথিবী তার সমস্ত পত্রপুষ্প নিয়ে তার ছয় ঋতু নিয়ে তার মোহিনী শক্তি বাড়িয়ে তোলে—বর্ষা যেন তার এলোচুলের কালো ছায়া, শরৎ যেন তার সোনালি মদের নীল পাত্র। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সে তোমায় দেখা দিয়েছে। যদি বুদ্ধিমান হও তবে জ্যোৎস্না রাতে বেড়াতে বেরিও না—পরী দেখবার আশায় বনে বনে ঘুরোনা কারণ পরী নেই রাজার মেয়ের সাথে ফুলবাগানে একাকী দেখা করো না কারণ সে হচ্ছে রাজার মেয়ে, আর তুমি..............

—আমি গরীবের ছেলে—কিন্তু আমি একদিন এমন মালা গাঁথব যে............

—হায়রে সেই এক ভুল.........সবারই এক ভুল—মায়াবিনী এত কচি বয়েসে তোমাকে দেখা দিয়েছে যে তোমাকে বাঁচাবার চেষ্টা বৃথা। আসি ভাই—আবার এমনি রাতে বনের ভিতর একদিন দেখা হবে।

বালক দেখল, তার সঙ্গী ক্রমে ক্রমে গাছের নীচ দিয়ে অন্ধকার বনের মধ্যে চলে যেতে লাগল। একটা জায়গায় গাছের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো তার মাথার উপরে এসে পড়ল, তার স্বপ্নের ঝুলিটীর উপর এসে পড়ল। তারপর অন্ধকারে আর তাকে দেখা গেল না।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

প্রাণ ও মরণ।

——:০:——

ধরার উরসপরে যেই দিন জনমিল প্রাণ,
নির্ব্বিকার অচল সমান,
নাই তার খেলার দোসর
নাই কর্ম্ম নাই অবসর
চুপি চুপি মুখে দিয়া চুম,
মৃত্যু তার ভাঙিল সে ঘুম।
তারপর ছুটে ছুটে প্রাণের একান্ত পাশাপাশি,
অলক্ষিতে বাজাইছে বাঁশী,
নিয়ে তারে দূর হতে দূর ;
মরণেরি বাঁশরীর সুর,
বাসনা আকারে ফুটি ফুটি
প্রাণের স্তব্ধতা দেয় টুটি।
এতটুকু ছোট প্রাণ শিহরিয়া জেগে উঠিবার
যে মুহূর্ত্তে পেল অধিকার,—
প্রণয়ের গভীর আবেগ,
সুনিবিড় আলিঙ্গন বেগ,
উরসের অধীর কম্পন,
কোথায় করিবে সম্বরণ!

মৃত্যু তাই দিনমান পরাণের পাশাপাশি রয়,
অগোচরে তারে করি' লয়,
ছোট ছোট পরশন দিয়া,
আলসের আবেশ ভাঙিয়া,
পরিপূর্ণ সমর্থ সবল ;
তারপর,—সন্ধ্যার তরল—
—আঁধার সাগরে তারে নিরিবিলে করাইয়া স্নান
তীরে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তিমান
বাহু দু'টী পসারে মরণ,
ভয়াতুরে করিতে বরণ।
প্রাণের পলকহীন আঁখি
মৃত্যু তারে বুকে রাখে ঢাকি।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

সনেট।

——ঃ০ঃ——
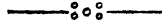
তব দেহশ্লিষ্ট গুরু বসন কাষায়
গোপন করিতে নারে যৌবন হিল্লোল।
সবাস্প নয়ন কোণে, কটাক্ষ বিলোল
চকিতে বেকত করে, ভেদি কুয়াশায়,
হৃদয় আকাশ বহ্নি, আলোর ভাষায়।
শৈবালে আবৃত তব হৃদয় পল্বল,
বৃথায় লুকাতে চায় প্রাণের কল্লোল।
নিরাশার ছদ্মবেশে ঢাকিয়া আশায়॥

শ্রাবণে নদীর বক্ষ আবেগে চঞ্চল।
সংযত করে কি তারে সন্ধ্যার অঞ্চল?
বায়ুর পরশ বিনে তাহার অন্তরে,
অবাধ্য যৌবন তোলে রসের তরঙ্গ;
অস্তের গৈরিক-রক্ত বহির্বাস পরে'
ব্যক্ত করে হৃদয়ের উদয়ের রঙ্গ॥

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

জাপানের পত্র।

———:০:———
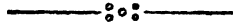
যেমন-যেমন দেখ্‌চি তেমনি-তেমনি লিখে যাওয়া আর সম্ভব নয়। পূর্ব্বেই লিখেচি, জাপানীরা বেশী ছবি দেয়ালে টাঙায় না, গৃহসজ্জায় ঘর ভরে ফেলে না। যা তাদের কাছে রমণীয়, তা তারা অল্প করে দেখে; দেখা সম্বন্ধে এরা যথার্থ ভোগী বলেই, দেখা সম্বন্ধে এদের পেটুকতা নেই। এরা জানে, অল্প করে না দেখলে পূর্ণ পরিমাণে দেখা হয় না। জাপান-দেখা সম্বন্ধেও আমার তাই ঘট্‌চে;—দেখবার জিনিস একেবারে হুড়মুড় করে চারদিক থেকে চোখের উপর চেপে পড়চে;—তাই প্রত্যেকটিকে সুস্পষ্ট করে সম্পূর্ণ করে দেখা এখন আর সম্ভব হয় না। এখন কিছু রেখে কিছু বাদ দিয়ে চল্‌তে হবে।

এখানে এসেই আদর অভ্যর্থনার সাইক্লোনের মধ্যে পড়ে গেছি; সেই সঙ্গে খবরের কাগজের চরেরা চারিদিকে তুফান লাগিয়ে দিয়েচে। এদের ফাঁক দিয়ে যে জাপানের আর কিছু দেখব, এমন আশা ছিল না। জাহাজে এরা ছেঁকে ধরে, রাস্তায় এরা সঙ্গে সঙ্গে চলে, ঘরের মধ্যে এরা ঢুকে পড়তে সঙ্কোচ করে না।

এই কৌতূহলীর ভিড় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে, অবশেষে টোকিয়ো সহরে এসে পৌঁছন গেল। এখানে আমাদের চিত্রকর বন্ধু য়োকোয়ামা

টাইস্কানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলুম। এখন থেকে ক্রমে জাপানের অন্তরের পরিচয় পেতে আরম্ভ করা গেল।

প্রথমেই জুতো জোড়াটাকে বাড়ির দরজার কাছে ত্যাগ কর্‌তে হল। বুঝলুম জুতো জোড়াটা রাস্তার, পা জিনিসটাই ঘরের। ধুলো জিনিসটাও দেখলুম এদের ঘরের নয়, সেটা বাইরের পৃথিবীর। বাড়ির ভিতরকার সমস্ত ঘর এবং পথ মাদুর দিয়ে মোড়া, সেই মাদুরের নীচে শক্ত খড়ের গদি; তাই এদের ঘরের মধ্যে যেমন পায়ের ধুলো পড়ে না, তেমনি পায়ের শব্দও হয় না। দরজাগুলো ঠেলা দরজা, বাতাসে যে ধড়াধ্বড় পড়বে এমন সম্ভাবনা নেই।

আর একটা ব্যাপার এই,—এদের বাড়ি জিনিসটা অত্যন্ত অধিক নয়। দেয়াল, কড়ি, বরগা, জানলা, দরজা, যতদূর পরিমিত হতে পারে, তাই। অর্থাৎ বাড়িটা মানুষকে ছাড়িয়ে যায় নি, সম্পূর্ণ তার আয়ত্তের মধ্যে। এ'কে মাজা ঘষা ধোওয়া মোছা দুঃসাধ্য নয়।

তারপরে, ঘরে যেটুকু দরকার, তা ছাড়া আর কিছু নেই। ঘরের দেয়াল মেঝে সমস্ত যেমন পরিষ্কার, তেমনি ঘরের ফাঁকটুকুও যেন তক্‌তক্‌ কর্‌চে, তার মধ্যে বাজে জিনিসের চিহ্নমাত্র পড়ে নি। মস্ত সুবিধে এই যে, এদের মধ্যে যাদের সাবেক চাল আছে, তারা চৌকি টেবিল একেবারে ব্যবহার করে না। সকলেই জানে চৌকি টেবিল-গুলো জীব নয় বটে, কিন্তু তারা হাত-পা-ওয়ালা। যখন তাদের কোনো দরকার নেই, তখনো তারা দরকারের অপেক্ষায় হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। অতিথিরা আস্‌চে যাচ্চে, কিন্তু অতিথিদের এই খাপগুলি জায়গা জুড়েই আছে। এখানে ঘরের মেঝের উপরে মানুষ বসে, সুতরাং যখন তারা চলে যায়, তখন ঘরের আকাশে তারা

কোনো বাধা রেখে যায় না। ঘরের একধারে মাদুর নেই, সেখানে পালিশ করা কাষ্ঠখণ্ড ঝক্‌ঝক্‌ করচে, সেই দিকের দেয়ালে একটি ছবি ঝুল্‌চে, এবং সেই ছবির সামনে সেই তক্তাটির উপর একটি ফুল-দানীর উপরে ফুল সাজানো। ঐ যে ছবিটি আছে, ওটা আড়ম্বরের জন্যে নয়, ওটা দেখবার জন্যে। সেইজন্যে যাতে ওর গা ঘেঁসে কেউ না বসতে পারে, যাতে ওর সাম্‌নে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যাহত অবকাশ থাকে, তারি ব্যবস্থা রয়েচে। সুন্দর জিনিসকে যে এরা কত শ্রদ্ধা করে, এর থেকেই তা বোঝা যায়। ফুল সাজানোও তেমনি। অন্যত্র নানা ফুল ও পাতাকে ঠেসে একটা তোড়ার মধ্যে বেঁধে ফেলে—ঠিক যেমন করে বারুণীযোগের সময় তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এক গাড়িতে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়, তেমনি,—কিন্তু এখানে ফুলের প্রতি সে অত্যাচার হবার জো নেই—ওদের জন্যে থার্ডক্লাসের গাড়ি নয়, ওদের জন্যে রিজার্ভ-করা সেলুন। ফুলের সঙ্গে ব্যবহারে এদের না আছে দড়াদড়ি, না আছে ঠেলাঠেলি, না আছে হট্টগোল।

ভোরের বেলা উঠে জানালার কাছে আসন পেতে যখন বসলুম, তখন বুঝলুম জাপানীরা কেবল যে শিল্পকলার ওস্তাদ, তা নয়,—মানুষের জীবনযাত্রাকে এরা একটি কলাবিদ্যার মত আয়ত্ত করেছে। এরা এটুকু জানে, যে জিনিসের মূল্য আছে, গৌরব আছে, তার জন্যে যথেষ্ট জায়গা ছেড়ে দেওয়া চাই। পূর্ণতার জন্যে রিক্ততা সব চেয়ে দরকারী। বস্তুবাহুল্য জীবনবিকাশের প্রধান বাধা। এই সমস্ত বাড়িটির মধ্যে কোথাও একটি কোণেও একটু অনাদর নেই, অনা-বশ্যকতা নেই। চোখকে মিছিমিছি কোন জিনিস আঘাত করচে না, কানকে বাজে কোন শব্দ বিরক্ত করচে না,—মানুষের মন নিজেকে

যতখানি ছড়াতে চায় ততখানি ছড়াতে পারে, পদে পদে জিনিস পত্রের উপরে ঠোকর খেয়ে পড়ে না।

যেখানে চারিদিকে এলোমেলো, ছড়াছড়ি, নানা জঞ্জাল, নানা আওয়াজ, - সেখানে যে প্রতিমুহূর্ত্তেই আমাদের জীবনের এবং মনের শক্তিক্ষয় হচ্চে, সে আমরা অভ্যাসবশত বুঝতে পারি নে। আমাদের চারদিকে যা কিছু আছে, সমস্তই আমাদের প্রাণ-মনের কাছে কিছু-না-কিছু আদায় করচেই। যে সব জিনিস অদরকারী এবং অসুন্দর, তারা আমাদের কিছুই দেয় না,—কেবল আমাদের কাছ থেকে নিতে থাকে। এমনি করে নিশিদিন আমাদের যা ক্ষয় হচ্চে, সেটাতে আমাদের শক্তির কম অপব্যয় হচ্চে না।

সেদিন সকালবেলায় মনে হল আমার মন যেন কানায় কানায় ভরে উঠেচে। এতদিন যেরকম করে মনের শক্তি বহন করেচি, সে যেন চালুনিতে জল ধরা, কেবল গোলমালের ছিদ্র দিয়ে সমস্ত বেরিয়ে গেছে; আর এখানে এ যেন ঘটের ব্যবস্থা। আমাদের দেশের ক্রিয়াকর্ম্মের কথা মনে হল। কি প্রচুর অপব্যয়! কেবলমাত্র জিনিসপত্রের গণ্ডগোল নয়,—মানুষের। কি চেঁচামেচি, ছুটোছুটি গলা-ভাঙ্গাভাঙ্গি! আমাদের নিজের বাড়ির কথা মনে হল। বাঁকাচোরা উঁচুনীচু রাস্তার উপর দিয়ে গোরুর গাড়ি চলার মত সেখানকার জীবনযাত্রা। যতটা চল্‌চে তার চেয়ে আওয়াজ হচ্চে ঢের বেশী। দরোয়ান হাঁক দিচ্চে, বেহারাদের ছেলেরা চেঁচামেচি করচে, মেথরদের মহলে ঘোরতর ঝগড়া বেধে গেছে, মারোয়ারি প্রতিবেশিনীরা চীৎকার শব্দে একঘেয়ে গান ধরেচে, তার আর অন্তই নেই। আর ঘরের ভিতরে নানা জিনিসপত্রের ব্যবস্থা এবং অব্যবস্থা,—তার বোঝা

কি কম! সেই বোঝা কি কেবল ঘরের মেঝে বহন কর্‌চে! তা নয়,—প্রতিক্ষণেই আমাদের মন বহন কর্‌চে। যা গোছালো, তার বোঝা কম; যা অগোছালো, তার বোঝা আরো বেশী,—এই যা তফাৎ। যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেঁচায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্ব্বক কাজ কর্‌তে যাদের আশ্চর্য্য দক্ষতা,—সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠচে, তার কি হিসেব আছে?

জাপানীরা যে রাগ করেনা, তা নয়,—কিন্তু সকলের কাছেই এক-বাক্যে শুনেছি, এরা ঝগড়া করে না। এদের গালাগালির অভিধানে একটিমাত্র কথা আছে—বোকা—তার ঊর্দ্ধে এদের ভাষা পৌঁছয় না! ঘোরতর রাগারাগি মনান্তর হয়ে গেল, পাশের ঘরে তার টুঁশব্দ পৌঁছল না,—এইটি হচ্চে জাপানী রীতি। শোকদুঃখ সম্বন্ধেও এই রকম স্তব্ধতা।

এদের জীবনযাত্রায় এই রিক্ততা, বিরলতা, মিতাচার কেবলমাত্র যদি অভাবাত্মক হত, তাহলে সেটাকে প্রশংসা কর্‌বার কোনো হেতু থাক্‌ত না। কিন্তু এইত দেখচি, এরা ঝগড়া করে না বটে, অথচ প্রয়োজনের সময় প্রাণ দিতে প্রাণ নিতে এরা পিছ্‌পাও হয় না। জিনিসপত্রের ব্যবহারে এদের সংযম, কিন্তু জিনিসপত্রের প্রতি প্রভুত্ব এদের ত কম নয়। সকল বিষয়েই এদের যেমন শক্তি, তেমনি নৈপুণ্য, তেমনি সৌন্দর্য্যবোধ।

এ সম্বন্ধে যখন আমি এদের প্রশংসা করেচি, তখন এদের অনেকের কাছেই শুনেচি যে, "এটা আমরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসাদে পেয়েচি। অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম্মের একদিকে সংযম, আর একদিকে মৈত্রী, এই যে

সামঞ্জস্যের সাধনা আছে, এতেই আমরা মিতাচারের দ্বারাই অমিত শক্তির অধিকার পাই। বৌদ্ধধর্ম্ম যে মধ্যপথের ধর্ম্ম।”

শুনে আমার লজ্জাবোধ হয়। বৌদ্ধধর্ম্মত আমাদের দেশেও ছিল, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রাকেত এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর সামঞ্জস্যে বেঁধে তুল্‌তে পারে নি। আমাদের কল্পনায় ও কাজে এমনতর প্রভূত আতিশয্য, ঔদাসীন্য, উচ্ছৃঙ্খলতা কোথা থেকে এল?

একদিন জাপানী নাচ দেখে এলুম। মনে হল এ যেন দেহভঙ্গীর সঙ্গীত। এই সঙ্গীত আমাদের দেশের বীণার আলাপ। অর্থাৎ পদে পদে মীড়। ভঙ্গীবৈচিত্র্যের পরস্পরের মাঝখানে কোনো ফাঁক নেই, কিম্বা কোথাও জোড়ের চিহ্ন দেখা যায় না;—সমস্ত দেহ পুষ্পিত লতার মত একসঙ্গে দুল্‌তে দুল্‌তে সৌন্দর্য্যের পুষ্পবৃষ্টি কর্‌চে। খাঁটি য়ুরোপীয় নাচ অর্দ্ধনারীশ্বরের মত, আধখানা ব্যায়াম আধখানা নাচ; তার মধ্যে লম্ফঝম্প, ঘুরপাক, আকাশকে লক্ষ্য করে লাথি-ছোঁড়াছুঁড়ি আছে। জাপানী নাচ একেবারে পরিপূর্ণ নাচ। তার সজ্জার মধ্যেও লেশমাত্র উলঙ্গতা নেই। অন্য দেশের নাচে দেহের সৌন্দর্য্যলীলার সঙ্গে দেহের লালসা মিশ্রিত। এখানে নাচের কোনো ভঙ্গীর মধ্যে লালসার ইসারামাত্র দেখা গেল না। আমার কাছে তার প্রধান কারণ এই বোধ হয় যে, সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা জাপানীর মনে এমন সত্য যে, তার মধ্যে কোনোরকমের মিশল তাদের দরকার হয় না, এবং সহ্য হয় না। একবার আমাদের দেশের নাচের কথা মনে পড়ল। কিন্তু সুন্দর ছবির উপর দৈবাৎ এক ফোঁটা কালী পড়লে মনটা যেমন ছ্যাঁক্ করে ওঠে, আমার সেইরকম মনে হল— তাড়াতাড়ি সেই কদর্য্য স্মৃতি ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেল্লুম।

কিন্তু এদের সঙ্গীতটা আমার মনে হল বড় বেশীদূর এগোয় নি। বোধ হয় চোখ আর কান, এই দুইয়ের উৎকর্ষ একসঙ্গে ঘটে না। মনের শক্তিস্রোত যদি এর কোনো একটা রাস্তা দিয়ে অত্যন্ত বেশী আনাগোনা করে, তাহলে অন্য রাস্তাটায় তার ধারা অগভীর হয়। ছবি জিনিসটা হচ্চে অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে। কেননা কবিতার উপকরণ হচ্চে ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ, আর একটা দিকে সুর; এই অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

জাপানী রূপরাজ্যের সমস্ত দখল করেচে। যা কিছু চোখে পড়ে, তার কোথাও জাপানীর আলস্য নেই, অনাদর নেই; তার সর্ব্বত্রই সে একেবারে পরিপূর্ণতার সাধনা করেচে। অন্য দেশে গুণী এবং রসিকের মধ্যেই রূপ-রসের যে বোধ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, এ দেশে সমস্ত জাতের মধ্যে তাই ছড়িয়ে পড়েচে। য়ুরোপে সার্ব্বজনীন বিদ্যাশিক্ষা আছে, সার্ব্বজনীন সৈনিকতার চর্চ্চাও সেখানে অনেক জায়গায় প্রচলিত,—কিন্তু এমনতর সার্ব্বজনীন রসবোধের সাধনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এখানে দেশের সমস্ত লোক সুন্দরের কাছে আত্মসমর্পণ করেচে।

তাতে কি এরা বিলাসী হয়েচে? অকর্ম্মণ্য হয়েচে? জীবনের কঠিন সমস্যা ভেদ করতে এরা কি উদাসীন কিম্বা অক্ষম হয়েচে?—ঠিক তার উল্টো। এরা এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই মিতাচার শিখেচে; এই সৌন্দর্য্যসাধনা থেকেই এরা বীর্য্য এবং কর্ম্মনৈপুণ্য

লাভ করেচে। আমাদের দেশে একদল লোক আছে, তারা মনে করে শুষ্কতাই বুঝি পৌরুষ। এবং কর্ত্তব্যের পথে চল্‌বার সদুপায় হচ্চে রসের উপবাস,—তারা জগতের আনন্দকে মুড়িয়ে ফেলাকেই জগতের ভাল করা মনে করে।

য়ুরোপে যখন গেছি, তখন তাদের কলকারখানা, তাদের কাজের ভিড়, তাদের ঐশ্বর্য্য এবং প্রতাপ খুব করে চোখে পড়েচে এবং মনকে অভিভূত করেচে। কিন্তু চৈতন্য যেমন বলেছিলেন, তেম্‌নি বলি—"এহ বাহ্য।" কিন্তু জাপানে আধুনিকতার ছদ্মবেশ ভেদ করে যা চোখে পড়ে, সে হচ্চে মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টি। সে অহঙ্কার নয়, আড়ম্বর নয়,—সে পূজা। প্রতাপ নিজেকে প্রচার করে; এই জন্যে যতদূর পারে বস্তুর আয়তনকে বাড়িয়ে তুলে' আর সমস্তকে তার কাছে নত করতে চায়। কিন্তু পূজা আপনার চেয়ে বড়কে প্রচার করে; এই জন্যে তার আয়োজন সুন্দর এবং খাঁটি, কেবলমাত্র মস্ত এবং অনেকে নয়। জাপান আপনার ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র সুন্দরের কাছে আপন অর্ঘ্য নিবেদন ক'রে দিচ্চে। এদেশে আসবামাত্র সকলের চেয়ে বড় বাণী যা কাণে এসে পৌঁছয়, সে হচ্চে "আমার ভাল লাগ্‌ল, আমি ভাল বাসলুম।" এই কথাটি দেশসুদ্ধ সকলের মনে উদয় হওয়া সহজ নয়, এবং সকলের বাণীতে প্রকাশ হওয়া আরো শক্ত। এখানে কিন্তু প্রকাশ হয়েচে। প্রত্যেক ছোট জিনিসে, ছোট ব্যবহারে, সেই আনন্দের পরিচয় পাই। সেই আনন্দ ভোগের আনন্দ নয়,—পূজার আনন্দ। সুন্দরের প্রতি এমন আন্তরিক সম্ভ্রম অন্য কোথাও দেখি নি। এমন সাবধানে যত্নে, এমন শুচিতা রক্ষা করে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে, অন্য কোনো জাতি শেখে

নি। যা এদের ভাল লাগে, তার সামনে এরা শব্দ করে না। সংযমই যে প্রচুরতার পরিচয়, এবং স্তব্ধতাই যে গভীরতাকে প্রকাশ করে, এরা সেটা অন্তরের ভিতর থেকে বুঝেচে। এবং এরা বলে সেই আন্তরিক বোধশক্তি এরা বৌদ্ধধর্ম্মের সাধনা থেকে পেয়েচে। এরা স্থির হয়ে শক্তিকে নিরোধ করতে পেরেচে বলেই, সেই অক্ষুণ্ণ শক্তি এদের দৃষ্টিকে বিশুদ্ধ এবং বোধকে উজ্জ্বল করে তুলেচে।

পূর্ব্বেই বলেচি, প্রতাপের পরিচয়ে মন অভিভূত হয়—কিন্তু এখানে যে পূজার পরিচয় দেখি, তাতে মন অভিভবের অপমান অনুভব করে না। মন আনন্দিত হয়, ঈর্ষান্বিত হয় না। কেননা, পূজা যে আপনার চেয়ে বড়কে প্রকাশ করে, সেই বড়র কাছে সকলেই আনন্দমনে নত হতে পারে, মনে কোথাও বাজে না। দিল্লিতে যেখানে প্রাচীন হিন্দু রাজার কীর্ত্তিকলার বুকের মাঝখানে কুতব-মিনার অহঙ্কারের মুষলের মত খাড়া হয়ে আছে, সেখানে সেই ঔদ্ধত্য মানুষের মনকে পীড়া দেয়, কিম্বা কাশীতে যেখানে হিন্দুর পূজাকে অপমানিত করবার জন্যে আরঙজীব মসজিদ স্থাপন করেচে, সেখানে না দেখি শ্রীকে, না দেখি কল্যাণকে। কিন্তু যখন তাজমহলের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াই, তখন এ তর্ক মনে আসেনা যে, এটা হিন্দুর কীর্ত্তি, না মুসলমানের কীর্ত্তি। তখন এ'কে মানুষের কীর্ত্তি বলেই হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করি।

জাপানের যেটা শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, সেটা অহঙ্কারের প্রকাশ নয়,—আত্মনিবেদনের প্রকাশ; সেই জন্যে এই প্রকাশ মানুষকে আহ্বান করে, আঘাত করে না। এই জন্যে জাপানে যেখানে এই ভাবের বিরোধ দেখি, সেখানে মনের মধ্যে বিশেষ পীড়া বোধ করি। চীনের

সঙ্গে নৌযুদ্ধে জাপান জয়লাভ করেছিল—সেই জয়ের চিহ্নগুলিকে কাঁটার মত দেশের চারদিকে পুঁতে রাখা যে বর্ব্বরতা, সেটা যে অসুন্দর, এ কথা জাপানের বোঝা উচিত ছিল। প্রয়োজনের খাতিরে অনেক ক্রুর কর্ম্ম মানুষকে করতে হয়, কিন্তু সেগুলোকে ভুলতে পারাই মনুষ্যত্ব। মানুষের যা চিরস্মরণীয়, যার জন্যে মানুষ মন্দির করে, মঠ করে,—সে ত হিংসা নয়।

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েচি—সব সময়ে প্রয়োজনের খাতিরে নয়—কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই যে পরাভব ঘটেচে, অভ্যাসবশত সেজন্যে আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেচি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে, সবই আমাদের শেখবার—এ কথা আমি মানি; কিন্তু যত ব্যবহার আছে, সবই যে আমাদের নেবার—এ কথা আমি মানি নে। তবু, যা নেবার যোগ্য জিনিস, তা সব দেশ থেকেই নিতে হবে—এ কথা বল্‌তে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই জন্যেই, জাপানে যে সব ভারতবাসী এসেছে, তাদের সম্বন্ধে একটা কথা আমি বুঝতে পারি নে। দেখতে পাই তারা ত য়ুরোপের নানা অনাবশ্যক, নানা কুশ্রী জিনিসও নকল করেচে; কিন্তু তারা কি জাপানের কোনো জিনিসই চোখে দেখতে পায় না? তারা এখান থেকে যে সব বিদ্যা শেখে, সেও য়ুরোপের বিদ্যা—এবং যাদের কিছুমাত্র আর্থিক বা অন্য-রকম সুবিধা আছে, তারা কোনোমতে এখান থেকে আমেরিকায় দৌড় দিতে চায়। কিন্তু যে সব বিদ্যা এবং আচার ও আসবাব জাপানের সম্পূর্ণ নিজের, তার মধ্যে কি আমরা গ্রহণ করবার জিনিস কিছুই দেখি নে?

আমি নিজের কথা বল্‌তে পারি, আমাদের জীবনযাত্রার উপযোগী জিনিস আমরা এখান থেকে যত নিতে পারি, এমন য়ুরোপ থেকে নয়। তা ছাড়া জীবনযাত্রার রীতি যদি আমরা অসঙ্কোচে জাপানের কাছ থেকে শিখে নিতে পারতুম, তাহলে আমাদের ঘর দুয়ার এবং ব্যবহার শুচি হত, সুন্দর হত, সংযত হত। জাপান ভারতবর্ষ থেকে যা পেয়েচে, তাতে আজ ভারতবর্ষকে লজ্জা দিচ্চে; কিন্তু দুঃখ এই যে, সেই লজ্জা অনুভব করবার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের যত লজ্জা সমস্ত কেবল য়ুরোপের কাছে,—তাই য়ুরোপের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে কুড়িয়ে তালি-দেওয়া অদ্ভুত আবরণে আমরা লজ্জা রক্ষা করতে চাই। এদিকে জাপান-প্রবাসী ভারতবাসীরা বলে, জাপান আমাদের এসিয়াবাসী বলে অবজ্ঞা করে—অথচ আমরাও জাপানকে এম্‌নি অবজ্ঞা করি যে, তার আতিথ্য গ্রহণ করেও প্রকৃত জাপানকে চক্ষেও দেখি নে, জাপানের ভিতর দিয়ে বিকৃত য়ুরোপকেই কেবল দেখি। জাপানকে যদি দেখতে পেতুম, তাহলে আমাদের ঘর থেকে অনেক কুশ্রীতা, অশুচিতা অব্যবস্থা, অসংযম আজ দূরে চলে যেত।

বাঙ্গলা দেশে আজ শিল্পকলার নূতন অভ্যুদয় হয়েচে, আমি সেই শিল্পীদের জাপানে আহ্বান করচি। নকল করবার জন্যে নয়, শিক্ষা করবার জন্যে। শিল্প জিনিসটা যে কত বড় জিনিস, সমস্ত জাতির সেটা যে কত বড় সম্পদ, কেবল মাত্র সৌখিনতাকে সে যে কতদূর পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে—তার মধ্যে জ্ঞানীর জ্ঞান, ভক্তের ভক্তি, রসিকের রসবোধ যে কত গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে প্রকাশ করবার চেষ্টা করচে, তা এখানে এলে তবে স্পষ্ট বোঝা যায়।

টোকিয়োতে আমি যে শিল্পীবন্ধুর বাড়িতে ছিলুম, সেই টাইকানের নাম পূর্ব্বেই বলেচি। ছেলেমানুষের মত তাঁর সরলতা, তাঁর হাসি, তাঁর চারদিককে হাসিয়ে রেখে দিয়েচে। প্রসন্ন তাঁর মুখ, উদার তাঁর হৃদয়, মধুর তাঁর স্বভাব। যতদিন তাঁর বাড়িতে ছিলুম, আমি জান্‌তেই পারি নি তিনি কত বড় শিল্পী। ইতিমধ্যে য়োকোহামায় একজন ধনী এবং রসজ্ঞ ব্যক্তির আমরা আতিথ্য লাভ করেচি। তাঁর এই বাগানটি নন্দনবনের মত, এবং তিনিও সকল বিষয়ে এখানকারই যোগ্য। তাঁর নাম "হারা।" তাঁর কাছে শুনলুম, য়োকোয়ামা টাইকান এবং তানজান শিমোমুরা আধুনিক জাপানের দুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী। তাঁরা আধুনিক য়ুরোপের নকল করেন না, প্রাচীন জাপানেরও না। তাঁরা প্রথার বন্ধন থেকে জাপানের শিল্পীকে মুক্তি দিয়েচেন। হারার বাড়িতে টাইকানের ছবি যখন প্রথম দেখলুম, আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। তাতে না আছে বাহুল্য, না আছে সৌখিনতা। তাতে যেমন একটা জোর আছে, তেমনি সংযম। বিষয়টি এই; চীনের একজন প্রাচীন কালের কবি ভাবে ভোর হয়ে চলেচে—তার পিছনে একজন বালক একটি বীণাযন্ত্র বহু যত্নে বহন করে নিয়ে যাচ্চে, তাতে তার নেই; তার পিছনে একটি বাঁকা উইলো গাছ। জাপানে তিনভাগওয়ালা যে খাড়া পর্দ্দার প্রচলন আছে, সেই রেশমের পর্দ্দার উপর আঁকা। মস্ত পর্দ্দা এবং প্রকাণ্ড ছবি। প্রত্যেক রেখাটি প্রাণে ভরা। এর মধ্যে ছোটখাটো কিম্বা জবড়জঙ্গ কিছুই নেই—যেমন উদার, তেমনি গভীর, তেমনি আয়াসহীন। নৈপুণ্যের কথা একেবারে মনেই হয় না—নানা রং, নানা রেখার সমাবেশ নেই—দেখবামাত্র মনে হয় খুব বড় এবং খুব সত্য। তারপরে তাঁর ল্যাণ্ড-

স্কেপের ছবি দেখ্‌লুম (ল্যাণ্ড্‌স্কেপের বাংলা প্রতিশব্দ নেই)। একটি ছবি,—পটের উচ্চপ্রান্তে একখানি পূর্ণচাঁদ, মাঝখানে একটি নৌকা, নীচের প্রান্তে দুটি দেওদার গাছের ডাল দেখা যাচ্চে—আর কিছু না—জলের কোনো রেখা পর্য্যন্ত নেই। স্থির জল জ্যোৎস্নার আলোয় কেবলমাত্র একটি বিস্তীর্ণ শুভ্রতা,—ওটা যে জল, সে কেবলমাত্র নৌকাটি আছে বলেই বোঝা যাচ্চে; আর এই সর্ব্বব্যাপী বিপুল জ্যোৎস্নাটিকে ফলিয়ে তোলবার জন্যে যত কিছু কালিমা,—সে কেবল ঐ দুটি প্যাইন গাছের ডালে। ওস্তাদ এমন একটি জিনিসকে আঁক্‌তে চেয়েচেন, যার রূপ নেই, যা বৃহৎ এবং নিস্তব্ধ—জ্যোৎস্নারাত্রি,—অতলস্পর্শ তার নিঃশব্দতা। কিন্তু আমি যদি তাঁর সব ছবির বিস্তারিত বর্ণনা করতে যাই, তাহলে আমার কাগজও ফুরোবে, সময়েও কুলবে না। হারাসান সবশেষে নিয়ে গেলেন একটি লম্বা সঙ্কীর্ণ ঘরে, সেখানে এক দিকের প্রায় সমস্ত দেয়াল জুড়ে একটি খাড়া পর্দ্দা দাঁড়িয়ে। এই পর্দ্দায় শিমোমুরার আঁকা একটি প্রকাণ্ড ছবি। শীতের পরে প্রথম বসন্ত এসেছে—প্লাম গাছের ডালে একটিও পাতা নেই, শাদা শাদা ফুল ধরেচে—ফুলের পাপ্‌ড়ি ঝরে ঝরে পড়চে;—বৃহৎ পর্দ্দার এক প্রান্তে দিগন্তের কাছে রক্তবর্ণ সূর্য্য দেখা দিয়েছে—পর্দ্দার অপর প্রান্তে প্লাম গাছের রিক্ত ডালের আড়ালে দেখা যাচ্চে একটি অন্ধ হাতজোড় করে সূর্য্যের বন্দনা করচে। একটি অন্ধ, একটি গাছ, একটি সূর্য্য, আর সোণায় ঢালা একটি সুবৃহৎ আকাশ; এমন ছবি আমি কখনো দেখি নি। উপনিষদের সেই প্রার্থনাবাণী যেন রূপ ধরে আমার কাছে দেখা দিলে,—তমসো মা জ্যোতির্গময়। কেবল অন্ধ মানুষের নয়, অন্ধ প্রকৃতির এই প্রার্থনা—তমসো মা

জ্যোতির্গময়—সেই প্লাম গাছের একাগ্র প্রসারিত শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়ে জ্যোতির্লোকের দিকে উঠ্‌চে। অথচ আলোয় আলোময়—তারি মাঝখানে অন্ধের প্রার্থনা।

এত বড় বৃহৎ-পটভরা ছবি ত কখনো দেখি নি। চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত হৃদয় ভরে যায়। যেন নিজের অন্তঃকরণকে দেখ্‌তে পাই, যেন সমস্ত পৃথিবীকে দেখি।

কাল শিনোমুরার আর একটি ছবি দেখ্‌লুম। পটের আয়তনটি ছোট, অথচ ছবির বিষয়টি বিচিত্র। সাধক তার ঘরের মধ্যে বসে ধ্যান করচে—তার সমস্ত রিপুগুলি তাকে চারদিকে আক্রমণ করেচে। অর্দ্ধেক মানুষ অর্দ্ধেক জন্তুর মত তাদের আকার, অত্যন্ত কুৎসিত—তাদের কেউ বা খুব সমারোহ করে আস্‌চে, কেউ বা আড়ালে আবডালে উঁকিঝুঁকি মারচে। কিন্তু তবু এরা সবাই বাইরেই আছে—ঘরের ভিতরে তার সাম্‌নে সকলের চেয়ে তার বড় রিপু বসে আছে—তার মূর্ত্তি ঠিক বুদ্ধের মত। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ্‌লেই দেখা যায়, সে খাঁটি বুদ্ধ নয়,—স্থূল তার দেহ, মুখে তার কুটিল হাস্য। সে কপট আত্মম্ভরিতা, পবিত্র রূপ ধরে এই সাধককে বঞ্চিত করচে। এ হচ্চে আধ্যাত্মিক অহমিকা, শুচি এবং সুগম্ভীর, মুক্তস্বরূপ বুদ্ধের ছদ্মবেশ ধরে আছে—একেই চেনা শক্ত—এই হচ্চে অন্তরতম রিপু, অন্য কদর্য্য রিপুরা বাইরের। এইখানে দেবতাকে উপলক্ষ্য করে মানুষ আপনার প্রবৃত্তিকে পূজা করচে।

আমরা যাঁর আশ্রয়ে আছি, সেই হারাসান গুণী এবং গুণজ্ঞ। তিনি রসে, হাস্যে, ঔদার্য্যে পরিপূর্ণ। সমুদ্রের ধারে, পাহাড়ের গায়ে তাঁর এই পরম সুন্দর বাগানটি সর্ব্বসাধারণের জন্যে নিত্যই উদ্‌ঘাটিত।

মাঝে মাঝে বিশ্রামগৃহ আছে,—যে খুসি সেখানে এসে চা খেতে পারে। একটা খুব লম্বা ঘর আছে, সেখানে যারা বনভোজন করতে চায় তাদের জন্যে ব্যবস্থা আছে। হারাসানের প্রচুর অর্থ, কিন্তু তাঁর সম্পদের ছটা প্রভাতের অরুণোদয়ের মত—তা বিশ্বের বন্ধু, তা নিজে সুন্দর, এবং যা কিছু সুন্দর তাকে সমাদরের আলোকে বিকশিত করে তুল্‌চে। তাঁর মধ্যে কৃপণতাও নেই, আড়ম্বরও নেই, অথচ তাঁর চারদিকে সমারোহ আছে। মূঢ় ধনাভিমানীর মত তিনি মূল্যবান জিনিসকে কেবলমাত্র সংগ্রহ করে রাখেন না,—তার মূল্য তিনি বোঝেন, তার মূল্য তিনি দেন, এবং তার কাছে তিনি সম্ভ্রমে আপনাকে নত করতে জানেন।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

৺প্রিয়নাথ সেন।

—:০:—

সকল দেশে সকল যুগেই এমন জনকতক লোক থাকেন, যাঁরা পাঠক সমাজের কাছে বিশেষ পরিচিত না হলেও, সে যুগের লেখক সমাজের কাছে সুপরিচিত। এ শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের মনের ছাপ সাহিত্যের উপর নয়,—সাহিত্যিকদের উপর রেখে যান। এঁরা লেখকদের সহজ বন্ধু, এবং এঁদের সঙ্গে আলাপে নবীন লেখকেরা আনন্দও পান, শিক্ষাও লাভ করেন। ৺প্রিয়নাথ সেন এই শ্রেণীর একজন লোক ছিলেন। বাঙ্গলা দেশে এ জাতীয় লোক নিতান্ত দুর্লভ, সুতরাং তাঁর অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যেরূপ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন, নিজেদের সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত মনে করছেন। লেখক হিসেবে যাঁরা ৺প্রিয়নাথ সেনের নিকট ঋণী, আমি তার মধ্যে একজন।

আজ ছাব্বিশ কি সাতাশ বৎসর পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে সঙ্গে করে প্রিয়নাথ সেনের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ঘরে প্রবেশ করবামাত্র আমি বুঝলুম যে, তিনি আর আমি, আমরা দু'জনেই জীবনের সেই এক পথের পথিক, যে পথ সকলে অবলম্বন করেন না; সুতরাং আমাদের উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তা জন্মাতে বাধ্য।

পৃথিবীতে অধিকাংশ লোক টাকা ভালবাসে—আর কিছু ভালবাসে না। কিন্তু সকল দেশের সকল সমাজেই এমন জনকতক লোক থাকেন, টাকার একান্ত মায়া যাঁদের ধাতে নেই। তাঁরা হয় টাকা ভালবাসেন না, নয় টাকা ছাড়া আরও কিছু ভালবাসেন—এবং সম্ভবতঃ তা টাকার চাইতে ঢের বেশী পরিমাণে। এ জাতের অনুরাগকে বৈষয়িক লোকেরা নেশা বলে থাকেন। আমাদের দেশে কারও কারও গানবাজনার নেশা আছে। বিলেতের লোকদের গানবাজনা ছাড়া আরও পাঁচরকমের নেশা আছে। সে দেশে কেউবা ফুল ভালবাসে, কেউবা ছবি, কেউবা শিকার, কেউবা কুকুর।—কিন্তু বই ভালবাসে, এমন লোক সব দেশেই কম—এবং আমাদের দেশে নেই বল্লেও হয়। বিলেতে সকলে সরস্বতীর পূজা করুন আর না করুন, ঘরের এক কোণে তাঁর জন্য টাট্ সাজিয়ে রাখতে বাধ্য হন। তার কারণ, সে দেশে যাঁর বৈঠকখানায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকদের অন্ততঃ দু'একশ বই না থাকে, তিনি ভদ্রসমাজে ভদ্রলোক বলে গণ্য হন্ না। এদেশে ঠিক তার উল্টো। আমাদের সমাজে যিনি বই ভালবাসেন, বুদ্ধিমান লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখেন; বিদ্যার সঙ্গে বুদ্ধির যে কোন সম্পর্ক আছে, বিজ্ঞ লোকেরা তা সহজে স্বীকার করেন না। এঁদের মতে বই পড়াটা একটা বাতিকের মধ্যে। বই পড়াটা না হো'ক, বেনাটা যে একটা বাতিক, এ কথা আমরা সকলেই স্বীকার করি। এ বাতিক আমারও আছে, এবং ৺প্রিয়নাথ সেনেরও যে পূরোমাত্রায় ছিল, তার প্রকৃষ্ট ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ তাঁর গৃহে প্রবেশ করবামাত্রই পাওয়া যেত। একেবারে আসবাবহীন তাঁর ঐ ছোট কুঠরীটি আমার চোখকে যে পরিমাণ আনন্দ দিয়েছিল, তার সিকির সিকি আনন্দও এ দেশের বিলাতি-আসবাব্-সঙ্কুল, চিত্রবিচিত্র

রাজপ্রাসাদ দর্শনে আমি কখন পাই নি।—সেকালে গৃহাভ্যন্তরে পুস্তককে উচ্চ আসন দেবার ফ্যাসান আমাদের ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত ছিল না,—আজকাল হয়েছে। লক্ষীর বরপুত্রেরা এবং প্রিয়-পাত্রেরা যে সরস্বতীর হস্তের বীণার না হো'ক, পুস্তকের আদর করতে শিখেছেন, এ অবশ্য অতীব সুখের বিষয়। কিন্তু বই কেনার ফ্যাসান ও তার ব্যসনের মধ্যে অনেকটা প্রভেদ আছে।

ধনী লোকদের পোষা লাইব্রেরীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, তা সরস্বতীর মন্দির নয়,—সমাধি-মন্দির। মনে হয়, ও-সব ক্ষেত্রে পুস্তকাবলী যেন মলাটের কফিন-বন্দী হয়ে চিরশান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। ৺প্রিয়নাথ সেনের বই যে গৃহসজ্জার জন্য সংগৃহীত হয় নি, সে যে ধনীর নয়, গুণীর হাতের বই,—তা বুঝতে কারও দেরি হত না। কেননা তাঁর বই দেওয়ালের গায়ে ছবির মত সাজানো থাকত না, আশেপাশে ছড়ানো থাকত। মেঝের উপর, ঘরের কোণে, বেঞ্চের উপর, যেখানে চোখ পড়ত সেইখানেই দেখা যেত, অসংখ্য বই স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে। গৃহস্বামী যে সেগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তার প্রমাণ তাদের বিপর্য্যস্ত অবস্থার ভিতরেই পাওয়া যেত। এই অনাদরই তাদের যথার্থ আদরের পরিচয় দিত।—আর সেই পুস্তকরাশির অধিকাংশ সেই জাতের, যাদের দর্শন কলিকাতার কোন বইয়ের দোকানে কিম্বা ধনীলোকের পুস্তকাগারে ছ'বেলা মেলে না।—অর্থাৎ ইউরোপের নব সাহিত্যে তাঁর ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল।

এই বই ভালবাসাটা সাহিত্যানুরাগের বাহ্য লক্ষণ হলেও, একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। যাঁরা যথার্থ সাহিত্য ভালবাসেন, তাঁরা সাহিত্যের শুধু রস নয়, রূপও ভালবাসেন।

আমরা উভয়ে একই রসের,—সাহিত্য রসের,—রসিক বলে, সেই প্রথম সাক্ষাতে আমাদের উভয়ের মধ্যে যে আত্মীয়তা জন্মায়, তা তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত স্থায়ী ছিল। যদিচ তখন আমি কলেজের ছাত্র, এবং তিনি সাহিত্য সমাজে একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তবুও পাঁচ মিনিটের আলাপে আমরা পরস্পারের বন্ধু হয়ে উঠলুম। তার আর একটি বিশেষ কারণ ছিল। পৃথিবীতে যিনি বিষয়সম্পত্তি ছাড়া অপর কোনও বস্তুতে সুখ পান, তিনি আর পাঁচজনকে সে সুখের ভাগ দিতে চান্। সংসারে যে আমাদের দুঃখের দুঃখী, সেই যেমন আমাদের যথার্থ বন্ধু—মনোরাজ্যে তেমনি যে আমাদের সুখের সুখী, সেই আমাদের যথার্থ বন্ধু। ৺প্রিয়নাথ সেন ফরাসী সাহিত্যের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। ফরাসী ভাষার সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় এবং ফরাসী সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ অনুরাগ ছিল বলে, প্রথম থেকেই তিনি আমাকে তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুশ্রেণীতে ভুক্ত করে নেন্।

আমি পূর্ব্বে বলেছি—৺প্রিয়নাথ তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুদের মনের উপর তাঁর মনের ছাপ রেখে গেছেন। এর কারণ, সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ appreciation ছিল।

তিনি সাহিত্যের একজন যথার্থ গুণগ্রাহী ছিলেন। কাব্যের সর্ব্বপ্রধান গুণ যে তার রস, এ বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, এবং আমার বিশ্বাস কাব্যে তিনি এই রস ব্যতীত অপর কোনও গুণের সন্ধানে ফিরতেন না। আমাদের পাঁচজনের আর পাঁচ বিষয়ে মন আছে,—যথা রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম ইত্যাদি,—কিন্তু ৺প্রিয়নাথ সেন এ সকল বিষয়ের আলোচনায় কখনও নিজের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করতেন না। একমাত্র সাহিত্যের প্রতিই তাঁর ঐকান্তিক প্রীতি ছিল, এবং তিনি তাঁর

সকল মন সকল প্রাণ দিয়ে আজীবন একমাত্র সাহিত্যেরই চর্চ্চা করেছেন। সাহিত্যের এই একাগ্র চর্চ্চার ফলে তাঁর সহজ রসবোধ যেমন পরিপুষ্ট হয়েছিল, কাব্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতও তেমনি উদারতা লাভ করেছিল। তিনি জানতেন যে, সাহিত্যজগতে এমন কোনও কষ্টিপাথর নেই, যার সাহায্যে সকলপ্রকার কাব্য সমান যাচিয়ে নেওয়া যেতে পারে। রূপে গুণে Shelley'র কবিতার সঙ্গে Gautier এর কোনও সাদৃশ্য না থাক্‌লেও,—এ দুই যে কাব্য, এবং উঁচুদরের কাব্য, এ জ্ঞান আমাদের সকলের নেই; তাঁর ছিল। তাঁর মন সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও তৈরি মতামতের অধীন ছিল না বলে, তিনি সাহিত্যে নববস্তুর গুণগ্রহণ কর্‌তে পার্‌তেন,—অবশ্য তাতে যদি কোনও গুণ থাক্‌ত। তাই আমাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের লেখা সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানবার জন্য উৎসুক্‌ হয়ে থাকতুম, এবং সে লেখা তাঁর মনোমত হলে আশ্বস্ত হতুম।

৺প্রিয়নাথ সেনের অভাবে তাঁর লেখক বন্ধুরা যে নিজেদের একান্ত ক্ষতিগ্রস্ত মনে কর্‌ছেন, তার কারণ,—সাহিত্যে সুরের কাণ সকলের নেই; শুধু তাই নয়, কাব্যকে কাব্য হিসেবে না দেখে,—দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি কিম্বা সমাজনীতির অঙ্গ হিসেবে দেখবার এবং সেই হিসেবে বিচার করবার সহজ পদ্ধতিটি অবলম্বন করাটাই একালের দস্তুর হয়ে উঠেছে।

৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্যভাণ্ডারে যে বিশেষ কিছু ধনরত্ন রেখে যান নি,—অর্থাৎ তিনি যে একজন বড় লেখক হন্‌ নি,—তার কারণ তিনি ছিলেন একজন বড় পাঠক। সাহিত্যের স্ফূর্ত্তি ও উন্নতির জন্য লেখকও চাই, পাঠকও চাই; কেননা এ উভয়ের মনের সংযোগ না

হলে সাহিত্য বাড়্তে পারে না। এবং এ দেশে এ যুগে, গুণী লেখকের মত, সমজদার পাঠকও শতেকে জনেক হয়। সেই একশ'র মধ্যে এক-জনের মৃত্যুতে সাহিত্য-সমাজের একটি উচ্চ আসন শূন্য হয়ে পড়ে। তাই ৺প্রিয়নাথ সেন আমাদের সাহিত্য-সমাজে একটি বড় ফাঁক রেখে চলে গিয়েছেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দাদার ডায়েরী।

দাদাকে আমার এক খেয়ালেই মাটি করে দেয়। তিনি মোটে ৫ বৎসর ওকালতী করেন—তার মধ্যে আদালতে গিয়েছিলেন জোর ত্রিশ দিন; তাও উপরি উপরি নয়। এক বন্ধু এসে দাদাকে বল্লেন, "দেখ কিশোরী (তাঁর এই মেয়েলী নামের জন্যে তাঁকে কতই না ঠাট্টা সহ্য করতে হয়েছিল!), এই কেস্‌টায় তুমি একবার দাঁড়াও, তাহলেই হবে—আর কিছু করতে হবে না"। দাদা উত্তর দিলেন, "ওটা আজ মুলতবী রইল; এখন বল দেখি তুমি বিকেলে Chess Competition-এর Final দেখতে এখানে আস্‌ছ কিনা"?

দাদার গলা ছিল ভারি মিষ্টি, কিন্তু কখনও গান শিখ্‌লেন না; ওস্তাদের কাছে দু'দিন ঘুরে এসে বল্লেন, "নাঃ হলনা, ও 'সাধনা' আমার কর্ম্ম নয়"। দাদার ঘরে এত বই ছিল, কিন্তু তার মধ্যে খুব অল্পই তিনি শেষ পাতা পর্য্যন্ত পড়েছিলেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, "মানুষে বই পড়ে কি শেষ করবার জন্যে"? যাক্‌, এইরকম কোন কাজেই তাঁর মতিস্থির ছিল না, আর সেই জন্যেই কখনও নাম করতে পারলেন না—অবশ্য তিনি কখনও সুখ্যাতির জন্য লালায়িত ছিলেন না। কতবার যে তাঁকে কাগজে লেখবার জন্যে অনুরোধ করেছি, তার ইয়ত্তা নেই। একবার মনে পড়ে তাঁকে এই যুদ্ধ সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখতে

বিশেষ করে বলি, তার উত্তর এই দিলেন, "আমার লেখা কে নেবে—আমি না জানি লিখতে, না জানি ভাবতে,—এমন কি মিষ্টি করে বাজে বক্‌তেও জানি নে; তোরা বোধহয় ভাবিস্ আমি একটা ছোট-খাটো prophet। হয়ত ঠিক্‌ই ভাবিস, কেননা আমি তাদেরই মত সত্যাসত্যের বাইরে, তাদেরই মত আমার একটি কথাও মেলে না,—সত্যি ঘটনার সঙ্গে।" আমি বল্লুম, "সে হচ্ছে না—এই মনে কর তুমি Germanদের মোটেই ভালবাসনা, ফরাসীদের মহা সুখ্যাতি কর; এই সুখ্যাতিটাই যদি বেশ ফেনিয়ে লেখ, তাহলেই খবরের কাগজওয়ালারা তোমার লেখা লুফে নেয়"। দাদা বল্লেন, "আমার Frenchদের ভাল লাগে বলেই ভালবাসি,—কোন কারণ নির্দ্দেশ করতে পারিনে, এবং সেই জন্যেই চাইনে।

* * * * *

সেদিন দাদার টেবিল খুঁজতে খুঁজতে এই ছেঁড়া কতকগুলো কাগজ বেরিয়ে পড়ল। দেখে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। বৌদিদিকে জিজ্ঞেস করাতে তিনি বল্লেন, "হাঁ, রাত্রে বসে মাঝে মাঝে কি লিখতেন; আমায় ত কিছু দেখাতেন না—কি করে জানব বল ভাই"—বলতে বলতে তাঁর চোখ্ দুটি জলে ভরে উঠ্‌ল। বল্লুম "ছাপাব?" তিনি কাতর হয়ে পড়লেন।

* * * * *

২রা বৈশাখ।—Woodrow Wilsonএর New Freedom বই-খানা পড়লুম,—বেশ ভাল লাগল,—বিশেষতঃ এই কথাটা, "Be unlike

your Fathers, for they are not in touch with the new processes of life".

বাপ মাকে ভক্তি করা আর তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া, দুটো এক কথা নয় বলেই যে, তাঁদের আন্তরিক অশ্রদ্ধা করা এবং বাইরে একমত হওয়া যে আলাদা কথা, তা নয়। কেউ স্বীকার করুক আর নাই করুক, এটা ঠিক্ যে, বয়েস হলে কেউ আর বাপ মায়ের চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখে না। বাপে ছেলেতে যে মনান্তর হয়, সেটা নতুনে পুরোণোয় মামুলী বিবাদ।—যাহোক্, আমার বইটা পড়ে পর্য্যন্ত মনে একটা খট্‌কা লেগেছে। সাহিত্যের সনাতন ঝগড়াটাও হয়ত এই নতুন-পুরোণোর শাশুড়ী-বউয়ের ঝগড়া। এই বীরবলী ভাষা নিয়ে বিসম্বাদটা আমার মনে হয় কেবলমাত্র নূতনের উপর পুরাতন দলের মিছে আক্রোশ—হিংসে বল্লেও চলে। কিছুদিন আগে একটি যক্ষ্মা-রোগীকে দেখতে যাই,—সে আমায় দেখে মুখ ফেরালে। আমি যখন তাকে 'কেমন আছ' জিজ্ঞেস করলুম, সে তখন আমার দিকে ফিরে বিরক্তভাবে চেয়ে আমার আঙ্গুলটা ধরে মট্‌কে দিলে। আমার ভবিষ্যতের অস্তিত্ব বোধহয় তার চোখের সামনে অতি বিসদৃশভাবে ফুটে উঠেছিল—তাই সে সহ্য করতে পারেনি। তার পরদিন তার বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখি একটা খাট তৈরী, আর জনকতক ভট্‌চায্যি মিলে বাড়ীর সামনে নস্যি নিতে নিতে হা হুতাশ কর্‌ছে। চলে এলুম।—হিংসে ছাড়া কি সংসার চলে না?

১৭ই বৈশাখ।—আজকের সভা বেশ বড়-গোছের হয়েছিল। বিষয় ছিল East & West; সকলে বল্লে বক্তৃতাটাও মন্দ হয়নি, পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বক্তা বেশ চাবুক মেরেছেন। আমাদের অতীতের

এরকম দার্শনিক আর সগৌরব বিবরণ শুনে খুব চমক লাগ্‌ল। একজন বক্তা উঠে বল্লেন, "তা নয়, তবে এ-দেশেও ভাল আছে, ও-দেশেও ভাল আছে—সামঞ্জস্য দরকার।" সভাপতি মহাশয় ইতিহাসের অধ্যাপক। তিনি এই বলে সভা সাঙ্গ করলেন,—"তা থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের উন্নতি করতে হবে, সেইজন্যই মেনে নিতে হবে যে, আমাদের দেশে সবই ভাল। এই দৃঢ় বিশ্বাসই আমাদের সামনে ঠেলে দেবে। অতীতের উপর আস্থা না থাকলে ভবিষ্যতের উন্নতির আরাধনা করা যায় না"। খুব হাততালি পড়্‌ল।

এই অতীত কথাটার মানে আমার কাছে বেশ একটু গোলমেলে ঠেকে। আচ্ছা, সব দেশেরইত অতীত আছে,—ইংরেজরা বলে আমরা পৃথিবীকে Shakespeare এবং Darwin দিয়েছি, Parliament-এরও আমাদের দেশের মাটিতেই জন্ম। আবার ফরাসীরাও বলে, আমাদের দেশেই স্বাধীনতার প্রথম উন্মেষ হয়েছে,—Hugo, Descartes ত ফরাসী। আবার জার্ম্মাণরাও বলে, Goethe, Beethoven, Helmholtz ত এদেশেরই লোক। তাহলে কোন দেশটাকে বড় বলে মান্‌ব? এর এক উত্তর এই যে,—কাউকে মান্‌তে হবে না। স্বদেশ-ভক্তি হচ্ছে হৃদয়ের জিনিস, বিচারের বস্তু নয়; আসল কথা ভালবাসা। Toussaint-কে কোন অতীতের কাছ থেকে স্বদেশ-প্রেম ধার করতে যেতে হয়নি।

তাহলে কথা এই দাঁড়াল যে, এগোতে হলে সকল সময়ই মানুষের পিছনে অতীতের ধাক্কা চাইনে; তবে পেলে ভাল। আমার মনে হয় যে, পূর্ব্বকালের ইতিহাস বলে জিনিসটা আমাদেরই এখনকার কালের হাতে গড়া পদার্থ; যা হয়ে গেছে তার নিজের কোন ইতিহাস নেই—কিম্বা

যদি থাকে, তা গ্রাহ্য নয়। তবে যা আছে, তা হচ্ছে আমরা যতটুকু সত্য বলে মেনে নিই, তাই। মনুসংহিতায় যদি কোন কুৎসিত কথা থাকে, তাহলে বলি 'Inter interpolation'; আর যদি এমন কোন চিত্র থাকে, যা আমাদের প্রত্যেকের মনগড়া-বৈদিকযুগের সভ্যতার ছবির সঙ্গে মিলে যায়,—তাহলে অমনি বলি, "এই হচ্ছে প্রাচীন ভারতের প্রকৃত চিত্র।"

২৭শে বৈশাখ।—এই বাইশে তারিখটা আমাকে বড় জ্বালায়। মাসের শেষাশেষি কি এক অজানা নেশার আমেজে আমাকে অকর্ম্মণ্য করে দেয়,—তখন কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারি নে যে এটা নেশা। দেহ, মন, বুদ্ধির কেমন একটা গুমোট বেধে যায়,—কবিতা পড়ে, গান শুনে, এমন কি কল্‌কাতার বাইরে ম্যালেরিয়ার দেশে গিয়েও এ গুমোট কাটাতে পারিনে। তাই এবার গঙ্গার ধারে হালিসহরে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে এক পণ্ডিতমশায়ের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকটি বেশ সংস্কৃতজ্ঞ। কথায় কথায় উঠ্‌ল, হিন্দু জাতির অবনতির কারণ কি?—তিনি বল্লেন, "আমাদের দেশে ধর্ম্মবিশ্বাসের অভাবই হচ্ছে এই অবনতির কারণ"।

"তাহলে অবনতি হয়েছে স্বীকার করেন?"

"নিশ্চয়ই।"

"অথচ বলেন যে ভারত Europeকে ধর্ম্ম শেখাবে"।

"এখনও যা আছে, তা মরাহাতি লাখ টাকা,—তবে আর্য্য ঋষিদের সময়ে যা ছিল, তার সিকির সিকিও নেই।"

"তাহলে ভারতের অবস্থা Europeএর অবস্থার চেয়ে এখনও ঢের ভাল?"

"নিশ্চয়ই।"

"তাহলে স্বদেশী করেন কেন?"

"আমাদের মন ও বুদ্ধিতে ইংরেজী সভ্যতার ছাপ পড়েছিল—সেই ছাপ মুছে ফেলবার জন্য।"

"ছাপ পড়াতে দোষ কি? খাঁটি সোনা ত ঠিক্ রইল।"

"তা থাকে না।"

"না থাকার কারণ আপনার মতে আমাদের ধর্ম্মে অবিশ্বাস, কিন্তু স্বদেশীর প্রসাদে সে বিশ্বাস ফিরে আসা দূরে থাক্, বরং অবিশ্বাস অর্থাৎ বিজ্ঞানের মাত্রা বেড়ে চলেছে, কেমন?"

"হাঁ, অনেকটা তাই বটে।"

পণ্ডিতমশায় আসল জায়গায় ঘা দিয়েছিলেন। আমাদের অবনতির কারণ, আমাদের বিশ্বাস নেই। ধর্ম্মে নয়,—নিজের উপর আমরা বিশ্বাস হারিয়েছি, অর্থাৎ আমাদের দাম্ভিকতা নেই। দাম্ভিকতা লোকের বেলায় পাপ, কিন্তু জাতের বেলা তাকে বলে স্বদেশ-প্রেম, কেননা তখন আর তাকে দাম্ভিকতা বলতে কেউ সাহস করে না।

শ্রীধূর্জ্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

শিশু-সাহিত্য।

—— :*: ——

যে কোনও ভাষাতেই হো'ক না কেন, সমাস ব্যবহারের ভিতর যে বিপদ আছে, সে বিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যদি কথার গায়ে কথা জড়িয়ে লিখি, তাহলে পাঠকদের পক্ষে তা ছাড়িয়ে নিয়ে পড়া কঠিন। ত্বষ্টা পুত্র বৃত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন "ইন্দ্রশত্রু হও"। কিন্তু সমাসের কৃপায় সে বর যে কি মারাত্মক শাপে পরিণত হয়েছিল, তার আমূল বিবরণ শত-পথ ব্রাহ্মণে দেখ্‌তে পাবেন। সুতরাং পাঠক যা'তে উল্টো না বোঝেন, সে-কারণ এ প্রবন্ধের সমস্ত নামটির অর্থ প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিশু-সাহিত্যের অর্থ বঙ্গ-সাহিত্য নয়। শিশুদের জন্য বাঙ্গলা ভাষায় যে সাহিত্যের আজকাল নিত্য-নব সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই সাহিত্যই আমার বিচার্য্য।

শিশু-সাহিত্য বলে কোনও জিনিষ আছে কি না? যা বিশেষ করে শিশুদের জন্যই লেখা হয়, তাকে সাহিত্য বলা চলে কি না?— এ বিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে; আমার মনে কিন্তু নেই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিশু সাহিত্য বলে কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নেই, এবং থাক্‌তে পারে না। কেননা শিশু-পছন্দ সাহিত্য শিশু ব্যতীত অপর কেউ রচনা কর্‌তে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর যে অত্যাচারই করুক না কেন, সাহিত্য রচনা করে না।

বিলেতে Children's সাহিত্য থাকতে পারে, এদেশে নেই; কেননা সে দেশের Child এর সঙ্গে এদেশের শিশুর ঢের তফাৎ—বয়েসে। এদেশে আর কিছু বাড়ুক আর না বাড়ুক, বয়েস বাড়ে,—আর সে এত তেড়ে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত সত্বর শৈশব অতিক্রম করে, পৃথিবীর অপর কোনও দেশে তত শীঘ্র করে না; অন্ততঃ এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। ফলে, যে বয়সে ইউরোপের মেয়েরা ছেলেখেলা করে, সেই বয়সে আমাদের মেয়েরা ছেলে মানুষ করে। এবং সেই ছেলে যাতে শীঘ্র মানুষ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা শৈশবের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের বেশি দিই নে। আজকাল আবার দেখতে পাই, অনেকে তার মধ্যেও দু'বছর কেটে নেবার পক্ষপাতী। শৈশবটা হচ্ছে মানব-জীবনের পতিত জমি; এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই পতিত জমি যত শীঘ্র আবাদ করা যাবে, ততে—তত বেশী সোণা ফলবে।

বাপমা'র এই সুবর্ণের লোভবশতঃ, এদেশের ছেলেদের বর্ণ-পরিচয়টা অতি শৈশবেই হয়ে থাকে। একালের শিক্ষিত লোকেরা ছেলে হাঁটতে শিখলেই তাকে পড়তে বসান। শিশুদের উপর এরূপ অত্যাচার করাটা যে ভবিষ্যৎ বাঙ্গালী জাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কেননা, যে শৈশবে শিশু ছিল না, সে যৌবনে যুবক হতে পারবে না। আর এ কথা বলা বাহুল্য, শিশু-শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুর শিশুত্ব নষ্ট করা। অর্থাৎ যার আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি অপরিমিত, তাকে জ্ঞানের ভোগ ভোগানো। সে ভোগ যে কি কর্ম্মভোগ, তা চেষ্টা করলে আমরাও কল্পনা করতে পারি। ধরুন যদি আমরা স্বর্গে যাবামাত্র স্বর্গীয় মাষ্টারমহাশয়দের দল এসে আমাদের স্বর্গরাজ্যের হিস্টরি জিওগ্রাফি শেখাতে, এবং দেবভাষার শিশু-

বোধ ব্যাকরণ মুখস্ত করাতে বসান, তাহলে আমাদের মধ্যে ক'জন নির্ব্বাণ মুক্তির জন্য লালায়িত না হবেন? আর এ কথাও সত্য যে, শিশুর কাছে এ পৃথিবী স্বর্গ। তার কাছে সবই আশ্চর্য্য, সবই চমৎকার, সবই আনন্দময়।

এ সব কথা অবশ্য বলা বৃথা, কেননা আমরা শিশুকে শিক্ষা দেবই দেব। মেয়েরা কথায় বলে, "পড়লে শুনলে দুধু ভাতু, না পড়্‌লে ঠেঙ্গার গুতো"। কথাটা অবশ্য ষোল-আনা সত্য নয়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, সরস্বতীর বরপুত্রেরাই লক্ষ্মীর ত্যাজ্যপুত্র; আমাদের কিন্তু মেয়েলি-শাস্ত্রে ভক্তি এত অগাধ যে, আমরা ছেলেদের ভবিষ্যতের "দুধু-ভাতুর" ব্যবস্থা করবার জন্য বর্ত্তমানে দু'বেলা "ঠেঙ্গার গুতোর" ব্যবস্থা করি। ছেলেদের দেহমনের উপর মারপিট, বছর সাতেকের জন্য মুলতবি রাখলে যে কিছু ক্ষতি হয়—অবশ্য তা নয়। যে ছেলে সাত বৎসর বয়সে "সিদ্ধিরস্তু" লিখ্‌বে, তিন সাত্তা একুশ বৎসর বয়সে তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে; অর্থাৎ সে সাবালক হবার সঙ্গে সঙ্গেই উপাধিগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিষ্কৃতি লাভ কর্‌বে। তবে যদি কারও চৌদ্দ বৎসরেও স্কুলবাস অন্ত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভগবান তার কপালে উপবাস লিখেছেন। তাকে যতদিন ধরে যতই লেখাও, সে ঐ এক কপালের লেখাই লিখ্‌বে।

শিশু-শিক্ষা জিনিষটে আমরা কেউ বন্ধ কর্‌তে পার্‌ব না—কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ও-ব্যাপারের যোগাড় দেওয়া উচিত? সাহিত্যের কাজ ত আর সমাজকে এলম দেওয়া নয়,—আক্কেল দেওয়া। সুতরাং আমরা যদি পাঁচ বছর বয়সের ছেলের যোগ্য এবং উপভোগ্য সাহিত্য লিখ্‌তেও পারি, তাহলেও আশা করি কোনও পাঁচবছরের ছেলে তা

পড়্‌তে পার্‌বে না। আর ও-বয়সের কোনও ছেলে যদি পঠনপাঠনে অভ্যস্ত হয়—তাহলে তার হাতে শিশু-সাহিত্য নয়, বেদান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য। কেননা সে যত শীঘ্র "বালাযোগী" হয়, তত তার এবং সমাজের উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। প্রথমতঃ ওরকম ছেলের বাঁচা কঠিন, আর যদি সে বাঁচে তাহলে সমাজের বাঁচা কঠিন। কেননা অমন সুপুত্র বাঁচলে—হয় একটি বিগ্রহ, নয় গ্রহ হতে বাধ্য। অকাল-পক্কতার প্রশ্রয় দেওয়াটা একেবারেই অন্যায়; কেননা কাঁচা একদিন পাক্‌তে পারে, কিন্তু অকালপক্ক আর ইহজীবনে কাঁচ্‌তে পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে। শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়সে সর্ব্বশাস্ত্রের পারগামী হওয়ার দরুণ, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের হৃদয়মন যে কতদূর ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল—তার পরিচয় তিনি নিজ-মুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বৃদ্ধ বয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।

অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশু-সাহিত্য বলে কোনও জিনিষ নেই, এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সংকল্প অতি সাধু। কেননা শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায়,—অর্থাৎ আনন্দ—সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। পৃথিবীতে অবশ্য সাধুসংকল্প মাত্রেই আমরা কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারিনে। সুতরাং এস্থলে জিজ্ঞাস্য, আমরা পণ করে বসলেই কি সে সাহিত্য রচনা কর্‌তে পারব? আমি বলি,—না। এর প্রমাণ, ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়্‌তে ভালবাসে, তা মুখ্যতঃ কি গৌণতঃ ছেলেদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিল। রূপকথা, রামায়ণ, মহাভারত, আরব্য উপন্যাস, Don Quixote, Gulliver's Travels, Robinson

Crusoe,—এ সবের কোনটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয়।

আসলে ছেলেরা ভালবাসে শুধু রূপকথা,—স্বরূপ কথাও নয়, অরূপ কথাও নয়; অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়। উপরে যে সব বইয়ের নাম করা গেল, তার প্রতিটিতেই রূপকথার রূপ আছে। আমরা যে শিশু-সাহিত্য রচনা করতে পারিনে, তার কারণ আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরি করতে পারি নে। যে যুগে রূপকথার সৃষ্টি হয়, সে যুগ হচ্ছে মানব-সভ্যতার শৈশব। সেকালে লোক মনে শিশু ছিল, সে যুগে সম্ভব অসম্ভবের ভেদজ্ঞান মানুষের মনে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একালের আমরা মনে জানি সবই অসম্ভব, আর ছেলেরা মনে করে সবই সম্ভব। তা ছাড়া, আমাদের কাছে পৃথিবীর সব জিনিষই আবশ্যক, কোন জিনিষই চমৎকার নয়; আর ছেলেদের কাছে সব জিনিষই চমৎকার, কোন জিনিষই আবশ্যক নয়।—সুতরাং আমাদের পক্ষে তাদের মনোমত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।

এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরূপ-কথা হয়ে দাঁড়ায়,—যথা Don Quixote, Gulliver's Travels ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ জাতের রূপকথা রচনা করবার জন্য অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক। অসম্ভবকে সম্ভব, কল্পনাকে বাস্তব করে তোলা,—এক কথায় বস্তুজগতের নিয়ম অতিক্রম করে একটি নববস্তুজগৎ গড়ে তোলা, তোমার আমার কর্ম্ম নয়। আর যাঁর অসামান্য প্রতিভা

আছে, তাঁর বই লেখার উদ্দেশ্য ছেলেদের এ বোঝানো নয় যে, তারা মনে পাকা,—কিন্তু বুড়োদের এই বোঝানো যে, তারা মনে কাঁচা। বয়সে বৃদ্ধ কিন্তু মনে বালক, এমন সাহিত্যিক যে নেই, একথা আমি বল্‌তে চাই নে। কিন্তু সে সাহিত্যিকের দ্বারাও শিশু-সাহিত্য রচিত হতে পারে না, তার কারণ—ছোট ছেলে ও বুড়োখোকা, এ দুই একজাতীয় জীব নয়। বয়স্কলোকের বালিশতার মূল হচ্ছে সত্য ধরবার অক্ষমতা, আর বালকের বালকত্বের মূল হচ্ছে কল্পনা করবার সক্ষমতা। সুতরাং আমার মতে, বিশেষ করে শিশু-সাহিত্য রচনা হতে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবতঃ তা শিশু সাহিত্যই হবে।

বীরবল।

একটি সাদা গল্প।

——— ঃ০ঃ ———

আমরা পাঁচজনে গল্পলেখার আর্ট নিয়ে মহাতর্ক কর্‌ছিলুম, এমন সময়ে সদানন্দ এসে উপস্থিত হলেন। তাতে অবশ্য তর্ক বন্ধ হ'ল না, বরং আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে তা চালাতে লাগলুম—এই আশায় যে তিনি এ আলোচনায় যোগ দেবেন; কেননা আমরা সকলেই জানতুম এই বন্ধুটি হচ্ছেন একজন ঘোর তার্কিক। M.A. পাস করবার পর থেকে অদ্যাবধি এক তর্ক ছাড়া তিনি আর কিছু করেছেন বলে আমরা জানিনে। কিন্তু তিনি, কেন জানিনে, সেদিন একেবারে চুপ করে রইলেন। শেষটা আমরা সকলে একবাক্যে তাঁর মত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন,—আমি একটি গল্প বলছি, শোনো, তারপর সারা রাত ধরে তর্ক করো। তখন সে তর্ক ফাঁকা তর্ক হবে না।

সদানন্দের কথা।

আমি যে গল্প বল্‌তে যাচ্ছি, তা অতি সাদাসিধে। তার ভিতর কোনও নীতিকথা কিম্বা ধর্ম্মকথা নেই, কোনও সামাজিক সমস্যা নেই, অতএব তার মীমাংসাও নেই,—এমন কি, সত্য কথা বল্‌তে গেলে কোন ঘটনাও নেই। ঘটনা নেই বল্‌ছি এইজন্যে যে, যে ঘটনা আছে তা বাঙ্গলা দেশে নিত্য ঘটে থাকে,—অর্থাৎ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে। আর হাজারে নশ' নিরনব্বইটি মেয়ের যে-ভাবে বিয়ে হয়ে থাকে, এ বিয়েও ঠিক সেই ভাবে হয়েছিল; অর্থাৎ এ ব্যাপারের মধ্যে পূর্ব্ব-

রাগ, অনুরাগ প্রভৃতি গল্পের খোরাক কিছুই ছিল না। তোমরা জিজ্ঞেস করতে পার যে, যে-ঘটনার ভিতর কিছুমাত্র বৈচিত্র্য কিম্বা নূতনত্ব নেই, তার বিষয় বল্‌বার কি আছে?—এ কথার আমি ঠিক উত্তর দিতে পারি নে। তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, যে-ঘটনা নিত্য ঘটে, এবং বহুকাল থেকেই ঘটে আসছে, হঠাৎ এক একদিন তা যেন অপূর্ব্ব অদ্ভুত বলে মনে হয়,—কিন্তু কেন যে হয়, তাও আমরা বুঝতে পারি নে। যে বিয়েটির কথা তোমাদের আমি বল্‌তে যাচ্ছি, তা মামুলি হলেও আমার কাছে একেবারে নতুন ঠেকেছিল। তাই চাইকি তোমাদের কাছেও তা অদ্ভুত মনে হতে পারে,—সেই ভরসায় এ গল্প বলা।

এ গল্প হচ্ছে শ্যাম বাবুর মেয়ের বিয়ের গল্প। শ্যামবাবুর পুরো নাম শ্যামলাল চাটুয্যে, এবং তিনি আমার গ্রামের লোক।

শ্যামলাল যে-বৎসর হিষ্টরির M.A.তে ফার্ষ্ট হন, তার পরের বৎসর যখন তিনি ফার্ষ্ট ডিভিসনে B.L পাস করে কলেজ থেকে বেরলেন, তখন তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা তাঁকে হাইকোর্টের উকীল হবার জন্য বহু পীড়াপীড়ি করেন। শ্যামলাল যে দশ পোনেরো বৎসরের মধ্যেই হাইকোর্টের একজন হয় বড় উকীল, নয় অন্ততঃ জজ্ হবেন, সে বিষয়ে তাঁর আপনার লোকের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না। কেন না যা যা থাক্‌লে মানুষ জীবনে কৃতী হয়, শ্যামলালের তা সবই ছিল,—সুস্থ শরীর, ভদ্র চেহারা, নিরীহ প্রকৃতি, স্থির বুদ্ধি, কাজে গা ও কাজে মন। কিন্তু শ্যামলাল তাঁর আত্মীয়স্বজনের কথা রাখলেন না। উকীল হতে তাঁর এমন অপ্রবৃত্তি হল যে, কেউ তাঁকে তাতে রাজি করতে পার্‌লেন না;—এ অনিচ্ছার কারণও কেউ বুঝতে পার্‌লেন না।

তাঁর আত্মীয়েরা শুধু দেখতে পেলেন যে উকীল হবার কথা শুনলেই একটা অস্পষ্ট ভয়ে তিনি অভিভূত হয়ে পড়্তেন। তাই তাঁরা ধরে নিলেন যে এ হচ্ছে সেই জাতের ভয়, যা থাকার দরুণ কোন কোন মেয়ে ছুড়্কো হয়; ও একটা ব্যারামের মধ্যে, সুতরাং কি বকে ঝকে, কি বুঝিয়ে সুঝিয়ে কোনমতে ও রোগ সারানো যাবে না। অতঃপর তাঁরা হারমেনে শ্যামলালকে ছেড়ে দিলেন; তিনিও অমনি মুন্সেফী চাকরি নিলেন।

তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা যাই ভাবুন, শ্যামলাল কিন্তু নিজের পথ ঠিক চিনে নিয়েছিলেন। যার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না, অনেক সময়ে দেখতে পাওয়া যায়, সেই অবাধ্য প্রবৃত্তি কিম্বা অপ্রবৃত্তিগুলোই মানুষের প্রধান সুহৃৎ। শ্যামলাল হাইকোর্টে ঢুকলে উপরে ওঠা দূরে থাক, একেবারে নীচে তলিয়ে যেতেন। তাঁর ঘাড়ে কেউ কোন কাজ চাপিয়ে দিলে এবং তা কর্‌বার বাঁধাবাঁধি পদ্ধতি দেখিয়ে দিলে, শ্যামলাল সে কাজ পূরোপূরি এবং আগাগোড়া নিখুঁৎ ভাবে কর্‌তে পারতেন। কিন্তু নিজের চেষ্টায় জীবনে নিজের পথ কেটে বেরিয়ে যাবার সাহস কি শক্তি তাঁর শরীরে লেশমাত্র ছিল না। পৃথিবীতে কেউ জন্মায় চরে খাবার জন্য, কেউ জন্মায় বাঁধা খাবার জন্য। শ্যামলাল শেষোক্ত শ্রেণীর জীব ছিলেন।

পৃথিবীতে যতরকম চাকরি আছে, তার মধ্যে এই মুন্সেফীই ছিল তাঁর পক্ষে সব চাইতে উপযুক্ত কাজ। এ কাজে ঢোকার অর্থ কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ করা নয়, ছাত্রজীবনেরই মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অন্ততঃ শ্যামলালের বিশ্বাস তাই ছিল, এবং সেই সাহসেই তিনি ঐ কাজে ভর্ত্তি হন। এতে চাই শুধু আইন পড়া আর রায় লেখা।

পড়ার ত তাঁর আশৈশব অভ্যাস ছিল, আর রায় লেখাকে তিনি এগজামিনে প্রশ্নপত্রের উত্তর লেখা হিসেবে দেখতেন। ইউনিভার-সিটির এগজামিনের চাইতে এ এগজামিন দেওয়া তাঁর পক্ষে ঢের সহজ ছিল, কারণ এতে বই দেখে উত্তর লেখা যায়।

(২)

চাকরির প্রথম পাঁচ বৎসর তিনি চৌকিতে চৌকিতে ঘুরে বেড়ান। সে সব এমন জায়গা, যেখানে কোন ভদ্রলোকের বসতি নেই, কাজেই কোন ভদ্রলোক তাদের নাম জানে না। শ্যামলালের মনে কিন্তু সুখ সন্তোষ দুই ছিল। জীবনে যে দুটি কাজ তিনি কর্‌তে পারতেন—পড়া মুখস্থ করা এবং পরীক্ষা দেওয়া—এ ক্ষেত্রে সে দুটির চর্চ্চা কর্‌বার তিনি সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে Tenancy Act, Limitation Act এবং Civil Procedure Codeএর তিনি এতটা জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলেন যে, সে পরিমাণ মুখস্থ বিদ্যা যদি হাইকোর্টের সকল জজের থাকত, তাহলে কোন রায়ের বিরুদ্ধে আর বিলেত-আপীল হত না।

শ্যামলালের স্ত্রী বরাবর সঙ্গেই ছিলেন—কিন্তু তাঁর মনে সুখও ছিল না, সন্তোষও ছিল না; কেননা যে সব জিনিসের অভাব শ্যামলাল একদিনের জন্যও বোধ করেন নি, তাঁর স্ত্রী সে সকলের—অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের অভাব, মেলামেশার লোকের অভাব, এমন কি কথা কইবার লোকের পর্য্যন্ত অভাব—প্রতিদিন বোধ কর্‌তেন।

চাকরির প্রথম বৎসর না যেতেই শ্যামলালের একটি ছেলে হয়। সেই ছেলে হবার পর থেকেই তাঁর স্ত্রী শুখিয়ে যেতে লাগলেন,—ফুল যেমন

করে শুখিয়ে যায়, তেমনি করে—অর্থাৎ অলক্ষিতে এবং নীরবে। শ্যামলাল কিন্তু তা লক্ষ্য করলেন না। শ্যামলাল ছিলেন এক-বুদ্ধির লোক। তিনি যে কাজ হাতে নিতেন, তাতেই মগ্ন হয়ে যেতেন; তার বাইরের কোনও জিনিসে তাঁর মনও যেত না, তাঁর চোখও পড়ত না। তা ছাড়া তাঁর স্ত্রীর অবস্থা কি হচ্ছে, তা লক্ষ্য কর্‌বার তাঁর অবসরও ছিল না। ঘুম থেকে উঠে তিনি রায় লিখতে বসতেন; সে লেখা শেষ করে তিনি আপিসে যেতেন; আপিস থেকে ফিরে এসে আইনের বই পড়তেন; তারপর রাত্তিরে আহারান্তে নিদ্রা দিতেন। তাঁর স্ত্রী এই বনবাস থেকে উদ্ধার পাবার জন্ম স্বামীকে কোন লোকালয়ে বদ্‌লি হবার চেষ্টা কর্‌তে বারবার অনুরোধ কর্‌তেন, কিন্তু শ্যামলাল বরাবর একই উত্তর দিতেন। তিনি বল্‌তেন, "তোমরা স্ত্রীলোক, ও সব বোঝোঁ না; চেষ্টা চরিত্তির করে এ সব জিনিস হয় না। কাকে কোথায় রাখবে, সে সব উপরওয়ালারা সবদিক ভেবে চিন্তে ঠিক করে। তার আর বদল হবার জো নেই।" আসল কথা এই যে, তিনি বদ্‌লি হবার কোনও আবশ্যকতা বোধ কর্‌তেন না. কেননা তাঁর কাছে লোকসমাজ বলে পদার্থের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আর তা ছাড়া সাহেব-সুবোর কাছে উপস্থিত হয়ে দরবার করা, তাঁর সাহসে কুলতো না। তাঁর স্ত্রী অবশ্য এতে অত্যন্ত দুঃখিত হতেন,—কেননা তিনি একথা বুঝতেন না যে, নিজ চেষ্টায় কিছু করা তাঁর স্বামীর পক্ষে অসম্ভব।

ফলে, আলো ও বাতাসের অভাবে ফুল যেমন শুখিয়ে যায়, শ্যাম-লালের স্ত্রী তেমনি শুখিয়ে যেতে লাগলেন। আমি ঘুরেফিরে ঐ ফুলের তুলনাই দিচ্ছি, তার কারণ শুন্‌তে পাই সেই ব্রাহ্মণকন্যা শরীরে

ও মনে ফুলের মতই সুন্দর, ফুলের মতই সুকুমার ছিলেন ; এবং তাঁর বাঁচবার জন্তে আলো ও বাতাসের দর্শন ও স্পর্শনের প্রয়োজন ছিল। ছেলে হবার চার বৎসর পরে তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করে আঁতুড়েই মারা গেলেন।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল অতিশয় কাতর হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে কত ভালবাসতেন, তা তিনি স্ত্রী-বর্ত্তমানে বোঝেন নি, তার অভাবেই মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করলেন। জীবনে তিনি এই প্রথম শোক পেলেন; কেননা তাঁর মা ও বাবা তাঁর শৈশবেই মারা যান, এবং তাঁর কোন ভাইবোন কখন জন্মায় নি, সুতরাং মরেও নি। সেই সঙ্গে তিনি এই নতুন সত্যের আবিষ্কার করলেন যে, মানুষের ভিতর হৃদয় বলে একটা জিনিস আছে—যা মানুষকে শাসন করে, এবং মানুষে যাকে শাসন করতে পারে না।

স্ত্রীর মৃত্যুতে শ্যামলাল এতটা অভিভূত হয়ে পড়লেন যে, তিনি নিশ্চয়ই কাজকর্ম্মের বার হয়ে যেতেন, যদি না তাঁর একটি চার বৎসরের ছেলে আর একটি চার দিনের মেয়ে থাকত। তাঁর মন ইতিমধ্যে তাঁর অজ্ঞাতসারে জীবনের মধ্যে অনেকটা শিকড় নামিয়েছিল। তিনি দেখলেন যে, এই দুটি ক্ষুদ্র প্রাণী নিতান্ত অসহায়, এবং তিনি ছাড়া পৃথিবীতে এদের অপর কোন সহায় নেই। তাঁর নব-আবিষ্কৃত হৃদয় তাঁর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যে, চাকরীর দাবী ছাড়া পৃথিবীতে আরও পাঁচরকমের দাবী আছে, এবং কলেজ ও আদালতের পরীক্ষা ছাড়া মানুষকে আরও পাঁচরকমের পরীক্ষা দিতে হয়। তাঁর মনে এই ধারণা জন্মাল যে, তিনি তাঁর স্ত্রীকে অবহেলা করেছেন; এ জ্ঞান হওয়ামাত্র তিনি মনঃস্থির করলেন যে, তাঁর ছেলে-মেয়ের জীবনের

সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি নিজের এবং একমাত্র নিজের ঘাড়েই নেবেন। স্বামী হিসেবে তাঁর কর্ত্তব্য না পালন করারূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তিনি সন্তানপালনের দ্বারা কর্‌তে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

এই জীবনের পরীক্ষা তিনি কি ভাবে দিয়েছিলেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল, সেই কথাটাই হচ্ছে এ গল্পের মোদ্দা কথা।

(৩)

শ্যামলাল আর বিবাহ করেন নি;—তার কারণ, প্রথমতঃ তাঁর এ বিষয়ে প্রবৃত্তি ছিল না, দ্বিতীয়তঃ তিনি তা অকর্ত্তব্য মনে কর্‌তেন। তারপর তাঁর মেয়েটির মুখের দিকে তাকালে, আবার নতুন এক স্ত্রীর কথা মনে হলে তিনি আঁৎকে উঠতেন। তাঁর মনে হত ঐ মেয়েটিতে তাঁর স্ত্রী তার শরীরমনের একটি জীবন্ত স্মরণচিহ্ন রেখে গিয়েছে।

কোনও কাজ হাতে নিয়ে তা আধা-খেঁচড়া ভাবে করা শ্যামলালের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সুতরাং এই সন্তান-লালনপালনের কাজ তিনি তাঁর সকল মন, সকল প্রাণ দিয়ে করেছিলেন। শ্যামলাল যেমন তাঁর সকল মন একটি জিনিসের উপর বসাতে পার্‌তেন, তেমনি তিনি তাঁর সকল হৃদয় দুটি একটি লোকের উপরও বসাতে পার্‌তেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর সকল হৃদয় তাঁর ছেলে-মেয়ে অধিকার করে বসেছিল; সুতরাং তাঁর হৃদয়বৃত্তির একটি পয়সাও বাজে খরচে নষ্ট হয় নি। ফলে তাঁর ছেলে ও মেয়ে শরীরে ও মনে অসাধারণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। কেননা এ কাজে শ্যামলালের ভালবাসা তাঁর কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রবল সহায় হয়েছিল।

তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি চৌকির হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে, বছর দশেক মহাকুমায় মহাকুমায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে সব দুর্গম স্থানে;—পটুয়াখালি, দক্ষিণ শাহাবাজপুর, কক্সবাজার, জেহানাবাদ প্রভৃতিই ছিল তাঁর কর্ম্মস্থল। আজ এখানে, কাল ওখানে;—এই কারণে তিনি তাঁর ছেলেকে স্কুলে দিতে পারেন নি, ঘরে রেখে নিজেই পড়িয়ে ছিলেন। বলা বাহুল্য বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁর সঙ্গে ও সব জায়গার কোন স্কুল-মাষ্টারের তুলনাই হতে পারে না। ফলে বীরেন্দ্রলাল যখন ১৫ বৎসর বয়সে প্রাইভেট ষ্টুডেন্ট হিসেবে ম্যাট্রিকুলেশান দিলে, তখন সে অক্লেশে ফার্ষ্ট ডিভিসনে পাস করলে।

শ্যামলাল তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর আবার বই পড়তে সুরু করলেন,—কিন্তু আইনের নয়। তার কারণ ইতিমধ্যে আগাগোড়া দেওয়ানি-আইন মায় নজির তাঁর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং নূতন Law-reports ছাড়া তাঁর আর কিছু পড়বার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বইপড়া ছাড়া সন্ধ্যেটা কাটাবার আর কোন উপায়ও ছিল না। সুতরাং শ্যামলাল হিষ্টরি পড়তে সুরু করলেন,—কেননা সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র হিষ্টরিই ছিল তাঁর প্রিয় বস্তু। ঐ হিষ্টরিই ছিল তাঁর কাব্য, তাঁর দর্শন, তাঁর নভেল, তাঁর নাটক। তিনি ছুটির সময় এক একবার কল্‌কাতায় গিয়ে সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বইয়ের দোকান থেকে সস্তায় হিষ্টরির যে বই পেতেন, তাই কিনে আনতেন,—তা সে যে-দেশেরই হোক, যে-যুগেরই হোক, আর যে লেখকেরই হোক। ফলে তাঁর কাছে সেই সব ইতিহাসের কেতাব জমে গিয়েছিল—যা এদেশে আর কেউ বড়-একটা পড়ে না। যথা, Gibbon's Decline and Fall, Mill's History of India, Grote's Greece, Plutarch's

Lives, Macaulay's History of England, Lamartine's History of the Girondists, Michelet's French Revolution, Cunningham's History of the Sikhs, Tod's Rajasthan ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রলাল বারো তেরো বছর বয়েস থেকেই, ভাল করে বুঝুক আর না বুঝুক, এই সব বই পড়্তে সুরু করেছিল; এবং পড়্তে পড়্তে শুধু ইতিহাসে নয়, ইংরেজিতেও সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ বীরেন্দ্রলাল নিজের শিক্ষার ভার নিজের হাতে নিয়েছিল—কিন্তু শ্যামলাল তা লক্ষ্য করেন নি।

ম্যাট্রিকুলেশান পাস করবার পর শ্যামলাল ছেলেকে কলেজে পড়্বার জন্য কল্‌কাতায় পাঠাতে বাধ্য হলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেহারে বদ্‌লি হয়ে গেলেন। তারপর চার বৎসরের মধ্যে বীরেন্দ্রলাল অবলীলাক্রমে ফার্ষ্ট ডিভিসনে I. A. এবং B. A. পাস কর্‌লে। তাঁর ছেলের পরীক্ষা পাস করবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখে, শ্যামলাল মনঃস্থির করলেন যে, তাকে M. A. পাসের পর Civil Serviceএর জন্য বিলেতে পাঠাবেন। বীরেন্দ্রলাল যে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে, সে বিষয়ে তার বাপের মনে কোনও সন্দেহ ছিল না।

বিলেতে ছেলে পড়্বার টাকারও তাঁর সংস্থান ছিল। শ্যামলাল জানতেন যে, খাওয়ার উদ্দেশ্য জীবন ধারণ করা এবং পরার উদ্দেশ্য লজ্জা নিবারণ করা; সুতরাং তাঁর সংসারে কোনরূপ অপব্যয় কিম্বা অতিব্যয় ছিল না। কাজেই তাঁর হাতে দশ বারো হাজার টাকা জমে গিয়েছিল।

ছেলে কল্‌কাতায় পড়্তে যাবার পর থেকে শ্যামলালের দৈনিক জীবনের একমাত্র অবলম্বন হ'ল তাঁর কন্যা। ইতিমধ্যে ছেলে

পড়ানো তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল যে, কাউকে না কিছু পড়িয়ে তিনি আর একদিনও থাক্‌তে পার্‌তেন না। কাজেই তিনি তাঁর সকল অবসর তাঁর এই কন্যার শিক্ষায় নিয়োগ করলেন। তাঁর যত্নে, তাঁর শিক্ষায়, তাঁর মেয়ের মন,—ফুল যেমন উপরের দিকে, আলোর দিকে মাথা তুলে ফুটে ওঠে,—সেইরকম ফুটে উঠতে লাগল। লোকালয়ের বাইরে থাকায় তার চরিত্রও ফুলের মত শুভ্র এবং ফুলের মতই নিষ্কলঙ্ক হয়ে উঠেছিল। শ্যামলাল, তাঁর মেয়েকে এত লেখাপড়া শেখাবার, এত বড় করে রাখবার ভবিষ্যৎ ফল যে কি হবে, তা ভাববার অবসর পান নি। তাঁর মনে শুধু একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল যে, একদিন তাঁর মেয়ের বিবাহ দিতে হবে; তবে কবে এবং কার সঙ্গে, সে বিষয়ে তিনি কখন কিছু চিন্তা করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর মেয়ের বিয়ের ভাবনা নেই; অমন স্ত্রী পেলে, যে-কোন সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক নিজেকে ধন্য মনে কর্‌বে। আসল কথা, সমাজ বলে যে একটি জিনিস আছে, সে কথাটা তিনি সমাজ থেকে দূরে এবং আলগা থাকার দরুণ একরকম ভুলেই গিয়েছিলেন। তাঁর মেয়ে যে অনায়াসে Tod's Rajasthan এবং Plutarch's Lives পড়্‌তে পারে, এতেই তিনি তাঁর জীবন সার্থক মনে কর্‌তেন। ফলে, তাঁর ছেলে যখন M. A. দেবার উদ্যোগ কর্‌ছে, তখন তিনি তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবার কোন উদ্যোগ করলেন না; যদিচ তখন তার বয়েস প্রায় ষোলো। তাঁর মেয়ের জন্য যে একটি স্বামী-দেবতা কোন অজ্ঞাত গোকুলে বাড়ছে, এবং সে স্বামী যে দেবতুল্য হবে, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ ছিল না।

এই সময়ে শ্যামলালের জীবনে একটি অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটল। এক-

দিন তিনি, তাঁর কর্ম্মস্থলে, তারে খবর পেলেন যে বীরেন্দ্রলাল কোন পলিটিকাল অপরাধে কল্‌কাতায় গ্রেপ্তার হয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর বাড়ীও খানাতল্লাসা হ'ল। তাঁর ছেলের যে কস্মিনকালে ফৌজদারি আদালতে বিচার হতে পারে, এ কথা তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নি। সুতরাং এ সংবাদে তিনি একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়্‌লেন। ব্যাপারটা তাঁর কাছে এতই নতুন লাগল যে, এ ক্ষেত্রে তাঁর কি করা কর্ত্তব্য তিনি ঠাউরে উঠতে পারলেন না; কেননা নূতনের সঙ্গে কারবার করবার অভ্যাস তাঁর ছিল না। কাজেই তাঁকে তাঁর মেয়ের পরামর্শমত চলতে হল। তিনি উকীল কৌঁস্থলি দিয়ে বীরেন্দ্রলালকে রক্ষা করবার চেষ্টা কর্‌লেন। ফলে, তাঁর ছেলে রক্ষা পেলে না; মধ্যে থেকে তাঁর যা-কিছু টাকা ছিল, সব উকীল কৌঁস্থলির পকেটে গেল। এই নতুনের সংঘর্ষে শ্যামলালের জীবনের জোড়া-সুখস্বপ্নের মধ্যে একটি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, আর তাঁর কন্যার ফুটন্ত ফুলের মত মনটির উপর বরফ পড়ে গেল।

এর পরে শ্যামলালের দেহমনে এমন অবসাদ, এমন জড়তা এসে পড়্‌ল যে, তাঁর পক্ষে আর কাজ করা সম্ভব হলনা। তিনি এক বৎসরের ছুটির দরখাস্ত কর্‌লেন; এবং সে দরখাস্ত তখনই মঞ্জুর হল। কেননা উপরওয়ালাদের মতে, তাঁর ছেলের মতি-ভ্রংশতার জন্য শ্যামলালও যে কতকটা দায়ী, তার প্রমাণ তাঁর ঘরের বই। এ শুনে শ্যামলাল অবাক্ হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন হিষ্টরি হচ্ছে শুধু পড়্‌বার জিনিস, মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যে কোন যোগাযোগ থাক্‌তে পারে, এ কথা পূর্ব্বে কখন তাঁর মনে হয় নি।

(৪)

ছুটি নিয়ে শ্যামলাল বাড়ী যাবেন স্থির কর্‌লেন। আজ বিশ বৎসর পর তাঁর মনে আবার দেশের মায়া জেগে উঠ্‌ল। তাঁর মনে ছেলেবেলাকার সুখের স্মৃতি সব ফিরে এল; তাঁর মনে হল তাঁর পুর্ব্বপুরুষের বাস্তুভিটাই হচ্ছে পৃথিবীতে একমাত্র স্থান যেখানে শান্তি আছে,—ও যেন মায়ের কোল। শ্যামলাল সেই মায়ের কোলে ফিরে গেলেন, কিন্তু তাঁর কপালে শান্তি জুট্‌ল না।

দেশে পদার্পণ কর্‌বামাত্র তিনি ঘোরতর অশান্তির মধ্যে পড়ে গেলেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা একবাক্যে তাঁকে ছিছি কর্‌তে লাগল। মেয়ে এত বড় হয়েছে অথচ বিয়ে হয় নি, তার উপর সে আবার পুরুষের মত লেখাপড়া জানে,—এই দুই অপরাধে তাঁর মেয়েকেও দিবারাত্র নানারূপ লাঞ্ছনাগঞ্জনা সহ্য কর্‌তে হল।

এই লোকনিন্দায় শ্যামলাল এতটা ভয় খেয়ে গেলেন যে, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্য একেবারে উতলা হয়ে উঠলেন। পাঁচজনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি, শ্যামলালের ধাতে ছিল না।

তাঁর মেয়ের জন্য পাত্র খোঁজবার ভার শ্যামলাল তাঁর খুড়োর হাতে দিলেন। তাঁর খালি এই একটি সর্ত্ত ছিল যে, পাত্র পাসকরা ছেলে হওয়া চাই। তাঁর মেয়ে যে মূর্খের হাতে পড়বে, একথা ভাবতেও তাঁর বুকের রক্ত জল হয়ে যেত।

কিন্তু তাঁর এ পণ বেশী দিন টি'ক্‌ল না, কেননা ও মেয়েকে বিয়ে কর্‌তে কোন পাসকরা যুবক স্বীকৃত হল না।

কারও কারও নারাজ হবার কারণ হল, মেয়ের বয়েস। যদিচ তার বয়েস তখন ষোলো, তবু জনরবে স্থির হল বিশ। এও শ্যাম-

লালের খুড়োর দোষে। তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন,—শ্রীমতীর বয়েস বারো, পশ্চিমের আবহাওয়ার গুণে বাড়টা কিছু বেশী হয়েছে বলে দেখতে ষোলো দেখায়। তিনি যদি নাতনীর বয়েস চার বৎসর কমাতে না চেষ্টা করতেন, তাহলে আমার বিশ্বাস লোকমুখে তা চার বৎসর বেড়ে যেত না।

কারও বা নারাজ হবার কারণ, মেয়ের শিক্ষা। ইংরাজিপড়া মেয়ে যে মেম হয়েছে, সে বিষয়ে গ্রামের লোকের মনে কোন সন্দেহ ছিল না। আর মেম-বউ ঘরে আনবার মত বুকের পাটা ক'জনের আছে? অবশ্য এ ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না। বিলাসিতা তার শরীরমনকে তিলমাত্রও স্পর্শ করে নি, এবং নেপথ্যবিধান করাটা যে নারী-ধর্ম্ম, এ জ্ঞানলাভ করবার তার কখন সুযোগ ঘটে নি।

অধিকাংশ পাত্রের নারাজ হবার কারণ, শ্যামলালের বরপণ দেবার অসামর্থ্য। তাঁর চিরজীবনের সঞ্চিত ধন তিনি বর্ত্তমান উকীল কৌঁসুলিদের দিয়ে বসেছিলেন, ভাবী উকীল কৌঁসুলিদের জন্য কিছুই রাখেন নি।

এর জন্য আমি কাউকে দোষ দিই নে, কেননা এ মেয়ে বিয়ে করতে আমিও রাজি হই নি; যদিচ আমি জানতুম যে, শ্যামলালের আমার উপরই সব চাইতে বেশী ঝোঁক ছিল। আমার নারাজ হবার একটু বিশেষ কারণ ছিল। শ্রীমতীর নামে গ্রামের লোকে নানারূপ কুৎসা রটিয়েছিল,—তার কারণ, সে শুধু ষোড়শী নয়, অসাধারণ রূপসী। আমি অবশ্য সে কুৎসার এক বর্ণও বিশ্বাস করি নি; কিন্তু আমি বয়েসকে ভয় না করলেও, রূপকে ভয় করতুম।

সে যাই হো'ক, মাস পাঁচ ছয় চেষ্টার পর শ্যামলাল M. A., B. A. জামাই পাবার আশা ত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হলেন। শেষটা তিনি মেয়ের বিয়ের সম্পূর্ণ ভার খুড়োর হস্তে ন্যস্ত কর্‌লেন। শ্যামলাল অবশ্য তাঁর খুড়োকে ভক্তি করতেন না, কেননা তাঁর চরিত্রে ভক্তি করবার মত কোন পদার্থ ছিল না। কিন্তু শ্যামলাল বুঝলেন যে, যে বিষয়ে তিনি একেবারে কাঁচা,—অর্থাৎ সংসার জ্ঞান,—সে বিষয়ে তাঁর খুড়ো শুধু পাকা নয়, একেবারে ঝুনো; অতএব তাঁর পক্ষে খুল্লতাতের উপর নির্ভর করাই শ্রেয়।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে খুড়ামহাশয়ের সকল চতুরতা ব্যর্থ হ'ল, কেননা— তাঁর পিছনে টাকার জোর ছিল না। যেমন মাসের পর মাস যেতে লাগল, শ্যামলাল তত বেশী উদ্বিগ্ন ও তাঁর খুড়ো সেই পরিমাণে হতাশ হয়ে পড়্‌তে লাগলেন; কেননা মাসের পর মাস মেয়েরও বয়েস বেড়ে যেতে লাগল, এবং সেই সঙ্গে ও সেই অনুপাতে, লোকনিন্দার মাত্রা। এই পারিবারিক অশান্তির ভিতর একমাত্র প্রাণী যে শান্ত ছিল, সে হচ্ছে শ্রীমতী। এই সব লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, নিন্দা, কুৎসা তাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে নি। তার কারণ, তার মনের উপর যে বরফ পড়েছিল তা এতদিনে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল। নিন্দাবাদ প্রভৃতি তুচ্ছ জিনিসের ক্ষুদ্র কষ্ট সে মনকে স্পর্শ কর্‌তে পারত না। তার এই স্থির, ধীর আত্মপ্রতিষ্ঠ ভাবকে গ্রামের লোক অহঙ্কার বলে ধরে নিলে। এর ফলে, শ্রীমতীর বিরুদ্ধে তাদের বিদ্বেষবুদ্ধি এতটা বেড়ে গেল যে, শ্যামলাল আর সহ্য কর্‌তে না পেরে, মেয়েকে নিয়ে দেশ থেকে পালিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তিনি মনে কর্‌লেন মেয়ের কপালে যা লেখা থাকে তাই হবে, এ উপস্থিত উপদ্রবের হাত থেকে

তাকে উদ্ধার করা তাঁর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। শ্যামলাল খুড়া-মহাশয়কে তাঁর অভিপ্রায় জানালেন, তিনিও তাতে কোন আপত্তি কর্‌লেন না। খুড়ামহাশয় বুঝলেন, আর কিছুদিন থাকলে তাঁকে স্বীকার কর্‌তেই হবে যে, তিনি অকৃতকার্য্য হয়েছেন। কিন্তু সময় থাক্‌তে যদি শ্যামলাল বিদায় হন্, তাহলে তিনি পাঁচজনকে বল্‌তে পারবেন যে, শ্যামলাল অত অধৈর্য্য না হলে তিনি নিশ্চয়ই তার মেয়ের ভাল বিয়ে দিয়ে দিতে পার্‌তেন। অতঃপর পাঁজিপুঁথি দেখে শ্যামলালের যাত্রা করবার দিন স্থির হল।

যেদিন শ্যামলালের বাড়ী ছাড়্‌বার কথা ছিল, তার আগের দিন তাঁর খুড়ামহাশয় বেলা বারোটার সময় হাস্‌তে হাস্‌তে শ্যামলালের কাছে এসে বল্‌লেন, "বাবাজি! তোমাকে আর কাল বাড়ী ছাড়্‌তে হবে না। তোমার মেয়ের বর ঠিক হয়ে গেছে। উপরে ত ভগবান আছেন—তিনি কি আমাদের পরিবারে একটা কলঙ্ক হতে দেবেন?" শ্যামলাল একেবারে আনন্দে অধীর হয়ে জিজ্ঞেস কর্‌লেন—

—কে?

—ক্ষেত্রপতি মুখুয্যে

—কোন্ ক্ষেত্রপতি মুখুয্যে?

—আমাদের গ্রামের ক্ষেত্রপতি হে—দক্ষিণ পাড়ায় যার বড় বাড়ী।

—আপনি কি আমার সঙ্গে রসিকতা কর্‌ছেন?

—মেয়ের বিয়েকে বাবাজি, আমি নই, তুমিই রসিকতা মনে কর।

—বলেন কি, তার স্ত্রী ত আজ সবে তিন দিন হ'ল মারা গেছে?

—সেই জন্যেই ত সে এই বিয়ের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছে। তার

স্ত্রী বেঁচে থাকলে ত আর তুমি তোমার মেয়েকে সতীনের ঘর করতে পাঠাতে না ?

—কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আমার একবয়সী ?

—দোজবরে বলেই ত সে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। বিশ একুশ বছরের মেয়েকে ত আর কোনও বিশ একুশ বছরের ছেলে বিয়ে করবে না। এতদিন ত চেষ্টা করে দেখেছ ?

—কিন্তু আমার মেয়ের বয়স ত আর বিশ একুশ নয়।

—বাবাজি, আমার কাছে আর মিছে কথা বলে কি হবে ? আমিই ত বলে বেড়াচ্ছি যে, ওর বয়েস বারো কি তেরো। আসল বয়েস আর কেউ জানুক আর না জানুক—আমি ত জানি। তোমাকে ত সেদিন জন্মাতে দেখলুম, তুমি কি আমাকে ভোগা দিতে পার ?

—কিন্তু ক্ষেত্রপতি যে আকাট মুর্খ, সে ত এন্‌ট্রান্সও পাস করে নি।

—সেই জন্যেই ত ও তোমার মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। তোমার টাকা দেবার সামর্থ্য নেই—আর বিনে পয়সায় পাসকরা ছেলে মেলে না,—এর প্রমাণ ত হাজার বার পেয়েছ !

শ্যামলাল বুঝলেন যে তাঁর খুড়োর সঙ্গে আর তর্ক করা অসম্ভব, কেননা খুড়ামহাশয়ের কথাগুলো যে সবই সত্য, তা তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না; অথচ এ বিবাহের প্রস্তাবে তাঁর হৃদয়মন একেবারে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে, ক্ষেত্রপতির সঙ্গে বিয়ে দেওয়া আর শ্রীমতীকে জ্যান্ত গোর দেওয়া—একই কথা। তাই তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর খুড়ো ধরে নিলেন্ যে, সে মৌন সম্মতির লক্ষণ। তিনি অমনি বাড়া থেকে বেরিয়ে গিয়ে ক্ষেত্রপতিকে পাকা

কথা দিয়ে এলেন। স্থির হ'ল ক্ষেত্রপতি তাঁর বিগত স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ করেই, আগত স্ত্রীকে ঘরে আনবেন।

ক্ষেত্রপতির এ বিবাহ করবার আগ্রহের একমাত্র কারণ, শ্রীমতী সুন্দরী এবং কিশোরী। সুন্দরী স্ত্রীলোককে হস্তগত করবার লোভ ক্ষেত্রপতি জীবনে কখন সম্বরণ করতে পারেন নি। এবং এ ক্ষেত্রে বিবাহ ছাড়া শ্রীমতীকে আত্মসাৎ করবার উপায়ান্তর নেই জেনে, তিনি তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হলেন। এ বিষয়ে তাঁর কোন দ্বিধা হ'ল না, কেননা তিনি লোকনিন্দাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতেন। তিনি গ্রামের কাউকেও ভয় করতেন না, সকলে তাঁকে ভয় করত; তার কারণ, তিনি পুলিশে চাকরি করতেন, তার উপর তাঁর দেহে বল, মনে সাহস ও ঘরে টাকা ছিল। এ তিন বিষয়ে গ্রামের কেউ তাঁর সমকক্ষ ছিল না।

শ্যামলালের খুড়ো তাঁকে এসে যখন জানালেন যে, তিনি ক্ষেত্রপতিকে পাকা কথা দিয়ে এবং বিয়ের দিনস্থির করে এসেছেন, তখন শ্যামলাল বললেন, "আপনি যাই বলুন আর না বলুন, আমি এ বিবাহ কিছুতেই হতে দেব না,—প্রাণ গেলেও নয়"।

এ কথা শুনে খুড়ামহাশয় "ভদ্রলোককে কথা দিয়ে সে কথার আর কিছুতেই অন্যথা করা যেতে পারে না", এই বলে চীৎকার করতে লাগলেন। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। কিন্তু শ্যামলাল যে সেই "না"; বলে চুপ করলেন, তারপর আর কোন কথা কইলেন না। তার কারণ, হাজার চীৎকার করলেও তাঁর খুড়োর কোন কথা শ্যামলালের কাণে ঢুকছিল না; তাঁর শরীর মন ইন্দ্রিয় সব একেবারে অবশ অসাড় হয়ে গিয়েছিল,—মাথায় বজ্রাঘাত হলে মানুষের যেমন হয়।

এ মহাসমস্যার মীমাংসাও শ্রীমতী করে দিলে। সকলের সকল কথা শুনে, সকল অবস্থা জেনে, শ্রীমতী বল্লে এ বিবাহ সে করবেই। সে বুঝেছিল যে, তার বিবাহ না হওয়া তক্ তার বাপের বিড়ম্বনার আর শেষ হবে না। তা ছাড়া সে কোন দুঃখকষ্টকেই আর ভয় করত না, বরং তার মনে হত যে তার পক্ষে জীবনে নিজে সুখী হবার ইচ্ছাটাও একটা মহাপাপ,—সে ইচ্ছাটা যেন তার নির্ম্মম স্বার্থপরতার পরিচয় দেয়।

শ্যামলাল অবশ্য মেয়ের মতে মত দিলেন, কিন্তু ব্যাপারখানা যে কি হল, তা তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। এইটুকু শুধু বুঝলেন যে, পুরাতনের সংঘর্ষে তাঁর জোড়া-সুখস্বপ্নের আর একটিও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

এরপর এক মাস না যেতেই শ্যামলালের মেয়ের বিয়ে হ'ল। সে বিবাহ-সভায় আমি উপস্থিত ছিলুম। পাঁচজনের যেমন হয়ে থাকে, তেমনি বিয়ে হ'ল; অর্থাৎ তার মধ্যে কোন নূতনত্ব ছিল না, এক মেয়ে বড়—এই ছাড়া। সেই আমি প্রথম ও শেষ শ্রীমতীকে দেখি। তার রূপের খ্যাতি পূর্ব্ব থেকেই শুনেছিলুম, কিন্তু যা দেখলুম তা সুন্দরী স্ত্রীলোক নয়,—শ্বেতপাথরে খোদা দেবীমূর্ত্তি; তার সকল অঙ্গ দেবতার মতই সুঠাম, দেবতার মতই নিশ্চল, আর তার মুখ দেবতার মতই প্রশান্ত আর নির্ব্বিকার। বর কনে' মানিয়েছিল ভাল, কেননা ক্ষেত্রপতিও যেমন বলিষ্ঠ তেমনি সুপুরুষ; তার বয়েস পঁয়তাল্লিশের উপর হলেও ত্রিশের বেশী দেখাত না, আর তার মুখও ছিল পাষানের মতই নিটোল ও কঠিন। আমার মনে হল, আমি যেন দুটি Statueর বিয়ের অভিনয় দেখছি। বরকনে'তে যে মন্ত্র পড়ছিল, তা

প্রথমে আমার কাণে ঢোকে নি,—তারপর হঠাৎ কাণে এল, ক্ষেত্র-পতি বল্‌ছেন, "যদস্তু হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব"। এ কথা শোনামাত্র আমি উঠে চলে এলুম। বুঝলুম এ অভিনয় সত্যিকার জীবনের, তবে তা Comedy কি Tragedy তা বুঝতে পারলুম না।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

দরবেশের উপদেশ।
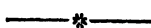
এল্ হারেদ্ বেন্ হাম্মাম্ যাহা লিখিয়াছেন তাহার ভাবার্থ:—অন্তিমকাল আসন্ন বুঝিতে পারিয়া আবু ফৈদ পুত্রকে ডাকিয়া আনিয়া পাশে বসাইলেন; বলিলেন—বাপ্ আমার, মরণের খোস্ বো পাইতেছি!—আর দেরী নাই।

খোদার হুকুমে, ওয়ারীস্-সূত্রে আমাদের দরবেশী সম্প্রদায়ের মুরুব্বীর পদে তোমাকেই বাহাল করিয়া রাখিয়া যাইতেছি।

পুরাতন দস্তুর অনুযায়ী কঠিন আঘাত দান করিয়া তোমাকে কর্ত্তব্যে সচেতন করিয়া নিশ্চয়ই তুলিতে হইবে না। কারণ, ঘুমন্তকেও জাগাইবার জন্য তাহার মাথায় যে ঢিল ছুঁড়িবার ফন্দী বাৎলাইয়াছে তাহার মগজের প্রতি আমাদের আস্থা নাই। মানুষমাত্রেই প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাণে আপনাপন উদ্ভাবিত অথবা আহৃত কর্ত্তব্যের উপদেশ-মধু ঢালিয়া দিয়া পরস্পর পরস্পরের হিতসাধন করিবেন—ইহার চেয়ে ন্যায়-বুদ্ধির অনুমোদিত ভালো যুক্তি আমি আর জানি না।

মন দিয়া কথাগুলি শুনিয়া যাও;—অবহেলা করিবার চেষ্টা করিও না।

হিতোপদেশের আতর গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট। তবে দোহাই তোমার সুবুদ্ধির রে বাপ্!—রুমালে মাখাইয়া তাহা যেন জামার জেবে রাখিয়া দিও না। ব্যবহার করিয়া দেখিও,—ফল পাইবেই।

জীবনের সারা পথ অতিবাহন করিয়া আসিয়াছি। সুতরাং আমাদের মত বুড়োদের উপদেশ নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে সুসংবাদ, এবং চরিত্র গড়িয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ দরকারীও বটে।

বাবা, আশা করি তোমার জীবন কল্যাণে অভিষিক্ত রহিবে। কিন্তু বাছা, হিতকামীর ন্যায়সঙ্গত উক্তিগুলি যদি তোমাদের এ কাণ দিয়া ঢুকিয়া অন্যমনস্কতাবশতঃ ও কাণ দিয়া বাহির হইয়া যায়, হজরৎ না করুন.........স্মরণ রাখিও, তাহা হইলে মঙ্গলের পোস্টাই হালুয়া তৈরী করিবার সকল উনুনের আগুনই একেবারে নিভিয়া যাইবে, এবং বিশ্ব-পারিবারিক প্রেমের বন্ধনগুলিও ক্রমাগত শিথিল হইতে শিথিলতর হইতে থাকিবে।

অবিশ্রান্ত পর্য্যালোচনার ফলে আমাকে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে হইয়াছে। তাহাতে করিয়া, জগতের বহুবিধ রহস্যের গুপ্ত-সংবাদ আমি অবগত হইয়াছি। ওগো! বিবেক অথবা তত্ত্ব—যাহাই কেন বল না,—প্রায় সব জায়গাতেই মানুষের স্বার্থের সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত, আমি জানি।

শাসন-সংরক্ষণই বলো, বা কৃষিবাণিজ্যই বলো—কোনো কাজই করিতে ঘৃণাবোধ করি নাই;—কিন্তু,এ খোদা, কি দেখিলাম! সব ফালতো! পিপাসার আদৎ সিরাপ্,—না, উহার কোনোটার মধ্যেই পাই নাই।

বস্তুতঃ, প্রভুত্ব বলিয়া যাহাকে আমরা দেখি সমাজের বুকের উপর বড় গর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, হে প্রিয় সন্তান আমার, আমি হলফ্ করিয়া বলিয়া গেলাম, তাহার এলাকায় শান্তির মিঠাপানী কখনো একবিন্দু খুঁজিয়া পাইবে না। দাসত্বের দুর্গন্ধী ফুলের ফসলের প্রচুর আবাদ একমাত্র সেখানে মিলিতে পারে।

পার্থিব ঐশ্বর্য্য কয়দিনের গো? উড়ন্ত ঐ পাখীটার মতই শীঘ্র উহা শূন্যে মিলাইয়া যায়।.........তাহার পর বাছারে, হয়রাণের এক-শেষ হইয়া আমরা যাহাকে সাচ্চা ভাবিয়া দুই হাতে আঁকড়িয়া ধরি, জানিয়া রাখো, উহা কেবলমাত্র এ দুনিয়ার ঝুঁটা দৌলতই নহে, তিক্তিরও বটে;—গতির কাণ ধরিয়া দাঁড় করাইয়া রাখাই তাহার কাজ। তবে মধ্যে মধ্যে, যুগে-যুগে যে-সকল অমৃত-পরিবেশনকারী রসুলগণ মঙ্গল মন্ত্রের শ্লোকগুলি গাহিতে গাহিতে দীনহীন পতিতের ভিতরে আসিয়া আবির্ভূত হন, ও বাঁধন ছিঁড়িয়া মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন,—তাঁহাদেরই করুণাদৃঢ় পদ্মহস্তের বরাভয়ে সমুদায় বিষ-বেদনা ধুইয়া-মুছিয়া যায়। এ-সকল অকপট সত্য; কারণ, আজীবন ঘন অন্ধকারেও মুস্কিল-আশানের চেরাগে আমাকে এ-সব প্রত্যক্ষ করিতে হইয়াছে।

ওগো বৎস! সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, আমরা কাহারা?—এ প্রশ্নের একমাত্র সদুত্তর, 'অন্তরে যা'র ফকির নাচে তাইরে নাইরে নাইরে না'। অন্য কোনো পরিচয় আমরা রাখি না। আমাদের জীবন এবং তাহার ইতিহাসের প্রত্যেক অক্ষরটি ফকিরীর শুভ্র কালীতে লেখা—পদতল হইতে ব্রহ্মচাঁদি পর্য্যন্ত আমরা ফকিরময়। তুমি দেখিতে পাইবে, অশ্রুর মুক্তাবিন্দুতে, বুকের দুরু দুরু কম্পনে, বাহুর আলিঙ্গনপ্রয়াসে ও চরণের আনন্দ-নর্ত্তনে, আমাদের মনের মানুষ সেই ভাবভোলা ফকিরটি আপনার মুনিকোঠা ছাড়িয়া অনবরত বাহির হইয়া আসিতেছেন, গতির মহৎ শিক্ষাকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতে! এই বহিঃপ্রকাশটি তাঁহার কে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে? আমাদের সম্প্রদায় চিরটা কাল পিপাসা ও তৃপ্তির সম্মিশ্রিত সুধারস সম্ভোগ করেন।

বাছা আমার! দাঁড়পড়া বুড়োর কথাগুলি ধরিতে পারিয়েছ তো? সঙ্গে সঙ্গেই যে তাহাদের রস নিঙ্ড়াইয়া লইতে হইবে এমন কোনো কথা নাই; কিন্তু কুড়াইয়া রাখা ভালো।

মানুষকে সাধারণতঃ কি হইতে হইবে, সেই চিরপুরাতন নীতি সমূহের পুনরুল্লেখ করিবার প্রয়োজন দেখি না। তবু, ফড়িঙের চেয়েও মধুমক্ষিকার মত পানে ও গুঞ্জনে বহিরান্তর যে পরিপুষ্ট হইয়া থাকে—এই পরীক্ষিত সত্যটুকু টুকিয়া লইতেই হইবে। আর একটা কথা লিখিয়া রাখিতে পারো যে, জন-সমাজের নিকট শার্দ্দূলের হৃদয় বহুমূল্য হইলেও, পুর্ণিমা-রাতে জোাৎস্নারসে মাতোয়ারা হরিণের লুকোচুরি খেলা, মুক্তির আনন্দের মতন, তদপেক্ষাও দামে বেশী।

কপালে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে দরবেশীদের কি এক মুহূর্ত্ত চলিতে পারিত? তাহাদের যে অন্তরের খোরাক যোগাইতে ও অদৃষ্টকে স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতে হয়! তাই তাহারা পথ চলে,—নানা রকমের পথে,—ভূধরে-সাগরে নামা ওঠা করে; খোঁজে,—তন্ন তন্ন করিয়া নানান ফলের বাগ্-বাগীচায়, মধুর মেওয়া ও রসালো আঙুর থোকায় থোকায় সংগ্রহ করিয়া ভাগাভাগি করিয়া লয়—কেহই কাহাকে বঞ্চনা করিয়া চলে না। খোঁজো, পাইবে;—খাটুনী বৃথায় যাইবে না।—এ সব শাস্ত্রের কথা, বাবা! বিফলতার মূলে বসিয়া বসিয়া যিনি ঝিমাইতেছেন, ঈষৎ একটু নজর করিয়া দেখো, উনিই অহিফেনসেবী প্রবীণ নিশ্চলতা,—বধির, খঞ্জ, মূক ও পঙ্গু!

ওরে বৎস! দিন দুনিয়ার মালেক এ বান্দাকে যদি পয়মাল হইয়া যাইবার জন্যই পয়দা করিবেন, তবে দিল্‌বাহার বেহস্তের সিন্না কাহার জন্য? ঢ্যাড়্‌রা পিটিয়া ঢোল-সহরৎ দ্বারা প্রত্যেকের কাণের কাছে

অনুক্ষণ এই ইস্তাহার জারী তিনি করিতেছেন,—সে সুধার এক বিন্দুও অলসের জন্য কখনই নহে ; বরং উদ্দাম পাগলেও আপনার আলাভোলা নটোন্মত্ততার বক্‌শীস্ স্বরূপে তাহার অজস্র ধারা দাবী করে, লাভ করে, পাণ করে, অমর হয়, এবং উত্তরোত্তর নাচিবার বেগ বাড়াইতেই থাকে। সে বেগের কিম্মত কি! অন্তঃসলিল গতির তরঙ্গে অচলায়তনের দেয়ালকে শিথিল-ভিত্তি করিয়া দিয়া তাহারই ছায়ায় ছায়ায় চলিয়াছে যে!

দরবেশদের কাহারো আঁধার ভালো লাগিলেই বুঝিতে হইবে সে রোগাবিষ্ট। তৎক্ষণাৎ দাওয়াই করিবে। একরকম আত্মনির্ভরতা অর্থাৎ দৃঢ়-অহঙ্কারের সহিত আঁধার-প্রিয়তার একটা বহিঃসাদৃশ্য দেখা যায় বটে ;—কিন্তু সাবধান! 'ডাল তুলিয়া ফল দেখিয়া' তবে অপর চিকিৎসা সুরু করা উচিত। আঁখির ঠারে ফেরেব্বাজী মানুষের সাথে করা এক আধটু চলিলেও চলিতে পারে ; মনের কাছে কিন্তু ধরা পড়েই বাপু! তখন আত্মপ্রতারণার আপশোষ করিবার পালা উপস্থিত হয়,—অথচ হাতের অন্য কত কাজ পড়িয়া থাকে ; সুতরাং অগ্রিম সাবধানতা মন্দ কি।

সিংহের গর্জ্জনকেও আমল্ দিব না,—চিত্তের এই দৃঢ় সংকল্প আমরাই সাধনা করিয়া লাভ করি। ভয়ের মত জঘন্য পদার্থের জোড়া মিলে না বলিয়াই, কালো কুকুরটার মত সেটাকে দূরে খেদাই-বার মন্ত্র গাহিয়া বেড়াই :—

সাহসের চূড়া আকাশ ফুঁড়িয়া খোদার চরণ চুমে।
তরাসের সদা মরণ কবুল—আছাড়ি মরিছে ভূমে।

আমাদের শিক্ষা কতই গভীর! কাকের মত সকলের আগে আমরা সবাইকে জাগাইয়া দিই! ভেকের মত অবাধ আমাদের চরণ-

লীলা! বিপদের বিভীষিকায় আমরা ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মতন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠি, আর আমাদের ভ্রূকুটির যাদুমন্ত্রে কুয়াসা কাটিয়া যায়! শূকরছানার মত কচুর শিকড়ও আমরা চিবাইয়া চুষিয়া খাই!—কাঁচা পাকার দিকে লক্ষ্যও রাখি না। ডরাই না কিছুতেই। উটের মত অনায়াসে মরুভূমিও পার হই!

শোনো বাছা! আর একটা জরুরী খবর তোমাকে জানাইয়া রাখি। কড়া কথাও ছন্দে ও সুরে গাহিতে পারিলে লোকে না শুনিয়া থাকিতে পারে না। অতএব ছন্দ ও সুর—এই দুইটা জিনিসেরই টাকা-টাকা তোলা।

বাপু হে! বাজারদরের খবর রাখা, দোহনের আগে গরুর বাঁট পরীক্ষা করিয়া দেখা, ও অজানাকে কলিজায় ধরিবার আগে তাহার জাত-জ্ঞাতের পরিচয় লওয়া কৃপণের হিসাব। বে-হিসাবীর হিসাব তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী সূক্ষ্ম; এত সূক্ষ্ম যে, তাহা চর্ম্মচক্ষে কেহ দেখিতেই পায় না।

হরদম্ চাওয়া এবং তাহার জন্য গোঁ ধরিয়া থাকা, ও পাওয়ামাত্রই ঢক্ ঢক্ করিয়া সবখানি একেবারে গিলিয়া ফেলা—সেরকম ফকিরিও আছে। তাহারা ফকির হইলেও, না চাহিয়া খুসী হইবার ও না পাইয়াও আনন্দে মাতিয়া উঠিবার ফিকির তো শেখে নাই! গতিকেই, আমাদের সমকক্ষ হইতে তাহাদের এখনও বহুৎ দেরী। এই দেরীটুকু ঘুচানোই আমাদের কাজ, জানিও।

ওরে পাইবে! হতাশ হইও না।—কারণ, বিশ্বে দয়ার অনন্ত তরঙ্গের মত সত্য তো আর কিছু নাই! নহিলে কে বাঁচিত বল্ রে!

আগামী ও গতকল্যের ভূয়ো মাধুরীতে যে মজে, সে কি বেকুব !—অন্যকার কোলে শিশু হওয়ার মত জীবনের সার্থকতা আর কোথায়? বাছারে! বর্ত্তমানের প্রতি সেলাম দান না করিয়া এক তারিখও জলগ্রহণ করিও না।

সংকল্প ও সিদ্ধির মধ্যে যে কালো বুড়ীটাকে দেখা যায়, সে সয়তানীর নাম—দীর্ঘ সূত্রতা। চোখে পড়িবামাত্র সেটাকে খেদাইয়া দূর করিয়া দিবে। তাহার ফুৎকারে বিষের সরবৎ টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া, গাঁজিয়া উঠিয়া, উপচিয়া পড়িয়া সংকল্পকে অচেতন করে; এবং সিদ্ধিকেও বিশ বাঁও পাতালের তলায় কবর-চাপা দিয়া রাখে।

হে পুত্র! সর্দ্দার সাজা মুখের কথা নয়। তাহাদের এমন চোগা-চাপ্‌কান পরিয়া দাঁড়ানো চাই যে, দশজনে যেন চাহিয়া দেখে। দর্‌জীকে পুছিও, আমাদের জামা-জোড়ার সেলাই আগা-সে-গোড়াতক্‌ আলাহিদা কায়দার;—অন্ততঃ ঐ বুকের কাছটায় তো সহিষ্ণুতার সবুজ-সুতা চাই-ই চাই, যে নম্রতাকে টানিয়া আনিয়া জ্ঞানের সঙ্গে এক করিয়া জুড়িয়া দিয়াছে।.........সর্দ্দার হইলেই চলিবে না।

সড়কের মাঝে আইল গড়িয়া যে নিজ এক্তিয়ার জাহির করে, তাহার বাতুলতা বরং অল্প; কিন্তু, যে, যে-কোনো-এক ঠাঁইয়ে একটা গণ্ডী দাগিয়া লইয়া, আপনার বাড়ী মনে করিয়া খুস-মেজাজে জিন্দীর ছাড়িতে ছাড়িতে বসিয়া পড়ে,—মাণিক আমার! তাহার চুক্‌টাই জবর চুক্‌। কারণ, বাড়ী পৌঁছিবার জন্য, সারা দুনিয়াই যে একমাত্র রাস্তা! অবিশ্রাম চলিতে থাকা ব্যতীত পথের আর কি ব্যবহার করিতে চাও? যে যতটুকু বসিতে চায়, সে ততটুকু খারাপ মুসাফির।

আমাদের পূর্ব্বতন আক্কেলমান্‌ মৌলবীগণ কি সাধ করিয়া এই

চলাটার এত তারিফ করিয়া গিয়াছেন ?—না গো, তাঁহারা নিজে চলিয়া চলিয়া ভুক্তভোগী হইয়াই যাহা কিছু বলিবার বলিয়া চুকিয়াছেন। চলিবার পথে, প্রতি পদক্ষেপে, বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাইয়া—তৎক্ষণাৎ আজানের সুরে নব-যৌবনের জয়-সঙ্গীত গান না করিয়া তাঁহারা মোটেই স্থির থাকিতে পারেন নাই। অসীম অব্যয় অনন্তের দিকে বালকটির মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া এই মহা-সঙ্গীত যে তাঁহাদের কতখানি আনন্দের বরাতি-হুণ্ডী ছিল, আল্লার কসম খাইয়া বলিতেছি, তাহা প্রণিধান-যোগ্য।

বিদায় দাও বাপ্‌জান্! আর বেশী কিছু বলিবার নাই। কেবল চিরদিবসের এই ভরসাটুকু আমার এইবার তোমায় বলি, শুনিয়া রাখো,—রোজ-কিয়ামতের দিনে তুমি যেন বিমুখ হইয়া বসিয়া লজ্জায় না কাঁপো।—আমারই ঔরসজাত তুমি, ঠিক ব্যাটা-ছেলের মত এবং অবিকল সিংহের গৌরবেই সেদিন যেন মহা বিচারের দরবারে ন্যায়বান হাকিমের এজ্‌লাসে আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারো! আমি দেখিতে চাই।

* * * * *

বেন্ হাম্মাম্ লিখিতেছেন—প্রত্যেক দরবেশই, আবু কৈদের এতদুক্তিসমূহের প্রতি, কোরান-সরিফের প্রথম অধ্যায়ের সমান সম্মান প্রদর্শন করেন। এবং ইহার সমুদায় পংক্তিগুলি তাঁহারা তাঁহাদের সাগিরদ্-দের সর্ব্বাগ্রেই শিক্ষা দিয়া থাকেন।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মৈত্রেয়।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সুরের কথা।

——:*:——

আপনারা দেশী বিলেতি সঙ্গীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোলযোগে আমি গলাযোগ কর্‌তে চাই।

এ বিষয়ে বক্তৃতা কর্‌তে পারেন এক তিনি, যিনি সঙ্গীতবিদ্যার পারদর্শী,—আর এক তিনি, যিনি সঙ্গীতশাস্ত্রের সারদর্শী; অর্থাৎ যিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে হয় সর্ব্বজ্ঞ, নয় সর্ব্বাজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এ বিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।

আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সারসংগ্রহ করেছি, সংক্ষেপে তাই বিবৃত কর্‌তে চাই। বলা বাহুল্য সঙ্গীতের সুর ও সার, পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কাণের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সুরসার,—কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসেবে।

সব বিষয়েরই শেষ কথা তার প্রথম কথার উপরেই নির্ভর করে; যে বস্তুর আমরা আদি জানিনে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা কর্‌তে হলে, তার আলোচনা ক, খ, থেকে সুরু করাই সনাতন পদ্ধতি; এবং এ ক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ কর্‌ব।

অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে, যারা দিব্যি বাংলা বলতে পারে, অথচ ক, খ, জানে না—আমাদের

দেশের বেশীর ভাগ স্ত্রী-পুরুষই ত ঐ দলের। অপরপক্ষে এমন প্রাণীরও অভাব নেই, যারা ক, খ, জানে, অথচ বাংলা ভাল বল্‌তে পারে না—যথা আমাদের ভদ্র শিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য্য নয় যে, এমন গুণী ঢের আছে, যারা দিব্যি গাইতে বাজাতে পারে, অথচ সঙ্গীতশাস্ত্রের ক, খ, জানে না; অপরপক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাক্‌তে পারে, যারা সঙ্গীতের শুধু ক, খ, নয়, অনুস্বর বিসর্গ পর্য্যন্ত জানে—কিন্তু গানবাজ্‌না জানে না।

তবে যারা গানবাজ্‌না জানে, তারা গায় ও বাজায়; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধ্বনি না কর্‌তে পারি, কলরব কর্‌বার অধিকার আমাদের সকলেরি আছে। সুতরাং এই তর্কে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা হবে না। অতএব আমাকে ক, খ, থেকেই সুরু কর্‌তে হবে, অ, আ, থেকে নয়। কেননা আমি যা লিখ্‌তে বসেছি, সে হচ্ছে সঙ্গীতের ব্যঞ্জনলিপি—স্বরলিপি নয়। কারণ, আমার উদ্দেশ্য সঙ্গীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার সত্ত্ব সাব্যস্ত করা নয়। আমি সঙ্গীতের সারদর্শী—সুরস্পর্শী নই।

(২)

হিন্দুসঙ্গীতের ক, খ, জিনিসটে কি?—বলছি।

আমাদের সকল শাস্ত্রের মূল যা, আমাদের সঙ্গীতেরও মূল তাই—অর্থাৎ শ্রুতি।

শুন্‌তে পাই এই শ্রুতি নিয়ে সঙ্গীতাচার্য্যের দল বহুকাল ধরে বহু বিচার করে আস্‌ছেন, কিন্তু আজতক্ এমন কোনও মীমাংসা কর্‌তে

পারেন নি, যাকে "উত্তর" বলা যেতে পারে—অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।

কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে কারণ আমি ও-বিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি, যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হতে পারে।

আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই স্বর, যা কাণে শোনা যায় না; যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য, যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্য-চক্ষু চাই, তেমনি শ্রুতি শোনবার জন্য দিব্য কর্ণ চাই। বলা বাহুল্য তোমার আমার মত সহজ মানুষদের দিব্য-চক্ষুও নেই, দিব্য-কর্ণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কাণও আছে। ওতেই ত হয়েছে মুস্কিল। চোখ ও কাণ সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি—এ দুটি বিশেষণ, কাণে অনেকটা এক শোনালেও, মানেতে ঠিক উল্টো।

সঙ্গীতে যে সাতটি সাদা আর পাঁচটি কালো সুর আছে, এ সত্য পিয়ানো কিম্বা হারমোনিয়ামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন। এই পাঁচটি কালো সুরের মধ্যে যে, চারিটি কোমল আর একটি তীব্র—তা আমরা সকলেই জানি, এবং কেউ কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশুনো জিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এদেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরও কালো এবং এমন কালো সুর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সে সব হচ্ছে অতিকোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামই প্রমাণ যে সে সব অতীন্দ্রিয় সুর, এবং তা শোনবার জন্যে দিব্যকর্ণ চাই,—যা তোমার আমার ত নেই, শাস্ত্রীমহাশয়দেরও আছে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস তাঁদেরও

নেই। শ্রুতি সেকালে থাক্‌লেও একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্রুতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য ত জগৎ বিখ্যাত। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সঙ্গীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ পরের কাণে মিষ্টি শোনা যাঁদের অভ্যাস—শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি শ্রুতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভাল। অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়্‌লে, আমাদের কাণ্‌কে একাদশী কর্‌তে হবে।

আর ধরুণ যদি ঐ দ্বাদশ স্বরের ফাঁকে ফাঁকে সত্য সত্যই শ্রুতি থাকে, তাহলে সে সব স্বর হচ্ছে অনুস্বর। সা এবং নি'র অন্তর্ভূত দশটি স্বরের গায়ে যদি কোনও অসাধারণ পণ্ডিত দশটি অনুস্বর জুড়ে দিতে পারেন, তাহলে সঙ্গীত এমনি সংস্কৃত হয়ে উঠবে যে, আমাদের মত প্রাকৃতজনেরা তার এক বর্ণও বুঝতে পার্‌বে না।

(৩)

এ সব ত গেল সঙ্গীতের বর্ণ-পরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সুরের-সৃষ্টিস্থিতিলয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।

শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়। অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনও পুরুষ কর্তৃক রচিত হয় নি—প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি টানা তারের গায়ে ঘা মার্‌লে প্রকৃতি অমনি সাতসুরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সার্গম আলাপ করেন, মানুষে শুধু তার নকল

করে। কিন্তু সে সকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিম্বা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতি দত্ত স্বরগ্রামের কোনও সুর একটু চড়ে, কোনও সুর একটু ঝুলে যায়। তা'ত হবারই কথা। প্রকৃতির হৃদয়তন্ত্রী থেকে এক ঘায়ে যা বেরোয়, তা যে একঘেয়ে হবে—এ ত স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এই সব প্রাকৃত সুরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।

এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ, এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সঙ্গীতে ব্যুৎপত্তি যে সহজ, এ সত্য ত লোকবিশ্রুত।

প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে,—শুধু শব্দ নয়, গোলমাল আছে—এ কথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, এ কথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই ত আর্ট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।

আর্টিষ্টরা বলেন—প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যার কাণ নেই, তার কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্ত্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা,—এ কথা কোন দর্শনেই বলে না। আর্টিষ্টদের মতে তৌর্য্যত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ—নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি—গীতবাদ্য—নয়।

এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপরসগন্ধস্পর্শ শব্দের উপাদান, এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নৃত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক্ ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।—

শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম্ম; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম্ম। আকাশের নৃত্য অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের, এবং বাতাসের উক্তরূপ কম্পন থেকে যে ধ্বনির উৎপত্তি

হয়েছে, তা বৈজ্ঞানিকেরা হাতেকলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সুরের উৎপত্তি, সুতরাং জড়-প্রকৃতির গর্ভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে; আর আকাশ বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসব-বেদনায়। সুতরাং আর্টিষ্টদের মতে, সুর শব্দের অনুবাদ নয়—প্রতিবাদ।

যেখানে আর্টে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপোষমীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে সুরের, কিম্বা সুর হতে শব্দের উৎপত্তি—সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এ স্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙ্গে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে—এক কথায়, সুর আগে না রাগ আগে? অবশ্য রাগের বাইরে সার্গমের কোনও অস্তিত্ব নেই, এবং সার্গমের বাইরে রাগের কোনও অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সুর পূর্ব্বরাগী কি অনুরাগী—এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন, যাঁরা বল্‌তে পারেন বীজ আগে কি বৃক্ষ আগে—অর্থাৎ কেউ পারেন না।

আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর কোনও খণ্ডন নেই। তবে বৃক্ষায়ুর্ব্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বৃক্ষ আগে কি বাজ আগে, সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বাৎলাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। কেননা ও কথা শোনবামাত্র আর এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণুবাদীরা, জবাব দেবেন যে, সঙ্গীত আয়ুর্ব্বেদের নয়—বায়ুর্ব্বেদের অন্তর্ভূত। অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।

আসল কথা এই যে, আমি কর্ত্তা তুমি ভোক্তা—এ জ্ঞান যার নেই, তিনি আর্টিষ্ট নন। সুতরাং সঙ্গীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বোধন করে—তুমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা—এ কথা কোনও আর্টিষ্ট কখনও বল্‌তে পারবেন না, এবং ও কথা মুখে আনবার কোন দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ—আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সুরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।

অতএব দাঁড়াল এই যে, সঙ্গীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজমানুষে চায় তার স্থিতি,—ভিত্তি নয়।

(৪)

অতঃপর দেশী বিলাতি সঙ্গীতের ভেদাভেদ নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা করা যাক্।—

এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক্, তা অবশ্য ক, খ গত নয়। যে বারো সুর এ দেশের সঙ্গীতের মূলধন, সেই বারো সুর যে সে দেশের সঙ্গীতেরও মূলধন, এ কথা সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সুদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনও ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তা ছাড়া আমি পূর্ব্বে দেখিয়েছি যে, সুরের এই অতিসুদের লোভে, আমরা সঙ্গীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী কিছু বলা নিস্প্রয়োজন।

দেশীর সঙ্গে বিলাতি সঙ্গীতের আসল প্রভেদটা ক, খ, নিয়ে নয় কর, খল্‌ নিয়ে। B. L. A = ব্রে; C. L. A-ক্লের সঙ্গে কর

খলের, কাণের দিক থেকেই হোক্ আর মানের দিক থেকেই হোক্, একটা যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে,—এ হচ্ছে একটি "প্রকাণ্ড সত্য"। এ প্রভেদ উপাদানের নয়—গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।

সুতরাং আমরা যদি বিলাতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি, তাহলে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, এবং তাতে অবশ্য রাগের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরাজি ভাষা লিখ্‌লে সে লেখা ইংরাজিই হয়, এবং তাতে বাংলা-সাহিত্যের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না—যদিচ এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয়, শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে, এবং সেই সঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে, তা Babu English হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখ্‌লে তা সাধুভাষা হয়—তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সঙ্গীতেও আমরা রাগ মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সঙ্গীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ কর্‌তে চাইনে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

(৫)

দেশী বিলাতি সঙ্গীতের মধ্যে আর একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলাতি সঙ্গীতে Harmony আছে—আমাদের নেই।

এই হারমনি জিনিসটে স্বরের যুক্তাক্ষর বই আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ও বস্তু হচ্ছে সঙ্গীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয় ভাগের অধিকারে। আমাদের সঙ্গীত এখনও প্রথম ভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে

সঙ্গীতের দ্বিতীয় ভাগের চর্চ্চা করা উচিত কি না—সে বিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান্ যে, দ্বিতীয় ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথম ভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলুন আর না ভুলুন, তাঁরা যে প্রথম ভাগকে আর আমল দেবেন না—সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করিনে,এবং অপর কেউ করতে গেলে অমনি বলে উঠি—সাহিত্যের সর্ব্বনাশ হ'ল, ভাষাটা একদম অসাধু এবং অশুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সঙ্গীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরাজ বলছিলেন যে, যে সঙ্গীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে, সেখানে harmony কি করে থাকতে পারে?, আমি বলি ওত ঠিকই কথা, বিশেষতঃ স্বামী যখন মূর্ত্তিমান রাগ, আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক একটি মূর্ত্তিমতী রাগিণী! অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সঙ্গীতের কৌলিন্য। আমাদের রাগসকল যদি কুলীন না হত, তাহলেও আমরা harmony-র চর্চ্চা করতে পারতুম না—কেননা ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মত আমাদের সঙ্গীতেও জাতিভেদ আছে, আর তার কেউ আর কারও সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতেও ভয় পাই, কেননা জাতির ধর্ম্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে harmony.

বীরবল।

বিয়ের সম্বন্ধ।

—:❀:—

নরেন ছেলেবেলা থেকেই আদর যত্নে প্রতিপালিত। সে ছিল শৈশবে ঠাকুরদাদার, কৈশোরে মাতার, যৌবনে পিতার আদরের সামগ্রী। বাড়ীর মেয়েরা নরেনকে তাঁদের অবাধ্য দেখ্‌লেই এখনো বলে থাকেন, যে তাকে আদর দিয়ে বাঁদর করা হয়েছে। সে কথা অবশ্য নরেন কখনো স্বীকার করে নি। সে বলে যে, তার যা কিছু ভাল হয়েছে তা কেবল ঐ আদরেরই ফলে।

ভাল হওয়ার ভিতরে লেখাপড়াটা বেশই হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্যাঠামীও বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তা না হবেই বা কেন? ছোট বয়সে ঠাকুরদাদার রসিকতা শুনে শুনে কাণ ও প্রাণ রসে ভরে ওঠ্‌বারই ত কথা। বাপ যদিও দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু হন নি, তথাপি ছেলেটী ইঁচড়ে পেকে গিয়েছিল। কিন্তু তার প্রতি অকালপক্কতার আরোপ করলে নরেন সোজাসুজি জবাব দেয় যে সে কোয়ায় মিষ্টি আছে।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে নরেন ইস্কুল থেকে কলেজে গিয়ে বি, এ পাস্ করে বেরলো। অমনি চারদিক্ থেকে তার বাপকে ছেঁকে ধর্‌লে, ছেলের বিয়ে দাও। ছেলে দেখ্‌লে বেগতিক, এ অবস্থায় এম্, এ পড়্‌লে আপাতত বিয়ের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়; লোককে বলা যায়, দেখুন, পড়াশোনার ক্ষতি হবে, ইত্যাদি।

অথচ, নরেন যে বিয়ে কর্‌তে একেবারেই অনিচ্ছুক তাও বলা যায় না। আসল কথা তার মনে ভয় ছিল পাছে তার গল্পের যুগের অবসান হয়ে কাজের পালা উপস্থিত হয়।

কাল কিন্তু কারও অপেক্ষা রাখে না। দুবৎসর জলের মত কেটে গেল। এম, এ পাসের পর এক "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" না পড়্‌লে ত আর পড়ার অছিলায় বিয়ের কথা উড়িয়ে দেওয়া চলে না। সেটার চেষ্টাও নরেনের পক্ষে একপ্রকার বিড়ম্বনামাত্র; কারণ, সে কোনো কালেই পরীক্ষায় প্রথম হতে পারে নি। বরং একবার তার নামটা গেজেটের ওপর. দিক্‌ দিয়ে টপ্‌কে বেরিয়ে গিয়েছিল। নরেনের ভাষায়, নামটী সাতরঙে ছাপাতে গিয়ে ছাপার ভুলে রঙ্‌ সাতটী মিশে গেজেটের কাগজের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে গিয়েছিল। অগতির গতি ল' কলেজে পড়লেও বিবাহে অমত করা মুস্কিল; কারণ, ল' কলেজের ঢের ছাত্রেরই ত স্ত্রীপুত্র বর্ত্তমান। এমন কি দু চার জনের মেয়ের বিয়ে দোবারও সময় হয়েছে; সেই উদ্দেশ্যেই ত ল' কলেজে তাঁদের আগমন!

সঙ্গতিপন্ন হলেও চুপ্‌ করে বসে থাকাটা যুবকের পক্ষে অনুচিত, এই বিবেচনা করে নরেনের পিতা তাকে ল' কলেজেই ভর্ত্তি কর্‌লেন। ফলে, নরেনের জ্যাঠামীর প্রকোপ বেড়ে উঠ্‌ল। দু'চারদিন হাইকোর্টে গিয়ে স্বচক্ষে দেখলে ও স্বকর্ণে শুন্‌লে যে উকিল ব্যারিষ্টারদের প্রধান সহায় আইন নয়, জ্যাঠামী, অন্তত নরেনের তাই মত।

এদিকে নরেনের বিবাহের প্রস্তাবও নানান তরফ থেকে আস্‌তে লাগ্‌ল। ছেলেটী লেখাপড়া জানে, ঘরও ভাল, চালাক্‌ চতুর, দেখ্‌তেও সুশ্রী, দু'পয়সার সংস্থান ও আছে, এতগুলির সমন্বয় ত সহজে মেলে

না। আজকালকার ছেলেদের ব্যাপার জেনে নরেনের বাপ্ মা তার ঠাকুরমাকে দিয়ে ছেলের কাছে বিয়ের সম্বন্ধের বিষয় খবর দেওয়াটাই যুক্তিসঙ্গত মনে করলেন। ঠাকুরমাটী পাকা লোক, ভাঙ্গেন ত মচ্‌কান্ না। বল্লেন,—দেখ নরেন, তোমার এইবার একটি বউ হওয়া দরকার। আমি দেখে যেতে চাই যে তুমি সংসারী হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাচ্ছ। তোমার শরীরও রোজ রোজ শুকিয়ে যাচ্ছে। একটি ভাল সম্বন্ধ আছে। মেয়ের বাপ্ কয়লার কারবার করে ঢের টাকা করেছে। ছেলে হয় নি, কেবল দুটি মেয়ে। তত্ত্ব-তাবাস, আদর-আপ্যায়িতের ঘর। যৌতুক-স্বরূপ একটি মোটর গাড়ী দেবে বলেছে, অবশ্য গয়নাপত্তর ও অন্য অন্য জিনিসও যথেষ্ট দেবে।

নরেন ভাব্‌লে যে একেত ঘটক ঘটকীর অনেক বাড়ানো কথা, তার উপর ঠাকুরমা যে একবার রঙের তুলি বোলান নি তারই বা ঠিকানা কি? তা ছাড়া মেয়ে যে কেমন সে বিষয়ে ঠাকুর-মা কিছু না বলায় মনে সন্দেহ হল যে হয়ত কুচ্ছিত। যদি বিয়েই কর্‌তে হয় ত ভাল বিয়েই করা উচিত। বল্লে,—বিয়ে কর্‌লেই যে আমি সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাতে পার্‌ব তার প্রমাণ নেই। আর, যে সম্বন্ধের কথা বল্‌চ সেটি এমন কিছু ভাল নয় যে লাফিয়ে লুফে নিতে হবে। মেয়ের বাপ ত প্রথমতঃ কয়লার কারবার করার দরুণ একটু কালো হয়েই গিয়ে থাক্‌বেন। তুমি বল্‌বে, বাপ্ যদিই কালো হয়, মেয়ের তাতে কি? কিন্তু তুমি ত মেয়ের কথা বলনি, তার বাপের কথাই বলেছ। আদর আমার এখানে কিছু কম নয় যে শ্বশুরবাড়ীর আদরের জন্যে লালায়িত হব। মোটরকারের কথা যা বলেছেন সেটাতে আমি আদৌ রাজী নই। হাতী নেওয়া সোজা, কিন্তু পোষা শক্ত। যদি মোটরের খরচা

বাবা মাসে মাসে দিতে পারেন তবে একখানা গাড়ীই কি আর নিজে কিন্‌তে পারেন না ?

তর্ক করে কোনো ফল নেই দেখে তৎনকার মতন ঠাকুরমাকে ক্ষান্ত হতে হল। মেয়েটীরও অন্য জায়গায় সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেল। অমন মেয়ে কি পড়ে থাকে ?

আর এক ক'ণের খবর ঠাকুরমার মারফৎ নরেনের কাণে পৌঁছল। রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, বয়েস বেশী নয়, ১১ কি ১২, কিন্তু গড়ন বাড়ন্ত, ঘরের কাজ কর্ম্মও জানে, এ ধারে গান বাজনাও কিছু কিছু আসে। বাপ্ উকীল, মাসে ৩।৪ হাজার টাকা উপায় করেন ; ছেলে খোজেন, যার দাম ২৬০০০৲।

নরেনের রং ফর্সা, কাজেই বউ কালো হলেও ছেলেপিলেরা নেহাৎ কালো হবে না, এ ছুতোটা টাকার লোভে বাড়ীর মেয়েদের মনে সহজেই উদয় হল। মেয়েই না হয় কালো, টাকা ত ফর্সা! আর, নরেন যখন উকীল হবে তখন এই রকম একটি শ্বশুর থাক্‌লে রোজগারের পক্ষেও বেশ সুবিধে হবে, সন্দেহ নেই। সুতরাং সম্বন্ধটী বড়ই বাঞ্ছনীয়, এই অভিমত ঠাকুরমা নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করলেন।

পালাবার পথ ছিল। বল্লেই হত যে কালো মেয়েকে ভালবাস্‌তে নাও পারি। নরেনের মনোগত ভাবও তাই। কিন্তু কথাটা মুখ দিয়ে বেরোল না। গেরো খুল্‌তে না পার্‌লে ছুরী কাঁচির আশ্রয় নিতে হয়। নরেন বলে বস্‌লে, এক্ষুণি বিয়ে কি ? রোজগার না করে কি সংসার পাতা উচিত ? লেখাপড়া শিখ্‌লুম কি কর্‌তে ?

যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ। অতএব উকীল হতে গেলেই উকীল-কন্যার পাণিগ্রহণ করাই শাস্ত্রবিধি, এরূপ কথাও বাড়ীর কুলপুরোহিতের

দ্বারা বলান হ'ল। নরেন সিদ্ধান্ত করলে যে ল' পড়াটাই এই সব অনর্থের মূল; ল' টা ছেড়ে দিতে পারলেই অনেকটা গোল চুকে যায়। আদুরে ছেলে বাপকে বোঝালে, আজকাল যে রকম ওকালতীর ফীল্ড্ ক্রাউডেড্ হয়ে পড়েছে তাতে করে ও ব্যবসাতে নামা আমাদের মতন স্বল্পবুদ্ধি লোকের পক্ষে লাভজনক হবে না, মনে হয়। সেই খান থেকেই নরেনের ল' পড়ার খতম হয়ে গেল।

এইবার নরেনের কি করা উচিত সেই কথা নিয়ে সকলেই আলোচনা সুরু করে দিলে। পরামর্শ-দাতার অভাব হল না। কেউ বলে, ডেপুটী হবার চেষ্টা কর, কেউ বলে, প্রফেসার হও, কেউ বলে, Enrolled Officer হও, কেউ বলে কোনো রাজা-টাজার কাছে Private Secretaryship যোগাড় কর, আবার কেউ বা বলে, বানিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, পাটের দালালী কর। অনুসন্ধান করে জানা গেল যে প্রায় সকল পরামর্শের মধ্যেই একটী অভিসন্ধি আছে। বেশীর ভাগ পরামর্শদাতাদের আপনা আপনির মধ্যে একটী করে বিবাহযোগ্যা কন্যা আছেন যাঁকে বিবাহ করলে নরেন,পরামর্শটা কার্য্যে পরিণত করতে পারে।

নরেন কিন্তু শ্বশুরের কাছে বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে ইচ্ছে করে না। সে বলে, শ্বশুরের দ্বারাই যদি পয়সা রোজগারের উপায় হয় ত তার নিজের কৃতিত্ব থাকে কোথায়? অন্ততঃ স্ত্রীর কাছেও ত পৌরুষ দেখাতে হবে!

ইত্যাকার গবেষণা চলেছে, এমন সময় একটী মেয়ের মা খবর পাঠালেন যে নরেন ছেলেটীকে তিনি দেখেছেন এবং দেখে এত ভাল-বেসে ফেলছেন যে তাকে জামাই না করে থাকতে পারছেন না। তাঁর

স্বামী বিলেতে ফেরৎ, জামাইকেও বিলেতে পাঠাতে চান্। মেয়েটী সুন্দরী, এখন ইংরিজী ইস্কুলে পড়ে, এরই মধ্যে এত লেখাপড়া শিখেছে, যে ফড়্‌ফড়্ করে ইংরিজী বল্‌তে পারে। নরেন কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত হলেও পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী হতে পারে নি। তার বাপ মা একটু সেকেলে ধরণের, তথাপি বিলেতে গেলে ছেলের ভাল হবে ভেবে এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। এমন কি, ঠাকুরমাও কেঁদেকেটে সায় দিলেন; তাঁর নাতিটীর ত বয়স হচ্ছে, না বিয়ে করেই বা কতদিন থাক্‌বে? হলই বা বিলেত ফেরৎ! নরেন মহাফাঁপরে পড়্‌ল। কৌমারব্রত ভঙ্গ থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় ভেবে ঠিক্ কর্‌তে পার্‌লে না। স্বাভাবসিদ্ধ জ্যাঠামীতে আর কুলিয়ে উঠ্‌ল না; উভয় পক্ষই স্থির কর্‌লেন যে বিবাহের পরই নরেনেকে বিলাত যাত্রা কর্‌তে হবে। তদনুসারে উদ্যোগে-আয়োজন আরম্ভ হ'ল।

এমন সময়ে ভূমধ্য-সাগরে একটা মস্তবড় যাত্রীর জাহাজ জর্ম্মন্‌রা ডুবিয়ে দিলে। খবরের কাগজগুলোয় বড় বড় হরপে ছাপা হল,

HUN OUTRAGE

P. & O. "Persia" Sunk

Many P. Lives Lost

* * * *

বরপক্ষীয়েরা এবস্থায় নরেনকে বিলেতে পাঠাতে রাজী হলেন না; প্রাণটা ত আগে। নরেনও বেচে গেল; ঠাকুরমাকে বল্‌লে,—

আমার বিয়ে হ'ল না, ভালই হয়েছে। দেখলে ত, অবস্থা বিশেষে বিয়ের পথটাই মরণের পথ। পথে যদি মারা পড়্‌তুম, আমার স্ত্রী না হয় হিঁদুমতে আর একবার বিয়ে কর্‌তে পারত; কিন্তু যমের বাড়ী থেকে ত আর সম্বন্ধ আস্‌ত না। ঠাকুর মা উত্তর কর্‌লে,—ভাই, আমার যে সব সম্বন্ধ পছন্দ ছিল তার কোনটাই ত কর্‌লে না। এবারে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিলেত ফেরতের ঘরে তোমার বিয়ে দিচ্ছিলুম। নরেন জবাব দিলে,—ঠাকুর মা, যদি তোমার পছন্দ মত বিবাহ কর্‌তুম তাহলে এতদিনে আমার বিশ-পঁচিশটী পরিবার হত!

শ্রীভবতারণ সরকার।

সঙ্গীত-পরিচয়।

(ব্রাহ্ম ছাত্রীনিবাসে পঠিত)

এই ছাত্রীনিবাসের কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সঙ্গীত সম্বন্ধে দুই চারটি কথা তোমাদের কাছে বলতে অনুরোধ করে' যে-পরিমাণ সম্মান দেখিয়েছেন, আমি সে অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তোমাদের সে-পরিমাণ চিত্তরঞ্জন করতে পারব কি না সন্দেহ। কারণ বিষয়টি বিস্তৃত, আমার জ্ঞান অল্প, এবং কি ভাবে সঙ্গীতালোচনা করলে তোমাদের সকলের ভাল লাগবে, তা বলা শক্ত।

তবে এটুকু নিশ্চিত যে, গান শুনতে আমাদের অধিকাংশ মেয়ে ভালবাসেন। সুতরাং আমার কথাগুলি যদি শুধু গানের মালা গাঁথবার সূতাস্বরূপ ব্যবহার করি, তাহলে বোধহয় তোমাদের মন সহজেই পাব।

ভারতবর্ষ গানের দেশ। আমাদের ছেলেরা গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে, বুড়োরা সুর করে' করে' পুরাণ পড়েন, মেয়েরা গান গাইতে গাইতে জাঁতা পেষে ও ছাত পিটোয়। মাঝিরা নৌকা বাইতে বাইতে গান করে; প্রতি পালপার্ব্বণে গানের ছড়াছড়ি। রাজস্থানের ইতিহাসে গানেতেই রক্ষিত ও প্রচারিত হত। প্রত্যেক ছন্দের বোধকরি আলাদা সুর আছে। এ দেশের মন্দিরে গান, মাঠে গান, গৃহে গান, বনে গান, উঠতে বসতে খেতে গান,—এমন কি ঘাট পর্য্যন্ত গান! এখানে গানের কাছ থেকে পালানোই শক্ত।

মানুষের মনের গোপন, গভীর, সূক্ষ্ম, উচ্চ, কোমল, করুণ অধীর ভাবসকল গানে যেমন প্রকাশ করা যায়, এমন আর কিছুতে নয়। বাঙ্গালী জাতি ভাবপ্রবণ বলেই এত সঙ্গীতভক্ত। গান গাইতে না পারলেও, শুনতে ভালবাসে না এমন লোক বোধহয় বাঙ্গলা দেশে নেই। যদিও আমি একটি বাড়ীর মেয়েকে বল্‌তে শুনেছি যে, "হঠাৎ বসে' থাকতে থাকতে চেঁচিয়ে উঠে লোকে যে কি সুখ পায়, তা'ত বুঝতে পারিনে"! সঙ্গীতের সৌভাগ্যবশতঃ এরকম শ্রোতা দুর্লভ!

বাঙ্গলাদেশের নিজস্ব গান—বাউল কীর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমি কিছু বল্‌তে চাইনে! কারণ, প্রথমতঃ আমি সে বিষয়ে খুব কম জানি, দ্বিতীয়তঃ তার রস বোধহয় সুরের চেয়ে কথার উপর বেশী নির্ভর করে। বাঙ্গালী মনের যে অংশ পল্লিবাসী, তা যে এই সরস কথা ও সরল সুরের সংযোগে মেতে ওঠে এবং ভাবে ভোর হয়, তা' আমরা সকলেই অল্পবিস্তর জানি ও বুঝি। ইতিহাস কি সাক্ষ্য দেয় ঠিক জানিনে, কিন্তু আমাদের সাবেক চালচলন ধরণধারণ আচার ব্যবহার বেশভূষা দেখ্‌লে মনে হয় আমরা বাঙ্গালীরা পল্লীগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছি ও বাল্যকাল কাটিয়েছি। কবে কোন্ যুগে,—প্রাণের দায়ে কিম্বা মানের দায়ে,—"সেই শান্তিভবন ভুবন" ছেড়ে এসেছি, তার সনতারিখ বল্‌তে পারব না; কিন্তু এখনো যে তার মায়া সম্পূর্ণ কাটাতে পারিনি তার প্রমাণ এই যে, বিশেষ কোন ভাবোদ্রেক করতে হলেই আমরা ঘুরে ফিরে সেই বাউলের সুরের আশ্রয় গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের সব আশা আকাঙ্ক্ষা সে সুরে ব্যক্ত হয় না, আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রার সব কথায় সে সুর সাড়া দিতে পারে

না। এখন যে আমরা হাটের মাঝে, পৃথিবীর চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি,—মায়ের আঁচল ছেড়ে সংসারে প্রবেশ করেছি। ইতি-মধ্যে বাইরের অনেক সহুরে রাজকীয় জিনিস আমাদের অন্ত-রঙ্গ হয়ে উঠেছে। বাঙ্গালী মেয়ের আটপৌরে কাপড় দেশী কালাপেড়ে লালপেড়ে সাড়ী হলেও, যেমন বেনারসী সাড়ী দূর থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে তার পোষাকী বেশের স্থান অধিকার করেছে; তেমনি কীর্ত্তনাদি খাঁটি বাঙ্গলা গান হলেও, রাগরাগিণীসম্বলিত ওস্তাদী বা দরবারী সঙ্গীত বহুকাল থেকে আমাদের দেশে এমন প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে, আজ তার কুলশীলের খোঁজ না করেই তার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকার করে' নিতে হবে।

এই সঙ্গীতের একটি সুবিধে এই যে, ভারতবর্ষের উত্তরভাগে তা' প্রায় সমভাবেই প্রচলিত। সুতরাং আর্য্যাবর্ত্তের সব জাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার পক্ষে সংস্কৃতঘেঁষা হিন্দী ভাষার জ্ঞান যেমন প্রধান সহায়, তেমনি তার সকল প্রদেশের সঙ্গীত-রস আদান প্রদানের পক্ষে ওস্তাদী সঙ্গীতের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকা অতীব আবশ্যক। এ পরিচয় যে আরো ঘনিষ্ঠ এবং লোকসামান্য নয়, তার একটা কারণ আমার মনে হয় এই যে, আমাদের সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করা অতিশয় কষ্টসাধ্য। যা' জানবার জন্য এত পরিশ্রম করতে হয়, সে সৌখীন বিদ্যা আয়ত্ত করতে আজকাল অনেকেই নারাজ;—এবং যা' জানিনে তা' ভাল লাগা অসম্ভব। আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রের মত সঙ্গীত-শাস্ত্রও অসংখ্য বিধিনিষেধে জটিল, এবং যাঁরা সে শাস্ত্রের উত্তরাধিকারী, তাঁরা দশজনের শিক্ষার সৌকর্য্যার্থে তার সরল সংস্করণ প্রকাশ করবার কোন চেষ্টা করেন নি, বরং যিনি যতটা জানেন স্ববংশের মধ্যে

আবদ্ধ রাখতেই চেয়েছেন। দুঃখের বিষয় এ দেশের পেশাদার ওস্তাদের, সঙ্গীত ছাড়া অপরাপর বিষয় শিক্ষাদীক্ষা এতই কম যে, কিসে সঙ্গীতের উন্নতি হয় বা জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচার হয়, সে সম্বন্ধে তাঁদের ভাববার আবশ্যক বোধ হয় কিনা সন্দেহ। অপরপক্ষে এও বল্‌তে হয় যে, পুরাকালের রাজারাজড়া বড়লোক তাঁদের যে-ভাবে প্রতিপালন ও সমাদর করতেন, একালে সে সম্মান ও সাহায্য লাভে তাঁরা বঞ্চিত হওয়ায়, দারিদ্র্যবশতঃ অন্নচিন্তাতেই তাঁদের সমস্ত মন দিতে হয়। তারপরে সেকালে স্বরলিপি করবার পদ্ধতি না থাকায়, ওস্তাদদের স্মরণশক্তির উপর এতটা নির্ভর করতে হয় যে, তাঁরা সঙ্গীতের শাস্ত্রবিধি সম্বন্ধে হিন্দু-বিধবার মত শুদ্ধাচারী ও শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। পাছে মুখস্থ বিদ্যার কোন ব্যতিক্রম ঘটে, পাছে অমুক আইনের অমুক ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হন, এই ভয়ে তাঁরা নিজেও অস্থির, এবং দেশসুদ্ধ লোককেও অস্থির করে তুলেছেন।

ওস্তাদী গানের প্রতি সাধারণ অভক্তির আর এক কারণ,—ওস্তাদদের কায়দাকানুন। তাঁদের অনাবশ্যক মুখভঙ্গী, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গী,—এক কথায় মুদ্রাদোষ, এবং পরস্পরের কূটতর্কে,—যা' প্রশস্ত সুন্দর রাজপথ হওয়া উচিত, তাকে এমনি কণ্টকিত জটিলারণ্যে পরিণত করেছেন যে, পথ-চল্‌তি লোকের পাশ কাটিয়ে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। বিদ্যামাত্রেরই একটা মজুরী ও শিক্ষানবিশী আছে,—তা' অর্থকরীই হোক্ আর সৌখীনই হোক্। কিন্তু শিক্ষার চরম ফলের মধ্যে তার প্রথম শুষ্ক কঠিন অংশের সমস্ত চিহ্ন লোপ পাওয়া উচিত,—যেমন চাষের ফলে নগ্ন রুক্ষ ভূমি স্বর্ণশস্যের মসৃণ রঙীন আস্তরণ-

তলে অন্তর্হিত হয়। য়ুরোপীয়গণ এ কথা খুব বোঝেন, এবং প্রথম থেকেই ছাত্রদের সংযত শোভন ভাব রক্ষা করবার শিক্ষা দিয়ে থাকেন। আমাদের সঙ্গীতাচার্য্যগণ কেন যে এদিকে লক্ষ্য রাখেন না বলতে পারিনে। কাণে হাত না দিয়েও চড়া সুর নেওয়া যে অসম্ভব নয়,—কিম্বা উচ্চারণ ও মুখের ভাব যত বিকৃত হবে, সঙ্গীত তত সংস্কৃত হতে যে বাধ্য নয়, তা ত হাতে হাতেই প্রমাণ করা যায়। বিশেষতঃ মেয়েদেরও সঙ্গীতচর্চ্চার সময় এ সব বিষয় খুব সাবধান থাকা দরকার। সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায় সেকালে রাজবাড়ীর মেয়েদেরও গীতবাদ্য শেখাবার প্রথা ছিল, সুতরাং বোধহয় তখন সঙ্গীতসরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীশ্রীর এতটা বিচ্ছেদ ঘটেনি। একালে আশা করি আমাদের মেয়েরা আবার সেই শুভসম্মিলন সাধন করবেন।

ওস্তাদী গানের প্রতি আধুনিক ঔদাসীন্যের আর একটি কারণ নিশ্চয়ই তার ভাষা। উচ্চাঙ্গের হিন্দুসঙ্গীত প্রায়ই মূলহিন্দীর কোন না কোন অপভ্রংশে রচিত। এবং সে ভাষা অধিকাংশ বাঙ্গালীর অপরিচিত বলে', সে গানও তেমন মর্ম্মস্পর্শী বোধ হয় না। তার উপর অশিক্ষিত লোকের মুখে মুখে গানের অনেক কথা এমন বিকৃত হয়ে যায় যে, শিক্ষিত লোকের পক্ষেও অর্থ করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। বাণী শুদ্ধ রাখবার দিকে ওস্তাদরা আর একটু দৃষ্টি রাখলে ভাল হয়। অবশ্য সুর ও কথা মিলেমিশে গান হয়, এবং বাক্য ও অর্থের ন্যায় এস্থলে এই দুইকে আলাদা করা অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি হিন্দীভাষা আর্য্যাবর্ত্তের মনের চাবিস্বরূপ। সেই সঙ্গে যখন সে-দেশের গানেরও এই একই চাবি, তখন কি সঙ্গীতভক্ত-অভক্ত সকল বাঙ্গালীরই হিন্দী শেখার প্রতি আর একটু মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়? বিশেষতঃ

যখন হিন্দীর মত এমন মার্জ্জিত মধুর ভাষা ভূভারতে আর নেই। তা' ছাড়া সুর ও কথার মধ্যে সঙ্গীতক্ষেত্রে সুরেরই প্রাধান্য মানতে হবে; কারণ কথা বাদ দিয়েও সঙ্গীত হয়,—যথা যন্ত্রসঙ্গীত কিম্বা রাগালাপ, পাখীর ডাক কিম্বা শিশুর কাকলি। কিন্তু সুর বাদ দিলে কথা সঙ্গীতের এলাকা ছাড়িয়ে কবিতার রাজ্যে গিয়ে পড়ে। অবশ্য মিষ্টি কথারও একটা সাঙ্গীতিক ধ্বনি আছে, যার মানে না বুঝলেও ভাল লাগতে পারে,—যেমন কোন কোন অজানা ভাষার আওয়াজও শ্রুতি-মধুর বোধ হয়। সংস্কৃত শ্লোক বা মন্ত্রের মাহাত্ম্য তার সুগম্ভীর ধ্বনির উপর কতটা নির্ভর করে, তা' সর্ব্বলোকবিদিত। সে হিসেবেও বলতে পারি হিন্দী-ভাষার মূল্য কম নয়। জানিনে অভ্যাসবশতঃ কি না, কিন্তু হিন্দী গান সম্পূর্ণ না বুঝলেও তা আমাদের কাণে যত মিষ্টি লাগে, বাঙ্গলায় ভাঙ্গলে সেই গানেরই আর তত লজ্জৎ থাকে না। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই বুঝতে পারবে।—

"অব ভজ ভোর প্রাত হরি নাম,
বন্দে সকল দুখ মিট যাত যাত
আওর সকল শরীর হোত কল্যাণ।"

জানিনে তোমাদের কি মনে হয়, কিন্তু "অব ভজ ভোর প্রাত হরিনাম" শুনলে আমার মনশ্চক্ষে ফুটে ওঠে গঙ্গার ধারের,—বিশেষতঃ কাশীর গঙ্গাধারের, ছবি; যেন নদীর তীরে বসে' কোন সৌম্যমূর্ত্তি সাধু একতারা বাজিয়ে গান করছেন, এবং ভোরের ঝির্‌ঝিরে হাওয়া এসে তাঁর ও আমাদের শরীরমন পবিত্র করে' দিচ্ছে। আমাদের একজন কবি যে শরৎ-প্রভাতকে 'নিরাময় নির্ম্মল' বিশেষণে ভূষিত করেছেন,

সেই প্রভাত যেন এখানে মূর্ত্তিমান হয়ে উঠেছে, তাই "সকল শরীর হোত কল্যাণ।" এ কথাগুলি কোন বাঙ্গালীর বুঝতেও কষ্ট হয় না।

এবার এরই বাঙ্গলাটা শোন ঃ—

"সবে কর আজি তাঁর গুণগান
যাবে সকল দুঃখ, সব পাপ তাপ,
ওরে সকল সন্তাপ হইবে নির্ব্বাণ।"

বাঙ্গলা গানটি ভাঙ্গা বেশ ভালই হয়েছে, কিন্তু তবু যেন কি একটা রস উবে যায়, সেই বিশেষ তারটি থাকে না। ওস্তাদী হিন্দী গানের এই রসটি আস্বাদ করবার জন্যে একটু শিক্ষার দরকার। সে শিক্ষাটুকুর বর্ণপরিচয় হতে হতেই লোকের ভাল লাগতে আরম্ভ করে, এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস; কারণ আমরাও তার বড় বেশীদূর এগোইনি। আজ তার প্রথম ভাগের কতকগুলি মূলসূত্র তোমাদের ধরিয়ে দেবার ইচ্ছে আছে। যাঁদের কাছে তা' পূর্ব্বপরিচিত, তাঁরা পুনরাবৃত্তি মার্জ্জনা করবেন।

আমাদের সকল শাস্ত্রেরই মূল যেমন বেদে অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়, সঙ্গীতশাস্ত্রেরও তাই। ঋগ্বেদের মন্ত্র যে উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরিত নামে তিনটি স্বরে উচ্চারিত হত এবং হয়ে থাকে, যাঁরা পণ্ডিতের মুখে তা' না শুনেছেন, তাঁরা আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্লোকপাঠে তার কতক পরিচয় পেতে পারেন। সামবেদও এখনো গীত হয়, কিন্তু ঠিক পূর্ব্ব সুরে কি না জানিনে। এবং দুঃখের বিষয় সে গান কখনো শুনিনি, তাই তোমাদেরও তার নমুনা শোনাতে পারলুম না। এই বৈদিক ত্রিস্বর থেকেই ক্রমশঃ আমাদের বর্ত্তমান সপ্তস্বর সম্ভবতঃ উদ্ভাবিত হয়েছে। য়ুরোপীয়দের আধুনিক বিচিত্র সঙ্গীতও তাদের পূর্ব্বতন ধর্ম্মযাজকদের মন্ত্রপাঠের স্বরগ্রামের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পৌরাণিক যুগে লবকুশের রামায়ণ-গান লোকপ্রসিদ্ধ ; ও ততদিনে বোধহয় সাতটি শুদ্ধ স্বরের অভিব্যক্তি হয়েছিল। বড়ই আপশোষের বিষয় যে, আমাদের ঐতিহাসিক স্পৃহা তত প্রবল না হওয়াতে, এবং স্বরলিপির প্রচলন পূর্ব্বে না থাকাতে, এই সব আদিম গানের কোন প্রতিধ্বনি কলিযুগ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছোয়নি। বৌদ্ধযুগান্তে ব্রাহ্মণ্য যুগের পুনরভ্যুত্থানের সময় যে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রচলন ও সমাদর ছিল, তার প্রমাণ সংস্কৃত কাব্যাদিতে পাওয়া যায় মাত্র। সঙ্গীতশাস্ত্রকে গন্ধর্ব্ববেদ ও পঞ্চমবেদ বলে' উল্লেখ করা হত, এবং ব্রাহ্মণ নাট্যাচার্য্য দ্বারা তা' রাজ-অন্তঃপুরেও শেখানো হত—এর থেকে সে সম্মানের মাত্রা বোঝা যায়। তা' ছাড়া দেবলোকে যে বিদ্যার জন্ম, সরস্বতীদেবী যার অধিষ্ঠাত্রী, নারদ যার দ্বারায় হরিগুণ কীর্ত্তন করেন, অপ্সরাগণ যার সাহায্যে দেবতাদের মনোরঞ্জন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ যার টানে তাঁর ভক্তদের মধ্যে অধিষ্ঠান করেন বলে' পুরাণের কথন ;—সে বিদ্যাকে যদি আমরা হেয়জ্ঞান করে' থাকি ত সে নিতান্তই আমাদের অধঃপতনের ফলে। তবু আমরা অত্যন্ত স্থিতিশীল ও অতীতভক্ত জাত বলে, মুখে মুখে এতকাল পরেও যে অন্ততঃ মুসলমান আমলের সঙ্গীতপদ্ধতি কথঞ্চিৎ রক্ষিত হয়েছে, সে আমাদের ওস্তাদবংশপরম্পরার কৃপায়, এবং সেজন্য তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদের পাত্র।

মুসলমানগণ তাঁদের সঙ্গে কোন জাতীয় সঙ্গীতপদ্ধতি এনেছিলেন কিনা জানিনে। তাঁরা সে সময় কিছু রূঢ়প্রকৃতির ছিলেন, এবং গানবাজনা নাট্যোল্লাসের পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই শোনা যায়। তবে দক্ষিণে, যেখানে মুসলমানপ্রভাব কম, সেখানে সঙ্গীতের রূপ সম্পূর্ণ না হোক্, অনেকটা ভিন্ন বলে', মনে হয় যে হয়ত সেইটেই

আমাদের আদিসঙ্গীতের বংশধর,—এবং আর্য্যাবর্ত্তের প্রচলিত সঙ্গীত মুসলমান ও হিন্দুসঙ্গীতের সংমিশ্রণের ফল। একেবারে অনার্য্য-সঙ্গীতের আভাস পাহাড়ী-গানে পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য স্বরলিপি এবং ইতিহাসজ্ঞানের অভাবে এ সমস্তই আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। দক্ষিণী বা কর্ণাটী সঙ্গীতের ঢং আমার ত মন্দ লাগে না, তবে ওস্তাদী গোঁড়ামীর কাছে খাঁটি উত্তর-হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ছাড়া আর সবই শব্দপর্য্যায়ের অন্তর্গত।

অনেক দক্ষিণী গান শুনতে শুনতে বোঝা যায় যে, উত্তরের সঙ্গে মোটামুটি কতকগুলি প্রভেদ এই যে, ওদের সুর তাল আমাদের চেয়ে হাল্কা ও একটু দ্রুত; এবং প্রত্যেকবার পুনরাবৃত্তির সময় ওরা একটু একটু করে' ছোট ছোট তান দিয়ে সুরের বিস্তার করে, তাকে বলে পল্লবী, অনুপল্লবী ইত্যাদি। ওদের রাগের নাম এবং রূপও আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। পূর্ব্বভারতে যেমন বাঙ্গলা, পশ্চিম-ভারতে তেমনি মহারাষ্ট্রী সঙ্গীতও প্রচলিত। কিন্তু হিন্দুস্থানই হিন্দুসভ্যতার বাস্তুভিটা, সেইজন্য হিন্দুস্থানী সঙ্গীতই সম্প্রতি আলোচ্য বিষয়।

প্রাচীন সঙ্গীতের অনেক পুঁথিগত শাস্ত্র আছে, যথা শার্ঙ্গদেব কৃত সঙ্গীতরত্নাকর, সোমেশ্বরকৃত রাগবিবোধ, অহোবলকৃত সঙ্গীত পারিজাত ইত্যাদি। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ৺ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, ৺শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতানুরাগী বাঙ্গালীগণ এই সব সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ ও সার সংগ্রহ করতঃ প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রকে সাধারণের আয়ত্তের মধ্যে এনে দিয়ে আমাদের উপকার করেছেন। এর মধ্যে কৃষ্ণধন বাবুর গীত-

সূত্রসার গ্রন্থের সঙ্গে আমার যেটুকু পরিচয় আছে, তা'তে বিশ্বাস হয়েছে যে তাঁর মত সমদর্শী, প্রাজ্ঞ, ও প্রাঞ্জল লেখক যে-কোন দেশেই দুর্লভ। তিনি কোন-একটী বিষয়ের আশপাশ সবদিক দেখে ও দেখিয়ে, বিবেচনা ও যুক্তিপূর্ব্বক যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তা'তে আনাড়ীর মনও স্বভাবতঃ সায় দেয়; কারণ যে-বিষয় কিছু জানি তার সম্বন্ধে কোন লোক যদি যুক্তিসঙ্গত কথা বল্‌ছে দেখতে পাই, তাহলে যে-বিষয় জানিনে সে সম্বন্ধেও তার বুদ্ধিবিবেচনার প্রতি আস্থা হয়। সুতরাং যিনি সংক্ষেপে হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান লাভ করতে চান, তাঁকে কৃষ্ণধন বাবুর গীতসূত্রসার দুই খণ্ডের আলোচনা করতে বলি। প্রথম খণ্ডে সঙ্গীত-শাস্ত্র এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সঙ্গীত-কর্ত্তব সম্বন্ধে যা লিপিবদ্ধ আছে, তাই জানাই সৌখীন সঙ্গীত-চর্চ্চার পক্ষে যথেষ্ট। তিনি বলেন, প্রাচীন পুঁথি থেকে আধুনিক হিন্দু-সঙ্গীতশিক্ষার উপদেশ কমই পাওয়া যায়। অতএব তা নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া অনাবশ্যক। সে কথা সত্য, কারণ লক্ষ্মী যেমন বাণিজ্যে বাস করেন, সঙ্গীত-সরস্বতী তেমনি সুগায়কের শ্রীকণ্ঠে বাস করেন,—পুঁথির পত্রে নয়। তবে ধর্ম্মপুরাণের অনেক কথা যেমন আমরা একালে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও শুনতে ভালবাসি, তেমনি সঙ্গীত-পুরাণের কতকগুলি কথা বর্ত্তমান সঙ্গীতশিক্ষার কাজে না লাগলেও শুনতে ভাল লাগে। যথা:—রাগরাগিণীর দেবমূর্ত্তির কল্পনা। তাঁদের ভক্তরা যথারীতি স্মরণ করলে তাঁরা গায়কের রাগালাপে নিজমূর্ত্তি ধারণ করেন। এই ধ্যানমূর্ত্তি এতই পরিস্ফুট যে সংস্কৃত শ্লোকে তার পরিষ্কার বর্ণনা আছে, ও সেই অনুসারে ছবি পর্য্যন্ত আঁকা হয়েছে।

এই বিশ্বাসই বোধহয় আর একটি পৌরাণিক বিশ্বাসের মূল,— অর্থাৎ যে তাঁরা যখন দেবতা, আমরা যখনতখন ডাকলে চল্‌বে না, তাঁদের অবকাশমত ডাকা চাই ; তাই বিশেষ সময়ে বিশেষ রাগ গাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যথা ঃ—সকালে ভৈরব, তুফুরে সারঙ্গ, বিকেলে মূলতান, রাত্রে বেহাগ ইত্যাদি।

কৃষ্ণধন বাবু অতি অশাস্ত্রীয় প্রকৃতির লোক, সুতরাং তিনি অবশ্য এর আধুনিক ব্যাখ্যা এই দেন যে, সেকালে রাজবাড়ীতে প্রহরে প্রহরে বৈতালিকদের গান হত, তাই একঘেয়ে বা এলোমেলোভাবে না গেয়ে তারা বিশেষ সময়ের জন্যে বিশেষ রাগ নির্দ্দিষ্ট করে' দিয়েছিল। যে-সময় যেটি শোনা অভ্যাস, সেই সময় সেটি শুনলে যে ভাল লাগে, সে বিষয় ত আমরাও আজকাল সাক্ষ্য দিতে পারি। শাঁখবাজানোর সঙ্গে আমাদের মনে যে মঙ্গলভাব জড়িত, রঁসুনচৌকীর আওয়াজ শোনবা-মাত্র বিবাহ-উৎসবের যে করুণ আনন্দ আমাদের মনে জেগে ওঠে, তা কি অপর কোন দেশের লোকের হওয়া সম্ভব ?—বিশেষতঃ শব্দের স্মৃতিউদ্দীপনী শক্তি প্রসিদ্ধ। তাই শুনতে শুনতে আমাদেরই সকাল সন্ধ্যার রাগ সময়ে শুনলে যত ভাল লাগে, অসময়ে তত ভাল লাগে না ;—ওস্তাদদের ত কথাই নেই। সঙ্গীতসম্বন্ধে আর একটি কৌতুকা-বহ কিম্বদন্তি এই যে, বিশেষ বিশেষ রাগের বিশেষ ক্ষমতা আছে, যথা ঃ—দীপক গাইলে আগুন জ্বলে' ওঠে, মেঘমল্লার গাইলে বৃষ্টি নামে, ইত্যাদি ; প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্পও প্রচলিত আছে। সপ্তস্বর সাতটি জীবের কণ্ঠস্বর থেকে গৃহীত বলে সেকালে আর এক ধারণা ছিল ; যথা ঃ—ময়ূর থেকে সা, বৃষ থেকে রে, ছাগল থেকে গা, বক থেকে মা, কোকিল থেকে পা (এখনো সেইজন্য

কবিরা বলেন কোকিল পঞ্চমে গায়), অশ্ব থেকে ধা, এবং হাতী থেকে নি।

সেকালের লোকেরা কিছু অধিক কল্পনাপ্রবণ ছিলেন বলে' তাঁদের লেখার নীর বাদ দি'য়ে ক্ষীর গ্রহণ করা একটু শক্ত। তাই বলে' মনে কর' না যে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রের সবই অতিরঞ্জিত এবং অনাবশ্যক জল্পনা। সকল বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করবার দিকে হিন্দু-মনের যে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল, সঙ্গীতশাস্ত্রেও নিশ্চয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে কালে অনেক পরিবর্ত্তন এবং আশা করি সেই সঙ্গে উন্নতিও হয় বলেই বল্‌ছিলুম যে, তাঁদের সব সিদ্ধান্ত আমাদের কালের উপযোগী নয়। কিন্তু এমনও অনেক জিনিস আছে, বিশেষতঃ রাগ-তালের বিবরণ, যাতে একালেরও নজির পাওয়া যায়, এবং যা' না জানলে আধুনিক হিন্দুসঙ্গীত সম্বন্ধেও পরিষ্কার ধারণা হয় না। যেমন কিছু ব্যাকরণ না জানলে ভাষাজ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না।

রাগ কাকে বলে জান?—জানলেও বোঝানো শক্ত; যেমন 'প্রাণ' কথাটার মানে আমরা সকলেই বুঝি, কিন্তু বোঝাতে হলে ফাঁপরে পড়ে' যাই। আমি বড় জোর বল্‌তে পারি যে, আমাদের দেশের গানের সুর রাগরাগিণী নামক কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। তার কাজ হচ্ছে প্রতি সুরের জাতিপরিচয় দেওয়া। যেমন মানুষমাত্রেরই পাঁচ ইন্দ্রিয় আছে,—অথচ গঠন, রঙ, আচার, ব্যবহার, বেশ ও নিবাস অনুসারে তারা বিশেষ বিশেষ জাতিতে বিভক্ত; তেমনি গানের সুর মাত্রই সপ্তস্বরের লীলা, কিন্তু সেই স্বরগুলি সাজাবার তফাতে রাগের তফাৎ হয়। এই উপমার একটু বিশেষ উপযোগিতা এই যে, কৃষ্ণধন বাবুর মতে এক এক জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত বিশেষ

বিশেষ সুর থেকেই বিভিন্ন রাগিণীর উৎপত্তি হয়েছে ; কথাটা যুক্তি-সঙ্গত বলে' বোধ হয়, কারণ অনেক রাগিণীর দেশের নামে নাম—যথা, সিন্ধু, গুর্জ্জরী, মূলতান, সুরট ইত্যাদি। একই রাগে অনেক গান হতে পারে, তাই শ্রেণী নাম দিয়েছি ; কিন্তু সেই রাগের বিশেষ লক্ষণ সবগুলিতে থাকা চাই। সে লক্ষণগুলি কি, তা' চিনতে অনেক অভ্যাস এবং শিক্ষার দরকার। প্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মোলিয়েরের অঙ্কিত একটি হঠাৎ-নবাব, ৪০ বৎসর বয়েসে লেখাপড়া শিখতে গিয়ে আবিষ্কার করে' আশ্চর্য্য হয়েছিলেন যে, এতদিন ধরে' তিনি যে ভাষায় কথা কয়ে আসছেন, তা'কেই বলে গদ্য! আমরাও হয়ত যে-সব চলিত বাঙ্গলা গান গেয়ে আসছি, অজ্ঞাতসারে তার রাগতাল বজায় রেখেই গেয়ে থাকি। যেটা অজ্ঞানে অনেক সময়ে করি, সেইটেই জ্ঞাতসারে করবার পদ্ধতির নাম শিক্ষা। কেউ কেউ বলতে পারেন যে, রাগতাল বুঝলেই কি গান বেশী মিষ্টি লাগবে?—যেহেতু শেক্সপীয়র বলে' গেছেন যে, অপর কোন নাম দিলেও গোলাপের গন্ধ সমানই মধুর হত! কিন্তু রাগরাগিণীর সঙ্গে একটু আধটু পরিচয় না থাকলে আমার বোধহয় আমাদের দেশের গান সম্পূর্ণ-রূপে ভাল লাগবার ব্যাঘাত ঘটে ; যেমন জাতিভেদ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকা আমাদের দেশের লোককে ভালরকমে চেনবার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় ;—রাগবিচার ও জাতবিচার দুই প্রথাই আমাদের এমন মজ্জাগত। তা' ছাড়া শুধু গাবার জন্য ততটা না হোক্, গান রচনা করবার জন্যে, বা গুণীর গুণপনার মাত্রা বোঝবার জন্যে, রাগবোধ কিছু থাকা নিতান্ত দরকার।

অবশ্য এই অল্প সময়ের মধ্যে আমি তোমাদের রাগরাগিণী

সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ দেবার অসাধ্য সাধন করতে চাইনে। তবে এইটুকু মোটামুটি বলে' রাখি,—যা' অনেকেই আগে শুনে থাকবেন—যে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রমতে ছয় রাগ, ও ছত্রিশ রাগিনী তাঁদের স্ত্রীস্বরূপা; তা' ছাড়া পুত্রপৌত্রেরও অভাব নেই। আধুনিক মতে ছয় ঋতুর সঙ্গে ছয় রাগের যোগ থাকা খুব সম্ভব। কিন্তু রাগিণীর সঙ্গে তাঁদের জবরদস্তি বহুবিবাহে আবদ্ধ না করে' স্বাভাবিক সাদৃশ্য অনুসারে রাগরাগিণী শ্রেণীবদ্ধ করলেই বোঝবার পক্ষে সহজ হয়। মুসলমান আমলে এই প্রকার সাদৃশ্যমূলক শ্রেণী বিভাগই করা হয়েছিল;—যথা অষ্টাদশ কানাড়া, ত্রয়োদশ তোড়ি, দ্বাদশ মল্লার, নব নট, সপ্ত সারঙ্গ। কিন্তু এর অনেক রাগিণীই স্বরলিপি অভাবে লোপ পেয়েছে। নানা মুনির নানা মতের ভিতর সঙ্গীতশাস্ত্রে ভরত ও হনুমন্তের মতই প্রধান। ভরত বাল্মীকির সমসাময়িক, এবং আদি নাট্যকার বলেও প্রসিদ্ধ। হনুমন্ত আমাদের আবাল্য-সুহৃৎ পবন নন্দন কি না তা' বলা যায় না, তবে ঐ নামে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, এটুকু নিশ্চিত। এঁদের কারও মূল-গ্রন্থ পাওয়া যায় নি; পূর্ব্বে যে গ্রন্থকারদের নাম করেছি, তাঁরা এঁদেরই অসম্পূর্ণ প্রচলিত মত সংগ্রহ করেছেন মাত্র। সেই জন্য মতের অনৈক্যও দৃষ্ট হয়; কিন্তু ওস্তাদী সঙ্গীতচর্চ্চার পক্ষে, যে বিষয় সকলে একমত, তার কিছু কিছু জানাই যথেষ্ট।

আমাদের গানের সাধারণ কতকগুলি লক্ষণের মধ্যে একটা এই যে, বার বার প্রথম থেকে পুনরাবৃত্তি হয়, ও ঠিক শেষে শেষ হয় না, কিন্তু সম নামক তালের একটা বিশেষ ঝোঁকে শেষ করতে হয়; আর একটা এই যে, রচয়িতার নাম শেষভাগে দেওয়া

থাকে, তা'তে লিপিবদ্ধ করবার অন্ততঃ একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়; আর একটা এই যে, মুখে মুখে শেখা ও শেখানো হয়, তাই স্মরণশক্তি থাকা খুব আবশ্যক; আর একটা এই—যা' পূর্ব্বেই বলেছি যে, রাগরাগিণী দ্বারা সীমাবদ্ধ।

রাগের যেমন প্রকারভেদ আছে, আমাদের গানেরও তেমনি প্রকারভেদ আছে,—তবে অত নয়। উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত মোটামুটি তিন প্রকার,—ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। কথা ও তাল বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলি নিরর্থক শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক রাগের রূপ দেখানোর একটা পদ্ধতিও আছে,—তাকে বলে আলাপ করা। সন্ধ্যাবেলা গানের বৈঠক বসলে ওস্তাদরা প্রায়ই ইমনকল্যাণের আলাপ করে' সেই রাগিণীর গান ধরেন—কেন জানিনে। ইমন্ পারস্যদেশ থেকে এসেছে শুনতে পাই, তাই হয়ত মুসলমান বাদশারা তা'কে এই সম্মানের আসন প্রদান করেছিলেন।

মুসলমানরা আসবার আগে থেকেই উত্তরপশ্চিমে ধ্রুপদের প্রচলন ছিল। ধ্রুপদে চারটি কলি বা ভাগ থাকে,—আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। পাখোয়াজে যে-সব ভারি ভারি তাল বাজানো হয়, যথা চৌতাল, ধামার, সুরফাঁকতাল ইত্যাদি, তা'তেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়। ধ্রুপদের কথার ভাবও গম্ভীর। যাদের কেবল ধ্রুপদ গাওয়া অভ্যাস ও ব্যবসা, হিন্দুস্থানে তাদের বলে "কালাবঁৎ" অর্থাৎ কলাবন্ত। স্বনামধন্য তানসেন ধ্রুপদ গায়ক এবং রচয়িতা ছিলেন, ও আকবরের সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাকি আগে হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান হন। তাঁর আগে নায়ক গোপাল ও বৈজু বাওরা, এবং পরে ছুঁদি খাঁ ও সুরদাস ভাল ধ্রুপদ-রচয়িতা বলে প্রসিদ্ধ।

খেয়ালের উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, বাদশা মহম্মদ সা ধ্রুপদ শুনে শুনে বিরক্ত হয়ে সুগায়ক সদারঙ্গকে নতুন কোনরকম গান তৈরি করতে আদেশ করেন,—ফলে জন্মাল খেয়াল। কেউ বলেন, তার পূর্ব্বে সুলতান হোসেন নামে জোয়ানপুরের এক নবাব খেয়াল সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণধন বাবুর মতে কোন বিশেষ ব্যক্তি কোন বিশেষ সময় খেয়ালের সৃষ্টি করেন নি ; কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐরকম গান পূর্ব্বাবধি প্রচলিত ছিল, সুলতান হোসেন হয়ত তাকে জাতে তুলে নিয়েছেন। কারণ কথাটার মানে থেকেই বোঝা যায় যে, তখনকার সভ্য ওস্তাদসমাজে খেয়াল জিনিসটাকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখ্‌ত। যাই হোক্, খেয়াল ধ্রুপদের চেয়ে সংক্ষেপ; এবং প্রায় দুই কলিতেই সম্পূর্ণ—আস্থায়ী ও অন্তরা। তার বেশী থাকলেও, সুর অন্তরারই মত হয়। রাগরাগিণী সম্বন্ধে খেয়াল ধ্রুপদে বিশেষ তফাত নেই ; তালে আছে। কাওয়ালি, একতালা, যৎ প্রভৃতি খেয়ালের তাল। রাগ সম্বন্ধে যেমন, তাল সম্বন্ধেও তেমনি অতি মোটা দুই একটি কথা ছাড়া এখানে কিছু বলবার সময় বা স্থান নেই। তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, একই ছন্দের অনেক তাল ঢিমা করে' গাইলে ধ্রুপদের তাল হয় এবং মাত্রা অর্দ্ধেক করে নিলে খেয়ালের তাল হয়,—নামও বদলায়। কিন্তু আসল প্রভেদ এই যে, খেয়ালে যে-রকম ছোট ছোট তান গিট্‌কিরি ব্যবহার হয়, ধ্রুপদে তা' হয় না ; এবং ধ্রুপদে যেরকম গমক ব্যবহার হয়, খেয়ালে তা হয় না। খেয়ালের তাল যেমন অপেক্ষাকৃত লঘু, ভাবও তাই। যেরকম অকিঞ্চিৎকর বিষয়ে অনেক খেয়াল রচিত হয়, তা' শুধু হিন্দী কথার মিষ্টতার গুণে পার পায়। যথা :—কারো পান খেয়ে ঠোঁট লাল হয়েছে, কারো সাড়ি

রঙিয়ে বা চুড়ি মাঙিয়ে দিতে হবে, কারো নূপুর বাজছে, কারো ননদী বক্‌ছে। হিন্দী খেয়ালরচয়িতার মধ্যে সদারঙ্গ ও আধারঙ্গ বিখ্যাত।

টপ্পা খেয়ালের চেয়ে আরো সংক্ষেপ, আরো হাল্কা এবং আরো তানযুক্ত,—কথায় কথায় তান। এ সম্বন্ধেও এই একটা গল্প প্রচলিত আছে যে, সদারঙ্গের এক সাক্রেদ গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌয়ে গিয়ে খেয়ালের ঔৎকর্ষ্য সাধন করেন। তাঁরই ছেলে গোলাম নবী, শোরী নামক এক পাঞ্জাবী স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন, এবং তাঁকে উদ্দেশ করে' যে সব গান রচনা করেন, তারই নাম টপ্পা। শোরীর টপ্পা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত, সেটা ঠিক; এবং শোরীর নামও শেষে উল্লিখিত আছে, তা'তে অনেকের মনে হয় যে শোরীমিঞাই বুঝি রচয়িতা। টপ্পারও খেয়ালের মত কেবল এক আস্থায়ী ও অন্তরা, এবং খেয়ালের প্রায় সকল তালই তা'তে ব্যবহৃত হয়; শোরীর টপ্পা অধিকাংশ মধ্যমান তালে। কেবল রাগিণীতেই খেয়ালের সঙ্গে টপ্পার প্রভেদ। টপ্পা আধুনিক এবং সংক্ষিপ্ত বলে'—কাফী, পিলু, বারোঁয়া, ঝিঁঝিট, লুম প্রভৃতি আধুনিক রাগে রচিত হয়ে থাকে; প্রাচীন রাগের মধ্যে ভৈরবী, খাম্বাজ, কালাংড়া, দেশ ও সিন্ধুই ব্যবহৃত হয়। টপ্পার হাল্‌কা তান গিটকিরির সঙ্গে ভারি রাগ, তাল বা ভাব খাপ খায় না।

এই তিনরকম গানের মধ্যে যে ওস্তাদ যে ঢংয়ের সাধনা করেছেন, সেইপ্রকার গানই গেয়ে থাকেন, কারণ অভ্যাসবশতঃ সেই এক ধরণই তাঁর গলায় সহজে আসে। পরস্পরের রাগতাল ব্যবহার না করার দরুণ এই তিনটি রীতি একেবারে পৃথক হয়ে পড়েছে।

ঠুংরী নামে আর একপ্রকার গানও হিন্দুস্থানে প্রচলিত আছে, তা' টপ্পার রাগিণীতে গাওয়া হ'লেও, তাল এবং সুরের বৈচিত্র্যবশতঃ স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। একপ্রকার তালের নামও ঠুংরী। একই গানে সুকৌশলে একাধিক রাগিণী এবং রীতি মিশিয়ে এই বৈচিত্র্য সম্পাদন করা হয়; এবং ওস্তাদী গোঁড়ামীর কাছে সেটা অবৈধ বা শ্রুতিকটু বোধ হলেও, সাধারণ শ্রোতার কাণে মিষ্টি লাগে। আমার বোধহয় আমাদের আজকালকার অনেক মিশ্র সুর ঠুংরীশ্রেণীভুক্ত।

গান সম্বন্ধে এত কথা বল্লুম বলে' মনে কর' না যে গানই সঙ্গীতের সর্ব্বস্ব। সংস্কৃতে সঙ্গীত বল্‌তে নৃত্যগীতবাদ্য তিনই বোঝাত; এখন তার অর্থ সঙ্কীর্ণ হয়ে কেবল গানে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কণ্ঠকে যদিও শ্রেষ্ঠ যন্ত্র বলা হয়েছে, তবু মানুষের হাতে গড়া বহুতর যন্ত্র আছে, যা' কথাকে অতিক্রম করে' আমাদের মনে অনির্ব্বচনীয়ের আভাস এনে দেয়। আর ভগবান ভাল গলা না দিলে ভাল গাইয়ে হওয়া সম্ভব নয়; কিন্তু চলনসই সুরবোধ থাকলেই যত্ন ও চেষ্টাপূর্ব্বক ভাল বাজিয়ে হওয়া যেতে পারে।

বৈদিক যুগেও যন্ত্রের অভাব ছিল না, কারণ ম্যাকডনেল সাহেব বলেন বাঁশি-বাজিয়ে, বীণা-বাজিয়ে, ঢোল-বাজিয়ে প্রভৃতি পেশার উল্লেখ বেদে আছে। প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রে চারপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের নাম :—তত, বা তারের যন্ত্র, যেমন সেতার; বিতত, বা চামড়ার যন্ত্র, যেমন খোল; ঘন, বা কাঁসার যন্ত্র, যেমন মন্দিরা; এবং শুষির, বা বায়বীয় যন্ত্র, যেমন বাঁশি। আমাদের সর্ব্বপ্রধান যন্ত্র অবশ্য বীণ বা বীণা, যার নাম শুনতে দেশেবিদেশে কারো বাকি নেই, যদিও আওয়াজ বোধহয় অনেকেই শোনেন নি। অন্যান্য প্রাচীন পদ্ধতির ন্যায়

বীণবাজানোর রেওয়াজও এখন মান্দ্রাজে বেশী। ডান হাতের সব আঙুল দিয়ে বাজাতে হয় বলে' শুনেছি বীণ বাজানো বড় শক্ত। তানপূরা বা তম্বুরাও বহু প্রাচীন যন্ত্র, এবং আজ পর্য্যন্ত ওস্তাদী গানের প্রধান সহায়। পুরাণে বলে ব্রহ্মার এক শিষ্য ছিলেন তুম্বুরু ; নামের সাদৃশ্যে মনে হয় তাঁর সঙ্গে এ যন্ত্রের কিছু যোগ আছে। আমাদের বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে সেতার ও এস্রাজই বেশী চলিত, ও বাজানো সহজ। গানের সঙ্গতের জন্য এখনকার কালে তম্বুরার চেয়ে এস্রাজই বেশী উপযোগী বলে আমার বোধ হয়,—বিশেষতঃ মেয়েদের পক্ষে। আমাদের মেয়ে-দের মধ্যে যাঁরা গান করেন, তাঁদের সকলকেই আমি এস্রাজ শিখতে অনুরোধ করি। কারণ এস্রাজ হাল্কা, মিষ্টি ও একটানা,—সুতরাং সঙ্গতের যন্ত্রের সব গুণই ওতে বর্ত্তমান। তানপূরা যন্ত্রটা কিছু বেশী ভারি, ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস না থাকলে তার সঙ্গে গাওয়াও শক্ত। সেতারের বড় ভাইয়ের নাম সুরবাহার,—সে যন্ত্রটি দেখতে বেশ সুন্দর, আওয়াজও সেতার অপেক্ষা প্রবল। কিন্তু তা'তে শুধু আলাপই বাজানো হয়, তাই খুব ভাল বাজিয়ে ছাড়া কেউ বড় বাজায় না। গৎ বাজাবার পক্ষে হরেদরে সেতারই সব চেয়ে ভাল। শুনতে পাই আলাউদ্দীনের সমসাময়িক আমীর খশ্রু নামক একজন সঙ্গীতগুরু সেতারযন্ত্রের স্রষ্টা ; এবং তার সঙ্গে বাজাবার জন্যেই তিনি পাখোয়াজ ভেঙ্গে বাঁয়া-তবলার নির্ম্মাণ করেন। আমাদের ছেলেরা বাঁয়া-তবলা শেখবার দিকে একটু মনোযোগ দিলে ভাল হয়। তাতে তাল-জ্ঞানও যেমন হয়, সঙ্গের গানবাজনাও তেমনি জম্‌কে তোলে। য়ুরোপীয় যন্ত্রের সঙ্গে আমাদের যন্ত্রের একটা তফাৎ এই যে, ওদের প্রধান যন্ত্র পিয়ানোর আওয়াজ এত জোরালো যে, অনেক বড় জায়গায় অনেক

লোকে একত্র বসে' শুনতে পারে। আর আমাদের প্রধান যন্ত্র সেতারের আওয়াজ এত মৃদু যে, একটী ছোট ঘরে কেবল জন কুড়িক লোক বসে শুনলে তবেই তার রস পাওয়া যায়। তাও যদি অন্ধকার ও নিরালা হয় তবে আরো ভাল ;—চাঁদের বা তারার আলোর চেয়ে বেশী তীব্র আলোতে যেন সে ধ্বনি খোলে না, বিজ্‌লি বাতি এবং অমনোযোগী লোকের ভীড় ও কষ্টেচাপা হাসিকথার গুঞ্জনে ত একেবারেই মরমে মরে' যায়,—এত সুকুমার তার প্রাণ, এত ক্ষীণ তার কায়া। এসীয় এবং য়ুরোপীয় প্রকৃতিতেও কি এই প্রভেদ লক্ষিত হয় না ?—ওদের ভজনভোজন, ওদের শিল্পকলা, ওদের জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদীক্ষা—সবই যেন "দশে মিলি করি কাজ" ; আর আমাদের সবই নিভৃতে নির্জ্জনে এক হাতে সম্পন্ন হয়। আমাদের দয়া মানে বিশেষ ব্যক্তিকে বিশেষ ব্যক্তির দান ; ধর্ম্ম মানে নীরবে একলা জপতপ ধ্যানধারণা ; দীক্ষার মন্ত্র পর্য্যন্ত কাউকে বল্‌বার জো নেই ; আহার ব্রাহ্মণকে একলা করতে হয়, কথা কইলেও দোষ ; শিক্ষা মানে একটি গুরু গুটিকতক শিষ্যকে জ্ঞান দান করেন,—হয়ত অনেক বিদ্যা গুরুর সঙ্গেই লোপ পায়। মুসলমান ওস্তাদদের ত একটি বদনামই আছে যে, ভাল ভাল গান কাউকে শেখাতে চায় না, কত খোসামোদ করে সাক্রেদদের আদায় করতে হয়। আমি একটি বিশিষ্ট ওস্তাদকে জানতুম, যিনি তাঁর গতের স্বরলিপি প্রকাশ করতে দিতে নারাজ হতেন, পাছে তাঁর বাজনা শোনবার বা শেখবার লোক কমে যায়! কত শত ভাল গৎ তাঁর সঙ্গে কবরস্থ হয়েছে,—তারা কি পরকালে সাক্ষী দেবে ?

এই দুর্ভেদ্য ভেদনীতি আমাদের জাতের মহাশত্রু। বৈষ্ণবধর্ম্ম এই সীমান্ত-রেখাগুলি প্রেমের উত্তাপে গলিয়ে মিলিয়ে কিছু দিনের মত

এক করে' তুলেছিলেন, কিন্তু দেশকালপাত্রের দোষে বৈষ্ণবরা আর একটি স্বতন্ত্র জাতিতেই পরিণত হয়েছে, ছড়াতে পারে নি। সেই সময়ে কৃষ্ণভক্তির আবেগে যে গীত বাঙ্গলাদেশের হৃদয় হতে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল, তার সুরতরঙ্গে এখনো ঘর-বাহির আন্দোলিত। বৈষ্ণবধর্ম্ম বাৎসল্য থেকে ভগবদ্ভক্তি পর্য্যন্ত সকল প্রকার ভাবের আধার,—সুতরাং সঙ্গীতে প্রকাশ হতে বাধ্য। অমর বৈষ্ণব কবিতাবলী আসলে গান,—কারণ প্রত্যেকেরই রাগিণীর নাম দেওয়া আছে; কিন্তু স্বরলিপির অভাবে তার যথাযথ সুর এখন জানা অসম্ভব, এ বড়ই দুঃখের বিষয়। তবে কীর্ত্তন এখন পর্য্যন্ত কি ভাগ্যি জীবিত রয়েছে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি আমি খাঁটি বাঙ্গলাদেশের গান সম্বন্ধে আজ কিছু বলতে আসি নি,—ধারাবাহিকতার অনুরোধে এ বিষয় উল্লেখ করলুম মাত্র।

বেদের সময় থেকে মুসলমান আমল পর্য্যন্ত যখন হিন্দুসঙ্গীতের নিশ্চয় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, তখন মুসলমান আমল থেকে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এক-একটি বিশেষ খণ্ড-শিল্প অবিকৃত ভাবে অমর হয়ে থাকতে পারে বটে, যথা কালিদাসের শকুন্তলা, কিম্বা তানসেনের কোন গান (যদি লেখা থাক্‌ত!)। কিন্তু শিল্পকলার আদর্শ যুগে যুগে বদলাতে বাধ্য, কারণ সেটি সমাজের তৎকালীন মনোভাবের প্রকাশ,—এবং সমাজ সচল পদার্থ, স্থাণু নয়। তাই ইংরাজরাজের আগমনের পর থেকেও হিন্দু-সঙ্গীতের অনেক বদল হয়েছে ও হচ্ছে। তাকে কেউ বলবে উন্নতি, কেউ বলবে অবনতি, কিন্তু তার পরিণতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

ব্রাহ্মসমাজের গান একটি ভাণ্ডারবিশেষ, যেখানে কালাবঁতী ধ্রুপদ

থেকে হাল্কা টপ্পার সুর, কীর্ত্তনবাউল থেকে আধুনিকতম মিশ্রসুর পর্য্যন্ত সবরকম রীতির নমুনা সঞ্চিত আছে ; সুতরাং যিনি ঐতিহাসিক ভাবে আমাদের গানের ক্রমোবিকাশ অনুশীলন করতে চান, তাঁর পক্ষে ব্রহ্মসঙ্গীতালোচনা প্রশস্ত।

ইংরাজ আমলের একটি নূতন রীতি হচ্ছে, তম্বুরার বদলে হারমোনিয়মের সঙ্গে গান গাওয়া। মধ্যে তার যত চল হয়েছিল, আজকাল তাতে কিছু ভাঁটা পড়ে' গেছে ; কারণ ইংরাজ প্রভাবের প্রথম ধাক্কায় যত প্রাচ্যবর্জ্জন এবং পাশ্চাত্যগ্রহণের দিকে ঝোঁক পড়েছিল, কিছুদিন থেকে তার উজানে স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু অভ্যস্ত জিনিস ছাড়ব বল্লেই ছাড়া যায়না, বিশেষতঃ যদি তার কিছু সুবিধে থাকে। হারমোনিয়ম সম্বন্ধে সম্প্রতি যে বিরুদ্ধভাব জেগেছে, ইংরাজই বোধহয় তার প্রবর্ত্তক, এবং আমরা কেউ কেউ তার অনুমোদক মাত্র। আমিও এই বিদ্রোহীদলের একজন, তবে একই কারণে কি না জানিনে। ভাল হারমোনিয়মের ভাল বাজান আমাদের আধুনিক গানের অনুপযোগী সঙ্গত বলে' আমি মনে করিনে ; কিন্তু অধিকাংশস্থলে যেরূপ নিকৃষ্ট যন্ত্রে কর্কশ কড়া আওয়াজ বের করা হয়, তা'তে আমাদের গান ঢেকে ফেলে ও নষ্ট করে দেয় ; পিয়ানোতেও নিতান্ত হাল্কা নাচুনে দেশী গান ভিন্ন বাজানো চলে না ; সুতরাং বেয়ালা কিম্বা এস্রাজের টানা মোলায়েম আওয়াজই আমাদের সঙ্গতের পক্ষে সাধারণতঃ উপযুক্ত।

যন্ত্র ছেড়ে দিয়ে গানের প্রতি দৃষ্টি করলেও বিদেশী প্রভাব লক্ষিত হবে। থিয়েটারের সাধারণ গান ও কন্সর্টে তার খোলো পরিচয় পাওয়া যায়, কারণ তা'তে কেবল ইংরিজী চতুর্থ শ্রেণীর ব্যাণ্ডের নকল করবার চেষ্টা

করা হয়ে থাকে। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর হাসির গানে যে ইংরিজী কায়দা মিশিয়েছেন, তা' বিষয়ের উপযোগী ও ভাবের সহায় বলে'ই আমার বিশ্বাস। স্বদেশী গানে যে ধুয়া, বা গানের প্রত্যেক কলির শেষভাগ হাল্কা সুরে একসঙ্গে গাওয়ার ইংরাজীরীতি প্রচলিত হয়েছে, তার সূত্রপাত আগে হলেও দ্বিজেন্দ্রলালই তার বহুলপ্রচার করেছেন। তাঁর স্বদেশী গান অনেকে একত্রে গাইতে পারবে বলে' বোধহয় তিনি ইচ্ছা করেই তা'তে সাদা ইংরিজী-ঢঙের সুর বসিয়েছেন, কিন্তু শুনতে পাই যে তা' সত্ত্বেও আমাদের দেশী রাগিণী ঠিক্ বজায় আছে। এবং তিনি যে দেশী রাগতাল বিলক্ষণ বুঝতেন ও নিজে বিশুদ্ধ ভাবে গাইতে পারতেন, তা' তাঁর ও তাঁর গানের ভক্তমাত্রেই জানেন। পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ও আমাদের গানে নানা নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করেছেন। তাঁর গানে ইংরাজী সুরের ছায়াও পাওয়া যায়, মিশ্র সুরেরও তিনি কিছু পক্ষপাতী। তার জন্যে লোকে নিন্দাই করুক আর প্রশংসাই করুক, তাঁর অনেক গান আমাদের সঙ্গীতের অঙ্গ হয়ে গিয়েছে, ও এত প্রচলিত হয়ে পড়েছে যে পরিচয়পত্র অনাবশ্যক। বিশেষতঃ আজকাল স্বরলিপি হওয়াতে গানকে বেঁধে রাখবার উপায় পাওয়া গেছে। এখন আর ফাঁকি দিয়ে গানের পাখী উড়ে যাবার জো নেই। তার ডানা কেটে তাকে মেপেজুখে খাঁচায় পোরবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তাতে একটু শ্রীভ্রষ্ট হলেও, সম্পূর্ণ বিনষ্ট হওয়ার চেয়ে ভাল। স্বরলিপির নানা পদ্ধতির মধ্যে ৺শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর ও পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্ভাবিত প্রণালীদ্বয়ই বেশী প্রচলিত। আজকাল অনেকে মিলে একত্রে সঙ্গীতচর্চ্চা করবার দিকে যে

ঝোঁক হয়েছে, তার ফলে অনেক যন্ত্র একসঙ্গে বাজানো, এবং সব সময়ে একসুরে না বাজিয়ে আলাদা আলাদা সম্বাদী সুরে বাজানোর চেষ্টাতে য়ুরোপীয় হারমণি বা স্বরসন্ধির প্রভাব লক্ষিত হয়। একজন লেখক একে সঙ্গীতের "গড়ে মালা গাঁথা" বলেছেন, অর্থাৎ একহারা মূল সুরের সঙ্গে অন্যান্য সুর এমনভাবে যোজনা করা, যাতে সবসুদ্ধ শ্রুতিমধুর হয়।

ফলতঃ, আমাদের যন্ত্রের উন্নতি করবার দিকে দেশের লোকের তেমন ঝোঁক না দেখা গেলেও, সৌভাগ্যবশতঃ গানের চর্চ্চা থেমে যায়নি, বরং বাড়তেই চলেছে। অনতিপূর্ব্বে সঙ্গীতকে যেমন অবহেলার চক্ষে, কিম্বা কেবল পেশাদারের উপযুক্ত বলে ঘৃণার চক্ষে দেখা হত, কিছুদিন থেকে সে রেওয়াজ উঠেছে, ও সে অবজ্ঞার বদলে অনুকূল হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে এবং কতকগুলি সঙ্গীত-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে, সেটি সুখের বিষয়। আধুনিক বাপ মা ছেলেমেয়েকে গানবাজনা শেখাবার জন্যে ব্যস্ত, বরং কিছু বেশী ব্যস্ত; অর্থাৎ রাতারাতি তাদের ওস্তাদ করে তুলতে চান, এবং অনেক সময়ে বিবেচনা করেন না তাদের ভিতরে সে ক্ষমতা আছে কি না। যাইহোক, ঔদাসীন্য অপেক্ষা উৎসাহ শ্রেয়, সে বিষয় সন্দেহ কি?—আমাদের দেশের জীবন্ত শিল্পকলার মধ্যে সঙ্গীতই প্রধান, সে কথা মনে রেখে আশা করি আমাদের দেশের লোকে—বিশেষতঃ মেয়েরা,—এই মোহিনী-বিদ্যার চর্চ্চা ও উন্নতির প্রতি সমধিক লক্ষ্য রাখবেন।

এতক্ষণ যদিও ওস্তাদী হিন্দী গানের তরফে ওকালতী করলুম, কিন্তু অবশেষে স্বীকার করতেই হবে যে হিন্দী গান যতই ভাল হোক,

বাঙ্গলা গান যেমন বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়ে প্রাণে গিয়ে পৌঁছতে পারে, অপর ভাষার গান কখনই তেমন পারে না। কারণ সুর ও কথা, এই দুই যাদুকরে মিলে তবে গানের পূর্ণ মায়া সৃজন করে। সুতরাং সংস্কৃত লিখলেও যেমন তার ভিতর দিয়ে ও তাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বাঙ্গলা-ভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলনই বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রেয় ও প্রেয়; তেমনি হিন্দী গানের চর্চ্চা আবশ্যক হলেও শেষে বাঙ্গলা গানেই তার ফসল ফলাতে হবে, বাঙ্গলা গানকেই বাঙ্গালীর সকলরকম ভাবপ্রকাশের উপযোগী করে' তুলতে হবে।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

সাহিত্যের ভাষা।

—————:০:—————

আমি ইদানিং মনস্থির করেছিলুম যে সাহিত্যের ভাষা নিয়ে আর তর্ক করব না; কেননা যে তর্ক এগোয় না, তাতে যোগ দেওয়ার অর্থ ঘুরে-ফিরে সেই একই কথার একই জবাব দেওয়া। এক-কথা বলে একশ-কথা শোনায় আমার আপত্তি নেই—কিন্তু একশ-কথা বলে একশ-জনের কাছ থেকে উত্তরে একই কথা শোনাটা ঈষৎ কষ্টকর। সাধুভাষীদের ঐক্যতান শুনে শুনে অন্ততঃ আমার শ্রবণ-মন ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। তর্কক্ষেত্রে বুদ্ধিবৃত্তিকে সজাগ রাখ্‌তে হলে, পূর্ব্বপক্ষের কাছ থেকে নিত্যনূতন চিন্তার ধাক্কা পাওয়া আবশ্যক; কিন্তু পূর্ব্বপক্ষ সে ধাক্কা প্রায়ই দেন না। সমাজের কিম্বা জীবনের যে রীতি পূর্ব্বাপর চলে আস্‌ছে, না ভেবেচিন্তে, একমাত্র অভ্যাসবশতঃ মনে ও ব্যবহারে যার সঙ্গে আমরা বনিবনাও করে আরামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ছি, কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বল্‌লে, আমরা না ভেবে-চিন্তে সেই বিরুদ্ধবাদের সমস্বরে প্রতিবাদ করি। পুরাতন যে কোনও প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত শক্তির বলে, নৈসর্গিক নিয়মে ক্রম-পরিবর্ত্তিত হয়ে নূতনে পরিণত হয়,—এর চাইতে বড় মিথ্যে কথা দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া ভার। কালবশে পুরাতন শুধু সনাতন হয়ে ওঠে। প্রচলিত প্রথার প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা। সুতরাং যিনি কোনও নূতন মত প্রচার করেন, তাঁর বিরুদ্ধে যাঁদের কোনও মত নেই, তাঁদের একমত হওয়া নিতান্তই স্বভাবিক। সুতরাং একমাত্র পুনরুক্তির বলে এ সত্য একরকম সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে যাঁরা বাঙ্গলা-ভাষার দৌলতে বাঙ্গলা-সাহিত্য গড়ে তুলতে চান— তাঁদের বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী। শুধু তাই নয়—যখন দেখ্‌তে পাই যে আমাদের মতের বিরুদ্ধে কোনও কোনও ব-কলম সই-করা উচ্চভাবও সাহিত্য-সমাজে উচ্চচিন্তা বলে সম্মান লাভ করেছে, তখন "মৌন অসম্মতির লক্ষণ" এই প্রাচীন বাক্য অনুসারে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করেছিলুম।

(২)

কিন্তু চুপ করে থাকা শ্রেয় হলেও সাহিত্যিকের পক্ষে কথা কওয়াটাই প্রেয়। সুতরাং পুনরায় এই তর্ক-যুদ্ধে যোগ দেবার জন্য আমার পক্ষে যদিচ কোনরূপ কৈফিয়ৎ দেবার দরকার নেই—তবুও তা দিচ্ছি। অগ্রহায়ণ মাসে নারায়ণ পত্রে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত সাধুভাষার স্বপক্ষে যে-সব যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন তা আমার মতে বিশেষরূপে আলোচনার যোগ্য। পূর্ব্বপক্ষের যত লেখা অদ্যাবধি আমার চোখে পড়েছে, তার মধ্যে উক্ত প্রবন্ধের একটা বিশেষত্ব আছে। এ প্রবন্ধের মধ্যে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্য জ্ঞানের পরিচয় পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে পাওয়া যায়। গুপ্তমহাশয় যা বলেছেন, তার অনেক কথা সত্য; বাদবাকী সব সত্যাভাস—একটি কথাও একেবারে মিছে নয়, সুতরাং আমি সাগ্রহে এঁর মতামতের আলোচনা কর্‌তে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

এঁর মতের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল যে কোথায় তা এক-নজরে ধরা যায় না; অথচ অমিল যে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা ইনি তথাকথিত সাধুভাষার স্বত্বস্বামিত্ব রক্ষা করবার জন্যই বহুবিধ আলঙ্কারিক এবং ঐতিহাসিক যুক্তির অবতারণা করেছেন। যখন আমাদের পরস্পরের প্রায় প্রতি-কথারই গোড়ায় মিল আছে, তখন শেষে অমিল হবার কারণ—হয় আমি ঠিক-নামাতে ভুল করেছি, নয় তিনি করেছেন! আমার মনে এ-সন্দেহও হয় যে এ ক্ষেত্রে গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে আমরা Principle-এ একমত—আমাদের মধ্যে যা-কিছু মতভেদ Facts নিয়ে। গুপ্তমহাশয় এই বলে তাঁর প্রবন্ধ সুরু করেছেন—

"পণ্ডিতীভাষা ব্যতিরেকেও এক সাধুভাষা আছে, বঙ্কিমচন্দ্র যাহার প্রবর্ত্তক এবং যাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া এ যাবৎ পরিচিত।......সম্প্রতি এক চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে যে, মৌখিক ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত প্রতিভা এই চেষ্টায় ঢালিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলার যে দুইজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, যাঁহারাই একরকম বাঙ্গলা-ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন,

তাঁহাদের এই দুটি বিভিন্ন আদর্শ আজ বাঙ্গালীর সম্মুখে। বঙ্গ-সাহিত্য আজ কাহাকে অনুসরণ করিবে—বঙ্কিমচন্দ্র না রবীন্দ্রনাথ ?"

এ প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি যে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সাধুভাষার প্রবর্ত্তক এবং রবীন্দ্রনাথ যে তার নিবর্ত্তক এ Fact নয়। তারপর বঙ্গ-সাহিত্য যে কোনও উভয়সঙ্কটে পড়েছে এমন ত আমার মনে হয় না। প্রতিভার অনুসরণ অর্থাৎ অনুকরণ করতে গেলে আমাদের সাহিত্য-সমাজে অপ্রতিভ হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাণরক্ষার জন্য নবীন সাহিত্যিকদের প্রত্যেককেই নিজের মন আবিষ্কার করতে হবে এবং নিজের রচনা-রীতি উদ্ভাবন করতে হবে। যে লেখায় আত্মরতি ও আত্মরীতি নেই—তা আর যাই হোক্, কাব্য নয়। বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের পক্ষে মাতৃভাষা বিশেষরূপে অনুকূল—এ বিশ্বাসের বলেই আমরা সে ভাষার পক্ষ নিয়েছি।

চলিত ভাষা বনাম সাধুভাষা নিয়ে আজকাল যে ঘোরতর তর্ক উপস্থিত হয়েছে, সে তর্ক আমিই তুলি; সুতরাং স্বপক্ষ বজায় রাখবার ভার আমাকেই নিতে হবে। যথাশক্তি সে কর্ত্তব্য পালন করতে আমি পূর্ব্বেও চেষ্টা করেছি—আবশ্যক হলে ভবিষ্যতেও করব। এ প্রচেষ্টা অপূর্ব্ব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র পণ্ডিতী ভাষার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূত্রপাত করে গিয়েছেন, আমরা তারই জের টেনে আনছি। তিনি সাহিত্যের ভাষাকে যেখানে দাঁড় করিয়ে গিয়েছেন, আমরা সেখান থেকে তাকে বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরের দিকে আরও দু'এক পা এগিয়ে দিতে চাই। যার প্রাণ আছে তাকে আমরা কোথায়ও দাঁড় করিয়ে রাখবার বিপক্ষে। কেননা বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে বসতেই হবে এবং শেষটা শুতেই হবে।

(৩)

গুপ্তমহাশয় এই কথা বলে বিচার আরম্ভ করেছেন—নব্যতন্ত্রীরা চান "নিজের এক নূতন সাহিত্য সর্ব্বজনবোধ্যভাষায় সর্ব্বজনউপভোগ্য সাহিত্য।" আমরা অবশ্য এ রকম কথা কখনো বলেছি বলে স্মরণ হয় না। গুপ্তমহাশয় বোধ হয়

অবগত নন্ যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ সাহিত্যিকেরা "অসাধুভাষা"র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে তা দুর্ব্বোধ্য। সাহিত্যের মহা-মহারথীদের নিকট যে ভাষা দুর্ব্বোধ্য, সে ভাষা যে "সর্ব্বজনবোধ্য" হবে— মনে এ রকম কোনও দুরাশা পোষণ করে আমরা লিখতে বসিনে। সে যাই হোক্, গুপ্তমহাশয় সজোরে বলেছেন—

"প্রথমেই আমরা বলিতে চাই আপামর সর্ব্বসাধারণের জন্য সাহিত্য নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলের মনস্তুষ্টি করা বা সকলের বোধগম্য হওয়াও নয়।"

আমি কাব্যসম্বন্ধে ঠিক এই কথাই বরাবর বলে আস্‌ছি। এ বিষয়ে আমার দু-একটি পূর্ব্বকথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"মনেরও উপর্য্যুপরি নানা লোক আছে, এবং শ্রেষ্ঠসাহিত্য মানসিক উর্দ্ধ-লোকেরই বস্তু। জাতির মনকে লোক হইতে লোকান্তরে লইয়া যাওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম। কামলোক হইতে রূপলোকে উঠিবার জন্য জনসাধারণের পক্ষে শিক্ষার আবশ্যক, সাধনার আবশ্যক। কবি যাহা দান করেন, তাহা গ্রহণ করিবার জন্য অপরের উপযুক্ত শক্তি থাকা আবশ্যক। মনোজগতে অমনি-পাওয়া বলিয়া কোন পদার্থ নাই—সবই দেওয়া-নেওয়ার জিনিস। Utilitari-anism-এর সাহায্যে সাহিত্যের মূল্য নির্ণয় করা যায় না। সাহিত্যের অবনতির দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধন করা যায় না।...

"সাহিত্যচর্চ্চার যে অধিকারী-ভেদ আছে তাহা অস্বীকার করায় সত্যের অপলাপ করা হয়।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।)

তারপর "সকলের মনস্তুষ্টি" করা যে সাহিত্যের কর্ত্তব্য এ ধারণাও আমার কস্মিনকালেও ছিল না। প্রমাণ, আমি বলেছি—"সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়।"

"আমি জানি যে পাঠক-সমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই— কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারি নাম বেদনা।"

"বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্রের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই করনা কেন, পাঠক-সমাজের মনোরঞ্জন, করবার চেষ্টা কোরোনা।"

"সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাঙ্গলাদেশে আজ দুর্লভ নয়।"—(সবুজ পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।)

এত স্পষ্ট করে জন-সাধারণের অপ্রীতিকর এই সকল কথা বলবার কারণ ভর্তৃহরির একটি শ্লোক আমি কখনও ভুলতে পারি-নি। এই "অসাধারণ" কবি নিজের সম্বন্ধে বলেছেন ঃ—

"ন নটা ন বিটা ন গায়না ন পরদ্রোহনিবদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
নৃপসদ্মনি নাম কে বয়ং কুচভারানমিতা ন যোষিতঃ॥

তা ছাড়া—"পরের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য হলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নট-বিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র।" (সবুজ পত্র, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।)—এ কথাও আমার মনে ছিল। পরের মনোরঞ্জন করতে হলে, নিজের মনোগত নয়, পরের মনোমত কথা কইতে হয়; সুতরাং আর যে-কারণেই হোক, King Demos-এর মনস্তুষ্টির জন্য আমরা মাতৃভাষার গুণগান করিনে। জানা জিনিসের অন্তরে যে অজানা গুণ থাকতে পারে—এ জ্ঞান জন-সাধারণের নেই। বাঙ্গলা-ভাষা বাঙ্গালী মাত্রেই জানে, সুতরাং তা সকলেরই অবহেলার সামগ্রী। গুপ্তমহাশয় বলেছেন যে "Democracy-র উচ্চ আদর্শ সহজেই Mob-rule বা Vulgarism-এ পরিণত হইতে পারে।" ন্যাশানাল কংগ্রেসের দল অবশ্য এ কথা শুনে চমকে উঠবেন। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে যাই হোক, সাহিত্যক্ষেত্রে গুপ্তমহাশয়ের কথা যে সত্য তার প্রমাণ "রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁহার সমস্ত প্রতিভা" যে কাব্যে "ঢালিয়া দিয়াছেন" সেই "ঘরে-বাইরে"র উপর সাহিত্যের শাসনকর্ত্তাদের সদলবলে আক্রমণ। বলা বাহুল্য, সংবাদপত্রই হচ্ছে Democracy-র একাধারে শাসনযন্ত্র ও পীড়ন-অস্ত্র। সুতরাং এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে জনসাধারণের মন-যোগানো কথা বলাই যদি আমাদের অভিপ্রায় হত তাহলে আমরা মাতৃভাষাকে সাহিত্যের উচ্চাসনে

বসাবার চেষ্টা করতুম না। আমাদের এ জ্ঞান ছিল যে প্রথম থেকেই দেশশুদ্ধ লোক এ চেষ্টায় বাধা দেবে; যে সাহিত্যে আটপৌরে মনোভাব পোষাকী ভাষা ধারণ করে, সেই সাহিত্যই লোকপ্রিয় ও লোকপূজ্য। সুতরাং দেখা গেল এ বিষয়ে গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে আমাদের মতের ষোলআনা মিল আছে। তবে অমিলটা যে কোথায় তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

(৪)

গুপ্তমহাশয় বলেছেন যে আমাদের মতে—"চলিত ভাষা সহজ সরল প্রাণ-স্পর্শী দ্যোতনাপূর্ণ, জীবনীশক্তিপূর্ণ—তাই চলিত ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা উচিত।" এ কথা সত্য। আমি একবার নয় বহুবার বলেছি যে মৌখিক ভাষা সহজ সরল সজীব সতেজ সরাগ ও সচল। মৌখিক ভাষার এ সকল গুণ যে আছে তা গুপ্তমহাশয় অস্বীকার করেন না। এবং সাহিত্যের ভাষায় এ সকল গুণ থাকাটা যে দোষের এ কথাও তিনি বলেন না। ভাষা যত কৃত্রিম, যত জটিল, যত নির্জ্জীব, যত নিস্তেজ, যত বিবর্ণ, যত নিশ্চল হবে, তত যে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি হবে—এ কথা তর্কের খাতিরেও কেউ বলতে পারেন না।

গুপ্তমহাশয় বলেন যে সাহিত্যের ভাষার সরলতা (Simplicity) একমাত্র গুণ নয়, স্বাভাবিকতা (Naturalness) একমাত্র গুণ নয়, সজীবতা একমাত্র গুণ নয়। কিন্তু একমাত্র না হলেও, এর প্রতিটি যে একটি গুণ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই এবং এইসকল গুণের একত্র সমাবেশে অন্ততঃ গদ্যসাহিত্য যে তার পূর্ণশ্রী, পূর্ণশক্তি লাভ করে এই বিশ্বাসের উপরই এইসকল গুণের আধার ফরাসী-সাহিত্য যে গড়ে উঠেছে—তা গুপ্তমহাশয়ের অবিদিত নয়। কেননা উক্ত প্রবন্ধ থেকেই পরিচয় পাওয়া যায় যে, সে সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় আছে। আমি ইতিপূর্ব্বে আমার "অলঙ্কারের সূত্রপাত" নামক প্রবন্ধে সংক্ষেপে এবং "ফরাসী-সাহিত্যের বর্ণপরিচয়" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং সে সকল কথার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যাঁর সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের

সঙ্গে সামান্য পরিচয় আছে, তিনিই জানেন যে এ বিষয়ে ফরাসী ও সংস্কৃত আলঙ্কারিক উভয়েই একমত। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে শাস্ত্রমতে বৈদর্ভী-রীতি বিশেষ করে কবিতার পক্ষে উপযোগী এবং ফরাসী মতে গদ্যের পক্ষে। সুতরাং এই দুই মতের সমন্বয়ে এই মীমাংসা করা অসঙ্গত হবে না যে এরীতি উভয়ের পক্ষে সমান উপযোগী।

ভাষার সরলতা স্বাভাবিকতা সজীবতা প্রভৃতি ধর্ম্ম সাহিত্যের গুণ কিনা সে বিষয়ে গুপ্তমহাশয় নিঃসন্দেহ নন।

তিনি বলেন, "natural হওয়াই সাহিত্যের ধর্ম্ম নয়।" "গৌ তৃণং অত্তি"—এ উক্তি সত্য হলেও যে "স্বাভাবোক্তি নয়" এ-বিষয়ে নব্য-প্রাচীন সকল সংস্কৃত আলঙ্কারিক যে একমত সে কথা আমি অনেক দিন হল পাঠক-সমাজকে শুনিয়ে রেখেছি। "গরুতে ঘাস খায়" এ কথাটা সত্য হলেও বলবার কিছু প্রয়োজন নেই। কিন্তু সাধুভাষাদের মতে "ধেনু তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে"—এ হচ্ছে উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যের কথা। এই নিয়েই ত ঝগড়া। তবে কি un-natural হওয়া সাহিত্যের ধর্ম্ম? অবশ্য তাও নয়। গুপ্তমহাশয় বলেন "সাহিত্যের লক্ষ আর্ট—শিল্প রচনা।" এ সত্য আমরা সজ্ঞানে কখনও অস্বীকার করি-নি। এ ত ভাষার কথা নয়, রচনার কথা; উপাদানের কথা নয়, গড়নের কথা। যে ভাষায় গড়ন নেই তা সাহিত্য নয়। আর্টহীন লেখার জন্য ভাষা দোষী নয়; দোষী লেখক।

পঞ্চতন্ত্রে একটি প্রবচন আছে যে অস্ত্র, যন্ত্র, ভাষা ও নারীর অন্তরে যে কতটা শক্তি নিহিত আছে তার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়—যখন ও-সকল বস্তু গুণীর হাতে পড়ে। আমারও বিশ্বাস এই যে, যে-কোনও ভাষা হোক না কেন, আর্টিষ্টের হাতে পড়লে তার থেকে উঁচুদরের সাহিত্য রচিত হয়।

"যে হোক সে হোক ভাষার কাব্য রস লয়ে।"—এ কথা যাঁর কলমের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তিনি হচ্ছেন বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় আর্টিষ্ট, অর্থাৎ ভারতচন্দ্র। অতএব মৌখিক ভাষার সঙ্গে যে আর্টের মুখ দেখা দেখি নেই এ-কথা আমরা

স্বীকার করবার কোনও কারণ দেখিনে, যে হেতু আমাদের দেশের প্রাচীন আচার্য্যগণ এবং প্রাচীন কবিগণ সমস্বরে আমাদের বরাভয় প্রদান করেছেন।

গুপ্তমহাশয় আসলে তাঁর প্রবন্ধে ভাষার নয়, style-এর বিচার করেছেন। সুতরাং তিনি মৌখিক এবং লিখিত ভাষার ভিতর যে পার্থক্য আছে তাই প্রমাণ করতে বিশেষ প্রয়াস পেয়েছেন। লিখিত ও কথিত ভাষার ভিতর যে পার্থক্য আছে এ সত্য উপেক্ষা করে আমরা মাতৃভাষার কোলে গিয়ে ঢলে পড়িনি। আজ চারপাঁচ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত আমার একটি প্রবন্ধের কিয়দাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি; তার থেকেই গুপ্তমহাশয় দেখতে পাবেন যে আমাদের আসল বক্তব্যটা কি।

"Art এবং Artlessness-এর মধ্যে আস্‌মান-জমিন ব্যবধান আছে, লিখিত এবং কথিত ভাষার মধ্যেও সেই ব্যবধান থাকা আবশ্যক। কিন্তু সে পার্থক্য ভাষাগত নয়,—Style গত। লিখিত ভাষার কথাগুলি শুদ্ধ, সুনির্ব্বাচিত এবং সুবিন্যস্ত হওয়া চাই এবং রচনা সংক্ষিপ্ত এবং সংহত হওয়া চাই। লেখার কথা উল্টানো চলে না, বদলানো চলে না, পুনরুক্তি চলে না, এবং এলোমেলো ভাবে সাজানো চলে না। "ঢাকা রিভিউ"য়ের সম্পাদক মহাশয়ের মতে যে-ভাষা প্রশস্ত (সাধুভাষা), সে-ভাষায় মুখের ভাষার যা যা দোষ, সে-সব পূর্ণমাত্রায় দেখা যায়, কেবলমাত্র আলাপের ভাষায় যে-সকল গুণ আছে—অর্থাৎ সরলতা গতি ও প্রাণ—সেই গুলিই তাতে নেই।" (ভারতী।)

তথাকথিত সাধুভাষার বিরুদ্ধে আমাদের একটি বিশেষ অভিযোগ এই যে, তা শতকরা নিরানব্বই জন লোকের হাতে সুগঠিত হয় না;—কেননা এই কৃত্রিম উপাদানের উপর তাঁদের সহজ অধিকার নেই। ভাব ও ভাষাকে নিজের মনোমত রূপ দিতে হলে কঠিনকে তরল করা, জটিলকে সরল করা দরকার। এই যুগসঞ্চিত সভ্যতার চাপের ভিতর মানুষের পক্ষে সহজ অর্থাৎ natural হওয়া সব-চাইতে শক্ত। বাইরের কোন বস্তু, তা ভাষাই হোক্ আর ভাবই হোক্, হুবহু নকল করে natural হওয়া যায় না। আর্টিষ্টের কাছে বাইরের

সব জিনিস উপাদান মাত্র—যা নিয়ে সে নিজের nature অনুসারে রূপ গড়ে।

(৫)

গুপ্তমহাশয়ের মতে আমাদের মৌখিক ভাষা সাহিত্য-রচনার পক্ষে উপযুক্ত উপাদান নয়। আমাদের মত অন্যরূপ। সুতরাং গুপ্তমহাশয় মৌখিক ভাষার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ এনেছেন তার বিচার করা আবশ্যক। গুপ্তমহাশয়ের প্রথম কথা এই যে—

"প্রতিদিন আমরা যে ভাষার ব্যবহার করি, তাহা মুখ্যতঃ প্রয়োজনের ভাষা। প্রতিদিনের ভাষা কর্ম্মসিদ্ধির ভাষা।"

এ কথার আমি প্রতিবাদ করতে পারি নে—কেননা আমি পূর্ব্বে নিজ-মুখেই স্বীকার করেছি যে—

"মানুষের ভাষা তাহার ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন অনুসারেই গড়ে উঠেছে,—এবং সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল।" "মানুষের ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ গেরস্থালীর ভাষা।" (সবুজপত্র, ৩য় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা।)

কিন্তু এর জন্য যদি মৌখিক ভাষায় সাহিত্য রচনা করা না যেতে পারে—তাহলে পৃথিবীতে এমন কোনও ভাষা নেই এবং থাকতে পারে না যাতে সাহিত্য রচিত হতে পারে। কেননা ভাষা হচ্ছে মানুষের মুখের জিনিস। সেই জিনিসকে ধরে রাখবার জন্য মানুষে অক্ষর নির্ম্মাণ করেছে। লেখা জিনিসটে হচ্ছে শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়কে দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় করবার একটা কৌশল—একটা mechanical উপায় মাত্র। পৃথিবীর কোনও সাহিত্যে—তা সে সে যত উচ্চ হোক্—এমন শব্দ নেই যা কস্মিনকালে কারও মুখের কথা ছিল না। অক্ষর যে একটি শব্দেরও সৃষ্টি করে নি, আমরা পুঁথি পড়া লোক সে সত্য সহজেই ভুলে যাই। সুতরাং বাঙ্গলা-ভাষা অপরাপর ভাষার মত মৌখিক ভাষা বলে সাহিত্যে অগ্রাহ্য নয়।

তার পর, পৃথিবীর অতীত, বর্ত্তমান সকল ভাষাই প্রয়োজনের ভাষা; এবং অনাগত ভাষাও যে অপ্রয়োজনের ভাষা হবে এ আশা করবার কোনও বৈধ কারণ নেই। গুপ্তমহাশয় বলেন, প্রতিদিনের ভাষা কর্ম্মসিদ্ধির ভাষা—আমি যাকে বলি গেরস্থালীর ভাষা—কিন্তু তা বলে আক্ষেপ করে কোনও ফল নেই—কেননা কর্ম্মের ভাষা অর্থাৎ জীবনের ভাষাই হচ্ছে সকল ভাষার মূলধন। জীবনের আদিম এবং সনাতন অর্থ—কর্ম্মজীবন; জ্ঞান ও ভক্তির মূলে ঐ কর্ম্মই বিদ্যমান। কর্ম্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অর্থ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করা। মানব-সমাজ ও মানব-ভাষা উভয়েই এই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন। আমাদের দর্শনে এক-রকম জ্ঞান, অথবা অনুভূতির কল্পনা করা হয়েছে যার কর্ম্মের সঙ্গে আদৌ কোনও সম্পর্ক নেই। আত্মার তুরীয় অবস্থায় যদি কোনও জ্ঞান কিম্বা অনুভূতি থাকে ত তার প্রকাশের যে কোনও ভাষা নেই, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বৈদান্তিকেরা সেই জ্ঞান, সেই অনুভূতির বিষয় সম্বন্ধে নেতি নেতি ছাড়া আর কোনও কথা বল্‌তে পারেন না। সুতরাং আমি যে পূর্ব্বে বলেছি যে যে ভাষা মানুষের ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজন-মত গড়ে উঠেছে, সেই ভাষাই মানুষের একমাত্র সম্বল, আমার বিশ্বাস সে উক্তি সত্য। জীবন-যাত্রার জন্য মানুষের দেহ ও মন দুয়েরই প্রয়োজন আছে। আমাদের দেহের মত, আমাদের মনেরও ক্ষুৎ-পিপাসা আছে; সুতরাং জীবনের প্রয়োজনবশতঃই মানুষে বাইরের মত ভিতরকার বস্তুরও নামকরণ করতে বাধ্য হয়েছে। এবং যেহেতু সাহিত্য ভিতর-বাহির দুই নিয়ে কারবার করে, তখন সাহিত্যের উপাদান সকল-ভাষাতেই পাওয়া যায়—বাঙ্গলা-ভাষা এ বিষয়ে একঘরে নয়। গুপ্ত-মহাশয়ের মতে—

"সাহিত্য প্রধানতঃ ভিতরের অন্তরাত্মারই বস্তু, সাহিত্যের ভাষাও ভিতরের অন্তরাত্মারই ভাষা।"

আমার বিশ্বাস বাইরের সঙ্গে ভিতরের যোগাযোগটা এত ঘনিষ্ঠ যে বুদ্ধির অস্ত্র দিয়ে সে যোগসূত্র ছিন্ন করে যে খণ্ডসত্য পাওয়া যায় তা সাহিত্যের বস্তু নয়।

ভিতরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন বাহির—বিজ্ঞানের এবং বাইরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভিতর—দর্শনের বস্তু। আর সাহিত্যের বস্তু যদি কেবলমাত্র "ভিতরের অন্তরাত্মার" বস্তু হয়, তাহলে সে বস্তু প্রকাশ করবার ভাষা একরকম নেই বল্লেই হয়। যে-কোনও ভাষার শব্দরাশি আলোচনা করলেই দেখা যায় যে তার মধ্যে হাজারে নশ-নিরানব্বইটি হচ্ছে বাহ্যবস্তুর বিশেষ্য কি বিশেষণ। গুপ্তমহাশয় বলেন সাহিত্যের কাজ হচ্ছে সুন্দর ও মহৎ মনোভাব প্রকাশ করা সুতরাং তার ভাষাও "স্থির সংহত গভীর গম্ভীর দৃঢ়সম্বদ্ধ" হওয়া চাই। বলা বাহুল্য, তিনি সাহিত্যের ভাব ও ভাষার যে ক'টি গুণের উল্লেখ করেছেন সে-সব ভিতরের বস্তুর নয়, বাইরের বস্তুরই গুণের নাম; বস্তু-বিজ্ঞানে যাকে বলে Properties of matter। এর জন্য আমি তাঁকে দোষ দিইনে—কেননা আমরা মনের বিষয়ের উপর বস্তুর ধর্ম্ম আরোপ করতে বাধ্য। কিন্তু একের ধর্ম্ম অপরের উপর আরোপ করবার ভিতর বিপদ আছে,—কেননা সে ধর্ম্ম যে যথার্থ নয়, কেবলমাত্র আরোপিত, এ সত্য ভুলে গেলে আমাদের সকল কথাই ভুল হয়। গুপ্তমহাশয় যে এ ভুল করেন তার প্রমাণ—তিনি বলেন যে মুখের কথায় আমরা "যত সংক্ষেপে যত অল্প শব্দোচ্চারণে মনের ভাব পরকে জানাইতে পারি, তাহার অতিরিক্ত কিছু শক্তিক্ষয় করিতে চাহি না।" উদাহরণ আমরা "করিয়া" না বলে "করে" বলি। তারপর তিনি বলেন যে "জিনিসকে সুন্দর করিয়া মহৎ করিয়া পূর্ণ করিয়া বলাতেই সাহিত্যের মর্য্যাদা। সরল সহজ করিতে যাইয়া বস্তুকে যদি ছোট করিয়া ফেল, অল্পের মুর্ত্তি দাও তবে সে সরলতা সাহিত্যের সরলতা নয়।" এই কি স্পষ্ট প্রমাণ নয় যে কাগজের উপর কতখানি জায়গা জোড়ে সেই অনুসারে তিনি শব্দের মহত্ত্ব নির্ণয় করেন? বাচকের দেহ অল্প হলে তার বাচ্যকে যে ছোট করে ফেলা হয়, তাকে অল্পের মূর্ত্তি দেওয়া হয়—এ ধারণার মূলে শুধু Space এর ধারণাই আছে; আর Space মনোজগতের নয়, বাহ্যজগতের জিনিস। ইঞ্চি-মাপ অনুসারে যে শব্দের শক্তি বাড়ে এ বিশ্বাস সাধুভাষীদের যে মজ্জাগত

তার প্রমাণ ইতিপূর্ব্বে পেয়েছি। এ বিশ্বাস যে ভুল তার প্রমাণ—মানুষের মনের পক্ষে যা সব-চাইতে বড় সত্য, পতঞ্জলির মতে তার বাচক হচ্ছে একটি অক্ষর—ওঁ। "পূর্ণ অখণ্ড অনুভূতির পূর্ণ অখণ্ড বাক্" যে অল্প সময়ে উচ্চারণ করা যায় না—এ সত্য গুপ্তমহাশয় কোথা হতে পেলেন? শব্দের শক্তি দেশ-কালের অতীত; কেননা সে শক্তির মূল মনোজগতে,—জড়জগতে নয়।

(৬)

গুপ্তমহাশয় সজীবতাকেও ভাষার গুণ বলে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—

"তার পর দৈনন্দিন জীবনের ভাষাকে সজীব বল। কিন্তু এ সজীবতার মধ্যে স্নায়ুমণ্ডলীর চঞ্চলতাই অধিক। দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই ব্যস্ততা, ত্রস্ততা···ইহার ভাষাও তাই অস্থির বিক্ষুব্ধ। চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। সাহিত্যের ভাষা গতি চায়, কিন্তু তাহা হইবে আত্মস্থ, স্থিরসত্ব, সংযত-প্রবাহ।"

সাহিত্যের ভাষা যে গতি চায় এ কথা তিনি যখন স্বীকার করেন, তখন গুপ্ত-মহাশয়কে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তিনি কি সে গতির একটি মাত্রা নির্দ্ধারণ করে দিতে পারেন যার সীমা অতিক্রম করলেই তা চাঞ্চল্যে পরিণত হবে? হয়ত তিনি যাকে বলবেন ভাষার স্থিরসত্ব গতি, আমরা তাকে বলব আধ-মরা। চাঞ্চল্য, জীবনের একমাত্র লক্ষণ না হলেও, একটি প্রধান লক্ষণ;—জড়তাই হচ্ছে মৃতের লক্ষণ। গুপ্তমহাশয় যাকে ভাষার স্থৈর্য্য বলেন, আমরা যদি তাকে জড়তা বলি, তাহলে তিনি তার কি উত্তর দেবেন? ভাষার গতি কি পরিমাণে বেড়ে গেলে তা চঞ্চল হয়, কি পরিমাণে কমে এলে তা জড় হয়—তার মাপকাটি কারও হাতে নেই। এ সমস্যার কোনও মীমাংসা নেই, কেননা ভাষাসম্বন্ধে এ রকম কোনও সমস্যাই নেই। অস্থিরতা, চাঞ্চল্য প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির ধর্ম্ম,—ভাষার নয়। সাহিত্যে সংযমের আমি একান্ত পক্ষপাতী এবং সেই কারণেই আমি সজীব ভাষার একান্ত

পক্ষপাতী। এ বিষয়ে আমি আমার গুটিকতক পূর্ব্বকথা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি ঃ—

"আমাদের চিত্তবৃত্তি স্বতঃই বিক্ষিপ্ত ; যাহা বিক্ষিপ্ত তাহাকেই সংক্ষিপ্ত করা সাহিত্যের কাজ। মনের ভিতর যাহা অস্পষ্ট তাহাকে স্পষ্ট করা, যাহা নিরাকার তাহাকে সাকার করাই আর্টের ধর্ম্ম। সাহিত্যের সাধনাও একরূপ যোগাভ্যাস। ধ্যানধারণা ব্যতীত এ ক্ষেত্রেও সিদ্ধি লাভ করা যায় না।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা।)

(৭)

অতএব দেখা গেল, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গুপ্তমহাশয়ের সঙ্গে আমি এক মত। কি উপায়ে তা সিদ্ধ হতে পারে তাই নিয়েই যা মতভেদ। গুপ্তমহাশয় প্রচলিত-সাধুভাষার পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস তথাকথিত সাধুভাষা ঢিলেমির প্রশ্রয় দেয়, কেননা সে ভাষার আশ্রয়ে আমরা শব্দাড়ম্বরের ভিতর ভাবের দৈন্য সহজেই গোপন করতে পারি। এ বিষয়ে আমার মত, আমি বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজের নিকট পূর্ব্বেই নিবেদন করেছি। আমার কথা এই ঃ—

"আমাদের গদ্যের ভাব ও ভাষা দুইই শিথিলবদ্ধ। আমাদের রচনায় পদ বাক্য কিছুই সুবিন্যস্ত নয়, এবং আমাদের বক্তব্য কথাও সুসম্বদ্ধ নয়। ইহা যে শক্তিহীনতার লক্ষণ তা বলা বাহুল্য। যে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলের পরস্পর-সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ নয়, সে দেহের শক্তিও নাই, সৌন্দর্য্যও নাই। প্রতি জীবন্ত ভাষারই একটি নিজস্ব গঠন আছে, নিজস্ব ছন্দ আছে। সেই গঠন রক্ষা করিতে না পারিলে, আমাদের রচনা সুগঠিত হয় না, সেই ছন্দ রক্ষা করিতে না পারিলে আমাদের গদ্য স্বচ্ছন্দ হয় না।" (সবুজপত্র, ১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।)

সাধুগদ্য যে বেচাল ও বে-প্যাটার্ণ তার কারণ এ গদ্য অনুবাদজন্য। পণ্ডিতী-ভাষা সংস্কৃতের অনুবাদ এবং সাধু-ভাষা ইংরাজির অনুবাদ এবং এ-দুইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙ্গলা-ভাষার সংস্কৃত অনুবাদ। "মূল ও অনুবাদ যে কোন দিন

সমপর্য্যায়ে দাঁড়াইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।”—এই হচ্ছে গুপ্তমহাশয়ের মত; এবং আমারও সেই মত।

গুপ্তমহাশয় বলেছেন চাঞ্চল্যই জীবনের একমাত্র লক্ষণ নয়। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। জীবনের একটি প্রধান লক্ষণ যে তা সাবয়ব। জীবনীশক্তি নিজের অনুরূপ দেহ গড়ে নেয়—যে দেহের ভিতর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। এ বিশ্বের যে-অংশের ভিতর জীবন নেই তা inorganic। জড়পদার্থেরও আমরা গড়ন দিই কিন্তু সে যোড়াতাড়া দিয়ে—ইংরাজিতে যাকে বলে mechanical পদ্ধতি অনুসারে। সজীব ভাষাই organic সাহিত্য রচনার পক্ষে একমাত্র উপযোগী ভাষা। সাহিত্যের বিশিষ্টতা কথার সমষ্টিতে নয়, ভাবের সমগ্রতার উপর নির্ভর করে—এবং এ সমগ্রতা কেবলমাত্র বিদ্যার বলে কি বুদ্ধির কৌশলে লাভ করা যায় না। মনোভাবকে শুধু মূর্ত্তিমান নয়, সজীব করে তোলাই হচ্ছে আর্টের উদ্দেশ্য। সুতরাং সাহিত্য জীবন্ত-ভাষার সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। লেখকমাত্রেই জানেন যে লেখার ভাষায় জীবনরক্ষা করাই কঠিন;—বধ করা সহজ। লেখনীর স্পর্শে ভাষা স্বতঃই আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকতা (naturalness) সাহিত্যের একমাত্র গুণ না হতে পারে—কিন্তু কৃত্রিমতা মহাদোষ।

(৮)

আমরা এ-যাবৎ গদ্যসাহিত্যেরই আলোচনা করে আস্‌ছি;—কবিতার নয়; এবং সরলতা স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দতা হচ্ছে গদ্যের প্রধান গুণ। গুপ্তমহাশয় Mathew Arnold-এর মতামতের অতি ভক্ত এবং সাধুভাষার স্বপক্ষে বারম্বার তাঁরই দোহাই দিয়েছেন। সেই Mathew Arnold গদ্য-সাহিত্যে বৈদর্ভীরীতির এতটা ভক্ত ছিলেন যে তিনি ইংরাজিগদ্যের অরাজকতার শাসনের জন্য French Academyর অনুকরণে ইংলণ্ডেও একটি Academyর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। গদ্যের যে একটি standard হতে পারে এ বিশ্বাস তাঁর ছিল—এবং আমারও

আছে। এ কথা ভুলে গেলে চল্‌বে না যে গদ্য শুধু কবিত্বের নয়, জ্ঞানেরও বাহন। সেকালে এদেশে অঙ্কশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্রও কবিতায় লেখা হত—একালে ইতিহাস, পুরাণও গদ্যে লেখা হয়। মানুষের জ্ঞান, মানুষের চিন্তা, অপরের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে হলে ভাষা যে সহজ হওয়া আবশ্যক এ বিষয়ে বোধ হয় মতভেদ নেই। যে ভাষা সর্ব্বলোকসামান্য সেই ভাষা অর্থাৎ চলিত ভাষাই যে জ্ঞানের আদান-প্রদানের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ভাষা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। লেখকমাত্রেই জানেন যে ভাবের সঙ্গে ভাষার সমন্বয় করা কতটা যত্নসাধ্য। গুপ্তমহাশয় স্বীকার করেন যে মৌখিক ভাষার সঙ্গে মানব-মনের একটা "সহজ সামঞ্জস্য" আছে। সে সামঞ্জস্য নষ্ট করাই কি সাহিত্যের ধর্ম্ম? প্রসাদগুণই গদ্যের সর্ব্বপ্রধান এবং অসাধারণ গুণ। কেননা ভাষার স্বচ্ছতা ভাবের স্বচ্ছতায় পরিচায়ক। যার মনের ভিতর আলো নেই, তার ভাষায় প্রকাশ-গুণ থাকতে পারে না। আর আলোক হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ—তা সে বহির্জগতেই হোক্, আর মনোজগতেই হোক্। আর আলোকের ধর্ম্ম হচ্ছে শুধু বস্তুকে নয়, নিজেকেও প্রকাশ করা। আলোক স্বপ্রকাশ বলেই পরম সুন্দর। এই প্রসাদগুণ থাক্‌লে দর্শনও কাব্য হয়ে উঠে। ভাষার এই গুণের সদ্ভাবে Plato শঙ্কর ও Bergson-এর দর্শন চিন্তাজগতে পরাকাষ্ঠা লাভ করেছে।

বলা বাহুল্য, সরলতা, স্বাভাবিকতা এবং স্বচ্ছন্দতা প্রভৃতি গুণসকলের সমাবেশেই ভাষা প্রসন্নতা লাভ করে।

(৯)

গুপ্তমহাশয়ের আলোচ্য বিষয় গদ্যের নয়, পদ্যের ভাষা। আমি ইতিপূর্ব্বে পদ্যের ভাষা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিনি। একালে পদ্যে শুধু কাব্য লেখা হয়,—শাস্ত্র লেখা হয় না। কাব্য অবশ্য কেবলমাত্র জ্ঞান কিম্বা চিন্তার আধার নয়। কবি মাত্রেরই দৃষ্টির এবং অনুভূতির বিশেষত্ব আছে। আমার মতে

"প্রতি কবির মন এক-একটি স্বতন্ত্র রসের উৎস।" (সবুজ পত্র ১ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।) সুতরাং প্রতি কবির ভাষারই সুস্পষ্ট বিশিষ্টতা থাকতে বাধ্য। সুতরাং কাব্যের ভাষার কোনও Standard থাকতে পারে না। যে গদ্যসাহিত্য কাব্যের অন্তর্ভূত সে গদ্যও Standard গদ্য হতে পারে না, তবে এই স্বাতন্ত্র্য-লাভ সম্বন্ধে পদ্যের অপেক্ষা গদ্যের স্বাধীনতা ঢের কম। গুপ্তমহাশয় যখন বিশেষ-করে এই কবিতার কথাই আলোচনা করেছেন, তখন তাঁর বক্তব্য কথার বিচার করা আবশ্যক বোধে এ বিষয়েও দু'-চার কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি। কাব্যের ধর্ম্ম কি ? কি কি গুণের সদ্ভাবে কাব্য শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে ?—সে সম্বন্ধে গুপ্তমহাশয় বহু আলোচনা করেছেন। সে অপ্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমি যোগ দিতে চাই নে। কাব্যের ভাষা ওরফে Style সম্বন্ধে তিনি যে মতামত প্রকাশ করেছেন সেগুলি গ্রাহ্য করবার পূর্ব্বে পরীক্ষা করা দরকার। বলা বাহুল্য গুপ্তমহাশয় অধিকাংশ স্থলেই Style অর্থে ভাষা শব্দ ব্যবহার করেন। এ দুয়ের প্রভেদটা উপেক্ষা করায় তাঁর বিচার অনেকটা উল্টোপাল্টা হয়ে প'ড়ছে। গুপ্তমহাশয় বলেছেন যে—

"মহৎকে সর্ব্বসাধারণের গোচর বা বোধগম্য করাইতে যাইয়া তাহার মহত্বই তুমি নষ্ট করিবে। এ কথাটি বিশেষরূপে প্রয়োজ্য কবিতার জগতে। সাধারণে সকলে বুঝিল বা না বুঝিল তাহার সহিত কাব্য সৃষ্টির কোনই সম্বন্ধ নাই।"

এককথায় প্রসাদগুণ কবিতার গুণ নয়। আমাদের আলঙ্কারিকের মত এর ঠিক উল্টো। তাঁরা বলেন—

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়া চ কিম্।
পদবিন্যাসমাত্রেন যয়া নাপহৃতং মনঃ ॥

সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই যে তার সাক্ষাৎ লাভ করবার মাত্রই মানুষে মুগ্ধ হয়। যার মর্ম্মগ্রহণ করবার জন্য টীকাভাষ্যের প্রয়োজন তা সত্য হতে পারে, শিব হতে পারে, কিন্তু সুন্দর নয়। রূপ স্বপ্রকাশ, অতএব প্রকাশকগুণ অর্থাৎ প্রসাদগুণ তার একমাত্র ধর্ম্ম। গুপ্তমহাশয়ের নিকট Democracy এতই

অবজ্ঞার জিনিস যে জনসাধারণকে তিনি মনেও অস্পৃশ্য করে রাখতে চান। তাঁর বিশ্বাস শ্রেষ্ঠ কাব্য শুধু শিক্ষিত লোকের জন্যই রচিত হয়। এক হিসাবে কথাটা যে আমিও মানি তার পরিচয় পূর্ব্বেই দিয়েছি। তবে আমার ধারণা এই যে, আমরা যাদের শিক্ষিতসম্প্রদায় বলি, শিক্ষার দোষে তাদের বেশীর-ভাগ লোকই কাব্য-রসের আস্বাদন করতে অসমর্থ। কবি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত কোনও বিশেষ শ্রোতাকে চোখের সুমুখে রেখে নিজের মনের কথা বলেন না। তিনি কাব্যে অবশ্য আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু কার কাছে? মানব মনের কাছে। ভাষার উদ্দেশ্য হচ্ছে একের মনের বস্তু অপরকে দান করা। কবির উক্তি perfect speech এবং সে উক্তি এই কারণেই চরমোক্তি যে তা perfectly communicative, অর্থাৎ তা অবলীলাক্রমে অপরের মনে সম্পূর্ণ সংক্রমিত হয়;—তার রূপ পরিচ্ছন্ন আর তার গতি অবাধ। যে উক্তির রূপ অস্পষ্ট, দেহ শব্দভারাক্রান্ত, গতি সবাধ, তার স্থান কাব্যে নেই—আছে পাণ্ডিত্যের রাজ্যে। প্রসাদগুণবর্জ্জিত ভাষা—ভাষা নয়, স্তূপীকৃত শব্দরাশি মাত্র। এবং এ কথাও বলা বাহুল্য যে যে-ভাষা বক্তা ও শ্রোতাসামান্য নয়, সে ভাষায় প্রসাদগুণের চরমোৎকর্ষ লাভের সম্ভাবনা নেই। আমার চিরদিনের মত এই যে, দুর্ব্বোধের আদর শুধু নির্ব্বোধের কাছে এবং এ মত পরিবর্ত্তন করবার অদ্যাবধি আমি কোনও কারণ দেখিনি।

(১০)

কিন্তু পাছে ভাবের মহত্ব নষ্ট হয় এই ভয়েই গুপ্তমহাশয় আকুল। মৌখিক ভাষা তাঁর মতে সাহিত্যে অগ্রাহ্য; কেননা "গভীর প্রদেশস্থ ঘননীলাম্বুর যে নিথর সত্বপূর্ণ স্থাস্নুত্ব" তার পরিচয় গুপ্তমহাশয় মাতৃভাষার ভিতর পান না। তিনি যে প্রসাদ গুণকে উপেক্ষা করেন তার প্রমাণ তাঁর পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ভিতরই পাওয়া যায়। আমাদের আলঙ্কারিকেরা যাকে বলে ওজঃগুণ তিনি একমাত্র সেই গুণের অতিমাত্রায় ভক্ত। অর্থাৎ তিনি সর্ব্ব-আলঙ্কারিক-নিন্দিত

গৌড়ী রীতিরই পক্ষপাতী। দণ্ডী বলেছেন—"অনুপ্রাসধিয়া গৌড়ৈ স্তদিষ্টং বন্ধগৌরবাৎ।" অর্থাৎ গৌড়জন অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের অতিশয় পক্ষপাতী; কেননা তাদের ধারণা যে উক্ত উপায়ে রচনা গাঢ়বন্ধ হয়। গুপ্তমহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বহুবার বন্ধনের গাঢ়তার বিষয় উল্লেখ করেছেন এবং মেঘনাদবধের অনুপ্রাসসম্বল নিম্নলিখিত কবিতা সাধুভাষার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করে দিয়েছেন—

"সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে"—

তার পর, তিনি Style সম্বন্ধে Cicero, Corneille এবং Victor Hugoর নজির দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য এ তিন ব্যক্তিই Rhetorician বলেই সাহিত্য-জগতে বিখ্যাত। যে রচনারীতির প্রধান সম্বল শব্দাড়ম্বর, বাঙ্গলা-ভাষায় সে রীতির অবলম্বন সুসাধ্য নয়। কেননা বাঙ্গলা-ভাষা "অল্পপ্রাণ অক্ষরবহুল"। অতএব শাস্ত্রমতে বৈদর্ভীরীতির উপযোগী ভাষা। আলঙ্কারিকেরা বলেন যে ওজঃগুণের অতিলোভবশতঃ সেকালের কবিরা "অনত্যর্জ্জুনাব্জন্ম সদৃক্ষাঙ্কো বলক্ষগুঃ" প্রভৃতি বাক্য রচনা করে গিয়েছেন। উক্ত বাক্য যে সার্ব্বজনবোধ্য নয়, তা বলা নিষ্প্রয়োজন, এবং সে কারণ সম্ভবতঃ এতে ভাবের মহত্ব নষ্ট হয়নি। কিন্তু যদি রক্ষিত হয়ে থাকে তবে সে ভাবধন মাটির নীচে রক্ষিত হয়েছে;—দিনের আলোয় প্রকাশিত হয়নি। ভাবের মহত্ব যে শব্দের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের উপর নির্ভর করে না—এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে তা প্রমাণ করবার জন্য তর্ক যুক্তির কোনও প্রয়োজন নেই। ওজঃগুণ যে styleএর একটি বিশেষগুণ তা আমরা সকলেই স্বীকার করি। নিম্নে বামনের অলঙ্কারসূত্র থেকে দু-চারিটি কথা তুলে দিচ্ছি; তার থেকে দেখতে পারেন যে সে গুণ প্রসাদ-গুণেরই অন্তর্ভূত।

"সমগ্রগুণা বৈদর্ভী।"
"ওজঃকান্তিমতী গৌড়ীয়া।"
"গাঢ়বন্ধত্বম্ ওজঃ।"

"শৈথিল্যং প্রসাদঃ।"

এস্থলে প্রশ্ন হতে পারে যে শৈথিল্য যখন ওজঃবিপর্য্যয়াত্মা তখন তা দোষ না হয়ে গুণ হয় কেন?

উত্তর—"গুণঃ সংপ্লবাৎ।"

ওজঃগুণের সংপ্লবেই প্রসাদ-গুণের পূর্ণতা। এস্থলে পুনরায় এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে প্রসাদ ও ওজঃ এ দুটি যখন পরস্পরবিরোধধর্ম্মী তখন এ উভয়ের সংপ্লব কি করে সম্ভব হতে পারে?

উত্তর—স ত্বনুভবসিদ্ধঃ।

অর্থাৎ সে সংপ্লব কবিহৃদয়ের অনুভবসিদ্ধ—যেমন বিভিন্নজাতীয় রত্নের একত্র সমাবেশ। বামনাচার্য্যের এই মত সম্পূর্ণ সত্য। আলঙ্কারিকদের মতে যে সংস্কৃতকবি প্রসাদগুণসর্ব্বস্ব, আমরা জানি সেই কালিদাসের কবিতাই ওজঃগুণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমার একটি বন্ধু বলেন, ওজঃগুণ এবং ওজনগুণ এক জিনিষ নয়। ভাষার সরলতা যে কবির মনোভাব প্রকাশের প্রতিকুল নয়, তা গুপ্তমহাশয়ের সমালোচক-গুরু Mathew Arnoldএর কথাতেই প্রমণে করা যায়। তাঁর মতে নিম্নলিখিত ছত্র ক'টিতে ইংরাজি কবিতা সৌন্দর্য্যের চরম সীমায় পৌচেছে।

"Afte life'sr fitful fever he sleeps well."

—Shakespeare.

"Though fal'n on evil days,
On evil days though fallen, and evii tongues"

—Milton,

"A thing of beauty is a joy for ever."

—Keats.

পাঠকমাত্রেই দেখতে পাচ্ছেন, উপরোক্ত বাক্য ক'টির ভাষা কত-সহজ, কত-সরল, কত-সর্ব্বজনবোধ্য। আমাদের মৌখিক ভাষাও শিল্পীর হাতে পড়লে যে কতদূর সরাগ ও সতেজ হতে পারে তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "ঘরে বাইরে"র ভাষা। অত শক্তিশালী অত শ্রীসম্পন্ন গদ্য বাংলাসাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে কখনও লেখা হয় নি। গৌড়ী রীতি শোভা পায় বক্তৃতায়—লেখায় নয়।

কেননা বক্তৃতার উদ্দেশ্য ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য শ্রোতার চিত্তকে, উদ্দীপিত, উত্তেজিত করে তোলা—এবং তার জন্য চাই ভাবের বাড়াবাড়ি ও ভাষার ধুমধড়াক্কা—যার প্রকোপে শ্রোতার "স্নায়ুমণ্ডলী" বিক্ষুব্ধ ও অস্থির হয়ে ওঠে। গুপ্তমহাশয় বলেন, কবির উক্তি "অতি সাধারণ"—আলঙ্কারিক ভাষায় যাকে বলে অতিশয়োক্তি। কিন্তু আলঙ্কারিকদের মতে অত্যুক্তি হচ্ছে অতিশয়োক্তির উল্টো জিনিষ।

(১১)

আমি পূর্ব্বে বলেছি গুপ্তমহাশয় অনেকস্থলে Style অর্থে ভাষা শব্দ ব্যবহার করেন, আবার অনেক স্থলে ভাষা অর্থে তিনি বোঝেন শব্দ। শব্দসমষ্টি যে ভাষাপদবাচ্য নয়—এ সত্য তিনি বরাবর উপেক্ষা করেন। বাক্য অর্থাৎ গঠিত শব্দই হচ্ছে ভাষার মূল উপাদান; এবং প্রাণ সেই বাক্যেরই আছে—শব্দের নেই। সে যাই হোক, গুপ্তমহাশয়ের মনোগত ভাব এই যে—যে-সকল শব্দ এককালে মুখেমুখে প্রচলিত ছিল, কিন্তু এখন নেই, এবং যে-সকল শব্দ কর্ম্মজীবনে নিত্য ব্যবহৃত হয় না, সেই সকলই সাহিত্যের যথার্থ উপাদান। সেই সকলই নয়, সে সকলও যে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং হওয়া উচিত এ কথা আমিও মানি। কর্ম্মজীবনের পরিধি সঙ্কীর্ণ এবং যে-জাতির কর্ম্মজীবনের পরিধি যত সঙ্কীর্ণ, সে জাতির নিত্যব্যবহার্য্য শব্দ তত স্বল্পসংখ্যক। সুতরাং কর্ম্ম জ্ঞান ও ভক্তি তিন নিয়ে যখন সাহিত্যের কারবার তখন আমাদের নিত্যকর্ম্মের শব্দে তার কাজ চলে না। কিন্তু যা নিত্যকর্ম্মের কথা নয় এমন অসংখ্য কথা আমাদের মৌখিক ভাষারই অঙ্গীভূত।

তারপর যে ভাষার সাহিত্য আছে সে ভাষায় এমন অনেক শব্দ লিপিবদ্ধ আছে যাদের আজকাল মুখেমুখে প্রচলন নেই। তা ছাড়া এমন অনেক শব্দ আছে যা কস্মিনকালেও আমাদের মুখের কথা ছিল না—যা কালক্রমে বাঙ্গলাভাষার অন্তর্ভূত হয়ে পড়েছে। এ সকল শব্দ অপর সাহিত্য হতে—বিশেষতঃ সংস্কৃত সাহিত্য

হতেসংগৃহীত। মৌখিক ভাষার বুনিয়াদের উপর, এ সকল শব্দ-সহযোগেও আমরা সাহিত্যে রচনা করতে পারি। আমরা চাই শুধু আমাদের সাহিত্যের বুনিয়াদ্ বজায় রাখতে।

সংস্কৃত শব্দ বর্জ্জন করলে আমাদের সাহিত্য ঐশ্বর্য্যহীন হয়ে পড়বে, কেননা কেবলমাত্র বাঙ্গলাকথায় আমাদের সকল মনোভাব ব্যক্ত করতে পারব না।

কথাটা একটু পরিষ্কার করা যাক্। যা আমাদের মনের বিষয় তারই আমরা নামকরণ করি। আমাদের মনের প্রধানতঃ দুটি বিষয় আছে—একটি বস্তুজগৎ, আর একটি মনোজগৎ। বস্তুজগৎ এক হলেও আমাদের মনোজগৎ দুই :—একটি নিজের মনের, আর-একটি পরের মনের। এই পৃথিবীতে যেমন সময় যাচ্ছে সেই সঙ্গে একটি বাহ্যমনোজগৎ গড়ে উঠছে—যে জগতের সন্ধান পাওয়া যায়—কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে। এ জগৎ বস্তুজগতের মতই যথার্থ। মেঘদূতের অলকা, পরমাণুর জগতের অসত্য হলেও পরমানুভূতির জগতে চিরসত্য হয়ে রয়েছে।

বস্তুজগতের জ্ঞান আমাদের যে-পরিমাণে বাড়ছে, সেই অনুসারে আমাদের ভাষায় নূতন শব্দের আমদানি হচ্চে—কতক সংস্কৃত হতে, কতক ইংরাজি হতে। এ সকল শব্দ, সাহিত্য আমাদের গ্রাহ্য করে নিতে হবে—অবশ্য যাচাই করে, বাছাই করে, ঝাড়াই করে।

গুপ্তমহাশয় সাহিত্য-রাজ্য হ'তে বাঙ্গলাশব্দ বহিষ্করণের পক্ষপাতী। তাঁর সঙ্গে আমাদের মতের প্রধান প্রভেদ এই যে আমরা বাঙ্গলা ভাষার কোন শব্দ অস্পৃশ্য মনে করি না—তা সে প্রাকৃতই হোক, আর সংস্কৃতই হোক।

"ন স শব্দো ন তদ্বাচং ন স ন্যায়ো ন সা কলা।
জায়তে যন্ন কাব্যাঙ্গমহো ভারো মহাকবেঃ ॥"

এই আলঙ্কারিক মত যে আমি সত্য বলে শিরোধার্য্য করি সে কথা আমি ইতিপূর্ব্বে কালি-কলমে স্বীকার করেছি। গুপ্তমহাশয় বলেন, সাহিত্যের পরি-

ভাষা আছে। আমি বলি পরিভাষা নয়, পরিপূর্ণ ভাষাই হচ্চে সাহিত্যের পূর্ণ সম্বল। কেননা মানুষের সমগ্র মন ও সমগ্র জীবনের উপর সাহিত্যের সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ উৎসাহ অবসাদ আশা নৈরাশ্য অনুরাগ বিরাগ প্রভৃতি যে-সকল মনোভাব আমাদের নিতান্ত অন্তরঙ্গ, সে সকলের প্রকাশের জন্য আমাদের নিত্যব্যবহার্য্য শব্দসকলই বিশেষ উপযোগী, আর আমাদের বাহ্য-মনোজগতের যে অংশ সংস্কৃত ভাষায় গড়া তার কথা কাব্যে আনতে হলে উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দই আমাদের ব্যবহার করতে হবে, যাতেকরে তার Association এর ঐশ্বর্য্য আমরা না হারাই। আমরা শুধু ভাষায় নয়, ভাবেও আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন অধিবাসীদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং যে যুগসঞ্চিত সম্পদ আমাদের হাতে রয়েছে তা একেবারে বাদ দিয়ে আমাদের পক্ষে সাহিত্য রচনা করা স্বদেশী গোঁয়ারতুমি ছাড়া আর কিছু নয়।

কিন্তু মানুষের সম্পদেই তার বিপদ। এই সংস্কৃত-শব্দের ব্যবহারে অতি সতর্ক না হলে, আমাদের পদে-পদে বিপদ ঘটে। কথার যে শুধু শব্দ আছে তাই নয়, রূপ রস তেজ, এমন-কি গন্ধও আছে। কবি কথার এই পঞ্চ গুণেরই সন্ধান রাখেন। এবং আমার বিশ্বাস এই কটির মধ্যে শব্দ-গুণই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। কারণ ধ্বনিগত আনন্দ কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়জ সুখ। সংস্কৃত কথার শব্দাঢ্যতাই আমাদের বিপদ ঘটায়। শাস্ত্রে বলে গৌড়ীয়েরা সেই শব্দের পক্ষপাতী যা শ্রোত্ররসায়ন। আমরা চাই সেই শব্দ যা কানের নয়, প্রাণের রসায়ন। সে শব্দ ব্যবহার করতে হলে তার যথার্থ ও সম্পূর্ণ অর্থ জানা চাই—তারপর সে শব্দ আমাদের ভাষার ভিতর খাপ খায় কি-না সে জ্ঞানও থাকা চাই।

সকল ভাষারই একটা নিজস্ব সুর আছে। সে সুরের প্রতি কান রেখে আমাদের সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করতে হবে—যাতে আমাদের রচনা আগাগোড়া বেসুরো না হয়ে যায়। কোন্ কথা সুরে বসবে আর কোন্ কথা বসবে না—তা দেখানো অসম্ভব; কেননা কাণই তার একমাত্র বিচারক। আমি প্রাগ্-

বৃটীশ যুগের ছুটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি যাতে অনেক সংস্কৃত কথা আছে, অথচ আমার কানে যার সুর পুরো বাঙ্গলা লাগে—

"কাঁদে বিদ্যা আকুল কুন্তলে
কপালে কঙ্কণ হানে—অধীর রুধির বাণে
কি হৈল কি হৈল বলে।"

—ভারতচন্দ্র।

রজনী শাওনঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমিঝিমি শবদে বরিষে
পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে।

—জ্ঞানদাস।

অপর-পক্ষে মেঘনাদ বধের আওয়াজ প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্য্যন্ত ভরাট ও বিরাট হলেও সে আরাব বঙ্গ-সরস্বতীর বীণার নয়—গড়ের বাদ্যির।

তার পর, অনেকে জিজ্ঞাসা করেন যে কি অনুপাতে বাঙ্গলার সঙ্গে সংস্কৃত মেশালে তা ভাল বাঙ্গলা হবে। এর অবশ্য কোনও উত্তর নেই। কেননা দু-ভাগ বাঙ্গলার সঙ্গে এক-ভাগ সংস্কৃত মেলালেও লেখা জল হবে না—যদি না লেখকের অন্তরে সেই শক্তি থাকে যার বলে এ-উভয়ের রাসায়নিক মিশ্রণ হয়। আসল কথা—এ সব সমস্যার মীমাংসা প্রতি-লেখককে তাঁর স্বীয় রুচি ও শক্তির অনুসারেই করতে হবে।

গুপ্তমহাশয় সর্ব্বশেষে ছন্দের কথা তুলেছেন; সে সুরের নয়—তালের কথা। আমি কবি নই, সুতরাং ছন্দ-বিচাররূপ অনধিকার চর্চ্চা করতে প্রস্তুত নই। এই মাত্র বল্লেই যথেষ্ট হবে যে যখন তাঁর মত যে গুরুভার শব্দই সাহিত্যের গৌরব বাড়ায়, তখন অবশ্য ভাষার একমাত্র মন্দগতিই তাঁর নিকট গ্রাহ্য। বস্তুজগৎ তাঁর মনের উপর ভারের মত চেপে রয়েছে, সুতরাং আমাদের

কথা তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। এ সত্ত্বেও এ-সব তর্কবিতর্ক নিস্ফল নয়; কেননা যিনি সাহিত্যের আভিজাত্য রক্ষা করতে চান, তিনিই আমাদের দলের লোক। তাঁর সঙ্গে আমরা মতে পৃথক হলেও মনে এক। Walter Pater এর নিম্নোদ্ধৃত কথা কটি এ বিষয়ে যে শেষ কথা,—এ কথা আমি মানি এবং আমার বিশ্বাস গুপ্তমহাশয়ও মানবেন।

"For in truth, the legitimate contention is, not of one age or school of literary art against another, but of all successive schools alike, against the stupidity which is dead to the substance and the vulgarity which is dead to form."

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

"নতুন-কিছু"

—:*:—
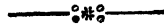
নূতনকে জান্‌বার জন্য, তাকে পাবার জন্য মানুষের কৌতুহল আর আগ্রহ যতই থাকনা, তার'পরে সন্দেহ আর বিদ্বেষও নিতান্ত অল্প নয়। ইতর প্রাণীকে খাবার আগে শুঁকে দেখ্‌বার প্রবৃত্তি যিনি দিয়েছেন— মানুষের মনের এই বিচার-বুদ্ধিও তাঁরই দান।—কাজেই এর অনুশীলন মানে—তাঁর ইচ্ছারই অনুসরণ। কিন্তু আমরা যে আমাদের বোকামি আর গোঁড়ামি দিয়ে আমাদের সহজ-বুদ্ধিকে কত রকমে, কত বেশী অভিভূত আর বিকৃত করে' তুল্‌তে পারি, তার আর অন্ত নেই!

আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় নতুন কিছু কানে উঠ্‌লেই কারো আসে গায়ে জ্বর, কারো হয় প্রাণে আতঙ্ক, কারো ওষ্ঠ-প্রান্তে ফোটে বিদ্রূপের হাসি, আর অধিকাংশেরই তা' মনে ধরে না। আর, সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এই ভাবগুলো নিতান্ত সাত্ত্বিক না হ'লেও একান্ত অহৈতুকী তাতে সন্দেহ নাই। আমাদের জাতীয় জড়তার সাথে সাথে সামাজিক মনও ধীরে ধীরে অনেকটা অসাড় এবং অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ফলে, আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ, প্রয়াস ও প্রযত্ন আদি করে' সুস্থ ও সবল প্রাণের যত ভাব ও বৃত্তি তারা সব অবসর নিচ্ছে। আর সন্দেহ ও অবজ্ঞা, নৈরাশ্য ও ঔদাসীন্য তাদের স্থান পূরণ কচ্ছে! এম্নি করে, যেটা স্বতঃসিদ্ধ—সেইটেতেই আমাদের দাঁড়িয়ে গেছে

ঘোরতর সন্দেহ ;—আর যেটাতে বিচারের যথেষ্ট অবসর আছে, সে বিষয়ে আমরা হয়ে' পড়েছি একেবারে উদাসীন !

সৎ-অসৎ বেছে নেবার ধৈর্য্য ও উদারতা আমরা ঠিক যে পরিমাণে হারিয়েছি, সন্দেহ ও অবজ্ঞা করারূপ কার্পণ্য ও ঠিক সেই পরিমানেই আমাদের পেয়ে বসেছে ! আগুন নিভে এলে ধোঁয়ার ভাগটা স্বভাবতঃই অপর্য্যাপ্ত হয়ে' ওঠে। আমাদের কর্ম্ম-প্রচেষ্টায় যতই ভাটা পড়্ছে, মনের আগুনের উত্তেজনা যতই কমে আস্‌ছে—আমাদের মনোজগতে বিধির চেয়ে নিষেধের মাত্রাও ততই প্রচুরতর হচ্ছে। একটু তলিয়ে দেখ্‌লেই দেখা যাবে,—বেশীর ভাগ নিষেধের মূলেই রয়েছে—আমাদের কর্ম্ম-বৈমুখ্য। এ বিষয়ে আমাদের জোড়া মেলে না ! এ রোগের বীজ এ দেশের জল-হাওয়ার ভিতরে এম্নি নিভাঁজে মিশিয়ে গেছে যে,—রোগটাই এখন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ; আর রোগমুক্ত অবস্থা যেটা, সে হচ্ছে আমাদের কাছে একটা "নতুন-কিছু"।

মাঝে মাঝে, স্থানে-অস্থানে আমরা আমাদের রক্ষণ-শীলতার বড়াই করে' থাকি। নানা বিভিন্ন সভ্যতার সঙ্গে সংঘর্ষে এসেও আমরা নাকি আমাদের জাতি-গত বিশিষ্টতা হারাই নি ! কিন্তু আমাদের সেই বিশিষ্টতাটা যে কি বস্তু, সেটা হাজারে এক জনও পরিষ্কার করে' বলে' দিতে পারেন না। আর সেটা বজায় থাকাতে আমাদের বর্ত্তমানেই বা কি সুবিধে হচ্ছে, আর আখেরেই বা কি সুসার হ'বার আশা আছে, সে সব বিবেচনা করবার মত বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি অনেকেরই নেই ! এর চেয়ে বিড়ম্বনা আর কি হ'তে পারে ? বস্তুটা যে কোথায়, কি অবস্থায় —তা' জানিনে, তবু তার অস্তিত্বের গুজবেই বিভোর ! ভাব্‌বার ধৈর্য্য আমাদের একটুও নাই—অহঙ্কারের তমো প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত

মাত্রাতেই রয়েছে। জাতীয় বিশিষ্টতা বলে' যদি সত্যিই কিছু আমাদের থাকে, তবে, তা' নিজের গুণেই রয়েছে। আমাদের তরফ্ থেকে তাকে রাখ্‌বার জন্যে জাতিগত ভাবে খুব বেশী চেষ্টা কর্‌তে হয় নি!—নিশ্বাসবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে, মাতৃ-ভূমির প্রতি অনুতে, যে জিনিস আমাদের অন্তরস্থ এবং মজ্জাগত হয়েছে,—তা' কি অত সহজে যাবার? যা' যাবার নয়, তা' রেখেছি বলে' বাহাদুরী নেওয়াটা তখনই সম্ভব, যখন নতুন কিছু গড়বার, ঘরে আন্‌বার, বা, যা' ছিল তাকে পরিপুষ্ট কর্‌বার আশা সুদূর-পরাহত।

রক্ষণশীলতার সাথে যদি প্রসার-পরায়নতা না থাকে, তবে তা' জাতীয় জীবনের পক্ষে পক্ষাঘাত তুল্য! জাতীয় জীবনের ধারাকে জমিয়ে বরফ করে' রাখায় কোনই লাভ নেই। তার লক্ষ্য অব্যাহত রেখে, তার প্রণালীর প্রসার সাধনই বাঞ্ছনীয়।

আমরা রক্ষণশীলতা বল্লে' যে বস্তুকে বুঝি, যার অজুহাতে আমরা সকল রকমের সংস্কারের 'পরেই খড়গ-হস্ত, তার কতকটা হচ্ছে তারই পরিবর্দ্ধিত এবং বিশিষ্ট সংস্করণ, যার বশীভূত হয়ে' আমরা শীতের দিনে পাঁচটায় ঘুম ভাঙ্গলেও আটটার আগে উঠিনে! আমরা আমাদের মনের সব বিভাগেই দিব্যি রবিবারের মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছি। এর মধ্যে যদি কেউ এসে হঠাৎ সোমবারের দাবী উপস্থিত করে—তা' হ'লেই মুস্কিল! চাক্-ভাঙ্গা মৌমাছির পাল্লায় পড়ে' সে ব্যক্তির যে অবস্থাটা হয়, সেটা খুব জমকালো হ'লেও মোটেই সুখের নয়।—তবে, ভরসা এই যে, আমরা ভন্ ভন্‌ই করি—হুল্ ফুটাই নে; কারণ, ও বস্তু আমাদের নেই। আর, তার কারণ, আমরা, যারা বেশীর ভাগ ভন্ ভন্ করি, তা'রা কোনো দিনই মধু-চয়ন করিনি!

চয়নের যোগ্যতা যাদের নেই, রক্ষণের ক্ষমতা তাদের দেওয়া, প্রকৃতির পক্ষে নিতান্ত বাজে-খরচ হ'ত।

আমাদের মনের যে রক্ষণশীলতা তা'র নিশ্চয়ই একটা সীমা আছে। আর, শিক্ষা দীক্ষা অনুসারে তা'র তারতম্যও আশা করা যায়। কাজেই, একজনের কাছে যা' সহজ, অপরের কাছে তা' বাড়াবাড়ি, একজনের কাছে যা' স্বাভাবিক, অপরের কাছে তা' জবরদস্তি বলে' মনে হওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। তবে, আজ যা' নতুন, দু'দিন বাদে তা'ই সেকেলে হয়ে দাঁড়াবে, হয়ত। অন্ততঃ আজ আমরা যে সব জিনিস বিনা তর্কে, সেকেলে বলে' গ্রহণ কর্চ্ছি, এটা নিশ্চিত সত্য যে, এক-কালে তা'ও নতুন ছিল!

আমাদের মনের দুয়ারে উমেদারা করে বলে' নতুনের "মান-হানি"র আশঙ্কা থাক্‌লেও তা'র গুণ-হানির কোনই আশঙ্কা নেই।—কাজেই কেবল নতুন বলেই বেশী দিন কোন জিনিস অবজ্ঞাত থাকে না। গুণগ্রাহী লোকে একদিন না একদিন তাকে বরণ ক'রে নেবেই, যদি তার ভিতরে গ্রহণ-যোগ্য কিছু থাকে। আর, জন-সাধারণ চিরদিনই গতানুগতিক।

যত কিছু রীতি-নীতি, বিধি-নিষেধ সমাজে প্রচলিত হয়েছে, সবারই এক ইতিহাস। বিনা বাধায় অনায়াসে কিছুই গ্রাহ্য হয় নাই! যা সত্য, বাধায় তার বেগ বাড়ে, আঘাতে তার ফুল্‌কি ছোটে, বিদ্রূপে তার স্বরূপ প্রকাশ পায়। মানব মনের রক্ষণশীলতার আগুনে পুড়ে' ছাই না হয়ে বরং খাঁটি হ'য়ে যা' বেরিয়ে আসে—তা'ই হবে গ্রহণ-যোগ্য, তা'ই হ'বে ধারণ-যোগ্য।

এই হিসেবে রক্ষণশীলতার মূল্য আছে। হিরণ্য-কশিপু অতিরিক্ত

মাত্রায় রক্ষণশীল হ'য়েছিল বলেই নর-হরি অবতার! রাবণের অত জেদ্ না থাক্‌লে রামায়ণ সুন্দরা কাণ্ডেই শেষ হ'ত।—অন্ততঃ লঙ্কা-কাণ্ডটা হ'ত না। আর, তাতে করে' শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্বের দাবী মোটেই জন্মাত না! ভীষ্ম দ্রোণের মত মহারথীরা যদি অতটা রক্ষণশীল না হ'য়ে, পাণ্ডবদের দাবীটাও একটু বুঝে দেখ্‌তেন, তা' হলে কুরুক্ষেত্রের মহোৎসবটা ঘট্‌ত না! আর, তাতে করে' শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত জগন্মান্য দর্শন-গ্রন্থ আমরা পেতাম না; পূর্ণাবতারের অবতারত্ব ব্রজলীলাতেই পর্য্যবসিত হ'ত। চাঁদ-সদাগর না থাক্‌লে মনসা দেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার হ'ত না! সেকালের কথা থাক্, এ যুগেও দেখুন;—আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের পত্তনের মূলে ইংলণ্ডের রক্ষণ-শীলতা; আবার, তার বর্ত্তমান ঐক্য এবং উন্নতির মূলেও সেই অন্তর্ব্বিপ্লব—যার কারণ, তার দক্ষিণাংশের রক্ষণশীলতা।

একটু ভেবে দেখ্‌লেই এদের সঙ্গে আমাদের তথা-কথিত রক্ষণ-শীলতার একটা বিষম অনৈক্য ধরা পড়ে। এরা প্রাণের সঙ্গে আঁক্‌ড়ে ধরে, দু'হাত দিয়ে ঠেল্‌তে জানে। আমরা নিষ্ক্রিয়, এরা উদ্দাম। আমরা চাই চাপা দিতে, ওরা বলে "হয়-এস্পার নয়-ওস্পার"। আমরা যা বলি সেটা মুখের কথা, তা'রা যেটা বলে গেছে সেটা তাদের প্রাণের অভিব্যক্তি। এই সব কারণেই প্রকৃত রক্ষণশীলতা হয়েছে চিরকালই ভালোমন্দ'র কষ্ঠি-পাথর। সমাজে যা কিছু রীতি-নীতি প্রচারিত হয়েছে, তারা সবাই এর 'পরে নিজ নিজ টিপ্-সই এঁকে দিয়ে, আপনাকে প্রমাণ করে', তবে মান্য হয়েছে। কিন্তু আমাদের রক্ষণ-শীলতা ত' ও শ্রেণীর নয়! তা' হ'চ্ছে অনেক স্থলেই আমাদের কর্ম্ম-বিমুখ মনের সুনিপুণ ছদ্মবেশ। কাজেই এ দিয়ে কষ্ঠি-পাথরের

কাজ চল্‌তে পারে না। ভেড়ার শিংএ হীরের ধার পরীক্ষার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

সংস্কার বলে' উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়া খারাপ বটে, কিন্তু রক্ষণশীলতার নামে জড়তার আশ্রয় নেওয়া আরো খারাপ বলেই মনে হয়।—জগাই-মাধাইয়ের কাছে সত্যের প্রকাশ অসম্ভব নয়; কিন্তু ইঁট-পাট্‌কেলের পক্ষে তার সন্ধান পাওয়া অস্বাভাবিক! উচ্ছৃঙ্খলের কার্য্য-কলাপ বিশৃঙ্খল হ'লেও, তার মন-প্রাণ ত' শৃঙ্খল-মুক্ত বটে!

যে যুগে আমরা জন্মেছি,—এ যুগে রক্ষণশীলতার অর্থ পুরাতনের পরে অন্ধ-বিশ্বাস নয়। (আর "নাই-মামা" এবং "কাণা-মামার" মধ্যে কোন্‌টা যে বাঞ্ছনীয় সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবসর আছে।) এ উন্নতির যুগে অন্ধ-বিশ্বাসের কোনো স্থানই নাই। স্থবিরত্ব, নির্ব্বান্, স্থানুত্ব আদি করে' সব পরিণতি আধ্যাত্মিক জীবনে খুব লোভনীয় জিনিস—সন্দেহ নাই—কিন্তু সামাজিক হিসেবে এ সব মান্য-গণ্য হলেও মোটেই বরেণ্য নয়। পণ্ডিতেরা বলেন,—আমাদের বাইরেটার সঙ্গে নাকি ভিতরটার একটা একটানা সতরঞ্চের বাজি চলেছে। বাইরের কিস্তি সাম্‌লাতে ভিতরেও যে ওঠা-নামা, ভাঙ্গা-গড়া চল্‌ছে, তা'ই নিয়েই নাকি আমাদের জীবন।—এ ওঠা-নামা যে দিন বন্ধ কর্‌র—ভবের পাততাড়িও সেদিন আমাদের গোটাতে হবে!

প্রাণের বেলায় যে কথা খাটে—মনের বেলায়ও, আমার বিশ্বাস, তা' খাট্‌বে। মনোজগতে যদি আমাদের বেঁচে থাক্‌তে হয়, তবে ওঠা-নামা, ভাঙ্গা-গড়ার জন্যে সর্ব্বদা তৈরী থাক্‌তে হবে! দেখে শুনে ঠেকে আমাদের শিখ্‌তেই হ'বে। সনাতনের দোহাই দিয়ে নূতনকে অগ্রাহ্য কর্‌লে চল্‌বে না। মাতৃ-স্তন্য শিশুর পক্ষে যতই উপকারী

হোক্ না, যতদিন পর্য্যন্ত উচিত, তার চাইতে বেশী দিন তার জের টান্‌লে—মা ও শিশু দু'জনের পক্ষেই তা' অপকারী হ'য়ে দাঁড়াবে।

আমাদের শিক্ষায়, আমাদের সাহিত্যে, আমাদের চিন্তায়, আমাদের অনুষ্ঠানে, আমাদের ধর্ম্মে, আমাদের সমাজে সর্ব্বত্র আমাদের ঝোঁক এবং জেদ্ হয়েছে এস্নিধারা পুরাতনের জের টান্‌বার দিকে! আমাদের বুদ্ধি আমরা নিযুক্ত করেছি নতুনকে নাজেহাল কর্‌বার জন্যে; আমদের বিদ্যা আমরা জাহির কর্চ্ছি পুরাতনের পক্ষে সাফাই গেয়ে!—এতে করে' আমাদের ওকালতি বুদ্ধি মার্জ্জিত হ'লেও, আন্তরিকতা ক্রমেই কমে আস্‌ছে। পুরাতনের সহস্র ত্রুটী আমরা অহরহ দেখ্‌ছি, অথচ নতুনের গুণরাজি আমরা কল্পনার কালিতে ঢাক্‌ছি! যা' আমাদের মনে নেই, তাই আমরা মুখে গাচ্ছি; আর, যা আমরা মুখে সাধ্‌ছি, তা' কাজে কর্চ্ছি নে! আমাদের শিক্ষিত সমাজের মনোজগতের এই সব গোলমালের একটা প্রতিক্রিয়া আছে—আমাদের জাতীয় জীবনের 'পরে। মনে হয়, তা'রি ফলেই, আমাদের দেশ-ব্যাপী আন্দোলন পরিণত হয় হুজুগে; আর অনুষ্ঠান পর্য্যবসিত হয় আস্ফালনে!

বর্ত্তমান যুগে রক্ষণ-শীলতার মানে,—পুরাতনের জায়গায় নতুন-কিছু আন্‌বার আগে তাকে বেশ করে' বাজিয়ে নেওয়া; পুরাতনের তুলনায় তার উপযোগীতা বেশী কিনা বিচার করা। এ কাজ কর্‌তে হ'লে উন্নতি-প্রয়াসী মাত্রেরই উচিত বিচারবুদ্ধিকে যথাশক্তি শানিত রাখা; আর মনটাকে একেবারে নিরপেক্ষ করা। নূতন পুরাতনের পরীক্ষায় আগেভাগেই পুরাতনের গায়ে পাশের মার্কা মেরে দিলে চল্‌বে না। নতুনের আমরা বিচারক হ'লেও, এটা আমাদের সব সময়েই মনে রাখতে হবে যে, সে আমাদের সাম্‌নে যে জায়গাটায়

দাঁড়ায় সেটা আসামীর কাঠগড়া নয়—বিচার প্রার্থীর আসন! তাকে সম্মান না দিতে পারি, কিন্তু অশ্রদ্ধা কর্‌বার অধিকার আমাদের নেই। আর, তাকে অবজ্ঞা কর্‌লে, নিতান্তই তার' পরে অবিচার করা হ'বে।—এম্নি করে'ই এখন আমরা বিচারকের আসন কলঙ্কিত কর্চ্ছি!

ব্রত অনুষ্ঠান কর্‌তে হ'লে যেমন শাস্ত্র-মতে সংযম পালন করে' ধর্ম্মবুদ্ধির উদ্বোধন কর্‌তে হয়, নতুনের ভালোমন্দ বিশ্লেষণের সময়েও তেম্নি মনটাকে যথা সম্ভব সংস্কার-বর্জ্জিত করে' সত্যের জন্যে একাগ্র করে তুল্‌তে হবে! তা' হ'লেই সত্য আমাদের লাভ হবে; 'যা' মিথ্যা তা' আপনা হ'তেই দূরে সরে' যাবে! চুম্বক লোহাকেই টান্‌বে, ছাই পাঁশ সব যেখানকার সেইখানেই পড়ে থাক্‌বে। কিন্তু, মন যদি আমাদের গোড়া থেকেই ছাই পাঁশে ভরা থাকে, সেখানে যদি সত্যের জন্যে এতটুকুও ঔৎসুক্য, কণামাত্র ও জিজ্ঞাসা না জাগে—তা' হ'লে আর আমাদের আশা কোথায়? কাঠের ঘোড়া কখনও জল খাবে কি? কাঠের ঘোড়ার পক্ষে জল-পান যতটা অসম্ভব, সত্যিকারের রক্ত-মাংসের ঘোড়ারও যদি গরজ না থাকে বা মর্‌জি না হয়, তবে তাকে জল খাওয়ানো তার চেয়ে কোনো অংশেই কম অসম্ভব নয়। যে ঘুমিয়ে আছে তাকে ডেকে তোলা বরং সোজা, কিন্তু যে জেগে ঘুমোয় তাকে ওঠান বড়ই শক্ত।

এখন আমরা যেগে ঘুমোচ্ছি। পুরাতনের অনুপযোগীতা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বুঝেছি; তার 'পরে বিতৃষ্ণ এবং বিরক্ত আমরা যথেষ্ট পরিমাণেই হয়েছি; কিন্তু তবুও নতুনকে সর্ব্বান্তঃকরণে আবাহন, গ্রহণ এবং আলিঙ্গন কর্‌বার সাহস ও উত্তেজনা আমরা পাচ্ছিনে! আর, আমাদের এই দৈন্য, এই হীনতা আমরা ঢাক্‌ছি রক্ষণশীলতার আবরণ

দিয়ে! কিন্তু এ আবরণটা যে কত পাৎলা, কত শতচ্ছিদ্র তা' আমরা দেখেও দেখ্‌ছিনে। রক্ষণ-শীলতার গোঁ আমাদের মোটেই নেই। আমাদের সমাজজোড়া, দেশজোড়া আছে—ঘোর তামসিকতা! কোথায় আমরা রক্ষণ-শীল? সর্ব্বত্রেই ত' আমরা অতি মাত্রায় অনুকরণ প্রিয়! সর্ব্বদাই ত' আমরা রাম-রহিমে মিলেয়ে একটা খিঁচুড়ী পাকিয়ে, নিজের নিজের জান্‌ বাঁচিয়ে দিন গুজরাণেরই পক্ষপাতী। কেবল যেখানেই আমাদের গায়ে আঁচড় লাগার সম্ভাবনা রয়েছে; যেখানেই আমাদের কাঁচাঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা হয়েছে সেখানেই আমরা রক্ষণ-শীল বনে' গেছি! যখন রক্ষা কর্‌বার জিনিস আমাদের প্রচুর ছিল, তখন আমরা হয়ে পড়েছিলাম বিশ্ব প্রেমিক; আর এখন, যখন আমাদের সবই চাই—আমরা হয়েছি রক্ষণ-শীল। আমাদের সেই বিশ্বপ্রেম আর এই রক্ষণ-শীলতা দুই ই হচ্ছে একই জিনিসের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।

অতিরিক্ত বিশ্বপ্রেমের বন্যায় নিজের জাতীয়তা ভাসিয়ে দেওয়া, কিংবা জাতীয় মনের দুয়ার বন্ধ-করে' তার সাম্‌নে রক্ষণ-শীলতার পাহারা বসান, দুই-ই জাতির পক্ষে সমান অকল্যাণ। এ দু'টো দোষই আমরা সমান আয়ত্ত করে নিয়েছি। আপাততঃ, তাতে করে' আমাদের সুবিধে হয়েছে এই যে,—কারো কাছেই আমাদের ঠক্‌তে হয় না! যখনি কেউ আমাদের জাতীয়তার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে, তখনি আমরা সাজি বিশ্ব-প্রেমিক; আর, যখনি আমাদের সামাজিক রীতি নীতি নিয়ে কথা ওঠে—তখনি আমরা হই রক্ষণ-শীল! বাতাস পেলে আমরা পাল তুলি, আবার দরকার হ'লে গুণেও নামি, কিন্তু নৌকা আর আমাদের এগোয় না। কারণ, বাঁধনটার পরে আমাদের অসাধারণ মায়া। সেটা কাট্‌তে আমাদের বড়ই বাজে।

নতুন-কিছুর 'পরে আমরা বিষম চটা ; কারণ তা' আমাদের এই বাঁধনটাতে আচম্‌কা এসে টান মারে। খাম্‌খা এসে' ছুরি চালায়। আমার কিন্তু মনে হয়, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় নতুনের সব চেয়ে বড় উপযোগীতাই হচ্ছে ঐখানে! হ'তে পারে—নতুন আমাদের কাছে যে আব্দার করে, সেটা অন্যায় ; তার পরিপূরণে আমরা অশক্ত ; কিন্তু তবু যে, তা' আমাদের ন্যায়-অন্যায় বোধটাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলে, আমাদের শক্তিটাকে ঝাঁকি দিয়ে খাড়া কর্‌বার চেষ্টা করে সেটাও বড় কম লাভ নয়। এবং কেবলমাত্র এইজন্যেই তার প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা আমাদের পোষণ করা উচিত

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

পৌষ। ১৩২৩

দাদার ডায়েরী।

——:*:——

২রা জ্যৈষ্ঠ—তাই ত' এত তাড়াতাড়ি যে কাল-বৈশাখী কেটে যাবে স্বপ্নেও ভাবিনি; সন্ধ্যে না হতে হতেই দখিণে-হাওয়া দিলখুলে বয়ে যাচ্ছে। বন্ধুবর গান ধরলেন "বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে"। পূরবী সুরটা হয়েছিল বাঁশীর জন্যে—চেরা গলায় তার চিকারা ছাড়লে ঔদাসিন্যের ঠিক্‌ উল্টো ভাবটা মনের ভিতর এনে দেয়। তাই বিভোর হওয়া দূরে থাকুক্‌ আমি বিরক্ত হয়ে গান ধরলুম "মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর"। বন্ধু চটে বল্লেন "তর্ক করব"

"বেশ কোন আপত্তি নেই, ঘরেবাইরে বই খানা কেমন লাগ্‌ল সত্যি কথা বলত ভাই"

"না, পূরো সত্যি কথা বলা হবে না, তা হলে তর্ক হবেই না।"

"তর্ক নাই বা হলো এমন দিনে মিছে কথা বলো না"।

"তা হলে বলি বেশ লেগেছে, তবে রবি বাবুর লেখাটা উচিত হয় নি"

"তা হলে দেখছি তোমার অনুচিত কাজগুলোই ভাল লাগে, যেমন রুগীর আচারে ঝোঁক্‌"

"ঠিক্‌ সেই জন্যেই আমার চলবার অধিকার আছে; সংসারে চলতে গেলে যা ভাল লাগে তা করলে চলবে না, কেননা অনেক সময় মন্দটাই করতে ইচ্ছে হয়"

"তোমার মতে প্রতীকারটা কি?"

"এই মাত্র—তোমার যা ইচ্ছে হয় তাই কর্ত্তে পার তবে দেখ যেন তাতে অন্যের ঐ রকম সহজ ইচ্ছানুযায়ী কাজের কোন ব্যাঘাত না ঘটে।"

"অর্থাৎ তুমি বলছ যাতে অন্যের অপকার না হয়"

"আমি ঐ কথাটাই একটু ঘুরিয়ে বলতে চাই যাতে অন্যের উপকার হয়"

"দেখ, ভাই তোমার কথাটা Kant-এর Categorical imperative-এর মত ঠেক্‌ছে"

"রবি বাবুর বইখানি সম্বন্ধে আমার আরও দুটি কথা আছে—প্রথমতঃ এটি আমাদের সমাজচিত্র নয়—দ্বিতীয়তঃ এতে চরিত্রের বিশ্লেষণ অতি চমৎকার হলেও, তার কোন অভিব্যক্তি নেই। আজ কালের সাহিত্য বড্ড aristocratic ব্যাপার হয়ে উঠেছে। সেটা ভাল লক্ষণ নয় কেননা সেই সাহিত্যই সত্যিকারের সাহিত্য যেটা দেশের বুকের উপর গড়ে ওঠে। এই দেখনা Bernard Shaw ইংরেজী সামাজিক সমস্যা নিয়ে নাটক লিখ্‌লেন—আর সেই সমস্যাগুলো সর্ব্বসাধারণের মনে বড় গোল বাধিয়ে দিলে বলেই না, তিনি সাহিত্যের আসরে এত খাতির পাচ্ছেন। কিন্তু রবি বাবু যে ঘরে বাইরে লিখলেন কি প্রমথ বাবু যে 'চারইয়ারী কথা' লিখ্‌লেন কই তাঁরা ত আমাদের সমাজচিত্র দেখালেন না ;—আর যা দেখালেন তা অন্ততঃ Park Street-এর এধারকার পাড়ার সমাজ নয়—তা হলে কি করে তাঁদের লেখার কদর করি"।

"এদেশে কেউ বার্ণার্ড শ'র মত নাটক লিখ্‌লে তিনি যে ভেড়ার গোয়ালে আগুন দিতেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু তার জন্য

সকলে যে তাঁকে ধন্য ধন্য করত সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।"

"তারপর ঘরে বাইরেতে চরিত্রের কোন অভিব্যক্তি নেই, প্রত্যেকেই এক একটা type—গোরার পরেশবাবু যে শেষ কালে মাষ্টারি করবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি—তাঁর ত বেশ পয়সা কড়ি ছিল, ললিতা বিয়ে হওয়ার পর নিজের নাম মক্ষিরাণী রাখলেন কেন? যখনই শুনেছি গোরচাঁদ Irishman-এর ছেলে তখনই বুঝেছি লোকটা বিষম গোলমাল বাধাবে। নিখিলেশ জেনে শুনেও গোরাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিলে কেন। আর সন্দীপও ত বিনয়ের মাকে মা বলত—তার ভাজকে কেনই বা সে Compromised করলে?"

"হেঁয়ালী রাখ—তুমি কি বলতে চাও সব এক type গোরা আর সন্দীপ, ললিতা মক্ষি এক"?

"তুমি ত খুব ধাঁ ধাঁ করে বুঝে ফেল্ল তবে এত ফেল কর কেন"

"ঐ বেশী ও শীগ্‌গির বোঝার জন্যে। তোমার কথাই যদি ঠিক হয় অর্থাৎ গোরা প্রভৃতি যদি নূতন অবস্থায় পড়ে সন্দীপ ইত্যাদি হয়ে থাকে তাহলে ত তাদের অভিব্যক্তিই হয়েছে।"

"যাক্‌গে ও সব কথা রেখে দেও, আমি বই খানার ভিতর এই বর্ত্তমান যুদ্ধের কারণের একটা সন্ধান পেয়েছি—আর বইয়ের ভাষার কি জোর। কি সৌন্দর্য্য!—বল্‌তে পার যে রবি বাবুর ভাষাটা যদি মূর্ত্তিমতি হয়ে দাঁড়াত তা হলে অর্জ্জুন মহারাজ চিত্রাঙ্গদার দিকে ফিরেও চাইতেন না"—

"এই দুটো কারণে ভাল লেগেছে?

"হাঁ।"

* * * * *

বন্ধুর কথাগুলো একেবারে ফেলবার মত নয়। একে তিনি বিদ্বান তারপর না ভেবে তিনি কোন মতামত প্রকাশ করেন্ না। কিন্তু আমার মনে হয় যে তাঁর সমালোচনাবুদ্ধির গায়ে গোটা দুই বিলেতী পরগাছা জন্মেছে যেমন—Categorical imperative, the greatest good of the greatest number, আর সেই পরগাছার বাড়ের দরুণ মূলের ধর্ম্মটা বেশ একটু বিগড়ে গেছে। অবিশ্যি বন্ধু তাঁর নিজের উপর ঐ সব বিদেশী ভাবের প্রভাব যে আছে সে কথা মানতে বড় সঙ্কোচ বোধ করেন আর সেই জন্যেই বলেন "দেখ আমরা ভারতবাসী আমাদের ধর্ম্মের দিক্‌টা বড় তেজাল সেই জন্যে Art-এর সৌন্দর্য্য-মাপি তার আধ্যাত্মিক উপকারিতা দিয়ে"। রোমান Catholic-রা গির্জ্জেতে বাতি দেয় মোক্ষলাভের আশায়, এখন যদি কোন Catholic জ্যোৎস্না থেকে কটা গির্জ্জের বাতি তৈরী হয়, সেই হিসেব থেকে চাঁদনী রাতের সৌন্দর্য্য মাপে—তা হলে তাকে কি সৌন্দর্য্যের উপাসক বলব? তাকে জোর ধার্ম্মিক বল্‌তে পারি, religious বলতে পারি কিন্তু Spiritual বলতে পারিনে, কর্ম্মী বলতে পারি কিন্তু কবি বলতে পারি নে, কেননা আদৎ ধর্ম্মে আছে কর্ম্মের সঙ্গে কবিত্বের ময়ান। সে ময়ানটুকু আমাদের দেশের ধর্ম্মে আছে—অনেক পরিমাণেই আছে—খ্রীষ্ট ধর্ম্মেও আছে কিন্তু আমরা হালে যেটাকে ধর্ম্ম বলে বড়াই করি (অর্থাৎ হিন্দু-ধর্ম্ম আর খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের খিচুড়ী) তাতে মোটেই নেই। এই দুটোর মিশ্রণে আমাদের মনে যা বিশেষ করে ফুটে উঠেছে তার নাম আধ্যাত্মিকতা নয় শুচীবাতিক, ইংরাজীতে যাকে বলে puritanism। Puritan হয়ে আমাদের অন্য কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হোক্ আর নাই হোক্ আমাদের বুদ্ধির তাক্ষ্ণতা খুব কমে আসছে। এটা আমার কাছে বড় আশ্চর্য্য

ঠেকে যে, যে দেশে ব্রহ্ম কি বস্তু তাই নিয়ে লাখ লাখ বই লেখা হয়েছিল সেই দেশের লোকেরাই শুদ্ধ মঙ্গল কি শুদ্ধ সত্য কি শুদ্ধ সৌন্দর্য্যের অনুভূতি করতে এত অক্ষম। মুখে যখন সত্য শিব সুন্দর বলি তখন ভাবি আংশিক সত্য সামাজিক মঙ্গল আর আট পৌরে ঘরোয়া সৌন্দর্য্য। শুধু তাই নয় যখন কোন জিনিস সত্য কি শিব কি সুন্দর বিচার করতে বসি তখন সত্যকে মাপি সামাজিক মঙ্গল দিয়ে, মঙ্গলকে মাপি খণ্ড সত্য দিয়ে, আর সুন্দর কে 'অতি বড় সুন্দরী না পায় বর' ভেবেই বিদায় দিই। এটা কি বুদ্ধি হ্রাসের চিহ্ন নয়! সত্যকে শুদ্ধ সত্যেরই কষ্টি পাথরে ঘসতে হবে, শিবকেও তাই সুন্দরকেও তাই। আমার বন্ধু যখন বল্লেন রবি বাবুর বই খানা লেখা উচিত হয়নি, তখন Kant আর Mill-এর বড় বড় কথাগুলো তাঁর মাথায় ঘা দিচ্ছিল তার ফলে এই দাঁড়াল যে তিনি Art অর্থাৎ সুন্দরকে বিচার করলেন সামাজিক আচারের কষ্টিপাথর দিয়ে। শুধু যদি এইখানে গলদ হত তা হলেও বাঁচতুম। Mill বলে গেলেন তাঁর কথা রাজ্যতন্ত্র নিয়ে আমরা সেই কথাটা কি হিসেবে সাহিত্যের সমালোচনায় খাটাই? Kant বলে গেলেন সমাজ-ধর্ম্ম নিয়ে, তাঁর কথাটা যদিই সত্য আর খাঁটি বলে মেনে নিই, তাহলেও কি বলে সেটাকে কলাবিদ্যার গায়িত্রী বলে জপ করি? বিশেষতঃ স্বয়ং Kant-ই যখন সুন্দরের বিচার করতে বসে তাঁর পূর্ব্বরায় একেবারে উল্টে দিলেন। Kant-এর Critique of Æsthetic Judgment যদি কলেজে পড়ানো হত তাহলে সুন্দর বেচারাও শিক্ষিত সমাজে দাঁড়াবার একটু জায়গা পেত। কিন্তু সে বই অবশ্য পড়ানো হবে না; কেননা তা-এত ছোট যে তার আর নোট দেওয়া চলে না।

যাই হোক্ বন্ধুর যুক্তিটি হচ্ছে এই যে, শিল্পীকে সমাজের Categorical imperative-এর গণ্ডীর ভিতর ঘরকন্না করতে হবে—যদি এক পা বেরোন তা হলে রাবণ রাজা ঝুলির ভেতর পুরে নিয়ে যাবেন। আমার উত্তর এই যে আদৎ শিল্পীকে সব সময়ে কুণো হয়ে থাক্তে হয় না। কালিদাস লিখলেন মেঘদূত, কুমার-সম্ভব, জয়দেব লিখলেন পদাবলী, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এঁরাও কবিতা লিখে গেছেন, আর সে কবিতাগুলিও যে অতি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় এ কথাটাও আজকাল সর্ব্ববাদীসম্মত। এঁদের লেখার ভিতর আধ্যাত্মিকতা আছে যথেষ্ট পরিমাণে,—এ কথা শুনেছি। কিন্তু আমি বন্ধুবরকে জিজ্ঞেস করি যে তাঁর কাছে জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন, প্রকৃতি পুরুষের বিবাহটা বেশী মনোহারী না ঐ সব কবিদের সৌন্দর্য্য অনুভূতিটা আমি নিশ্চয় বলতে পারি যে তিনি বলবেন না তাঁদের পূজাই ভাল লাগে, আরতিই মিঠে ঠেকে, ধূপ ধুনোই মাতিয়ে তোলে অথচ এ কথাটা সকলকেই মান্তে হবে যে ঐ সব কবিরা যেমন Spiritual হয়েছেন অম্নি সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মঙ্গলকে উপেক্ষাই করেছেন। তাঁদের সহজিয়া ভাবটার তারিফ কর্তে হলে পৃথিবীর আর কোন রস-সাহিত্যকে নিন্দে করা চলে না। আর একালে কাব্যের ভিতর অন্য কোন দোষ থাক্লেও যে, সে কালের কবিতার মত অত কোনও খোলাখুলি কথাবার্ত্তা নেই এ কথা সকলকেই স্বীকার করতে হবে। আমার বিশ্বাস একালের উঁচুদরের সাহিত্য সকলের কাছে যে তেমন মুখোরোচক হয় না, তার কারণ তাতে রস ছাড়া আরও কিছু থাকে—আর তা বেশী মাত্রাতেই থাকে—যাকে Mathew Arnold বলেন, Criticism of life.

* * * * *

আজ আর পারি না, এমন পাগলকরা হাওয়া বচ্ছে, লিখতে ভাল লাগ্‌ছে না। কতো পুরাণো কথা মনে পড়্‌ছে, এধারে বাতি ফুরিয়ে এল, লেখাটা পরের কথা, প্রাণ খোলাটা আগের। সময় যদি পাই আর লেখায় যদি আবার মন বসে তাহলে বন্ধুর আর আর কথার উত্তর দেব।

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

স্বপ্ন ও জাগরণ।

বড় ঘরের ছেলে, আর বয়স তখন বিশ কি একুশ, কল্‌কাতাতে জন্ম, কল্‌কাতারই বাসিন্দা; বাইরের খবর বড় কিছু রাখতুম না। জান্‌তুম এক খবরের কাগজ,—তাতে ত শুধু পরের কান্না। তবে একবার অবশ্য দর্জ্জিলিং গেছলুম। তাই নাটোর যে পূর্ব্ব বাঙ্গলার ঢাকা বিভাগে, আর শিলিগুড়ি রাজসাহী জেলাতে—এ কথা আমার জানা ছিল।

আমার এক খেয়াল ছিল,—বই পড়া। অবশ্য নভেল আর নাটক। আর তার বেশীর ভাগই বিলেতি। বাঙ্গালীর মেয়ে ছাই প্রণয়ের কি জানে? বাঙ্গলার মাটিতে রঙ বেরঙের নভেল নাটক গজাবেই বা কোত্থেকে?

সে দিন একখানা বই পড়ছিলুম, Ivan Turgenev-এর "A Sports man's Sketches" রুষিয়ার পল্লীজীবনের কি জীবন্ত কি চমৎকার বর্ণনা? সে বই পড়ে আমার অন্তরটা অজানা এক রূপ-রাজ্যের কল্পনায় ভরে উঠ্‌ল। পল্লীজীবনের কত নতুন নতুন ছবি আমার মনের উপর আপনা হতেই গড়ে উঠ্‌ল।

প্রাণটা বড় উড়ু উড়ু করতে লাগ্‌ল। কল্‌কাতার একঘেয়ে জীবন যেন অসহ্য মনে হ'ল। তাই স্থির করলুম স্বদেশের পাড়াগাঁয়ে গিয়ে একবার স্বভাবের সৌন্দর্য্য উপভোগ করে আস্‌ব। বলা বাহুল্য, আমার মত অকবি লোকের হৃদয়-মন, শুধু গাছপালা বা

ফলফুলের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হবার সম্ভাবনা অতি অল্প। আমি অতিমাত্রায় লালায়িত হলুম পল্লীবালাদের স্বভাবসৌন্দর্য্যটুকুর দর্শনের জন্য। কি একটা বইতে পড়েছিলুম এক জাতের রমণী আছেন, তাঁরা নাকি পদ্ম-গন্ধী। কিন্তু কল্‌কাতা সহরে সেই জাতির স্ত্রীলোক একেবারেই দুর্লভ। টবের ফুলেরও ত গন্ধ নেই। কল্‌কাতায় যাঁদের পরিচয় পাই, তাঁরা বিলেতি এসেন্সের যোগে তীব্র-গন্ধী। মানুষের হাতে গড়া কাগজের ফুলের মত বাহারটুকুন তাঁদের ষোল আনাই আছে। গাছের ফুলের কমনীয়তাও তাঁদের নেই, সৌরভ ত দূরের কথা।

পল্লীদর্শনের লোভ আমাকে বড়ই বিব্রত করে তুল্‌লে, আমি একেবারে অধীর হয়ে পড়লুম। হরিহরপুরে আমাদের জমিদারীর এক কাছারী ছিল। স্থির করলুম আমার বন্ধু হরেন আর দুইজন শিকারী সঙ্গে করে সেখানেই শিকার কর্ত্তে যাব যেমন Turgenev গিয়েছিলেন। তখনি নায়েবের কাছে টেলিগ্রাফ গেল। পরদিন রাত বারোটার গাড়িতে আমরা রওনা হলুম। চড়লুম ফার্ষ্ট ক্লাসে। আরামের কোন ব্যাঘাত হ'ল না। ক্রমে চোখ বুজে এল। ঠিক নিদ্রা নয়;—নিদ্রার কেমন একটু আবেশে আমি এলিয়ে পড়লুম। আমার মনের উপর কত কল্পনা এসে খেলে যেতে লাগল। দেখ্‌লুম কি সুন্দর এক দেশ। সে দেশ যেন চির-বসন্তের। সবুজ পাতায় সবুজ ঘাসে সব মোড়া, সব রঙানো। কোকিলের কুজনে, পাপিয়ার তানে মুখরিত। সেখানে রবির প্রখর তাপ ধরণীর অন্তর দগ্ধ করে না। সূর্য্যের রশ্মি যেন মধুর হাসি হেসে একেবারে আটখানা হয়ে প্রকৃতির বুকের উপর লুটিয়ে পড়ে।

আর মানুষগুলো ত সেখানকার সব সত্য যুগের। হিংসা নেই, দ্বেষ নেই, কপটতা নেই, জাল নেই, জুয়োচুরী নেই। মানুষের অন্তর যেন শ্বেত পাথরের মতই নিরাবিল ও ধপ্‌ধপে, তার গায়ে একটি আঁচড়ও লাগেনি, এক ফোঁটা কালিও পড়ে নি। বাঃ কি অপূর্ব্ব সে দেশ! যেখানে শান্তি আছে, স্বাস্থ্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে।

তারপর আরো বলছি। কল্পনার চোখে দেখলুম সমস্ত দিন শিকার করে আমরা যেন হয়রাণ হয়ে এসে বসেছি;—নদীর ধারে, গাছের তলায়, ঘাসের উপরে। সে ঘাস কেমন শ্যামল, কত মৃদুল, কি কোমল! আর তখন দিনও নেই, রাতও আসেনি। সূর্য্যও ডুবেছে, চাঁদও ওটেনি। প্রকৃতি কি শান্ত কি সৌম্য কি সুন্দর কি মধুর!

তার উপর আবার ঝির-ঝির করে বাতাস বচ্ছে। সে বাতাস ফল ফুলের সৌরভ আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। গাছের সবুজ পাতা থর-থর করে কাঁপছে। অতি মৃদু অস্ফুট কুলু-কুলু রবে ছোট্ট নদীটি প্রেমের অভিসারে ত্রস্তচরণে চলেছে। একটা হংস আর একটি হংসী তরঙ্গের অঙ্গে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কত কি প্রেমের অভিনয় করছে। কি জানি কেন এক একবার পৃথক হয়ে পড়ছে। আবার বড়ই আবেগে ছুটে এসে দুটো এক হচ্ছে। বিরহের পর মিলন, মিলনের পর বিরহ পালায় পালায় হয়ে যাচ্ছে। পাড়ের একটি গাছের ডালে সাত রঙ্গের ছোট্ট একটি পাখী বড়ই মুখ ভার করে বসে রয়েছে,—যেন অভিমানভরে। আর তার জুড়িটি এ ডাল ও ডাল করছে। এক একবার এসে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে মানভঞ্জনের পালার অভিনয় করছে। আমি অবাক হয়ে দেখছি আর ভাবছি এ

দেশের মশা মাছিগুলোও হয়ত প্রেমের গুরুগিরি করতে জানে। এমন সময় অনতিদূরের এক ধানের ক্ষেত থেকে ফুড়ুৎ করে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে আকাশের গায়ে একটি অর্দ্ধচন্দ্র গড়লে। আবার পর-ক্ষণেই জোড়ে জোড়ে এদিক ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলুম। এর পর যা দেখলুম, তাতে বড়ই অভিভূত হয়ে পড়লুম। দেখি একটি বালিকা অলক্ষ্যে এসে বড়ই কৌতূহলী হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। যেমনি চেয়েছি, অমনি ছুটে দৌড়।

বড় সুন্দরী সে বালিকা। যেন হীরামাণিকের টুকরো। মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার হৃদয়-মন যথাসর্ব্বস্ব সেই নাবালিকাকে সঁপে দিলুম। বলা বাহুল্য আমি Love-য়ে পড়ে গেলুম। অবশ্য এর আগেও দু-একটি সহুরে মেয়ের সঙ্গে ভালোবাসায় পড়েছিলুম। কিন্তু সে সব পূর্ব্ব প্রীতির স্মৃতি সেই মুহূর্ত্তে হৃদয় থেকে মুছে গেল। আমার সমস্ত অন্তর সেই পল্লীবালার রূপেই ভরে রইল। সারা রাত সেই বন-ফুলকে চোখে ধরে রাখলুম। একটুও ঘুম হল না—শুধু স্বপ্ন। তার পর মনে হল যে ভোরে উঠে এদিক ওদিক পায়চারি করছি। দেখি আমার সেই কল্পনার ধন একটি শিউলী গাছের তলায়।

থেকে থেকে ভোরবেলার দম্‌কা বাতাস বচ্ছে। শিউলীফুল ঝর্‌ছে। বালিকার মিশ্‌মিশে কালো কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলো উড়ে উড়ে চোখে মুখে এসে পড়্‌ছে। বালিকা আঁচল ভরে ফুল কুড়োচ্ছে। কি চোখজুড়ানো কি মনভোলানো দৃশ্য!

আমি ধীরে ধীরে গিয়ে বালিকার কাছে দাঁড়ালুম। পকেট থেকে একটি সোণার আংটি বার করে বালিকার হাতে দিতে গেলুম। বালিকা অমনি সলজ্জ ভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালে।

আমি তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার রক্তকমলের মত হাত দুটি চুম্বন করে বল্‌তে যাচ্ছিলুম, "আমি যে………"

এমন সময় আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। সেনগাঁ ষ্টেশনে এসে গাড়ি লাগ্‌ল; আমরা নেমে পড়লুম।

হরিহরপুর সেখান থেকে পনর ষোল মাইল দূর। পাল্কী বেহারা এসেছিল। ভোর হতে না হতেই আমরা রওনা হলুম।

বড় ক্ষুব্ধ-অন্তরে আমাকে জানাতে হচ্ছে যে আমি সংবর্দ্ধিত হলুম কোকিলের কূজন বা পাপিয়ার তানে নয়—এক ঝাঁক কাকের উৎকট কলরবে। এক মাঠের মধ্যে একটা আমগাছ, মাথাভাঙ্গা, আধ-মরা। পাতাগুলো ত সব ঝরেই পড়েছে,—হরিত কি পীত বলবার যো নেই। সেই গাছে বসেছিল এক ঝাঁক কাক তারাই আমার সংবর্দ্ধনা করল। আমি অবশ্য এ অভিভাষণে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হলুম। কিন্তু একেবারে নিরাশ হলুম না। মনে করলুম আমাকে অকবি জেনেই হয়ত প্রকৃতিদেবী এই গদ্যের ব্যবস্থা করেছেন।

এরপর দেখলুম সারি সারি লোক চলেছে; ছাতা উড়িয়ে, চিড়ে গুড় চাদরে বেঁধে। যিনি মোড়ল, তিনি লম্বা লম্বা বক্তৃতা কর্‌ছেন। একটা মিথ্যে স্বাক্ষীর rehearsal চল্‌ছে। দলের একটি লোক বল্লে, "আজগর কাকা! ও বেটা ত একেবারে ফতুর হয়েছে। ছেলে-পিলে দুবেলা খেতে পাচ্ছে না। তার উপর আমার এই মিথ্যে মোকর্দ্দমায় জেল খাটাব। ধর্ম্মে কি সইবে?"

মোড়ল মশায় অমনি আগুন হয়ে উঠ্‌লেন। বলতে লাগলেন,—"তা বাপু তোমার যা ইচ্ছে কর। আমার কি এত মাথার ব্যথা? তবে বলছি ওবেটা সংসারে থাক্‌তে তোমার আপদ যাবে না। কোন

দিন ঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারবে। যখন পা দিয়েছে, তখন চরম করেই ছাড়া উচিত। বিষয়-কর্ম্মে আবার ধর্ম্ম অধর্ম্ম কি আছে ?”

আমি ত অবাক। এই পাড়াগাঁয়ে এমন কূট রাজনীতি! পল্লী-গ্রামে এহেন চাণক্য! দেশের মঙ্গল বটে।

তারপর যা যা দেখলুম, তাতে আমার স্বপ্নটা ক্রমে ভাঙ্‌তে লাগ্‌ল। দেখলুম বাঁশঝাড়ে ঘেরা একটি পুকুরঘাট থেকে একটি মেয়ে কলসি কাঁকে করে আস্‌ছে। প্রাণটা ত নেচে উঠ্‌ল। এত-ক্ষণে পল্লীবালা। কিন্তু কাছে গিয়ে যখন নমুনাটি বেশ করে চেয়ে দেখলুম, তখন ভক্তি একেবারে চটে গেল। বয়সটা অবশ্য ‘লাভে’ পড়বার মতই,—চোদ্দ কি পনের। কিন্তু আর আর যা, তা বড়ই নৈরাশ্যজনক। মাথায় একডালি চুল। সাত জন্মেও যেন তেল পড়েনি; সাবান পমেটম ত নয়ই। চুলগুলোয় সব জটা বেঁধে গেছে। গায়ের খাঁচ খাঁচে জমাট ময়লা। চিমটি কাট্‌তে মাটি উঠে এসে। আর বসনের সুবাসে দূর থেকে নাকে কাপড় দিয়ে ভূত পালায়।

এরপর দেখি একটি মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন বসে। পচা মড়ার দুর্গন্ধে অন্নপ্রাসনের ভাত পর্য্যন্ত উঠে যাবার যো। কাছেই ছেলেরা হাল বচ্ছে। ভ্রূক্ষেপও নেই। আমার যেন মনে হল এটা শকুনেরই রাজ্য। আর মানুষগুলো এ রাজ্যের নির্জ্জীব অধিবাসীমাত্র।

হাঁ, আর বড়ই মরখুটে একটা গরু। ঠেলা দিতে পড়ে মরে। ঘাড়ে থক্‌ থক্‌ করছে ঘা, ভিন্‌ ভিন্‌ করে মাছি এসে পড়্‌ছে, তার উপর জোয়াল চাপিয়েছে। কিছুতেই তার ভার আর বইতে পারছে

না—ঘাড় নাড়ছে। মাথা এদিক ওদিক করছে। তাই কি আর নিষ্কৃতি আছে। চাষী এমনি ঠেঙ্গাচ্ছে যে পিঠে লম্বা লম্বা লাল দাগ পড়ে যাচ্ছে। প্রমাণ পেলুম মানুষের মত গরুর শরীরও রক্ত মাংসের।

পাশে জমির একটি আলের উপর একটি ছোক্‌রা বসে আছে। বয়সে বালক হলেও, জরা সুড়ঙ্গ কেটে তার ভিতরে ঢুকেছে। মুখে তার মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। থাকবার মধ্যে ছিল হাড় ক খানি। আর "টেপা" মাছের মত তার পেটটি। মাথার চুল এত বিরল যে দু'একটি করে গোণা যেতে পারে। অত যে গা-পোড়ানো রোদ, তবুও শীতে কাঁপ্‌ছে। পাড়াগাঁয়ের স্বাস্থ্যের লক্ষণ।

তারপর,—সেও দেখবার মত একটা জিনিস। কোমরে কাপড় জড়িয়ে, মা বসুন্ধরার বুকে লাথি মেরে, পবন দেবের সঙ্গে কি লড়াই লড়ছে। লড়াইটে হচ্ছে কথার, আর সে কথা কি কটু কি তীব্র আর তার কি জোর কি তোড়। বীরত্ব বটে! মেয়েমানুষ যে শক্তি-স্বরূপিনী, এতদিন আমি মানতুম না। আজ তার চাক্ষুশ প্রমাণ পেলুম।

আর একটি ঘটনা—উল্লেখ করবার মত। সারাবাড়ি নিয়ে একখানি ঘর, বেড়া ভেঙ্গে পড়ছে, চালের খড় খসে পড়ছে; সেই ঘর থেকে আবার বেরিয়ে এলেন, না-চাষা না-বাবু এক অদ্ভুত ধরণের জীব। পায়ে জুতো, পরনে ময়লা ঘুট্‌ঘুটে কাপড়, গায়ে ধপ্‌ধপে জামা, গলায় গরদের চাদর। মুখে আবার "red lamp" সিগারেট। জীবটিত বেরিয়ে পড়লেন। বুড়ি মা চেঁচিয়েই অস্থির। "আধ পয়সা রোজগার নেই, বাবুগিরি করে বেড়াবি, ঘরে একমুঠো চাল নেই। পিণ্ডের জোগাড়' কোত্থেকে হবে?

হাঁ, ভুলে যাচ্ছিলুম। নদীও একটি দেখলুম। পাণি-ফলের পাতায় ছেয়ে ফেলেছে,—পানায় ভরে উঠেছে। এক এক জায়গায় পানা-আবর্জ্জনা এদিক ওদিক সরিয়ে দিয়ে একটু জলের চেহারা বার করা হয়েছে। সে জলের কি রং! নাইলেই কাপড় রঙিয়ে ওঠে। তাই আবার, রোদে পুড়ে কতদূর থেকে পল্লী-বধূরা এসে কলসি কলসি নিয়ে যাচ্ছে। হয়ত ঝলকে ঝলকে জল পড়ে তাদের বুকের কাপড় ভিজে উঠছে। আমি কিন্তু আর ফিরে চাইলুম না। আর তখন-কার অবস্থাও আমার তেমন ছিল না। এমনি রোদের তাত্, মনে হচ্ছিল আমাকে যেন আগুনের ভিতর দিয়ে নিয়ে চলেছে। কোন রকমে ত বেলা এগারটার সময় কাছারীতে গিয়ে পৌঁছলুম। নেয়ে খেয়ে বিশ্রাম করতে গেলুম। ভোজনের আয়োজন অবশ্য যথেষ্টই ছিল। তবুও নায়েবের প্রাণের ভয় গেল না। বিকালে এসে জোড়-হস্তে নিবেদন কর্‌লে,—"পাড়া-গাঁ, কিছুই মেলে না। হুজুরের জন্য বিশেষ কিছু আয়োজন কর্‌তে পারিনি, ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এখানে চাকর মনিবের সম্বন্ধ। ভদ্রতা করে দুটো কথা বলা মোটেই দরকার মনে করলুম না। আরাম-কেদারায় লম্বা হয়ে শুয়ে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রইলুম। সহসা বিকট এক ক্রন্দন-ধ্বনি আমার কাণে এল। বুকটার মধ্যে ধড়াস্ করে উঠ্‌ল। নায়েবকে জিগ্‌গেস করলুম ব্যাপার কি? উত্তরে যা শুনলুম তাতে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। পাশেই বাগ্দী-পাড়া; একটি ছেলের কলেরা হয়েছিল, মারা গেল। আমার ভিতর একটা কাঁপুনি ধরল। এই ত তেপান্তরের মাঠ,—না আছে ডাক্তার, না আছে কবিরাজ। আর এখানে এই রোগ যার নাম শুনতেও পিলে

চমকে উঠে। সত্যি সত্যি গাটা যেন বমি বমি করতে লাগ্‌ল। নায়েবকে হুকুম করলুম; পাল্কীবেহারা তখনি হাজির হল। অমনি বাড়িমুখো রওনা হলুম। অনেক বক কাদাখোঁচার প্রাণ বেঁচে গেল। এখন পল্লীগ্রামের নাম শুন্‌লেই আমার চোখের সমুখে এসে উপস্থিত হয় সেই মরখুটে গরুটা, যে জোয়ালের ভার আর বইতে পারছে না,—অথচ মার খাচ্ছে। আর সেই শকুনের পাল।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

সজীব অতীত।

——ঃ*ঃ——

গত বৎসরের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় "ঐতিহাসিক" নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তাতে ইতিহাস সম্বন্ধে দু'চারটে অতি খাঁটি কথা ছিল। প্রবন্ধের শেষে তিনি আমাদের দেশে এমন ঐতিহাসিকদের চেয়েছিলেন যাঁরা কল্পনার দ্বারা "আমাদের অতীতকে জীবন্ত করে তুলিবেন"।

তাঁর এই কথাটাকে আমি আর একটু স্পষ্ট করে বলতে চাই। রায় মহাশয় ভাবুক এবং দরদী লোক। তিনি কোন কথার উপর বেশী করে জোর দেন না, পাছে তাঁর কথার পুষ্পমালা নিষ্পেষিত হয়ে যায়। তাতেই আমার মত একজন হাতুড়িপেটা নিরেট লোকের আসরে নামবার দরকার হয়েছে।

অতীতকে জীবন্ত করা আমাদের দেশে অবশ্য নিতান্ত দরকার হয়ে উঠেছে। আমাদের অতীত যেন একটা যাদুঘর, যেখানে আমরা পাথরে খোদা সব মূর্ত্তি সাজিয়ে রেখেছি। সেখানে সকলের সঙ্গেই আর সকলের সামঞ্জস্য রয়েছে—প্রত্যেকটি তার নিজের নিজের স্থানে সুন্দর সৌম্য মূর্ত্তিতে বিদ্যমান। কিন্তু জ্যান্ত জিনিস ত এমন করে সৌন্দর্য্যতে অটল অচল হয়ে বসে থাকে না। জীবনের মধ্যে কত অসুন্দর কত অসামঞ্জস্য কত কান্না কত বেদনা কত ভুলচুক কত ধুলো কাদা কত পাপ-পুণ্য রয়ে গেছে। আর এই সব আছে বলেই ত

জীবনটা সহনীয়। কেননা বিশ্বের যে পারে হাসিকান্না ভুলচুক সেই পারেই ত আমাদের সুখ শান্তি মায়া মমতা ঘৃণা ভালবাসা।

ভুল করি শাস্তি পাই, তাই বলেই ত জীবনটাতে এত আনন্দ এত স্ফূর্ত্তি। শান্ত শিব সুন্দরকে নিয়ে কে কবে ঘর করতে পেরেছে?

আমাদের অতীত যে আমাদের কাছে মৃত এ কথা আর প্রমাণ করতে হবে না। আমাদের বড় বড় এম, এ, বি, এ, রা ও মনে করেন যে আমাদের দেশে আগের কালে ছিলেন শুধু মুণিঋষিরা —যাঁরা বলে গেছেন সব অকাট্য কথা। যাঁরা জানতেন না বুঝতেন না এমন কিছু ব্রহ্মাণ্ডে ছিল না, নেই এবং থাক্‌তে পারে না। তাঁদের প্রদর্শিত পথ ছাড়া জীবনের আর কোনও নতুন পথ নেই—আর যদি থাকে ত সে ভুল পথ।

এই মত সম্বন্ধে বক্তব্য হচ্চে এই যে এঁরা যেমন করে মুণিঋষি-দের দেহ থেকে প্রাণটুকু বার করে নিয়ে তাঁদের সমাধিস্থ করে দেন, তেমন করে সৎকার করা হিন্দুআচারসঙ্গত নয়। এ যেন ইজিপ্সি-য়ানদের মত, মরা লোকদের "মামি" করে রাখা।

আগের কালের লোকেরাও এক কালে ছোট ছোট খোকা খুকি ছিলেন—গুরু মশায়ের কথা না শুনে কানমলা খেয়েছিলেন—তার পর বড় হয়ে ছিলেন—তারপর নানা রকম দেখে-শুনে বলে-কয়ে হেঁসে-কেঁদে পাপ-পুণ্যের ভিতর দিয়ে শেষটা মৃত্যুর দুয়োরে এসে পৌঁছেছিলেন। এ সব কথা ভুলে গেলে চলবে কেন? মনের মধ্যে এ সব ধারণা করা অবিশ্যি সহজ নয়। দাদাভাই নৌরজি কিম্বা রাসবিহারী ঘোষ যে একদিন ছোট্ট খোকা ছিলেন, তা'ই ভাবতে

কঠিন লাগে—সুতরাং ব্যাসদেব কিম্বা পরাশরের কৈশোর কিম্বা যৌবন কল্পনা আয়াসসাধ্য ত হবেই।

কিন্তু মানুষের বুড়ো বয়েসটাকেই মনে করে রাখতে হবে—আর তার শৈশব যৌবন ইত্যাদি মনে রাখ্‌তে হবে না এই বা কি কথা? মরা লোকদের কেবল মরাটাই কি বড় আর তাদের জীবনের আর সব ব্যাপারই তুচ্ছ? নিশ্চয়ই নয়। যাদের ভালবাসি তাদের সব কথা জানতে ইচ্ছে হয়। যখন আমরা তাদের জানতুম না, তখন তারা কেমন ছিল—তাদের তখনকার প্রত্যেক ছোট ছোট কথা প্রত্যেক ছোট ছোট কাজ প্রত্যেক সুখ প্রত্যেক দুঃখের খবর নিতে ইচ্ছে করে। আমাদের প্রিয়জনকে খালি প্রিয় বলে জেনে তৃপ্তি হয় না—সে যে জীবিত এটা কি ভুলতে পারি? তারপর যখন আমরা প্রিয়জনকে মৃত্যুর মধ্যে হারাই—তখন কি সুধু তার নাম করে আমরা সুখী হই—তাদের প্রত্যেক কথাটি প্রত্যেক কাজটি আমরা একটি একটি করে মনে আনি। "মরা লোক সম্বন্ধে শুধু ভালই বল" এ কথা যে বলেছিল সে কখনও মরা লোককে সত্যি সত্যি ভালবাসেনি। ভালমন্দ জানিনে, আমার প্রিয়জনের কোন খুঁটি-নাটিই আমি ফেলতে পারব না।

তাইতেই ত বলি, আমাদের অতীতকে যাঁরা একটা অচল স্থির সৌন্দর্য্য বা শিবত্ব বলে কল্পনা করেন তাঁরা অতীতকে একেবারে মৃত রূপে দেখেন। জীবনের স্ফূর্ত্তিতে অতীত যে দিন সজীব ছিল—পাপ-পুণ্য—ন্যায় অন্যায়—দোষ গুণ—এ সব দিয়ে সে দিনও আমাদের দেশ এখনকার মতই গড়া ছিল—এ কথা যাঁরা ভোলেন তাঁরা অতীতকে ভক্তি করতে পারেন কিন্তু ভালবাসেন না। "সে দেশ-

টাও যে এই মাটির সেটা সোণা রূপার নয়—সেথা আকাশেতে সুর্য্যি উঠ্‌ত মেঘে বিষ্টি হ'ত"। তখনকার লোকরাও আমাদেরই মত ছুনিয়াকে ভালবাসত—মানুষকেও ভালবাসত—

যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে
দুখীরা কেঁদেছে সুখীরা হেসেছে
প্রেমিক যে জন ভাল সে বেসেছে
আজি আমাদেরি মত।

এই যে অতীতকে জীবন্ত করে দেখা অতীতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা এইটেই হচ্ছে ঐতিহাসিকের কাজ। কিরণশঙ্কর রায় মহাশয় সেই ঐতিহাসিককে চেয়েছেন—যিনি অতীতকে জীবন্ত করে দেখ্‌তে এবং দেখাতে পারেন।

অতীতকে মৃত ভাবে দেখে দেখে আমাদের প্রাণ ফুটতে পারছে না। মৃত্যুর চাপে আমরা আধমরা হয়ে পড়েছি। কোথায় অতীত আমাদের আলো দেখিয়ে উৎসাহ দিয়ে জীবনের পথে অগ্রসর করবে, না আমাদের অতীত হয়েছে এক ভূতের ব্যাপার, সে আলেয়ার আলো দেখিয়ে আমাদের শ্মশানের দিকে নিয়ে চলেছে। মৃত্যু, জীবনের আদর্শ হলে সে কি ভয়াবহ ব্যাপার হয়। আর সেই ভয়াবহ ব্যাপার হয়েছে আমাদের। জীবন হচ্ছে সচল—অস্থির। আমরা আদর্শ করেছি অচল স্থির এক কাল্পনিক অতীতকে।

বাধা বিপত্তি দুঃখ কষ্ট সয়ে মানুষের মন নৃত্য কর্‌তে কর্‌তে যুগ থেকে যুগান্তরে চলেছে এই হচ্ছে ইতিহাসের গোড়ার কথা—আর শেষের কথা। মনের মধ্যে এই ধ্রুব সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করা আমাদের দরকার। নৈলে আমাদের সুখ নেই স্বস্তি নেই। আমাদের এখন

মন খুলে হাসবার যো নেই। শৈশবে আমরা খেলিনে। যৌবনে আমরা মাতোয়ারা হই নে—কোনও কালেই আমরা হাসতে সাহস করিনে। এত সৌন্দর্য্য, এত আনন্দের মাঝখানে কি আমরাই কেবল মৃত্যুর নকল করব ?

না, না, চাই আমরা সেই ঐতিহাসিককে যিনি জীবনের আনন্দকে ঘৃণা করতে আমাদের ভুলিয়ে দেবেন। যিনি অতীতকে সজীব করে, আনন্দকে তার কারাগার থেকে মুক্ত করবেন। যতক্ষণ আমরা মৃত্যুর শান্তির জন্য লালায়িত না হই ততক্ষণই ত বেঁচে সুখ।

শ্রীবীরেন্দ্র কুমার বসু।

বাঙ্গলার ইতিহাস।

———ঃ*ঃ———

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে "বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।" আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকাটা কিছু মন্দ নয়, বিশেষতঃ একালে। কেননা পুরাকাল সম্বন্ধে যৎসামান্য জ্ঞান নিয়ে যখন আমরা অপরিমিত আত্মগরিমায় স্ফীত হয়ে উঠেছি তখন বেশী জান্‌লে কি যে করতুম তা ভেবে ঠিক করা শক্ত। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ আমাদের আর আত্মবিস্মৃত থাক্‌তে দেবেন না বলে উঠে পড়ে লেগেছেন; এই দু'চার বৎসরের মধ্যে অসাধারণ পরিশ্রম এবং অধ্যবসায়ের ফলে একই রকমের দুটি ইতিহাস বাঙ্গলা-সাহিত্যে জন্মলাভ করেছে।

এর একখানি, শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয়ের বাঙ্গলার ইতিহাস, পড়ে আমার যা মনে হয়েছে, তা এ প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ কর্‌ছি। রাখাল বাবুর রচিত পুস্তকটিকে ইতিহাস আখ্যা প্রদান করা সমীচীন বলে মনে হয় না। কারণ এ বই থেকে আমাদের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না।

বন্দোপাধ্যায় মহাশয় নিজেও জানেন যে ইতিহাস জিনিসটা স্বতন্ত্র, সে জন্য তিনি ভূমিকায় লিখেছেন যে, "সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে যে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল'। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁদের পন্থানুবর্ত্তী দেশীয় প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌দের বিপুল অধ্যবসায় এবং পরিশ্রমের ফলে ভারতবর্ষের

ইতিহাসের যে সমস্ত মাল মসলা সংগৃহীত হয়েছে রাখালদাস বাবু সেই গুলির সত্যাসত্য বিচার করে তাদের একত্র গেঁথে ইতিহাসের একটি কাঠাম প্রস্তুত করেছেন। জীবন্ত মানুষের সঙ্গে কঙ্কালের যতই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকুক না কেন তথাপি কঙ্কাল শুধু কঙ্কাল; সুতরাং সাধারণ পাঠকে এ কঙ্কাল দেখে সম্ভবতঃ ভীত হবেন। কিন্তু সকলের মনে রাখা উচিত এ বই সাধারণ পাঠকের জন্য নয়।

রাখালদাস বাবু বাঙ্গলার ইতিহাসকে শুধু প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে আলোচনা করেছেন; তিনি আজীবন ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই নীরস অধ্যায়টিকে আয়ত্ব করতে বহু পরিশ্রম করেছেন। যদিও তাঁর আলোচ্য বিষয়টির পরিধি সঙ্কীর্ণ তথাপি এই গণ্ডির ভিতর তাঁর জ্ঞানের গভীরতা অসামান্য এই জন্য সত্য-সন্ধিৎসু লোক মাত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে তাঁর নিকট মাথা নত করবেন।

আমাদের দেশের ইতিহাস সম্বন্ধে এত অল্প তথ্য আমরা এ পর্য্যন্ত জেনেছি যে এখন পর্য্যন্ত দেশের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে অনেকেরই নিরঙ্কুশ কল্পনা একেবারে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। রাখাল বাবু যাকে বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলে স্বীকার করেছেন, তার শাসন অত্যন্ত কঠোর। এখানে ফাঁকি নেই, কল্পনার গোঁজামিলনও নেই। রাখাল বাবু যা হাতে ছুঁয়ে নিজের চোখে দেখে জেনেছেন কিংবা যা অকাট্য প্রামাণ্য দ্বারা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনেছেন তাকেই শুধু তিনি গ্রাহ্য করেছেন। সে জন্য ভবিষ্যতে যাঁরা বাঙ্গলার ইতিহাস লিখবেন তাঁদের কাছে রাখাল বাবুর ইতিহাস একটি অমূল্য বস্তু।

আর্য্য-সভ্যতার প্রতি আমাদের একটা অহৈতুকী ভক্তি আছে, কেননা আমাদের বিশ্বাস তা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সভ্যতা।

রাখাল বাবুর বই পড়লে সকলেই দেখ্‌তে পাবেন যে সে ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আর্য্য-সভ্যতা যে বাংলা-দেশে চট্‌পট্‌ এসে পৌঁছয়নি, তার প্রমাণ আমরা প্রাচীন বৈদিক-সাহিত্য হতে পাই; আমাদের শরীরে কি পরিমাণে আর্য্যরক্ত আছে তার আলোচনা নৃতত্ত্ববিদেরা করবেন; কিন্তু আর্য্য আসবার অনেক পূর্ব্বে বাংলা-দেশে যে দ্রাবিড় নামক একটি সুসভ্য জাতি বাস করত; তার প্রমাণ রাখালবাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ আমাদের সাম্‌নে ধরে দিয়েছেন। ক্যালডিয়ার ইতিহাসের বিখ্যাত সুমের জাতি যদি বাস্তবিকই দ্রাবিড় জাতির একটি শাখা হয়, তাহলে দ্রাবিড় জাতির সঙ্গে আত্মীয়তা স্বীকার করতে হয়ত আমরা নারাজ হবনা।

তারপর রাখাল বাবুর ইতিহাসে এই সত্য বিশেষ করে আমাদের চখে পড়ে যে বাংলা দেশ বারংবার ভারতবর্ষের উত্তরাপথের রাষ্ট্রীয় উৎপাতের দ্বারা বিধ্বস্ত হয়েছিল, কেননা সেকালে বাংলার কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। মৌর্য্য, শুঙ্গ, কাণ্ব, অন্ধ্র এবং গুপ্ত শাসন বাংলা-দেশের উপর কি পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা জানার উপায় আমাদের নেই; কিন্তু এই সহস্র বৎসরাধিক রাষ্ট্রীয় জীবনের অস্থিরতায় বাঙ্গালী কিংবা ভারতবর্ষের অপর কোন জাতই যে তাদের নিজত্ব গড়ে তোলবার সুযোগ পায়নি, তা সুনিশ্চিত। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর অপরাপর জাতির ঐক্য দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমাদের মধ্যে কোন কোন স্বদেশ-বৎসল লোক শাস্ত্র থেকে বচন তুলে প্রমাণ করতেও চেষ্টা করেছেন যে, আমরাও বহু-প্রাচীন কাল হতে এক জাতি। কিন্তু এখনকার দিনে আমাদের যা ঈপ্সিত তা আমরা পেয়ে বসে আছি বলে, নিজেদের যেন ভুলিয়ে

না রাখি। ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে যেটা সব চাইতে স্পষ্ট করে আমাদের চোখে পড়ে তা হচ্ছে ভারতবাসীদের মৌলিক ঐক্য নয়, মৌলিক পার্থক্য।

হাজার বৎসর ধরে আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ল্যাবরিটারিতে সমগ্র ভারতবর্ষকে একছত্র সাম্রাজ্যে পরিণত করবার চেষ্টা হচ্ছিল। আমরা জানি যে ভৌগলিক হিসাবে মাঝে মাঝে এ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত হলেও আমাদের দেশের কোন সাম্রাজ্য বেশীদিন স্থায়ী হতে পারে নি; কেননা সে সাম্রাজ্য সমগ্র ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবনের ঐক্য-সাধন করতে পারেনি। আমরা বারংবার দেখছি যে অসামান্য শক্তিশালী দু'একজন রাজা তাঁদের বাহুবলে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন, কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁদের সাম্রাজ্য ভেঙ্গে চুরে খান্ খান্ হয়ে গিয়েছে, তার কারণ সমগ্র ভারতবর্ষে একটি রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তোলবার উপাদান সে কালে ছিল না। এই আসমুদ্রব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করবার বৃথা চেষ্টার ফলে শুধু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন জাতির স্বাতন্ত্র্য ফুটে উঠতে পারেনি। আমার মনে হয় এই দীর্ঘ-কালব্যাপী সাম্রাজ্য গড়বার অস্বাভাবিক চেষ্টাতেই খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আমাদের দেশ থেকে রাষ্ট্রীয়জীবন সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়।

রাখালবাবু প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বে ভারত-বর্ষের অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে অনেকটা বিস্মিত এবং ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যে নিদারুণ অরাজকতা এবং রাষ্ট্রীয় বিপ্লবকে অপসারিত করে মুসলমান সম্রাটগণ ভারতবর্ষে নিজেদের অধিকার স্থাপন করেছিলেন তা জেনে আমরা কখনই মুসলমান বিজয়ের জন্য আক্ষেপ করতে পারিনে। এখন

পর্য্যন্ত আমরা নিরপেক্ষ ভাবে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চ্চা করিনি, তা নাহলে আমরা জানতুম যে মুসলমান শাসনের ফলে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় জীবন কিছুমাত্র ক্ষুণ্ন হয়নি। এই ইতিহাস পড়ে শুধু এই কথাই আমাদের মনে হয়, যে হিন্দু-যুগে একটি বিরাট অশান্তি এবং অরাজকতা ভীষণ দুঃস্বপ্নের মতন সমস্ত দেশের উপর চেপেছিল। এই অরাজকতা (যাকে খালিমপূরের তাম্রশাসনে মৎস্যন্যায় বলা হয়েছে) দূর করবার জন্য গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র এবং বপ্যটের পুত্র গোপালকে বাংলা-দেশের রাজপদে বরণ করে। পালরাজগণ অন্যূন সাড়ে চারশ বৎসর বঙ্গাঙ্গমগধে রাজত্ব করেন, কিন্তু এই কালে বাঙ্গালী যে বিশেষ শান্তিতে ছিল না, তা রাখালবাবু আমাদের পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিয়েছেন। পশ্চিম হতে গুর্জ্জর এবং কান্যকুব্জের রাজাগণ দক্ষিণ হতে রাষ্ট্রকূট এবং উড়িষ্যা'র চোল বংশীয় নরপতিগণ পূর্ব্ব হতে কামরূপের রাজা, উত্তর হতে কাম্বোজরাজ উপর্য্যুপরি আক্রমণ করে বাংলা-দেশকে বিব্রত করে তুলেছিলেন। এই পাঁচশ বৎসর যাবৎ, যে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব চল্‌ছিল তাতে কখনও দেশে শান্তি এবং সুশাসন সম্ভবপর ছিল না। আর্য্যাবর্ত্তে যখন হর্ষবর্দ্ধন সম্রাট ছিলেন তখন চীন শ্রমণ ইয়ুন চুথাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে দেশে অশান্তির কথা জান্‌তে পাই। তাঁর মৃত্যুর পরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ যেরূপ অন্তর্যুদ্ধদ্বারা পীড়িত হয়েছিল তাতে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে শুধু বাংলা-দেশ কেন, ভারতবর্ষের কোন দেশেই শান্তি এবং সুশাসন ছিল না। এই ঘোর অরাজকতার দিনে মুসলমানগণ উত্তর পশ্চিমের পার্ব্বত্যপথ ভেদ করে আর্য্যাবর্ত্তে তাঁদের অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকাকে সুদৃঢ়রূপে

প্রতিষ্ঠিত করেন। বাংলা-দেশ ও অবশেষে তাঁদের সম্পূর্ণ করতলগত হয়।

রাখালবাবু হয়ত বাঙ্গলার ইতিহাসের ২য় খণ্ড লিখ্‌তে এখন ব্যস্ত আছেন। মুসলমানদের আমলে বাংলা-দেশের অবস্থা কেমন ছিল তা তাঁর ২য় খণ্ড পড়ে জানা যাবে, হিন্দু-যুগকে যাঁরা ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে মনে করেন তাঁদের ভ্রম রাখালবাবুর ইতিহাস পড়ে কিয়ৎ-পরিমাণে ভাঙ্‌বে। একদিকে যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয়জীবন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌ছিল। অপরদিকে তেমনি সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন পুরোহিততন্ত্রের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সংস্কৃত-ভাষাতে সাহিত্য রচিত হত, এবং সেইজন্য সাহিত্য ক্রমশঃ ক্রমশঃ অস্বাভাবিক হয়ে শুধু ভাবহীন ভাষাড়ম্বর হয়ে পড়েছিল। মুসলমানশাসন এই জড়তার উপর আঘাত দিয়ে দু'এক জায়গায় জাতীয় জীবন উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। আমরা জানি যে এই মুসলমান বিজয়ের পর ভারতবর্ষে নব ধর্ম্মজীবন জেগে উঠেছিল; নানক কবীর চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ যে বিশ্বজনীন ধর্ম্ম প্রচার করেছিলেন উপনিষদের পর ভারতবর্ষে সেরকম সার্ব্বভৌম ধর্ম্মবাণী কখনও প্রচারিত হয়নি; মুসলমান রাজাদের দরবারে এবং তাঁদেরই উৎসাহে বাঙ্গলা-ভাষায় সাহিত্যকুসুম প্রস্ফুটিত হতে আরম্ভ করে। গৌড়ের বাদশাদের শাসনের আর যে দোষ গুণই থাক্‌না কেন, তার মহাসুফল এই হয়েছে যে মুসলমান আমলেই বাংলা-দেশ ও বাঙ্গালী জাতি নিজের স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছে।

রাখালবাবু যে যুগের ইতিহাস লিখেছেন সে যুগে বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও অন্তর্বিপ্লব এ দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। বাংলার

মুসলমান শাসনকর্ত্তারা এই ঘোর অরাজকতার পরিবর্ত্তে দেশে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, এবং সেই যুগেই আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় সাহিত্য বিশিষ্ট ভাবে গড়ে ওঠবার অবসর পেয়েছে।

শ্রীঅরুণ চন্দ্র সেন।

তারিখের শাসন।

——:*:——
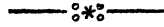
শীতের সকাল বেলার মিঠে রোদটি শিশির-ভেজা ঘাসের উপর এসে পড়েছে। দূর চিমনীর নীলাভ ধোঁয়া আকাশের গায় ধীরে রেখা টেনে চলেছে। এমনতর সকালে মনে, এই বলে কেবলি আক্ষেপ হয় যে জীবনটা কেন একটি পরিপূর্ণ আলস্যে কাটিয়ে দেওয়া যায় না। যে কালে জন্মগ্রহণ করা গেছে সে কালে তা একেবারে অসম্ভব। এ হচ্ছে কাজের যুগ, কোন একটা কাজ না করলে লোকে বলবে সময় নষ্ট হচ্ছে। একটা বই নিয়ে বসা গেছল বলা বহুল্য বইটে Bejnamin Franklin-এর জীবন চরিত বা Smiles-এর Self-Help নয়, কিন্তু উঠতে হবে Cowper's letters-এর নোট লিখতে। আজকে সকালে Cowper's letters পড়াটা লঘু পাপে গুরু দণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

ছেলেবেলায় পড়েছিলুম "জাড্য-দোষ বড় ভয়ঙ্কর" এবং সেই থেকে শিশুশিক্ষার অনেক বুলির ন্যায় ও বুলিটাও লেখকের রচনায়, বক্তার বক্তৃতায় এবং অন্য অনেক স্থানে শুনে আসছি। শুনেছি যে সময়ের যে মুল্য আছে সেটা না জানা থাকাতেই আমাদের দেশের এমন অবস্থা। এত যে উপদেশ শুনলুম তবু যে আলস্যদোষ গেল না, তার কারণ ও দোষ আমাদের মজ্জাগত। আসল কথা ওটা যে একটা দোষ তা স্বীকার করতে আমরা মোটেই রাজী নই।

সময়ের যে একটা মূল্য আছে এটা আমরা আমাদের দেশে মানি নি। না মানাতেই যে ঠকেছি একথা বলতে পারি নে। কারণ, কি জন্য যে ঠকেছি তা ঠিক করতে বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, অর্থনীতিজ্ঞ ও রাজনীতিজ্ঞ প্রভৃতির মধ্যে মতভেদ ঘটেছে—কেউ বলেন ম্যালেরিয়া হওয়াতেই দেশের দুরবস্থা, কেউ বলেন ধর্ম্মহীন হওয়াতে এই দুরবস্থা, কেউ বা বলেন দেশের সাহিত্যে এত প্রেমকবিতার প্রাদুর্ভাব হওয়াতেই দেশের এই দুরাবস্থা। বৃথা সময় নষ্ট করা উচিত নয় আমাদের দেশে এ সব ধারণা ছিল না, অধিকাংশ জীবনের বিশেষ কোন উদ্দেশ্য ছিল না ব'লে জীবনটাই উদ্দেশ্য হ'ত। তাই তখনকার জীবনের যে নমুনা আমাদের হাতে আসে তাতে Æsthetics-এর চেহারা দেখতে পাই। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা স্নুবাসিত বারিতে স্নান ক'রে, গাত্রে চন্দন লেপন ক'রে, লীলাকমল হাতে নিয়ে রাজ-সভায় গিয়ে বসতেন—সেখানেও পোলিটিক্যাল বাকবিতণ্ডা ছিল না। সেখানে হয়ত কোন নূতন কবি কোন নূতন রচনা পাঠ করবেন। কাজের তাড়া নেই—আবশ্যকের উৎপাত নেই। ভেবে দেখুন দেখি বিংশ শতাব্দীতে এমনতর ঘটনা ঘটতে পারে কি না। ধরুন এই ট্রাম, ছক্কর মোটার গাড়ীতে পূর্ণ কলিকাতা সহরে আমরা চন্দনচর্চ্চিত দেহে লীলাকমল হাতে নিয়ে গভর্ণমেণ্ট হাউস, বা টাউনহল বা সিনেটহল অভিমুখে যাচ্ছি আমাদের কণ্ঠে ফুলের মালা, শ্রবণে মণিকুণ্ডল, করমূলে স্নুবর্ণ বলয়। ধরুন সিনেটহাউসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নূতন কোন কাব্য পাঠ করবেন; তাঁর উচ্চাসনের দুই দিকে রজত দীপাধারে স্নুগন্ধি তেলের বাতি জ্বলছে, ভেবে দেখুন যদি এমন একটা ব্যাপার সম্ভবও হ'ত তবে সে কি বিসদৃশ হত; এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া

সেখানে আমরা সকলেই কেমন বেমানান হতুম। এসব যে এখন অসম্ভব হয়ে উঠেছে তার একটি কারণ হচ্ছে তখন সময় আমাদের ভৃত্য ছিল এখন আমরা সময়ের ভৃত্য। বিংশ শতাব্দীতে মানুষ জড়-প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে কেবল যে জড়-প্রকৃতির দাস হয়েছে তাই নয় সময় নামক না-জড় না-চেতন না-সূক্ষ্ম না-স্থূল এক অদ্ভুত পদার্থের দাস হয়েছে এবং তার ফলে জীবনযাত্রা পূর্ব্বের চেয়ে অনেক পরিমাণে শ্রীহীন হয়ে পড়েছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভিড় ঠেলে যখন যেতে হবে, তখন গলায় মালা পরাও চলে না, হস্তে বলয় রাখাও চলে না—তখন গায়ে চন্দন লেপন নিতান্তই বাহুল্য কারণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরে সে চন্দন থাকবে না। এ সব ইতরতার মূলই হচ্ছে সময়ের যে মূল্য আছে এই জ্ঞান—এবং এ জ্ঞান আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শেই লাভ করেছি।

(২)

সময়ের মূল্যজ্ঞান থেকে আমরা আর একটি গুণের সন্ধান পেয়েছি—সেটির নাম হচ্ছে Punctuality। ইংরেজ বলেন Punctuality is a virtue। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে আমাদের এই পুণ্যলোভাতুর দেশেও পুণ্যসঞ্চয়ের এত সহজ উপায়টা কারো মনে ইতিপূর্ব্বে আসেনি। সাতটার সময়ে আসব বলে ঠিক সাতটায় এলেই যে পুণ্য অর্জ্জন করা যায়—এটা দেশের দুরবস্থার আলোচনার সময়ে যতই স্বীকার করি না কেন আমাদের মন তা কিছুতেই মান্‌তে চায় না—তাই ও পুণ্যটার সম্বন্ধে আমরা একেবারে নির্লোভ।

কাজের পক্ষে ওটাতে সুবিধা হতে পারে কিন্তু কাজ যে ইচ্ছার চেয়ে বড় এ কথায় সায় দেওয়া কঠিন।

আমাদের বোঝা উচিত যে সময়ের প্রতি এই অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধা কর্ম্মক্ষেত্রে যতই ফলদায়ক হোক না কেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রে তা একেবারেই অচল। কি এক কুক্ষণে মাসিকপত্রের আবির্ভাব হ'ল সম্পাদক বল্লেন যদি বছরে সাড়ে তিন টাকা ক'রে আমাকে দাও তবে প্রতি মাসের ২রা তারিখে অমি সাহিত্য-রস যোগাবার ভার নেব। সেই থেকে সে তারিখে যদি পাঠকদের উক্ত রস যোগান না হয় তবে তাঁরা রাগ করেন। সাহিত্য-বৃক্ষের রস নাববার সময় হলে তা আপনিই বার হবে এই নিয়মই হচ্ছে স্বাভাবিক। মাসিকপত্রের বাঁধা ভাঁড়ের উদর পূর্ণ করবার জন্যে তারিখে তারিখে তাকে যে রস বার কর্ত্তে হবে এ অপমান যেন সে কোন দিন না স্বীকার করে। তারপর গরজ কার, যে রসভিক্ষু তার না, যে রস যোগাবে তার? যদি স্বয়ং সম্রাটও হুকুম দেন যে এই শীতের সকালে অশোকমঞ্জরী ফুটে উঠুক—তবে সে কি ফুটবে? বসন্তের হাওয়া চাই, ভ্রমরের গুঞ্জন চাই, সুন্দরীর চরণ-স্পর্শ চাই তবে না সে দেখা দেবে। সবুজ পত্রের আর কোন গুণ থাক্ আর না থাক্ একটি এই মহাগুণ আছে যে তা ধার্য্য তারিখে বার হয় না।

তাই বলছি আমরা যারা কাজের হুকুম মানিনে, এস দল বেঁধে আজ মহাসমারোহে আলস্যকে রাজসিংহাসনে বসাই—বৃদ্ধ সময়ের সেখানে নিমন্ত্রণ হবে না। জয় আলস্য—উদার অগাধ আলস্য তোমারি জয়—আমাদের চিত্তে তোমার আসন অটল হোক। যারা সকালে ঠিক ছয়টায়ে উঠে, দশটায়ে খেয়ে এবং নটায় শুয়ে ভাবে জীবনটা বেশ

কেটে যাচ্ছে আমরা তাদের কেউ নই। কিম্বা জীবনের স্রোতে যারা সজোরে নৌকা বেয়ে পণ্য নিয়ে বন্দরের দিকে ছুটে চলেছে আমরা তাদেরও কেউ নই ; সুতরাং আমরা কেন তারিখের শাসন মানবো ?

শ্রীকিরণ শঙ্কর রায়।

সমুদ্র-বক্ষে।

—–:*:—–
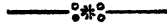
সমুদ্রের দোলায় চড়ে সম্মুখে পশ্চাতে দোল খেতে খেতে মহা আরামে এক পার হতে আরেক পারে, লক্ষ্যবিহীন যাত্রা।

চারিদিকে কল্‌কল্‌ ছল্‌ ছল্‌ রবে অগাধ চঞ্চল জলরাশির দিগন্তের পানে অবাধ উল্লম্ফন, ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ঠোকাঠুকি, সবারই এক মাত্র চেষ্টা, ছুটে গিয়ে ওই অসীম আকাশকে লুফে নেবার।

অগ্নিগর্ভ গোলকটাকে আকাশের বুকে গড়াতে গড়াতে দিনটে বিলীন হয়ে গেল, ওই পশ্চিম সমুদ্র-গর্ভে। সেই সঙ্গে কে যেন আবিরে রাঙিয়ে দিয়ে গেল, গোধুলির ললাট খানি! ঊর্দ্ধে, নিম্নে, নীলিমার গায়ে তারই চিহ্ন এখানে, ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে।

মুহূর্ত্ত পরে আবার একি! পাতাল পুরী ফুঁড়ে অগাধ জলের তল থেকে কোন্‌ অদৃশ্য দৈত্য একটা ধাক্কা মেরে তুলে দিয়ে গেল, সোণার থালার মতন জ্বল্‌জ্বলে ওই চাঁদ খানাকে। সাগরের বুক অমনি ফেঁপে ফুলে উঠে কি এক অন্ধরোষে দিগদিগন্তে বিক্ষুব্ধ হতে লাগ্‌ল। যেন তার হৃৎপিণ্ডের শিরা উপশিরা গুলি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে বার হয়ে আস্‌চে।

রাত দুপুর। সকলে নিদ্রিত, ঘুম নেই কেবল আমার চোখে। কাণে এসে বাজ্‌চে শুধু যাত্রিদের নাসিকা গর্জ্জন, জলকল্লোলের সঙ্গে এক অপূর্ব্ব সুরে, তালে তালে এক লয়ে!......আর সাড়া পাওয়া

যাচ্ছে, কলঘরে খালাসীদের, কাপ্তেন সাহেবের আর এঞ্জিনের; আর ওই সুদূর আকাশে চন্দ্র তারকাদের।

তারাদের কোন কোনটীর বা চোখ রাত জেগে জেগে ঘুমে ঢুল-ঢুল কর্‌চে, কোনটী বা সদ্য জেগে চোখ মেলেছে, রাত্রির পাহারার জন্যে।

এইরূপ কতক জাগরণে, কতক নিদ্রায় বিশ্বজগতের কাজের চল্‌তি; এর বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, এক মুহূর্ত্তের জন্য, এক পল অনুপলের জন্যেও, জলে স্থলে আকাশে কোথাও নয়!

প্রকৃতির বুকে লালিত মানুষ, প্রকৃতিরই 'ধাতে' গড়া। সে যখন নিজে কর্ম্মশীলা, মানুষের তখন বিরাম কোথায়?......তাকে চল্‌তেই হবে, ফিরতেই হবে, এই প্রকৃতিরই সঙ্গে তালে তালে সমান পা ফেলে ফেলে জীবনের যাত্রা-পথে।

প্রভাত। অকস্মাৎ পূর্ব্বদিক থেকে একটা আলোর করাত রাত্রি-শেষের ধুসর আভাকে দু'ফাঁক করে দিয়ে যেতে লাগ্‌ল, নীলিমার বুক চিরে চিরে দিক্ হতে দিগন্তরে। আবার নূতন আলো, নূতন দিন, নূতন জগৎ—সব নূতন। কাল্‌কার যা, আজ তা' পুরাতন, মৃত। আজকার এই আলোয় ধোওয়া আকাশ, সাগর, সব যে নূতন, সব যে আজকার জন্যেই আজকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তাই কালকার আমি আর আজকার আমি নই!......আজকার আমি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মানুষ। না না, ওই যে জন্ম থেকে মরণ অবধি একটী সম্বন্ধ সূত্রে আমি বাঁধা পড়ে-গেছি, তাইতেই আমাকে আলাদা হতে দেয় নি। নইলে আজকার এই আকাশ, সাগর, এই আলো, এই দিন, এই জগৎ যে আমারই তৃপ্তির জন্যে একটি শতদলের মত বিকশিত হয়ে' উঠেছিল!......

সাতটা, ঢং ঢং ঢং !

আবার সেই বাস্তবের রাজ্য !......আবার সেই টুং টাং ঝন্ ঝন্ খন্ খন্ শব্দ। খানা-কামরার মধ্যে আবার সেই চাঞ্চল্য......সেই গতি বিধি।

প্রকৃতি মানুষকে বড় বেশীক্ষণ ভা'ব রাজ্যে থাক্‌তে দিতে চায় না ; এই চায় না বলেই মানুষের এত গতায়াত, এত প্রচেষ্টা, যেন কি একটা চাইই, নইলে কিছুতেই তার চলে না।

এই যে হাজার হাজার মানুষের ঘর থেকে বেরিয়ে আসা, এও প্রকৃতির তাড়নাতেই, এই তাড়না আছে বলেই মানুষের বড় হবার চেষ্টা, একের উপর অপরের প্রভুত্ব কর্‌বার প্রবল আকাঙ্ক্ষা।

(২)

এই যে দেশসুদ্ধো লোক সাগরের বুকে দোল খেতে খেতে শত শত মাইল ভেসে চলেছে, কেন ?...কি জন্যে...এই প্রকৃতির তাড়নাতেই। এত বড় দেশটা আজ এদের মুখে অন্ন তুলে দিতে অক্ষম, তাই এরা ক্ষুধার জ্বালায় ভগবানের নাম করে ভেসে পড়েছে, এই অতল জলধির বুকে, এক অজ্ঞাত দেশের উদ্দেশ্যে।

দেশের বল কোথায় ? যাদের দেখা যাচ্ছে, এরাত, শ্মশানের কঙ্কাল মূর্ত্তি ; ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে, যেন কি এক মায়ামন্ত্রবলে। নইলে চল্‌বার এদের স্বাভাবিক শক্তি কোথায় ? যারা সংসারের তপ্ত খোলায় ভাজা ভাজা হয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েছে, তবুও তাদের ভিতরে একটা প্রাণ আছে, বল্‌তে হবে।...যদিও তাদের অনেকেই হয়ত

কেরাণীগিরির প্রত্যাশী ; কিন্তু যারা একান্ত পরনির্ভরশীল, তাদের উপায় কি ?...হয়ত ব্যাধিক্লিষ্ট দেহে উপার্জ্জনক্ষম আত্মীয়ের গলগ্রহ হয়ে' দুর্ব্বিহ জীবন যাপন কর্‌ছে। পানা পুকুরের পচা জল, বিষাক্ত বায়ু, এবং ততোধিক বিষাক্ত উপার্জ্জনশীল আত্মীয়ের গঞ্জনা-বাণী পরিপাক ক'রে, তাদের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করতে হচ্ছে।

এই যে জাহাজে চ'ড়ে ভবিষ্যতের কেরাণীর দল, মুটে মজুরে মুদি পসারীর দল চলেছে, এদের সকলেরই কি দশা একই প্রকার ?

উত্তর নেই! মূক জড়ভরত সমাজের মুখে উত্তর পাবারও যো নেই! থাক্‌লে বোধ হয় দুঃখ নিবারণেরও উপায় থাকত! কেননা, তা' হ'লেও বোঝা যেত, যে এদের দুরবস্থা সম্বন্ধে সমাজ সজাগ। কিন্তু তা কৈ ?...

এই যে ভবিষ্যতের কেরাণী মুটে মজুরের দল চলেছে, এদের ভিতরে কি একটীও প্রতিভাশালী লোক নাই ?...সকলেই কি কেরাণী-গিরি, মুটে মজুরীর উপযোগী ?...খুজ্‌লে পরে এদের ভিতরে চিত্রশিল্পী কবি অথবা শক্তিশালী ভাস্কর বা কারিগর যে নাই, এ কথা কে জোর ক'রে বল্‌তে পারে ?...কিন্তু আমাদের দেশের কজনের আত্মশক্তি ফুটিয়ে তোলবার সুযোগ বা অবসর ঘটে ?

যাদের কেরাণী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই, হোক্ তারা কেরাণী, কেরাণীগিরিতেই তাদের জীবন বস্‌বে ভাল। কিন্তু যার ভিতরে বঙ্কিম, রবীন্দ্রের মত প্রতিভাবীজ বর্ত্তমান, তাকে কেন কেরাণীগিরি ধরাও ? তুমি হয়ত উত্তর দেবে, এটা জীবন সংগ্রামের যুগ, এর পরিণতি যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনে। যে বাধাকে পদদলিত করে যোগ্যতম হবে, সেত আমাদেরই একজন, দেশ গৌরবান্বিত হবার হয়ত, ওই একজনেই হবে।

আমি বলি তা' নয়, তোমার চেয়ে যে বড়, যার শক্তি তোমার চেয়ে বেশী, যার জন্মে একটী দেশ লালায়িত, তাকে অত পরীক্ষার আগুনে পোড় খাইয়ে দরকার কি? তাতে ত ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছুই হবে না। আরেক কথা, কাউকে নষ্ট করবার অধিকার তোমার নাই। এই যে অগ্নি পরীক্ষা কর্‌তে চাও, তাতে কি সব সময়ে সুফল ফলে? যে বীজটী অঙ্কুরিত হয়ে ওঠ্‌বার জোগাড় হয়েছে, তোমার পরীক্ষার তাতে যে সেটা শুকিয়ে চিরদিনের মত লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়ে যাবে, তাতে লাভটা কি? তবে কখনো কখনো যে পরীক্ষায় সুফল ফলে থাকে, এ কথা অস্বীকার কর্‌বার জো নেই; তাই বলে সব সময়ে যে ফলে না, এটা নিশ্চয়।

তুমি হয় ত, বল্‌বে প্রতিভাকে কখনো গড়া যায়না; নিত্য নব নব শক্তির বিকাশেই প্রতিভার পরিচয়; সৃষ্টি প্রতিভার কাজ সুতরাং সমাজ প্রতিভাকে কি করে সৃষ্টি কর্‌বে?

তা মানি, গড়্‌তে পারা যায় না, তাও খুব সত্য। কিন্তু প্রতিভাকে ধ্বংসের হাত থেকে ত বাঁচানো যায়। তাই বা কর কই? বরং উল্টে তাকে ধ্বংস কর্‌বার চেষ্টায় থাক।

আমরা যারা নিজেদের অভাবটাকে অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি কর্‌ছি, সেই আমরাই কি তার প্রতীকারের কোন চেষ্টা কর্‌ছি, না কর্‌বার কোন পথ আবিষ্কারের উপায় দেখ্‌ছি! কিছুই না, যেমনি চল্‌বার, তেমনি চলেছি, দেশ ছেড়ে স্বজন স্বজাতি ছেড়ে এক সুদূর বিদেশে নিত্যকার জীবিকা অর্জ্জন করতে। নিজের জীবিকা কে না অর্জ্জন করে? আমরা তারই একটা মস্ত বড়াই করে বুক ফুলিয়ে চলেছি, ঠিক বাদশার মত। সমুদ্রের ঢেউগুলা কলহাস্যতুলে যেন বিদ্রূপ করে বলে যাচ্ছে

ভুল ভুল সব ভুল! প্রণবের ধ্বনির মত, তাদের সেই শব্দ কাণে এসে জোরে জোরে ঘা মেরে মেরে সুপ্ত আমাকে জাগিয়ে তোল্‌বার জন্য এক একবার চেষ্টা কর্‌ছে, আর হেসে বল্‌ছে এদের ঘুমন্ত আত্মাকে জাগানে যাবেনা। এরা কর্ম্মহীন জড়জগতের অচল গুহায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, আর এক একবার খেয়ালের স্বপ্ন দেখে পাশ ফির্‌তে চাচ্ছে। এদের যে এত সব কথাবার্ত্তা, বক্তৃতা, এ আর কিছুই নয়, স্বপ্নের ফল, স্বপ্নের ফল। এত বড় সত্য জগতে একটা এত বড় জাতি জীবনটাকে জল্পনা কল্পনার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন করে রেখেছে, একথা ভাবতে গেলেও কূল কিনারা পাওয়া যায় না।

ঝনন্‌ ঝন্‌রবে জাহাজের শিকল নোঙ্গর গুলো বেজে উঠ্‌লো,—চেয়ে দেখি আমারি সোণার-বাংলার মোহিণী মূর্ত্তি যেন ওই পুরোবর্ত্তী অদূর সৈকতে তালীবন মাঝে ভেসে উঠেছে। লোক জনের চাঞ্চল্যের একটা প্রবল ধাক্‌কায় ভেঙ্গে দিয়ে গেল কল্পনার মায়া-মন্দির।

রেঙ্গুন,
১-৫-১৯১৬।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ সরকার-শর্ম্মা।

দাঁড়কাক।

———ঃ৵ঃ———

'কা—কা—কা' ;—একটা দাঁড়কাক নিমগাছের ডাল থেকে ডেকে উঠ্‌লো। অম্নি গিন্নি বলে উঠ্‌লেন 'দূর দূর'! ঝি শশব্যস্তে কোটা মাছ ঢাকা দিলে এবং ছেলেরা গুলতি নিয়ে বের হলো।

বেচারা দাঁড়কাক বুঝলে বেগতিক!—সে নিমগাছ থেকে জামগাছে এবং জামগাছ থেকে তেঁতুলগাছে উড়ে গিয়ে আবার ডাক্‌লে 'কা—কা' অর্থাৎ কা বার্ত্তা—ব্যাপার কি?

যদি এ ঘটনা খুব প্রত্যুষে হতো, তাহলে নাহয় কবির ব্যাখ্যায় সায় দিয়ে ব'ল্‌তে পারতুম—ও অভিসারিকাদের ব'ল্‌ছে ঘরে ফিরে যেতে, কিম্বা সূর্য্যদেবকে সতর্ক করে দিচ্ছে যাতে তিনি ওকে এক টুকরো জমাট অন্ধকার না মনে করেন;—কিন্তু তখন বেলা প্রায় ন'টা।

বধূ ছাদের উপর বড়ি দিচ্ছিলেন—তাঁর কোলের ভিতর মাথা রেখে স্তন্যপান কচ্ছিল একটী শিশু। তিনি দেখলেন দাঁড়কাকটা তাঁরই দিকে চেয়ে আছে, সুতরাং দু'একবার অস্ফুটস্বরে 'হুস্—হুস্' শব্দ কল্লেন,—কিন্তু দাঁড়কাক আর নড়লো না।

বধূ হাত গুটিয়ে দাঁড়কাকের কথাই ভাবতে লাগলেন—বোধহয় সে তাঁকে mesmerise করে থাক্‌বে।

খানিক পরে দাঁড়কাকটা আবার 'কা' বলে ডেকে নিমগাছ ছেড়ে উড়্‌লো, এবং ছাদের গায়ে লাগানো যে একটা ডালিমগাছ ছিল, তারই ডালের উপর এসে ব'সলো।

বধূ মনে ভাবলেন—দেখি আমি নিজে একটা শকুন-শাস্ত্র রচনা করতে পারি কি না ; দাঁড়কাক যখন "কা" বলে আমার কাছে উড়ে এসেছে, তখন ধরে নেওয়া যাক্ ওর অর্থ হচ্ছে "কাত্বম্" অর্থাৎ "কে তুমি ?"

নিজের ব্যাখ্যায় নিজে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি হেসে উত্তর দিলেন—"সে খোঁজে তোর দরকার কি রে পোড়ারমুখো ?"

দাঁড়কাক তাঁর দিকে দু'একবার কট্‌মট্ করে চেয়ে ঘাড় বাঁকালে এবং নিতান্ত অনুনয়ের সুরে উচ্চারণ করলে একটি ছোট্ট মোলায়েম 'কা'।

"কা ক্ষতি ?—কেমন ?" বলেই বধূ একটু চম্‌কে উঠলেন ; তাঁর পিছন থেকে কে তাঁকে ডেকে বল্লে—"কার সঙ্গে কথা বল্‌ছো বৌদি ? বড়ির সঙ্গে, না দাঁড়কাকের সঙ্গে ?"

"কে ? ঠাকুর-পো ! কেন, ঐ দাঁড়কাকটার সঙ্গে—তাতে কোন দোষ আছে নাকি ?"

আল্‌সের উপর থেকে একখানা কচুপাত টেনে নিয়ে, তার উপর বস্‌তে বস্‌তে সুশীল বল্লে—"আছে বৈকি বৌদি, জানত 'বহুকা ভালা চুপ'।"

"তাহলে বোবা মেয়ে বিয়ে কর্‌তে চাওনা কেন ?"

"সে যে দরকার হলেও—"

"তাই বল—কিন্তু সে দরকারটা কি কেবল তোমাদেরি ? আমাদের যতই দরকার হোক্ না, বাইরে একটা কথা বল্‌বার জো নেই—কাজেই ঘরের ভিতর এত দরকার হয় যে, তোমরা বিরক্ত হয়ে ওঠ। জানত ভাই, কথা মন থেকে কেবলি ঠেলে উঠ্‌তে চায়—তাকে জিভ

দিয়ে চেপে রাখলে সে এক সময় না এক সময় এমন জোরের সঙ্গে, তেজের সঙ্গে—"

"এবং গোলমালের সঙ্গে বের হয়, যে তার সঙ্গে পেরে ওঠা দায়!—তা ঠিক্, কিন্তু আমরাই যখন পারি না, তখন দাঁড়কাকটা কি পারবে? ওকে ভালোয় ভালোয় বিদায় দিলে হয় না?"

"না—না, থাক্, তাড়িও না; তুমি কি ওদের ভয় কর নাকি?"

সুশীল একটু হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর করলে—"তা করি বৈকি—ওদের রং যে কালো।"

"তা ত ফিঙেরও।"

"আর ওদের কদাচিৎ দেখা যায়।"

"সহরেই দেখা যায় না—নৈলে পাড়াগাঁয়ে ওরা যথেষ্ট।"

"তা হ'লেও বৌদি, ওরা যেন কেমন এক রকমের—ওরা যে কোত্থেকে আসে আর কোথায় যায়—"

"তার সঠিক্ খবর নিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে উড়্‌তে হয়! তবে ওরা যে যমপুরী থেকে আসে, এ বিশ্বাস বোধহয় তোমার নেই?

সুশীল খুব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্লে—

—"তা বলা যায় না; লোকে ত বলে ওরা যমরাজের গুপ্তচর"।

"গুপ্তচর হ'লে ওরা কোনদিনই প্রকাশ্যে কাছে আস্‌তো না।"

"আচ্ছা, না হয় দূতই হলো।"

"তাহ'লে ত ধর-পাকড় করতো।"

"কি আপদ! ধরনা ওরা যম-রাজের পেয়াদা—নোটিস্ জারী ক'রে বেড়ায়।"

"আর নিরীহ গেরস্তর কাছ থেকে বারবরদারী আদায় করে?"

বধূ এই বলে সুশীলের অলক্ষিতে একটা বড়ি কাকের দিকে ছুঁড়ে দিলেন।

"পেয়াদাটাই ঠিক—অন্তত শাস্ত্রে তাই বলে; কিন্তু ওর সঙ্গে তোমার কি কথা হচ্ছিল শুনি" ?

"সে অনেক কথা,—ওর সুখদুঃখের কথা।"

"বটে! দাঁড়কাকের আবার সুখদুঃখ!"

"তা নেই? পাখীরা উড়ে বেড়ায় বলে কি আর ঘরসংসার করে না?"

এমন সময় দাঁড়কাক ডালের গায়ে ঠোঁটের দু'পাশ ভাল করে ঘসে নিয়ে ডাক্‌লে—"কং-—কঃ।"

সুশীল কৌতূহলী ছাত্রের মত জিজ্ঞাসা করলে—"বৌদি, এবার?"

"এবার ও বল্‌ছে যে, এ কথা কে কাকে বোঝায়।"

"বটে! তাহলে তুমি সত্যি সত্যিই ওর আত্মজীবনী শুনেছ দেখ্‌ছি—আচ্ছা, বল দেখি ওর জীবনের বৃত্তান্তটা কি?"

"না:—সে আর তোমার কাছে বলবো না—ও আমাকে বিশ্বাস করে'—"

দাঁড়কাক অমনি তার পুচ্ছাগ্র বিস্ফারিত করে' ডাক্‌লে "ক্যও—ক্যও।"

সুশীল অম্নি বলে' উঠ্‌লো—"বৌদি! বল, অনুমতি দিয়েছে।"

বৌদিদিকে অগত্যা কাকের জীবনচরিত প্রকাশ কর্‌বার জন্যে প্রস্তুত হতে হ'ল; তিনি ছেলেটাকে সুশীলের কোলে দিতে দিতে বল্‌লেন—

"তাহ'লে একে ধর, আমি বড়ি দিই আর গল্প করি—অর্থাৎ কি না ইতিহাস বলি।"

"তুমি ইতিহাসকে ঠাট্টা ক'রোনা বৌদি—ওটা আমার ভারি প্রিয় জিনিস; কিন্তু দেখ, তোমার নতুন বন্ধু কেমন একদৃষ্টে বড়ির দিকে চেয়ে আছে, আর ওর বাঁ চোখটা কেমন ছল্ ছল্ কর্‌ছে।"

"ওটা হচ্ছে শূন্যদৃষ্টি; আর ঐ যে চোখ ছল্‌ছল্ কর্‌ছে ওটা হচ্ছে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন।"

"তুমি ওকে দু'একটা বড়ি দিয়েছ বুঝি ?"

"না, তা কেন ? ওর নামে তুমি যে সব অপবাদ দিচ্ছিলে, তা কাটিয়ে দিয়েছি।—যাক্, এখন তাহলে শোন; কিন্তু ও যেরকম ভাবে বলেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই বল্‌বো ঃ—

প্রথম যেদিন আমি ডিম থেকে ফুটে বের হলুম, চেয়ে দেখি আমার কাছে আর কেউ নেই—কেবল আমারি মত একজন। তার চোখ দুটী একটু লাল আর ঠোঁটটি একটু ছোট। সে আমার দাদা, কি ছোট ভাই—এই কথা মনে মনে ভাবছি, এমন সময় মুখে কি নিয়ে মা উড়ে এল। আমরা দুজনেই হাঁ করলুম, কিন্তু মা "আধার" আমার মুখে দিলে—তার মুখে দিলে না; অথচ তারই মাথায় ঠোকর মারতে আরম্ভ করলে। সে 'কু—কু' করে কেঁদে উঠ্‌লো,—সে কান্না কি মিষ্টি ! দেখাদেখি আমারও কান্না পেলে, কিন্তু আমার গলা দিয়ে বের হলো একটা মোটা বিশ্রী সুর,—যা আমারই ভাল লাগলো না। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার ডাকলুম,—কিন্তু সেই এক সুর। 'কা' আর কিছুতে 'কু' হল না। ওদিকে ঠোকর খেতে খেতে সে অতিকষ্টে বাসা ছেড়ে

উড়লো, তারপর কোথায় যে চলে গেল—কে জানে। তার পিছনে পিছনে মাও উড়ে চল্‌লো, আরো যেন কে কে।"

দেখা গেল দাঁড়কাকটা নীচের ডাল থেকে লাফিয়ে একটি উপরের ডালে গিয়ে বস্‌লো, এবং অসীম আকাশের দিকে হতাশ নয়নে চেয়ে ডাকলে—"ক্ব—ক্ব।"

"বৌদি ?—"

"ও বল্‌ছে 'ক্ব গতা', অর্থাৎ কোথায় গেল সেদিন, সেই মায়ের আদর ?"

এমন সময় একটী পাঁচ বছরের ছোট মেয়ে এক-থালা মাখা-ভাত হাতে করে ছাদের উপর উঠে এল ; বধূ তাকে দেখেই বল্‌লেন—

"অপু, মা, ওইখানে ব'স, রোদপিঠ করে'—হাঁ, হাঁ—লক্ষ্মী মেয়ে—খাইয়ে দিতে হবেনা ত ?"

বালিকা "আমি খাবো" বলে' পা ছড়িয়ে বস্‌লো, এবং থালাটাকে পায়ের মধ্যে রেখে প্রমাণ কর্‌বার চেষ্টা করলে যে সে নিজেই খেতে শিখেছে।

সুশীল তার ভাবভঙ্গী দেখে খুব এক চোট্ হেসে বল্‌লে—"তা ত বটেই—তুই মা'র হাতে খাবি কেন ? তোর মা'র হাত যে নোঙ্‌রা"—তারপর বৌদিদির দিকে ফিরে বল্‌লে—"তার পর ?"

"তারপর আমি বড় হ'য়ে তাকে অনেক খুঁজলুম, কিন্তু কোথাও আর দেখতে পাই না ; শেষে একদিন দেখি কি, সে একটা আমগাছে বসে আম খাচ্ছে, আর মাঝে মাঝে মুখ নীচু করে ডাক্‌ছে, আর এক দল ছেলেমেয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে উঁচু দিকে চেয়ে আছে।

আমি গাছে গিয়ে ব'সতেই, সে খাওয়া বন্ধ কর্‌লে। আমি ভাবলুম বুঝি সে আমাকে চিন্‌তে পেরেছে, কিন্তু তার সঙ্গে একটা কথা বল্‌তে না বল্‌তেই সে এক রাশ 'কু—কু—কু—কু' শব্দ করে, নক্ষত্রবেগে কোথায় উড়ে গেল। আমি কি করি, ছেলেরা পাছে মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই তার জায়গায় বসে তারই মতন করে ফলে মুখ দিতে যাচ্ছি—এমন সময় কি একটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। চম্‌কে উঠে নীচের দিকে চেয়ে দেখি, ছেলেরা ঢিল কুড়চ্ছে আর বলাবলি করছে, "ভারি পাজী—কোকিলটাকে উড়িয়ে দিলে—আচ্ছা ওকে দেখে নিচ্ছি—দেখিস্ যেন ফলে না ঠোকর দেয়—ওর ঠোক্‌রানো ফল খেতে নেই"। আর শোনবার কি দেখবার প্রবৃত্তি রইল না; আমি যেদিক হয় একদিকে উড়ে গেলুম। কিন্তু ছেলে-দের উপর তত রাগ হল না—যত হিংসে হল ঐ কোকিলটার উপর। আমার মনের ভিতর থেকেও কে যেন বলে দিতে লাগ্‌লো "ওকে হিংসে করাই তোর উচিত।"

তারপর তার খোঁজ আর করলুম না, কিন্তু এটা বেশ দেখতে পেলুম যে, ভাল ফলের গাছে বস্‌তে গেলেই লোকে আমাকে তাড়ায়—তারা আমার জন্যেই ক্ষেতের মধ্যে চুনমাখা হাঁড়ি, আর গাছের ডালে পাতি-কাকের ডানা টাঙিয়ে রাখে। তা দেখে আমার মনে আতঙ্ক হয়। ক্রমে এমন হলো যে, ভাল করে না দেখেশুনে, কি চারপাশে না ঘুরে এসে আমি কোন গাছেরই ডালে বস্‌তে সাহস করতুম না। ভয় হল হয়ত চিরজীবন আমাকে ডানাতে ভর দিয়েই থাক্‌তে হবে। কিন্তু শেষে জান্‌তে পারলুম যে, কেবল দুটো গাছ আছে, যার ফল খেলে কেউ আমাকে কিছু বলে না।"

সুশীল বাধা দিয়ে বল্লে—"সে কি, বৌদি ?"

"এই বট আর জগ্‌ডুমুর।"

"অর্থাৎ যে ফল মানুষে ছোঁয় না।—আচ্ছা, তারপর ?"

"তারপর আর কি—আমি গভীর বনের মধ্যে ঢুকে এক দেবদারু গাছের উপর একটা পাকারকমের বাসা তৈরী করলুম।"

"তখন তোমার বিয়ে হয়েছে ?"

"এইবার ঠেকিয়েছ—দাঁড়াও মনে করি"।

"এই শুন্‌লে, আর এই ভুলে গেছ ? যাক্, বুঝেছি—তাহলে এই-খানেই ইতিহাস শেষ, কেমন ?"

বৌদিদি কি বল্‌তে যাবেন, এমন সময় দাঁড়কাকটা আল্‌সের এক-ধারে এসে উড়ে বসে 'খা—খা' শব্দ কর্‌তে লাগলো।

"না—এবার বড় খারাপ রকম ডাক্‌ছে—ওকে উড়িয়ে দিই" বলে সুশীল এক টুকরো শক্ত বালি হাতে কর্‌লে।

বৌদিদি বল্লেন "না, না, উড়িও না—ও ভাল কথাই বল্‌ছে ; দেখছ না অপি কেমন ভাত ছড়াচ্ছে—বুক বেয়ে ভাতের স্রোত বইছে—এটা ওর সহ্য হচ্ছে না—ও জানে ভাতের দাম কি—তাই বল্‌ছে "খা, খা, কুড়িয়ে খা"।

"তোমার জন্যে বৌদি, পাখী ত পাখী, পিঁপড়েটারও আস্পর্দ্ধা বেড়ে যায়—ঐ শোন, মা সুদো বুদোকে ডেকে বল্‌ছেন অলক্ষুণে কাকটাকে তাড়িয়ে দিতে। আর ঐ দেখ, ও অপুর বুকের উপর থেকে এক ডেলা ভাত মুখে করে ডালের উপর গিয়ে বস্‌লো—আহা দেখ, বেচারীর মুখখানা ! ভয়েতে কাঁদ কাঁদ হয়েছে।"

বৌদিদি মেয়ের দিকে চেয়ে বল্লেন—"কাক বড় দুষ্টু—না? ওকে মারবো'খন—তুমি কেঁদনা—আরে কাগ!"

অপুর আলোড়িত মুখমণ্ডল আবার শান্তভাব ধারণ করলে; সে পুনর্ব্বার আহারে মনঃসংযোগ করতেই, তিনি ঠাকুর-পোর দিকে ফিরে বল্লেন—"যা খেয়ে গিয়েছে ঠাকুর-পো, তার ত আর চারা নেই—এখন থেকে দেখো যেন পাতের দিকে না যায়।"

"তা দেখবো'খন'; কিন্তু দেখেছ বৌদি, ওর নাকের উপর কেমন একটা ছেঁদা?"

"হাঁ, ওটার কথাই ত বল্‌তে যাচ্ছিলুম—তা ত শুন্‌লে না।"

"না, বল।"

"আমি একদিন উড়্‌তে উড়্‌তে একটা মস্ত বাড়ীর রেলিংএর উপর গিয়ে বসি; সেখানে দেখি কি যে, বারান্দার খাঁচায় সেই কোকিল। সে তখন খাচ্ছিল পাকা কলা আর তেলাকুচো। যথার্থ বল্‌তে কি, আমার লোভ হল—ও সব ত আমি খেতে পাই না। শুধু বেল পাক্‌লে কেন, অনেক ফল পাক্‌লেই আমার স্বার্থ নেই।

আমি ভাবতে লাগলুম, আমাকে কেন লোকে খাঁচায় ধরে রাখে না? আমি কি ওর চেয়ে দেখতে মন্দ? অবশ্যই নই, যদি স্বাস্থ্য ও বল দুয়ে মিলে সৌন্দর্য্য হয়।

তবে সুর?—তা কি সকলের গলায় থাকে? হীরেমন চন্দনা কাকাতুয়ার আছে?—তবে একটা কথা এই, তারা ধরা দেয়, আমি ধরা দিই না। সেটা আমার বোকামি। এই যেমন মনে হওয়া, অমনি আমি আর নড়লুম না—ছেলেরা এসে আমাকে ধর্‌লে, কিন্তু যদিও পাশে একখানা খালি-খাঁচা ছিল, তবু আমাকে তার মধ্যে পুরলে না—কেবল

নাকে একটা কড়ি পরিয়ে হাতভালি দিতে দিতে উড়িয়ে দিলে। কি করি, আমি আর একটা বাড়ীতে উড়ে পড়লুম। সেখানে তোমারি মত কে একজন বেড়াচ্ছিল, তার নাকে তোমারি মত একটা কি। ভাবলুম আমারও নাকে যখন একটা কিছু রয়েছে, তখন আমাকে নিশ্চয়ই আপনার লোক বলে আদর করবে; কিন্তু সে আমাকে দেখে হাস্‌তে হাস্‌তে আর দশজনকে ডেকে দেখাতে লাগলো—শেষে আমি যাই না দেখে একটা ধনুক নিয়ে তাড়া করলে। রাগে এবং দুঃখে আমি নিজের দলে উড়ে গেলুম।"

দাঁড়কাকটা আবার আল্‌সের উপর নেবে 'কা—কা' করে ডেকে উঠ্‌লো।

সুশীল বল্লে—"ঐ বৌদি, আবার যাচ্ছে।'

বৌদিদি বল্লেন "নজর রেখো, কিন্তু ও ডাকের মানে হচ্ছে "কা গতিঃ" অর্থাৎ 'উপায় কি?' বাস্তবিকই তখন ও ছাড়া আর আমার উপায় কি ছিল—কিন্তু তারা আমাকে খাতির করা দূরে থাক্, বরং ঠোক্‌রাতে এলো; এমন কি, যার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছিল, সেই দাঁড়কাকীটাও আমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল।

মনের দুঃখে, দল ছেড়ে নিজের বাসায় উড়ে গেলুম। সেখানে গিয়ে দেখি, ঝড়ে আর বৃষ্টিতে বাসাটা একটু আল্‌গা হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দিয়ে সেটাকে মেরামত করতে গিয়ে, নাকের কড়িটা পড়ে গেল। কিন্তু তাহলেও আর নিজের দলে গেলুম না।"

"পাতি কাকের দলে?"

"তারা হচ্ছে ছোট জাত—তাদের গাম্ভীর্য্যও নেই।—কাজেই শেষে ঠিক করলুম নিজের বাসাতেই নির্জ্জন-বাসে থাক্‌বো, আর নেহাৎ

বেড়াতে ইচ্ছে হ'লে লোকালয়ের কাছ দিয়ে ঘুরে আসবো। তারা তাড়াক্ আর যাই করুক—সেখানে কিছু পাওয়া যায়।"

"পাওয়া যায়—কিন্তু সে চুরি করে।"

"সে পেটের দায়ে।"

"বৌদি, ঐ দেখ! কেমন আস্তে আস্তে এক-পা এক-পা করে এগচ্ছে, আবার অপুর হাত তোলা দেখে, পা না হটিয়ে গা টাকে হটিয়ে দিচ্ছে।"

"আচ্ছা, এই বড়িটা ছুঁড়ে দাও তো—দেখি এদিকে আসে কি না!"

বৌদিদির কথামত সুশীল বড়ি ছুঁড়ে দিলে, এবং তার এই ফল হ'ল যে, কাকটা দু'একবার বক্রদৃষ্টিতে বড়ির দিকেও চাইতে লাগলো; কিন্তু বড়লোকের দেওয়া জিনিস বড় হ'লেও নিতে ভয় হয়—তাই সে একবার একটু এগিয়ে, যথাক্রমে সুশীল আর তার বৌদিদির দিকে স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করে, এবং কোনরকম একটু অঙ্গসঞ্চালন দেখলেই তিন পা পিছিয়ে যায়,—এইরকম কিছুক্ষণ ধরে অভিনয় করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ একটা প্রবল সাহসে ভর করে, বড়িটার কাছেই উড়ে এসে বস্‌লো, এবং আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করে, গলা ও ঠোঁট যথাসম্ভব লম্বা করে দিয়ে বড়িটাকে মুখে তুলে নিয়েই ডালিম গাছের সর্ব্বোচ্চ ডালে উড়ে বসলো।

এমন সময় নীচে শব্দ শোনা গেল "উইরে ওই—দে গুলতী দে।"

বৌদিদি খুব হেসে বল্লেন—"দেখ্‌লে ত ঠাকুর-পো ওর সাহস—ও যমের পেয়াদা হওয়া দূরে থাক্, আদালতের পেয়াদা হতে পারে কি?"

এমন সময় কাকটা ঝট্‌পট্‌ কর্‌তে কর্‌তে ডালিম গাছ থেকে ছাদের উপর লুটিয়ে পড়্‌লো।

সুশীল চেঁচিয়ে বলে উঠ্‌লো—"ঠিক্‌ বলেছ বৌদি—পেয়াদা নয়, আসামী। ঐ দেখ, যমরাজ ওকে তলব করেছেন।"

বৌদিদি বড়ির উপর দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটে গিয়ে দাঁড়কাকটাকে বুকের মধ্যে তুলে নিলেন এবং চেঁচিয়ে বল্লেন—"ঠাকুর-পো—জল,—শীগ্‌গির!"

সুশীল ছেলেকে ছাদের উপর নামিয়ে রেখে দ্রুতবেগে নীচে ছুটলো।

বৌদিদি কাকটার চোখে মুখে বার বার ফুঁ দিতে লাগলেন; সে একবার তার ওল্টানো চোখ মেল্‌লে, কিন্তু আবার তা উল্টে গেল। বৌদিদির এক ফোঁটা চোখের জল তার চোখের মধ্যে নিয়ে সে তার লট্‌কানো ঘাড়টাকে তাঁর হাতের উপর ঝুলিয়ে দিলে।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘটক।

শিশু-শিক্ষা।

———:০:———

বর্ত্তমানে বাঙ্গলা-দেশে জাতি গঠনের যে একটি প্রবল বাতাস বহিয়াছে তাহার প্রমাণ চারিদিক হইতে পাওয়া যায়। সকল শ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ের চিন্তা ও আলোচনা চলিয়াছে। বাঙ্গালী জাতিটিকে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য নানারূপ চেষ্টাও হইতেছে এবং এই চেষ্টার যে কিছু ফলও হইয়াছে তাহার প্রমাণ বাঙ্গালীর Ambulance Corps ও double Company.

জাতি গঠণের বড় বড় সমস্যার আলোচনার মধ্যে পড়িয়া কতকগুলি অতি আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি আমরা একেবারে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। অগ্রহায়ণ মাসের 'সবুজ পত্রে' বীরবল শিশু-সাহিত্যের ও শিশু-শিক্ষার আলোচনা করিয়া আমাদের নিকট একটি ভাবিবার বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন। শিশুরাই যে কালক্রমে যুবক হইয়া উঠে তাহা আমরা অনেক সময় ভুলিয়া যাই। যুবকদের কিসে ভাল হইবে, কিরূপে তাহাদের জীবন গঠিত করিতে হইবে এই সব লইয়া আমরা বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি, কিন্তু শিশুকে কি উপায়ে দেহ ও মনে সুস্থ ও সবল যুবকে পরিণত করিতে পারা যাইবে সে বিষয়ে আমরা একেবারেই অমনোযোগী। তাই আমার কাছে আমাদের জাতিগঠনের প্রচেষ্টা অনেকটা "গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়া" বলিয়া মনে হয়।

শিশুদের শিক্ষাদান করা যে কি দুরূহ ব্যাপার তাহা আমরা একেবারেই উপলব্ধি করিতে পারি না। ছেলের বয়স চারি পাঁচ বৎসর

হইলেই তাহাকে একটী অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়া আমরা তাহার শিক্ষার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকি। এই শ্রেণীর শিক্ষক যে শিশুদিগকে শিক্ষা দানে কতদূর অনুপযুক্ত তাহা একবার ভাবিয়াও দেখি না। তাহাদের বিশ্বাস দ্বিতীয় ভাগের বানান ও নাম্‌তা মুখস্ত করানই শিক্ষার আদর্শ। ছোট ছোঠ ছেলেদের দেহমন যখন এইপ্রকার শিক্ষকের দ্বারা বিপর্য্যস্ত হইতে দেখি, তখন আমার কেবলই মনে হয় যে আমরা এখনও পর্য্যন্ত শিক্ষা জিনিসটা যে কি তাহা একেবারেই ধারনা করিতে পারি নাই। আমার একটি ডেপুটী বন্ধু তাঁহার পুত্রটীকে উত্তমরূপে লেখাপড়া শিখাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়স হইতে তাহাকে নিজের হস্তে লইয়া অল্প বয়সে এনট্রান্স পাস করাইবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ওই বয়স হইতে তিনি সকালে দুই ঘণ্টা ও বিকালে দুই ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ নিজে পড়াইতেন, ইহা ব্যতীত ঐ শিশুকে স্কুলে পাঁচ ঘণ্টা করিয়া কাটাইতে হইত। প্রথম দুই এক বৎসর ইহার ফল আপাতদৃষ্টিতে ভাল হইয়াছিল, কিন্তু সে যতই উপরের ক্লাসে উঠিতে লাগিল, ততই তাহার অবনতি ঘটিতে লাগিল।

উপরের ক্লাসে যেখানে কিছু কিছু বুদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজন সেখানে সে একেবারেই হটিয়া গেল। মুখস্তদ্বারা যতদূর সম্ভব তাহা সে করিতে পারিত, কিন্তু সকল বিষয়ে মুখস্ত করিলে চলে না। যেখানে বুদ্ধি চালনার দরকার সেখানে সে অন্যান্য বালকদের অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিত।

এই বালকটীর উপর আমি অনেক দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম এবং ভবিষ্যতে ঐ প্রকার শিক্ষার তাড়নায় যে কি ফল হয় তাহা দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সতর আঠার বৎসর বয়সেই সে

গুরুতর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাহার পিতা তাহার লেখা পড়া বন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হন। এই প্রকার Incubator-এর মধ্য দিয়া ছেলে মানুষ করিবার প্রথায় যে কি বিষময় ফল উৎপন্ন হইতেছে তাহা বলিয়া উঠা যায় না, কত শত শত বালক বালিকা যে এই প্রকারে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নোদ্যম হইয়া সমাজের ভারস্বরূপে জীবন যাপন করিতেছে, তাহার ইয়ত্বা নাই।

শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেমন বয়োঃবৃদ্ধির সহিত ক্রমশঃ পূর্ণতা লাভ করে, মস্তিষ্কের গঠনেও সেইরূপ ক্রমঃবিকাশ লক্ষিত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত ভারবহন শিশুর শরীরের পক্ষে যেরূপ অসম্ভব, তাহাকে অতিরিক্ত ভারবহন করাইলে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি যেরূপ স্থানে স্থানে বাঁকিয়া যায় সেইরূপ অপরিপক্ক মস্তিষ্কের উপর অতিরিক্ত ভার চাপাইলে তাহার পূর্ণ-বিকাশের বাধা ঘটিয়া থাকে। মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র Cell গুলি এই প্রকার চাপে পিষ্ট হইয়া যায় ও ভবিষ্যতে বয়োঃ-বৃদ্ধিসহকারে পূর্ণতা-লাভ করিতে পারে না। শিশু ভূমিষ্ট হইবার পর হইতে তাহার মনঃবৃত্তিগুলির ক্রমঃ-বিকাশ যে কত ধীরে ধীরে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা সকলেই লক্ষ করিয়াছেন এবং মনঃবৃত্তিগুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে দেওয়া এবং তাহাদের স্বাভাবিক স্ফুরণে সাহায্য করা যে পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহার পরিবর্ত্তে আমরা সেই মনঃবৃত্তিগুলিকে চাপিয়া শিক্ষার কৃত্রিম ছাঁচে ঠাসিয়া পুরিয়া দিয়া শিশুকে একটী অকালপক্কবৃদ্ধে পরিণত করি, তাহার ফল এই হয় যে বাঙ্গালীসন্তান চল্লিশ না পার হইতেই অশীতি বর্ষ বৃদ্ধের ন্যায় হইয়া পড়ে, চল্লিশ বৎসর বয়সেই তাহার জীবনের সমুদয় কাজ ও সমুদয় আশা ও ভরসা ফুরাইয়া যায়।

সাধারণ বাঙ্গালীর ঘরে মেয়েদের উপর শিক্ষার তাড়না ততটা অধিক নহে, সেই জন্য একটী দশ বৎসরের মেয়েও একটী দশ বৎসরের ছেলেতে অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। মেয়েটীর মধ্যে কেমন একটী পূর্ণতার ও আত্মনির্ভরের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ছেলেদের মধ্যে সে ভাব ও এ বয়সে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। মেয়েটী অধিকাংশ সময়ই খেলিয়া বেড়াইয়াছে, সঙ্গিনীদের সহিত পুতুলখেলায় বা গল্পগুজবে সময় অতিবাহিত করিয়াছে, কখন বা বয়স্কাদিগের গৃহকর্ম্মের সাহায্য করিয়াছে, এই-রূপে তাহার দেহ ও মন উভয়ই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। বালকটি কিন্তু চার বৎসর বয়স হইতেই একটী অজ্ঞ শিক্ষকের হস্তে দুই বৎসর কাল নিষ্পেষিত হইয়া ষষ্ট বৎসর বয়সে স্কুলে প্রেরিত হইয়াছে, স্কুলে প্রত্যিদিন পাঁচঘণ্টা করিয়া অবরুদ্ধ থাকিয়া ও বাড়ীতে দুই ঘণ্টাকাল প্রাইভেট টিউটারের তাড়না খাইয়া, তাহার স্বাভাবিক মনঃবৃত্তিগুলি একেবারে হারাইয়া বসিয়া আছে। তাহার মধ্যে কোন প্রকার স্বাধী-নতা স্বাতন্ত্র্য বা আত্মনির্ভরতা বিকশিত হইতে পারে নাই। তোতা পাখীর মত, কতকগুলি পুস্তক গলাধঃকরণ করিয়াছে মাত্র, সেই সকল পুস্তকের ভিতরে তাহার প্রবেশ করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। কালে সেই বালক হয়ত বিএ ও এমে পাস করে বটে কিন্তু তাহার মনঃবৃত্তিগুলির অফুটন্ত ভাবেই থাকিয়া যায়। তাহাতে আর উচ্চ শিক্ষার ফল ফলে না।

এই প্রকার শিক্ষার ফল যে কি বিষম, তাহা জার্ম্মনি বহুদিন পূর্ব্বেই উপলব্ধি কারতে পারিয়া।ছল, এবং সেই জন্য সে দেশের Kinder garten প্রণালীতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রথা প্রচলিত

হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে বাঙ্গলা-দেশে Higher education-এর জন্য বড় বড় College হইয়াছে, প্রতি বৎসর কত নূতন নূতন College কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্যপুত্র হইতেছে, কিন্তু শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার সুচারু বন্দোবস্ত করিবার কোন প্রকার চেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। পুস্তক কণ্ঠস্থ করা ব্যতীত যে অন্য কোন প্রকারে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব তাহা আমরা ভাবিয়াই উঠিতে পারি না। শিশুদিগের সহিত গল্প করিয়া ছবি দেখাইয়া তাহাদের Museum অথবা চিড়িয়া-খানায় লইয়া গিয়া যে কথোপকথনছলে কত শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা আমরা একেবারেই জানি না।

পর্য্যবেক্ষণশক্তি শৈশবকাল হইতে চর্চ্চিত না হইলে কখনই তাহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। পুস্তকের সাহায্যে এই শক্তিটীর চর্চ্চা কিছুতেই সম্ভব নহে। দেখিয়া শুনিয়া যে ধারণাগুলি মনোমধ্যে একবার সঞ্চিত হয় তাহা কিছুতেই অপনোদিত হইতে পারে না, এই সময় যাহাতে ঐ সকল ধারণাগুলি সঠিক হয় তাহার জন্য যত্নবান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবন, শৈশব ও বাল্যকালের শিক্ষা ও দীক্ষার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে, এই সময় তাহাদিগকে তোতাপাখী তৈয়ারী না করিয়া যাহাতে তাহাদিগের বুদ্ধিশক্তি পরিমার্জ্জিত হইতে পারে, তাহার জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন. ছেলেরা যাহাতে দেখিয়া শুনিয়া ভাবিয়া চিন্তিয়া নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে, সেই শিক্ষাই শিক্ষা। সকল সময়ই যে তাহাদের সিদ্ধান্ত ঠিক হইবে তাহা নয়, ভুল হইলেও, ক্রমে আপনা হইতেই তাহা সংশোধিত হইয়া যাইবে। এখন আমরা যেরূপ ভাবে ছেলেদের শিক্ষা দিই তাহাতে কেবল তাহাদের স্মৃতিশক্তির

চর্চ্চা হয়। স্মৃতি একটী আবশ্যকীয় পদার্থ হইলেও বুদ্ধি ও বিবেচনার সাহায্য ব্যতীত তাহার দ্বারা কোন প্রকার কাজ হয় না, সময় সময় অপকারই ঘটে। আমার মনে হয় ছেলে মেয়েদের ছয় সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের নিজের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত। এই সময় তাহারা হাঁসিবে, কাঁদিবে, উঠিবে, পড়িবে, ভাঙ্গিবে, গড়িবে এবং ইহাতে যে আত্মনির্ভরতা ও স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে তাহা ভবিষ্যৎ জীবনে তাহাদিগের বিশেষ কাজে লাগিবে। স্বাধীন চিন্তা আত্ম-নির্ভরতা জ্ঞানলিপ্সা প্রভৃতি কতকগুলি গুণ শিশুবয়সে অভ্যস্থ না হইলে পরে আর কখনই উপার্জ্জন করা যায় না। এই বয়সে যাহাতে ঐ সকল গুণ শিশুদের মনে প্রস্ফুটিত হইতে পারে তাহার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতে হইবে। বাঙ্গালী-জাতির মধ্যে এই গুণগুলির যে সম্পূর্ণ অভাব দেখিতে পাওয়া যায় তাহার একমাত্র কারণ যে শৈশবে সে সকলের চর্চ্চা করা হয় নাই।

কি জীব-জগতে কি উদ্ভিদ-জগতে সর্ব্বত্রই দেখা যায় প্রকৃতির প্রধান চেষ্টা বৈচিত্র্য সাধন করা। দুইটী মানুষ দুইটী ফুল বা দুইটী ফল কখন একরূপ হয় না। তাহাদের পরস্পারের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য বিদ্যমান থাকেই থাকে! প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ফলে এই বৈচিত্র্য হইতে নূতন নূতন জাতি ও শ্রেণী উৎপন্ন হইতেছে। কৃষিক্ষেত্রে ও পুষ্পোদ্যানে এই বৈচিত্র্যতার সাহায্যে ফুল ফল ও শস্যের নানারূপ উৎকর্ষসাধন করা হইতেছে। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জাতিগত, সমাজগত ও বংশগত কতকগুলি গুণ উত্তরা-ধিকারী রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা ব্যতীত তাহার ভিতর এমন কিছু গুণ থাকে যেটী তাহার নিজের এবং সে গুণটী অন্যান্য

সকল মানব হইতে তাহাকে বিশিষ্ট করিয়া রাখে। অধিকাংশ সময়েই অনুকরণপ্রিয়তা ও শিক্ষার চাপে তাহার এই নিজস্ব গুণগুলি অস্ফুটন্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। আমরা আমাদের সন্তানগুলিকে নিজেদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে চাই, কাজেই শিশুর প্রকৃতিগত বৈলক্ষণ্যটী আমাদের চোখে বিসদৃশ লাগে। এবং সেইজন্য সেটীকে দমন করিবার নানারূপ চেষ্টা করিয়া থাকি, ইহার ফল এই হয় যে, যে বিশেষ একটী গুণ লইয়া শিশু জন্ম করিয়াছিল, যে গুণটী প্রস্ফুটিত হইলে সে অন্যান্য জনসাধারণের সমক্ষে মাথা উঁচু করিয়া চলিতে পারিত, অঙ্কুরাবস্থাতেই আমরা সেটিকে নষ্ট করিয়া সাধারণের সহিত তাহাকে একসার করিয়া দি। গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের মধ্যেও আমরা নির্ব্বাচন করিয়া তাহাদিগের জাতি ও শ্রেণীর উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকি কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমাদের নিজেদের সন্তানের সময় ঐরূপ নির্ব্বাচনের যে কোন বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা ভুলিয়া যাই। পশুপক্ষীদিগের নির্ব্বাচন তাহাদিগের শারীরিক গঠনের উপর নির্ভর করে, মানবশিশুর নির্ব্বাচন তাহাদিগের বুদ্ধি ও মনোবৃত্তি সকলের বিকাশের উপর নির্ভর করে। যাহার যে গুণটী বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় সেই গুণটীর উৎকর্ষসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। শৈশবের প্রথম কয়েক বৎসর শিশুকে শিক্ষার কৃত্রিমতার মধ্যে আনিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার নিজের হাতে ছাড়িয়া দিলে তাহার কোন্ শক্তি বা কোন্ মনোবৃত্তি বিশেষরূপে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে তাহা সহজেই বুঝা যায় এবং তখন সেইটীর উৎকর্ষসাধনও বড় কঠিন হয় না। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে আমাদিগের মধ্যে যে গুণগুলির অভাব লক্ষিত হয় সেই সকল

গুণ যাহাতে আমাদিগের সন্তানদিগের মধ্যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহারই চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য এবং তাহার একমাত্র উপায় শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার উপায় নির্দ্ধারণ। চিরপ্রচলিত গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে আজ যাহা হইতেছে দুই শত বৎসর পরেও তাহাই হইবে। নবযুগ বা নবজীবন বাঙ্গালীর স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে।

শ্রীমৃগেন্দ্র নাথ মিত্র।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

কলিকাতা।
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
উইক্লী নোট্স প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট।
শ্রীসারদা প্রসাদ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

আমাদের শিক্ষা।

——:০:——

স্পর্শ করলে দেহের যে অঙ্গ একেবারে সাড়া দেয় না, সে অঙ্গ মৃত—আর যে অঙ্গ অতিরিক্ত সাড়া দেয়—সে অঙ্গ রুগ্ন।

আমাদের ব্যবহারে মনে হয় যে, ব্যথা আমাদের সকল গায়ে ;—কেননা কেউ আমাদের গায়ে হাত দিলে, আমরা অসঙ্গত ভাবে চীৎকার করে উঠি—অসম্ভব রকম ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ি। শুধু তাই নয়, দেখতে পাই অনেকের ধারণা যে সহ্যগুণটা মেয়েলি-ধর্ম্ম এবং চীৎকার করাতেই মানুষে পৌরুষের পরিচয় দেয়।

আমাদের সব চাইতে বেশী ব্যথা লাগে, যদি কেউ আমাদের অহঙ্কারে আঘাত করে,—তার কারণ আমরা জাৎকে জাৎ রাতারাতি বেজায় অহঙ্কারী হয়ে উঠেছি। আমাদের বিশ্বাস যে বর্ত্তমান যুগে আমরা ভারতবর্ষের সর্ব্বাগ্রগণ্য জাতি। এ দাবীর মূলে আছে আমাদের শিক্ষা। মাথা-গুণ্‌তি হিসেবে বাঙ্গালী যে সব চাইতে উচ্চ-শিক্ষিত তার প্রমাণ বোধহয় সেন্‌সাস্‌-রিপোর্ট থেকেই পাওয়া যায়। তারপর এ যুগের নবশিক্ষা আমাদের জাতীয়-দেহে যে কতকটা নব-জীবন এনে দিয়েছে, আমাদের মনে যে ইউরোপীয় সভ্যতার রং একটু বেশী করে ধরেছে—এ সত্যও প্রত্যক্ষ। সুতরাং আমাদের শিক্ষার কেউ নিন্দা কর্‌লে, অমনি আমাদের গাত্রজ্বালা উপস্থিত হয়। এবং প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির কেউ বদল কর্‌তে চাইলে আমরা মনে মনে প্রমাদ গণি।

সম্প্রতি এ দেশের ইংরাজি-কাগজওয়ালারা আমাদের, শিক্ষার উপর কলমের খোঁচা দিতে সুরু করেছেন এবং তাতে আমরা অস্থির হয়ে উঠেছি। আমি পূর্ব্বেই বলেছি খোঁচা খেয়ে খিঁচুনিটে দেহমনের স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। পরনিন্দা পরখ করে দেখলে, দেখতে পাওয়া যায় যে, তা প্রায়ই নেহাৎ বাজারে জিনিস।

সে যাই হোক আমাদের শিক্ষিত-সম্প্রদায়কে মনে রাখতে হবে যে, আমাদের কপালে লোকে-লোক-লাঞ্ছনা ও ঘরে গুরুগঞ্জনা দুই লেখা আছে। এই ডাইনে বাঁয়ে আক্রমণের ভিতর দিয়ে—আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন পথ কেটে বেরিয়ে যেতে হবে। সে শক্তি যদি আমাদের না থাকে ত আমরা যথার্থ শিক্ষিত নই। কেননা যে জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের আত্মশক্তিকে প্রবুদ্ধ না করে, তা শুধু বিদ্যার পাপের বোঝা। আর তা ছাড়া আমরা আজকাল যে নিন্দার ভাগী হয়ে পড়েছি তার ওজন যতই বেশী হোক্, তার মূল্য যাচাই সাপেক্ষ।

আমাদের শিক্ষার উপর একদল ইংরাজ এই কারণে নারাজ যে তার ফলে আমরা এ দেশের প্রচলিত রাষ্ট্রতন্ত্রের বদল চাই আর আমাদের গুরুজনদের মধ্যে একদল এই কারণে নারাজ যে, আমরা এ দেশের প্রচলিত সমাজ-তন্ত্রের বদল চাই। এঁরা উভয়েই চান যে আমরা শিক্ষা পাব নতুন কিন্তু আমাদের মন থেকে যাবে সনাতন। এক কথায় এঁরা চান যে বাঙ্গালী তার মনের আবাদ কর্‌বে—কিন্তু তাতে কোনও ফসল ফলবে না। শিক্ষার এ রকম যদি কোনও আদর্শ-পদ্ধতি থাকে ত মানব-সমাজ আজ পর্য্যন্ত তা আবিষ্কার কর্‌তে পারে নি। আর যদি কস্মিনকালে পারে ত বাঙ্গলাদেশে তা বিশেষ কাজে লাগবে না; কেননা বাঙ্গালীর দেশের মত বাঙ্গালীর মনও মরুভূমি

নয় সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে ভাবের বীজ বোনা যাবে তা উপ্ত ও অঙ্কুরিত হতে বাধ্য। সে আমাদের মাটির গুণে—বিলেতি লাঙ্গলের দোষে নয়।

সুতরাং সমালোচকদের খোঁচাখুঁচিতে অধীর হয়ে পড়বার বিশেষ কোনও কারণ নেই— তবুও যে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠি—তার থেকে কি এই প্রমাণ হয় না যে আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানের ভিৎ এখনও তেমন পাকা হয় নি এবং সেইজন্য তার উপর কেউ হস্তক্ষেপ করলে আমরা অযথা রকম ভয় খাই?

আমার মতে কিন্তু আমাদের গায়ে যে খোঁচা মারে সেই আমাদের পরম সুহৃদ। খোঁচার ধর্ম্ম হচ্ছে মানুষকে সজাগ করে দেওয়া এবং এখন আমাদের ঘুমের অবসর নেই,—যে করেই হোক এ যুগে আমাদের হৃদয় মনকে জাগিয়ে রাখতেই হবে। আর যদি জাতীয় চৈতন্যকে জাগরুক করবার শক্তি আমাদের ভিতরে না থাকে ত বাইরের ধাক্কা আমাদের পক্ষে আদরের সামগ্রী হওয়া উচিত।

আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে পরনিন্দা যে আমাদের গায়ে সয় না—তার কারণ ওবস্তুতে আমরা নিজেই সন্তুষ্ট নই; এবং সন্তুষ্ট হবার কোন কারণও নেই। শুধু আমরা কেন; পৃথিবীর অনেক জাতই— স্বদেশের শিক্ষাপদ্ধতির উপর বিরক্ত—এবং সে বিরক্তির কারণ পৃথিবীতে আদর্শ শিক্ষা বলে কোনও বস্তু নেই, এবং হতে পারে না। শিক্ষা নিয়ে মানুষ আজ পর্য্যন্ত শুধু Experiment করছে এবং কাজে কাজেই Experience-এর ফলে—শিক্ষাপদ্ধতির নিত্য নতুন পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য। শিক্ষার যে একটা আদর্শ পদ্ধতি হতে পারে এ অমূলক ধারণা আছে শুধু অশিক্ষিত জনসাধারণের এবং প্রচলিত শিক্ষাই যে আদর্শ শিক্ষা এ অদ্ভুত বিশ্বাস আছে শুধু শিক্ষিত জনসাধারণের।

শিক্ষা নিয়ে মানুষে চিরকাল শুধু Experiment করে আস্‌ছে এ কথা সত্য হলেও পৃথিবীর অপর দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের এ বিষয়ে একটা প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে।

ইউরোপের সকল দেশের শিক্ষাপদ্ধতিই জাতীয় জীবনের সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে গড়ে উঠেছে—অবশ্য সমভাবে নয়। সে দেশের মামুলি শিক্ষা কখনও বা জাতীয় জীবনের গতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে নি, এবং সেই কারণে—তা নবযুগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, আবার কখনও বা সে শিক্ষা জাতীয় জীবনকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে এবং সমাজকে নবমন্ত্রে শিক্ষিত করে জাতায়-জীবনের নবতন্ত্র সৃষ্টি করেছে। গত একশ বৎসরের ইউরোপের ইতিহাস এই সত্যের পরিচয় দেয় যে ইংলণ্ডের শিক্ষার ধাৎ হচ্ছে জীবনের পশ্চাৎপদ থাকা আর জার্ম্মাণির অগ্রসর হওয়া। কিন্তু ধীরেই হো'ক আর দ্রুতবেগেই হোক—ইউরোপের সকল দেশেই শিক্ষার পদ্ধতি জাতীয় জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত হয়ে আসছে কারণ সে দেশের লোকেরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন, যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কখন বা নবশিক্ষা নবযুগের বোধন করে, কখন বা নবযুগ নবশিক্ষার আবাহন করে, এই যা তফাৎ।

অপর পক্ষে আমাদের নবশিক্ষা আমাদের জাতীয় বুদ্ধি কিম্বা জাতীয় নিবুর্দ্ধিতা থেকে জন্মলাভ করে নি। এ কালের স্কুল কলেজ দেশের মাটিতে গজায় নি, আকাশ থেকে পড়েছে—সুতরাং এ বস্তু আমরা এখনও ভাল করে চিনিনে সুতরাং এর ফলাফল সম্বন্ধে পাঁচ-জনের সন্দিহান হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।—শুধু তাই নয়, এই শিক্ষা দেশের মাটিতে শিকড় গাড়বে কি না সে বিষয়েও অনেকর সন্দেহ আছে।

কেননা তা মুলত বিদেশী। এ সন্দেহ অবশ্য একেবারে অকারণ। যে শিক্ষার বলে নব-ইউরোপের বুদ্ধি ও চরিত্র গড়ে উঠেছে তা আদিতে সম্পূর্ণ বিদেশী ছিল। গ্রীক্ ল্যাটিন সাহিত্যের ও খৃষ্ট ধর্ম্মের অজ্ঞতায়—ইউরোপীয় সভ্যতা যে কি রূপ ধারণ করত তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে ;—সম্ভবতঃ ইউরোপীয়েরাও পারেন না। পরস্পরের জ্ঞানের ভাবনার আদান প্রদান থেকেই বিশ্ব-মানবের মনের সাম্রাজ্য যুগপৎ স্থিতি ও বিস্তৃতি লাভ করছে। মনোজগতে যে জাতি একঘরে সে জাতি পতিত।

আমাদের জীবনের সঙ্গে আমাদের নবশিক্ষা যে আজও সম্পূর্ণ খাপ খায় নি—তার কারণ তা অতি নূতন। এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ত সে দিন হয়েছে। আমাদের এ সল্পায়ুঃ জাতের মধ্যে এমন লোক বোধ হয় আজও আছেন—যাঁরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাত-কর্ম্মের সময় উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং আমরা যে এই নবশিক্ষাকে একেবারে আপনার করে নিতে পারি নি তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। Oxford, Cambridge, Paris, Bologne প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বয়েস প্রায় হাজার বৎসরের কাছাকাছি—আর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবে ষাট পেরিয়েছে সুতরাং ইউরোপে শিক্ষা নিয়ে আজও যদি experiment চলে—তবে আমাদেরও যে তা চলবে তাতে আর আটক কি ? সত্য কথা এই যে আমাদের এই শিক্ষা প্রথমতঃ বিদেশী দ্বিতীয়তঃ নূতন সুতরাং এর মতিগতি ফেরাবার এর রীতিনীতি পরি-বর্ত্তনের যথেষ্ট অবসর আছে। আশা করি এ ধারণা কেউ মনে পোষণ করেন না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একপুরুষে এত বনেদি বড়মানুষ হয়ে উঠেছে—যে তার হালচাল আর বদলানো যাবে না।

আমাদের শিক্ষার এই অর্ব্বাচীন পদ্ধতি যাতে দেখতে দেখতে চোখের সুমুখে প্রাচীন না হয়ে ওঠে, নূতন যাতে সনাতন না হয় তার জন্য এর প্রতি আমাদের জাতীয় মন নিয়োগ কর্‌তে হবে, শিক্ষা সম্বন্ধে public opinion-এর সৃষ্টি কর্‌তে হবে, জাতীয় শিক্ষা জাতীয় বিচার বুদ্ধির অধীন কর্‌তে হবে। যে নিন্দা প্রশংসার ভিতর বিচার নেই, বিবেচনা নেই,—তা অবশ্য একটা উপদ্রব বিশেষ। এবং অনেকের বিশ্বাস যে ইংরাজিতে যাকে বলে public opinion তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অজ্ঞতাপ্রসূত—সুতরাং ও বস্তুর রাজনীতিতে যে সার্থকতাই থাক্ শিক্ষানীতিতে কোনই সার্থকতা নেই। যেখানে বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কারবার সেখানে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ছাড়া অপর লোকের মত প্রকাশ কর্‌বার কোনও অধিকার নেই—কেননা সে মতের কোনও মূল্য নেই। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। দেশে দেশে যুগে যুগে, মানুষে মানুষে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও উপায় সম্বন্ধে এতটা মতভেদের পরিচয় পাওয়া যে বোধ হয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে ও পৃথিবীতে ততটা মতভেদ নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় কর্‌বার পক্ষে public opinion-এর যথেষ্ট সার্থকতা আছে কেননা জাতীয় জীবনের আদর্শ কেবল মাত্র পুঁথিগত বিদ্যার সাহায্যে স্থির করা যায় না,—সে আদর্শ জাতীয় আশা ভরসা দিয়েই গড়া এবং কোনও বিশেষ দেশের কোনও বিশেষ যুগের সামাজিক আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার গুণেই জাতীয় মতিগতির লক্ষ্য নূতন হয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান করা আর সমাজের অভিপ্রায় তার ফলভোগ করা—সুতরাং এ উভয়ের সম্পর্ক আপেক্ষিক ও ঘনিষ্ঠ। বিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু। আর এর প্রমাণ সকল দেশেই পাওয়া যায় যে শিক্ষা দেওয়া যাঁদের

ব্যবস্থা তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকে শিক্ষার পদ্ধতির উপর এতটা নজর দেন, যে শিক্ষার উদ্দেশ্যের কথাটা তাঁরা প্রায়ই ভুলে যান। বিদ্যালয় নামক যন্ত্রটার কলকব্জায় তেল দেওয়াটাই তাঁদের কাছে হয়ে ওঠে গুরুতর কর্ত্তব্য। সুতরাং বিদ্যালয়বস্তুটি যে সমাজদেহের একটি বিশেষ অঙ্গ সে বিষয়ে গুরুমহাশয়দের সদাসর্ব্বদা সতর্ক করে রাখবার জন্য তাঁদের মনের উপর বারোমাস public opinion-এর চাপ রাখা আবশ্যক। নচেৎ এমন দিন আসে যখন সমাজ হঠাৎ আবিষ্কার করে যে শিক্ষা জিনিসটে জীবন-যাত্রার সহায় হওয়া দূরে থাক তার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে public opinion একটা হুজুগে পরিণত হয়। বাইরের একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় সামাজিক মন যখন চমকে উঠে চোখ মেলে, সব ঝাপসা দেখে তখন শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্ত্তনের জন্য তার আর তর সয় না। ফলে সকলে মিলে শিক্ষার উন্নতি সাধন করতে গিয়ে অনেক সময়ে তার বিভ্রাট ঘটায়। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে সামাজিক মনকে শিক্ষা সম্বন্ধে অহর্নিশি সচেতন করে রাখা যে জাতির পক্ষে কল্যানকর সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই এবং তার জন্য চাই public opinion অর্থাৎ দু'এক জনের সেই মত যা দশজনে নিজের বলে গ্রাহ্য করে নেবে। আমাদের দেশে আজকের দিনে প্রচলিত শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্গত public opinion নেই। কিন্তু তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট এবং কতকাংশে অযথা অসন্তোষ আছে।

এক দলের মতে এ শিক্ষায় শুধু কুফল ফলছে। কিন্তু কুফলটা যে কি সে বিষয়ে এঁরা সকলে একমত নন্, কেননা, সে সম্বন্ধে তাঁদের কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা নেই। এঁদের কথাবার্ত্তা শুনে মনে হয়

যে শিক্ষার কোনরূপ ফল ফলাটাই এঁদের মতে দোষ, কেননা সে ফল নতুন। নবশিক্ষার প্রভাবে মানুষের মনে যে নূতন ভাবের সৃষ্টি হবে এ ত ধরা কথা। সুতরাং এই নূতনত্বটাই যদি দোষের হয় তাহলে, শিক্ষার পাট উঠিয়ে দেওয়াই কর্ত্তব্য। স্কুল কলেজের দুয়োরে চাবি দেওয়াটা অবশ্য শিক্ষার পথ পরিষ্কার করা নয়। এঁরা তাই স্কুল কলেজ একেবারে বন্ধ কর্‌বার পক্ষপাতী নন। এঁরা বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সদর ফটক বন্ধ করে খিড়কির দরজা খুলে রাখা হোক্, কেননা আজকাল সেখানে যত লোক ঢোকে তত বেরোয় না এবং যত লোক বেরোয় তত বেরোনো উচিত নয়। বিদ্যার্থীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়াটা যাঁরা শিক্ষা বিস্তারের সদুপায় মনে করেন, তাঁদের কথার কি জবাব দেওয়া যাবে ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং এ শ্রেণীর সমালোচকদের কলরব শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েই উপেক্ষা কর্‌তে বাধ্য। এঁদের ধারণা যে শিক্ষার উন্নতি সাধনের একমাত্র উপায় হচ্ছে তার বিস্তৃতি কমিয়ে আনা। উচ্চশিক্ষা লাভ করবার শক্তি যে সকলের নেই—এ কথা সত্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও বহুলোককে সুযোগ না দিলে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের আশা করা যায় না। এঁরা ভুলে যান যে, যথার্থ শিক্ষিত ব্যক্তি স্বশিক্ষিত; স্কুল কলেজ শুধু মানুষকে নিজগুণে নিজ-চেষ্টায় শিক্ষিত হয়ে ওঠবার সুযোগ দেয় এবং সাহায্য করে—এর বেশী আর কিছু নয়। যে জাতি এই সুযোগ যত বেশী পায় সে জাতি তত বেশী সুশিক্ষিত।

অনেকের মতে আবার এ শিক্ষা অচল, কেননা তা নিষ্ফল। এঁরা বেশ স্পষ্ট দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। এঁদের এক দলের মতে আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষা যথেষ্ট অর্থকরী নয়। এঁরা চান—বিশ্ব-

বিছ্যালয়কে বৈশ্য-বিছ্যালয়ে পরিণত করতে। এ শ্রেণীর লোক শুধু ভারতবর্ষে নয় সকল দেশেই আছে। এঁদের আর এক দলের মত ঠিক এর বিপরীত—এঁদের বুলি হচ্ছে Knowledge for knowledge's sake—অর্থাৎ এঁদের আদর্শ হচ্ছে সেই বিশ্ব-বিছ্যালয় যার শিক্ষার প্রসাদে মানুষ বৈশ্য নয় নিঃস্ব হবে। বলা বাহুল্য এ দুই মত সমান সত্য হতে পারে না কেননা এঁদের পরস্পরের মনের ভিতর আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এ দুয়ের ভিতর যদি একটি গ্রাহ্য করতে হয়, তাহলে আমরা বরং শেষোক্ত মতে সায় দেব। কেননা, মনকে ঘুম পাড়িয়ে দেহকে কর্ম্মক্ষম করা আর যে দেশেরই আদর্শ হোক ভারতবর্ষের হতে পারে না। আমরা যে প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, সে সভ্যতার যদি কিছু মাহাত্ম্য থাকে ত সে এই গুণে যে, তার কাছে বাইরের চাইতে ভিতরের মূল্য ঢের বেশী ছিল। কিন্তু একটি ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে এ উভয় সঙ্কট আসলে কাল্পনিক। এঁরা উভয়েই নিতান্ত একদেশদর্শী। সমাজ নিষ্কর্ম্মা জ্ঞানীও চায় না—অজ্ঞ কর্ম্মীও চায় না। সমাজ চায় যে সামাজিক মানব একাধারে জ্ঞানী ও কর্ম্মী হবে। এবং সেই হচ্ছে আদর্শ বিছ্যালয়—যা মানুষকে একসঙ্গে কিছু হতে এবং কিছু করতে শেখাবে। এই সোজা কথাটা মানুষকে বারবার শোনানো দরকার—কেননা, আমরা হয় সাংসারিক নয় মানসিক অভ্যুদয়ের লোভে দিনে দশবার তা ভুলে যাই। সুতরাং জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সমালোচকদের কথা সম্পূর্ণ গ্রাহ্য না হলেও সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নয়, কেননা এঁদের দুজনের কথার ভিতর আংশিক সত্য আছে।

কিন্তু আমরা—যারা নবশিক্ষাকে বিফল বলে অবজ্ঞা করিনে এবং

তাতে কুফল ফল্‌ছে বলে ভয় করি নে—আমরাই কি এ শিক্ষায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট? অবশ্য না। তার কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর আশানুরূপ সুফল ফল্‌ছে না। এই ত্রুটির কারণ কি সে বিষয়ে আমাদের আর উদাসীন হয়ে থাকা চল্‌বে না সুতরাং আমি দেশশুদ্ধ লোককে আমাদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করি, যাতে করে আমরা এ বিষয়ে একটা সঙ্গত public opinion খাড়া কর্‌তে পারি। ইউরোপের সমস্যা হচ্ছে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের যোগ রক্ষা করা এবং আমাদের হচ্ছে এ উভয়ের যোগসাধন করা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

সত্যনিষ্ঠা।

(ঢাকা ছাত্রসমাজে কথিত)।

সত্য কহিও মিথ্যা কহিও না, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বিতীয় ভাগ হইতে রামায়ণ, মহাভারত, মনু, বিষ্ণু প্রভৃতি সকল নীতিগ্রন্থে এই কথা বার বার উপদিষ্ট হইয়াছে।

"অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়াধৃতম্,
তুলয়িত্বা তু পশ্যামি সত্যমেবাতিরিচ্যতে।"

ইত্যাদি রূপক, অতিশয়োক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারের সাহায্যে সত্যনিষ্ঠার গৌরব জগতে ঘোষিত হইয়াছে। এত পুরাতন এবং জীর্ণ এই কথা, যে ইহার পুনরাবৃত্তি নিতান্ত অরুচিকর মনে হইতে পারে।

কিন্তু এত পুরাতন হইলেও এই সত্যনিষ্ঠার প্রকৃতস্বরূপ সকলে ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারয়াছে কি? আমরা সকলেই কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে আমরা প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ, সত্য আমাদের কাছে যত কিছু দাবী করে সব আমরা তাহাকে দিতে পারিতেছি?

এমন লোক হয়ত আছে যে কখনও মিথ্যা কথা বলে নাই, কিন্তু তাই বলিয়াই কি তাহাকে সত্যনিষ্ঠ বলিতে হইবে—সত্যনিষ্ঠা কি এমন একটা বস্তু যাহা কেবল মিথ্যা কথা হইতে নিবৃত্ত হইলেই লাভ করা যায়? সত্যনিষ্ঠা তামসিক গুণ নয়, সাত্বিক ও রাজসিক। ইহার ধর্ম্ম জড়তা নয় প্রকাশ ও প্রবৃত্তি। এই কথাটা আমরা সব, সময়ে মনে রাখি না বলিয়াই অনেক সময় সত্যনিষ্ঠার গৌরব অন্যায়রূপে

আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করি। যদি আমরা কর্ম্মী না হই, সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক.রবার জন্য অসত্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে অগ্রসর না হই, যদি কেবল মিথ্যা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের অন্তরের সংগুলি দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকি তবে আমরা হয়ত মিথ্যার প্রবেশ নিবারণ করিতে পারি—কিন্তু সত্যকেও সেই সঙ্গে বিমুখ করিয়া দেশান্তরে পাঠাইয়া দিই।

সত্যনিষ্ঠা একটি "Cloistered virtue" নয়, বদ্ধঘরে ইহার দম আটকাইয়া যায়, খোলা হাওয়ায়, জীবন সংগ্রামের ঠিক মাঝখানে ইহার প্রতিষ্ঠা, সেইখানেই ইহার পরিণতি।

যদি তুমি সত্যনিষ্ঠ হও—সত্যের প্রতি যদি তোমার একান্ত প্রীতি থাকে, তবে তুমি চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে কিছুতেই পারিবে না। তোমাকে উঠিতে হইবে, কাজে অগ্রসর হইতে হইবে, অসত্যের সঙ্গে প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে।

কারণ সত্যের ধর্ম্ম বিদ্রোহ—মাথা পাতিয়া কোনও কথা মানিয়া লওয়া সত্যনিষ্ঠের স্বভাব নয়। নিজের মনের ভিতর যে কষ্টিপাথর আছে সব কথা, সব আচার, সব অনুষ্ঠান তার কাছে যাচাই করিয়া তবে তাহা গ্রহণ করিবে। পরীক্ষায় যাহা না উত্তীর্ণ হইবে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে—তাহাকে জীবন হইতে, জীবনের চারিপাশ হইতে দূর করিতে হইবে।

অথচ চাহিয়া দেখ জীবনের চারিদিকে অন্ততঃ বার আনা কথা লোকে বিনাবিচারেই মানিয়া লইতেছে। তুমি যে সমাজের ভিতর, যে সংস্কারের ভিতরর জন্মিয়াছ তাহা তোমার স্বাধীনতাকে চারিদিকে খর্ব্ব

করিয়া রাখিয়াছে। তুমি যদি প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ হও তবে তোমার এই সংস্কারের সঙ্গে সমাজ-বিধির সঙ্গে হয়ত পদে পদে যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি যদি সত্যের তীব্র প্রদীপ হাতে ধরিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হও, তবে দেখিতে পাইবে চারিদিকে কত মিথ্যা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সত্য আজ পদানত, মিথ্যা জয়ী ;— জীবনের বেশীর ভাগ কথা, বেশীর ভাগ কাজ মিথ্যার সেবায় ব্যয়িত হইতেছে। তুমি কি চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া সে মিথ্যার শাসন স্বীকার করিয়া লইবে না সত্যের ধ্বজা ধরিয়া সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মিথ্যার সহিত সংগ্রামে অগ্রসর হইবে ?

আমাদের এ পৃথিবী এক অদ্ভুত স্থান। এ জগতে কেহ সত্যকে ষোল আনা মানিয়া চলে না। সত্য বল, ধর্ম্ম বল, ন্যায় বল, মুখে মুখে সকলে ইহাদের গৌরব গান করে—অথচ জীবনের ভিতর—নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপের ভিতর ,এ সব বড় বড় কথার বড় একটা স্থান নাই। ব্যবসায়ীর একটা কারবারের বিষয়ে, গৃহস্থের একটা বৈষয়িক ব্যাপারে তুমি যদি পরামর্শ দিতে যাও—লাভালাভের হিসাব খতাইয়া তুমি যত কথা বল সব কথা সে মনোযোগের সহিত শুনিবে, কিন্তু যদি তুমি বল, "হউক তোমার লোকসান, তুমি সত্য হইতে ভ্রষ্ট হইও না," তবে সে যদি খুব বিজ্ঞ হয় ত মুচকিয়া হাসিবে, যদি সে বিদ্রূপপ্রিয় হয় তবে বলিবে "—ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির আর কি !" কিম্বা বলিবে "বাপু হে সংসারে অত সত্য দেখিতে গেলে চলে না, ধর্ম্মের পথে চলিতে হয় ত সংসার ছাড়" ইত্যাদি। চারিদিকে চোখ মেলিয়া চাহিলে, দেখা যায় সত্য ও জীবনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী বিরোধ রহিয়া গিয়াছে। তাই পৃথিবীর পনের আনা লোক মুখে বলে ধর্ম্মের কথা আর জীবনের ভিতর সে ধর্ম্মকে প্রবেশ করিতে দেয় না। লোকে

ধর্ম্মকে মন্দিরের গণ্ডীর মধ্যে বন্দী করিয়া জীবন নিয়মিত করে কেবল নিছক লাভক্ষতির হিসাব অনুসারে। ধর্ম্মকে জীবনের ভিতর গ্রহণ করিতে না পারিয়া আমরা সত্যের কাছে চিরদিন দেনদার থাকিয়া যাইতেছি। এটা আমরা একটা স্বতঃসিদ্ধের মধ্যে ধরিয়া লইয়াছি যে খাঁটি ধর্ম্মের পথ ধরিয়া থাকিলে জীবনযাত্রায় আর সবার অনেক পিছনে পড়িয়া থাকিতে হইবে—এবং ধর্ম্ম অবশ্য মৌখিক হিসাবে সবার বড় হইলেও সাংসারিক হিসাবে সফলতাটাই জীবনের—চরম উদ্দেশ্য।

সমস্ত সমাজ এবং সমস্ত জগৎ যখন এই নিময় মানিয়া চলিতেছে তখন যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ তাহার পদে পদে সমাজের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া উপায় নাই। আমি যাহা ধর্ম্ম, যাহা ন্যায়, যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছি, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যটি তাহাদ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিতে না পারিলে আমি সত্যভ্রষ্ট হইব, অথচ সে পথে চলিতে গেলে জগতের সঙ্গে নিরন্তর বিরোধ হইবেই।

সত্যনিষ্ঠ যে তাহাকে কাজেই কর্ম্মবীর হইতে হইবে; সত্য জানিলে হইবে না, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, জীবনে তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইবে। নহিলে সত্যলাভ বা সত্যরক্ষা হইবে না।

বাস্তবের সঙ্গে ন্যায় ও ধর্ম্মের বিরোধের কথাটা এত স্পষ্ট হইলেও এ বিষয়ে আমরা সত্য কথা বলিতে সব চেয়ে কুণ্ঠিত। ধর্ম্মের পথ হইতে যে যত দূরে সরিয়া থাকে সেই মুখে তত বেশী ধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করে—আর যদি কেহ ধর্ম্মের মানদণ্ডে জীবনের পরিমাণ করিয়া তাহার দোষ ত্রুটি দেখাইয়া দেয় তবে সে সকলের কাছে নিন্দনীয় হয়।

এই বিরোধের মূল কারণগুলি অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই

যে দোষটা যে ষোল আনা বিষয়ী জগতের তাহা নহে। অনেক সময় দেখা যায় যে এই বিরোধের মূল কারণ আর কিছুই নয়, আমরা সব সময় সত্য বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে খাঁটি সত্য কথা বলি না। জিনিসটাকে আমরা সিংহাসনে চড়াইয়া তফাৎ করিয়া রাখিয়াছি তাহার কারণ এই যে বাস্তবিকই যাহাকে আমরা ধর্ম্ম বলি সেটা জীবনের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না।

(২)

ধর্ম্মনীতিরও সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। অথচ ধর্ম্মনীতিকে আমরা নিত্য ও সনাতন জ্ঞান করিয়া তাহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করি না। জীবনে যেটাকে সত্য বলিয়া অনুভব করিয়াছি আমাদের অন্বয়াগত ধর্ম্ম-নিয়মের সঙ্গে তাহার বিরোধ দেখিতে পাই। সেখানে আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে পূর্ব্বের নিয়ম মিথ্যা। কাজেই সে নিয়মকে সিংহাসনে চড়াইয়া ফুল চন্দন দিয়া পূজা করি, আর তার সম্মুখে একটা পরদা টানিয়া তাহার আড়ালে নূতন-পাওয়া সত্যকে লইয়া ঘর করি। সনাতন ধর্ম্ম-নিয়মের সঙ্গে আমাদের এই রকম লুকোচুরী চিরকাল চলিয়া আসিতেছে।

সমাজ যেমন চলিতেছে ধর্ম্ম ও নীতির বিধানও তাহার সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং সেগুলির উপযুক্ত পরিবর্ত্তন বা সংস্কার না করিলে তাহা জীবনের শাস্ত্র হইতে পারে না। এই সত্য যদি আমরা স্বীকার না করি—প্রচলিত বিশ্বাস যেখানে অসত্য বা অসম্পূর্ণ বলিয়া

জানি সেখানে যদি তাহাকে আমরা অসত্য বা অসম্পূর্ণ বলিতে সাহসী না হই তবে আমাদের সত্যনিষ্ঠার স্পর্দ্ধা অসত্যের পরাকাষ্ঠা হইবে।

সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে এ কথা অনেকে এখন অসঙ্কুচিত চিত্তে স্বীকার করিবেন। প্রাচীন যে সকল সমাজ-ব্যবস্থা এতদিন আমাদের ভিতর ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে এবং যাহা অস্বীকার করা অধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহা যে অনেক সময় অপরিবর্ত্তনীয় ধর্ম্মের পদবী লাভ করিতে পারে না, তাহা যে অসম্পূর্ণ, হীনাঙ্গ ও পরিবর্ত্তনযোগ্য,—এ কথাও অনেকে স্বীকার করিবেন। কিন্তু প্রচলিত সমাজ-নীতি যাহাকে Bernard Shaw বলেন Conventional morality তাহার সম্বন্ধে এ কথা স্বীকার করিতে অনেকে কুণ্ঠিত হইবেন।

কিন্তু চক্ষু বুজিয়া থাকিলে ত সত্য মিথ্যা হইয়া যাইবে না। মামুলি নৈতিক নিয়মগুলি যে সব সময় নিখুঁত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া চলে না এ কথা অস্বীকার করা অসম্ভব। এ কথা সত্য কিনা তাহা একখানা শিশুপাঠ্য নীতিগ্রন্থ হাতে লইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। তাহাতে যে সকল নীতির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে সেগুলির বেশীর ভাগ কি বাস্তব জীবনে আমরা Copy book maxims বলিয়া উড়াইয়া দিই না! আর জীবনে যে সব সত্য আমরা উপলব্ধি করিয়াছি তাহার ওজনে তৌল করিলে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে সেগুলি সত্য সত্যই আংশিক সত্য বা অল্প সত্যের অতিশয়োক্তি।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, ধর পিতামাতার প্রতি ভক্তি। নীতিগ্রন্থে ইহার যে সকল উপদেশ আছে তাহা সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লওয়া চলে না।

শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃভক্তি বা ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি নীতিগ্রন্থে বেশ সুশোভন, কিন্তু বাস্তব জীবনে তাহার বাস্তবিকই কোনও স্থান নেই। আমাদের এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই যে পিতামাতার প্রতি একান্ত ভক্তি একটা absolute duty নহে। ইহা ভাল কিন্তু সব সময় ভাল নয়; যেমন ব্রজেশ্বরের পিতার আজ্ঞায় পত্নীত্যাগ ব্যাপারটা যে খুব ভাল কাজ এ কথা আমরা বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি না। যে উৎকট পিতৃভক্তি মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করিয়া দেয়, তাহাকে অপর পাঁচটি কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করে', যাহা তাহার জীবনের সম্পূর্ণতা লাভে বাঁধা দেয়—সে পিতৃভক্তি যে ভাল নয় এ কথা আমরা বাস্তবজীবনে শত শত কার্য্যে নিত্য দেখাইতেছি, কিন্তু এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিলে লোকের কাছে নিন্দাভাজন হইতে হয়।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। এই সত্যকথা বলা সম্বন্ধেই আমরা সকল সময়ে ঠিক সত্য কথা বলি না। সকল স্থানে ও সকল অবস্থায়ই যে সত্য কথা বলিতেই হইবে ইহা ধর্ম্ম নহে— এ কথা আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মুক্তকণ্ঠে বলিয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। অথচ আমাদের Copy book নীতি অনুসারে পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যা কথা বলা বড় দোষ। কিন্তু শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলান, তাহাকে ভাত খাওয়াইবার জন্য নানা অসম্ভব প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমরা নিত্যই অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

তাহা ছাড়া আরও এমন অনেক দৃষ্টান্তের বলে দেখান যাইতে পারে যে কোন কোন স্থলে মুখের সত্য জীবনের সত্যের বিরোধী হইয়া উঠে।

সুতরাং সত্য বলিতে হইবে এ কথাটা সকল সময় সকল অবস্থায় নিখুঁত সত্য নহে;—সত্য কথা বলিতে হইলে এ কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

সমাজের পরিণতির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে সর্ব্বত্রই কোনও একটা নিয়ম যখন প্রথম বিধিবদ্ধ হয়—তা সে নিয়ম ধর্ম্মেরই হউক আর সমাজেরই হউক, আইনেরই হউক আর নীতিরই হউক—প্রথমে সে নিয়ম খুব ব্যাপক ভাবে রচনা করা হয়, পরে ক্রমে ক্রমে তাহার পরিধি সঙ্কীর্ণ করিয়া তাহাকে জীবনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া লইতে হয়। নিয়মটা যে অতিব্যাপক এ সত্য কালক্রমে অভিজ্ঞতা হইতে লাভ করা যায়। এমনি করিয়া প্রত্যেক নিয়ম সঙ্কুচিত হইয়া ক্রমশঃ অধিক সত্য হইয়া উঠে। যেখানে অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মকে এই ভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া না লওয়া হয় সেইখানেই ক্রমে নিয়ম অসত্য হইয়া দাঁড়ায় এবং বাস্তব জীবন ও নৈতিক জীবনে বিরোধ বাধিয়া উঠে।

যে প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ তাহাকে একদিকে যেমন ধর্ম্মের সঙ্গে জীবনকে সঙ্গত করিতে হইবে, তেমনি অপরদিকে ধর্ম্ম বা নীতির যে নিয়ম সত্য-বিরোধী বা সত্যাতিরিক্ত তাহাকে অসত্য বলিয়া প্রকাশ করিতে সাহসী হইতে হইবে। যে সত্যনিষ্ঠ সে কোনও কথা মানিয়া লইবে না; কোনও কথা সত্য বলিয়া মানিবার পূর্ব্বে তাহার মন ও বুদ্ধির নিকট তাহা যাচাই করিয়া লইবে। কোনও আচার বা অনুষ্ঠান বা বিধি যত কেন প্রাচীন হউক না, তাহা যদি তোমার নিজের চিত্তের নিকট, সম্যক সশ্রদ্ধ অনুসন্ধানের পর সত্য বলিয়া প্রতিভাত না হয় তবে তুমি তাহা গ্রহণ করিবে না। ইহাই সত্যনিষ্ঠের প্রথম সংকল্প। যদি তুমি কোন

কথা সত্য বলিয়া জানিয়া থাক তবে তাহা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, তাহার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিবে—ইহাই ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠার পরিচয়। তুমি যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাই তোমার কাছে একমাত্র সত্য, অন্য কেহ তাহাকে অসত্য বলিয়াছে বলিয়াই, তুমি নিজের সত্যকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ এ কথা আজ আর অস্বীকার করা চলে না যে, সত্য মূলে এক ও নিত্য হউক বা না হউক সত্যের প্রকাশ বহু। দুইটি পরস্পরবিরোধী কথা একই রূপ সত্য হইতে পারে।

আজ যাহা সত্য বলিয়া পরিগণিত, আজকার দিনে, আজকার সমুদয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার হিসাবে তাহাই সত্য। তাহাকে সত্য বলিয়া জানিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া স্থির জানিয়াছ তাহা লইয়াই তোমাকে কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরের প্রসাদে সত্যলাভ করিয়া কখনও প্রকৃত সত্যনিষ্ঠ হইতে পারিবে না। হইতে পারে যে আজ তুমি যাহাকে সত্য বলিয়া জানিতেছ, কাল যখন মনের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবে তখন তাহাকে সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইলে চলিবে না। সত্য কালের সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতেছে, পরিণত হইতেছে; তুমি যদি একবারে চিরন্তন এবং নিত্য সত্যের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাক তবে তোমার সে সত্য লাভ হইবে না। অপ্রমত্ত চিত্তে মার্জ্জিত বুদ্ধি ও ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা লইয়া অনুসন্ধানে যাহা সত্য বলিয়া জানিয়াছ তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার দ্বারা তোমার জীবনকে পরিচালিত করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে তোমার সত্যই একমাত্র অভ্রান্ত ও শেষ সত্য নহে। যে তোমার দলে

নয়, তোমার মত যাহার মত নহে, সে'ও তোমারই মত সত্যনিষ্ঠ ও সত্য-সেবক হইতে পারে। কেননা সত্য নানারূপ ; নানা যুগে ও একই যুগে নানা ভাবে নানা লোকের কাছে আবির্ভূত হয়। আমি যাহা সত্য বলিয়া পাইয়াছি, তাহার দ্বারা আমার জীবনকে নিয়মিত করিতে হইবে এ কথা অবশ্য সত্য। কিন্তু তাহার বিরোধী বা আপাত-বিরোধী যাহা কিছু তাহাই যে মিথ্যা, সত্যের সেবা করিতে হইলে যে তাহাকেই পাতিত করা আবশ্যক এ কথা সত্য নহে।

শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।

শিক্ষার লক্ষ্য

——:০:——

শিক্ষাসম্বন্ধে এমন কতকগুলি তত্ত্বকথা প্রচলিত আছে, যাহার উদ্দেশ্য—কিছুই না বলিয়া, সমগ্র বিষয়টার একটা সর্ব্ববাদীসম্মত সুগভীর মীমাংসা করা। এই সকল তত্ত্ববাক্যের মধ্যে একটী এই যে, শিক্ষার উদ্দেশ্য যথার্থ মানুষ তৈয়ারি করা। মানব-শিশু যখন সচরাচর মানুষের শরীর ও মন লইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়, —এবং যেটী না হয়, শিক্ষার দ্বারা তাহাকে যথার্থ মানুষ করার চেষ্টা স্বয়ং বৃহস্পতির পক্ষেও নিষ্ফল,—তখন যথার্থ মানুষ কাহাকে বলে জিজ্ঞাসা করিলে তত্ত্বজ্ঞেরা অবশ্য উত্তরে বলিবেন—আদর্শ-মানবকে, অর্থাৎ অসাধারণ মনুষ্যকে। আদর্শ-মানব যে কি প্রকার জীব, সে সম্বন্ধে কাহারও সুস্পষ্ট বা অস্পষ্ট কোনও রূপ ধারণা না থাকাতে, জিনিসটা যে অতিশয় কাম্য এবং শিক্ষার দ্বারা অবশ্যলভ্য, এ বিষয়ে কাহারও কোনও দ্বিধা উপস্থিত হয় না; এবং একটা দুরূহ প্রশ্নের সহজ সমাধানে মনও প্রসন্ন হইয়া উঠে। ইহার পরেও যদি কেহ জানিতে চায় আদর্শ-মনুষ্য কাহাকে বলে, তবে অধিকাংশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিশ্চয়ই তাহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিবেন। তবে কোনও কোনও তত্ত্বজ্ঞ হয়তো অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আদর্শ-মনুষ্য সেই, যাহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল শক্তি বা বৃত্তিই সম্যক অনুশীলিত হইয়াছে ও পূর্ণরূপে স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে; এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য এই শ্রেণীর মানুষ গড়িয়া তোলা। এখন কথা এই যে, প্রথমত এহেন

মানুষ চর্ম্মচক্ষে দূরের কথা, কেহ কখনও মানস-নেত্রেও দেখেন নাই। পৃথিবীর কবি ও কল্পনাকুশল লোকেরা যে-সকল মহাপুরুষ ও অতি-মানুষের আদর্শ-চিত্র আঁকিয়াছেন, সে সকলের কোনটীই একাধারে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অসম্ভব মানুষের চিত্র নয়। সেগুলির কোনটীতে দেখিতে পাই বহু-শক্তির একত্র সমাবেশ, কোনটীতে বা দু-একটী বৃত্তির অতিমাত্রায় বিকাশ; কিন্তু তাহার প্রতিটিই রক্তমাংসের মানুষেরই চিত্র। দ্বিতীয় কথা এই যে, সকল শক্তির পূর্ণ অভিব্যক্তি দূরে থাক—দুই চারিটী শক্তির একসঙ্গে একটু অসাধারণরকম স্ফূর্ত্তির পরিচয় যাহার শরীরে আছে, এমন লোক হাজারে একজন মেলা কঠিন; অথচ শিক্ষা যে সকলের জন্যই প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে কোনও মতভেদ নাই। তপস্বী বাল্মীকি যখন নারদকে বীর্য্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, বিদ্বান প্রভৃতি নানা গুণসম্পন্ন ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তখন ত্রিলোকজ্ঞ নারদ সেই ত্রেতাযুগেও ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কাহারও নাম করিতে পারেন নাই। এবং কোনও বিশেষ শিক্ষাপ্রণালীর ফলে রামচন্দ্র যে এই সকল গুণের আধার হইয়াছিলেন, এমন কথা নারদও বাল্মীকিকে বলেন নাই, বাল্মীকিও আমাদিগকে বলিয়া যান নাই। তৃতীয় কথা এই যে, যদি প্রকৃতই আদর্শ-মানব বা অতিমানুষ গড়া শিক্ষার উদ্দেশ্য হইত এবং এই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে এইরূপ শিক্ষার ফলে পৃথিবীটা মানুষের পক্ষে বাসের উপযুক্ত থাকিত কিনা, সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। যে সমাজবন্ধনের ভিত্তির উপর মানুষের সভ্যতার ইমারত গঠিত হইয়াছে, তাহার মূল এই যে, মানুষে মানুষে শক্তির প্রভেদ আছে, এবং সে প্রভেদ কোনও শিক্ষার সাহয্যে সম্পূর্ণ লোপ করা যায় না।

এই পার্থক্যও তারতম্য আছে বলিয়াই সমাজে শ্রমবিভাগ ও কার্য্য-বিভাগ সম্ভবপর হইয়াছে, এবং এই বিভিন্নতার উপর মানুষের সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হইতে অদ্যাবধি সমস্ত পরিণতি নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। যদি শিক্ষার ফলে এই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য লোপ করিয়া সকলকেই সর্ব্বশক্তিসম্পান্ন আদর্শ-মানুষে পরিণত করা সম্ভব-পর হইত, তাহা হইলে সমাজের সমস্ত কাজের কল কারখানা তখনি বন্ধ হইয়া যাইত। মানুষে মানুষে প্রভেদ আছে বলিয়াই মানুষের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয়। যদি শিক্ষার ফলে সকলেই আদর্শ-মানুষ, অর্থাৎ একছাঁচের মানুষ হইয়া উঠিত, তাহা হইলে আমাদের পরস্পারের সঙ্গ আমাদের নিকট এমনই অসহ্য বোধ হইত যে, মানুষ ঘর ছাড়িয়া বনে পালাইতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিত না। শেষ কথা, পৃথিবীতে মাঝে মাঝে এক একজন অতিমানুষের জন্ম হয়। তাহার ফলে কর্ম্মের জগতে বা চিন্তার রাজ্যে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা স্মরণ রাখিলে সমাজ যদি কেবল অতিমানুষেরই সমাজ হইত তাহা হইলে ব্যাপারটা কি ঘটিত মনে করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে।

অতএব তত্ত্ববেত্তারা যাহাই বলুন না কেন, শিক্ষার উদ্দেশ্য আদর্শ-মানুষ গড়াও নয়, অতিমানুষ তৈরীও নয়। কেননা এই উদ্দেশ্যটা সিদ্ধ হইবার সুদূর সম্ভাবনাও নাই, এবং যদি কোনও সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে তাহার ফল অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিত।

(২)

শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিজ্ঞলোকদের আর একটি মত এই যে, শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত—ছাত্রের চরিত্রগঠন। চরিত্র জিনিসটা

কি, তাহা লইয়া তর্ক নাই তুলিলাম। ধরিয়া লওয়া যাক্, চরিত্র সেই সকল গুণের সমঞ্জসীকৃত সমষ্টি, যাহা মানুষের থাকা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। এই সকল গুণের তালিকা এবং সমষ্টির বিষয়, তাহাদের রূপ ও মাত্রা সম্বন্ধে, বিভিন্ন কালে ও বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা যে ছিল এবং আছে, তাহার প্রমাণ এই যে শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ভিন্ন দেশকালের প্রচলিত মত কিছু এক নয়। এই বিজ্ঞ বচনের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, মুখে যিনি যাহাই বলুন না কেন, কি প্রাচীন কি আধুনিক কোনও শিক্ষা প্রণালীই প্রকৃত কাজের বেলায় ছাত্রের চরিত্রগঠনকে তাহার প্রধান লক্ষ্যস্বরূপে গ্রাহ্য করে নাই। যিনি শিক্ষার দ্বারা চরিত্রগঠন বিষয়ে অতিমাত্র উদ্যোগী, তিনিও সাহিত্যের একশ' পাতার মধ্যে দশ পাতা হিতোপদেশ থাকিলে ভাল হয়, এই কথাই বলেন, এবং ইস্কুলের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আধ ঘণ্টার জন্যেই নীতিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ইহার কারণ এ নয় যে, মানুষের চরিত্র জিনিসটা সমাজের পক্ষে কিছু কম প্রয়োজনীয়; ইহার কারণ এই যে, চরিত্র জিনিসটা সেরূপ শিক্ষণীয় নয়। মানুষের চরিত্র প্রধানতঃ নির্ভর করে বংশানুক্রম এবং পরিবার ও সমাজের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর। কেবলমাত্র শিক্ষকের শিক্ষার দ্বারা চরিত্রের যে পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহার পরিমাণ অতি সামান্য; এবং তাহাও আবার শিক্ষার গৌণ ফল। সোজাসুজি নীতিশিক্ষার দ্বারা চরিত্র গড়িবার চেষ্টা করিলে, সে শিক্ষা অতি নিরস হইয়া উঠে—এবং তাহার ফলও প্রায়ই বিপরীত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং প্লেটো তাঁহার যে-সকল মত সক্রেটিসের নামে চালাইয়াছেন, তাহার মধ্যে

একটা মত এই যে, চরিত্র বা virtues জ্যামিতি ও অলঙ্কারশাস্ত্রের ন্যায়ই একটা শিক্ষণীয় বস্তু। কিন্তু এই মতের মূলে আছে তাঁহার আর একটী মত। প্লেটোর মতে ভালমন্দের জ্ঞান, বুদ্ধির সাহায্যে লাভ করা যায়,—এবং সেই জ্ঞানলাভ করিলেই মানুষে সচ্চরিত্র হয়। এই জ্ঞান-বাদের বা intellectualism-এর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক মনীষী আজ লেখনী ধরিয়াছেন; এবং বেদাধ্যয়নেও যে দুরাত্মার চরিত্রের কোন পরিবর্ত্তন্ হয় না, তাহা আমাদের দেশের উদ্ভট কবিতার অজ্ঞাত-নামা কবি অনেক পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছেন।

এ বিষয়ে একটা ভুল ধারণা থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাপ্রণালীর সহিত বিলাতের শিক্ষাপ্রণালীর তুলনা করিয়া আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা এবং তাঁহাদের বন্ধুবান্ধব সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, এবং আমরাও শুনিয়া শুনিয়া বলি যে, বিলাতে ইস্কুলকলেজে ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়, আর আমাদের ইস্কুলকলেজ হইতে ছাত্রেরা কেবল কতকগুলি কথা মুখস্থ করিয়া চলিয়া আসে। কথাটা সত্য বলিয়াই ধরিয়া লওয়া যাক্। কিন্তু ইহাতে এ প্রমাণ হয় না যে, বিলাতের ইস্কুল ও ইউনিভার্সিটীতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার ফলেই ছাত্রদের চরিত্র গঠিত হয়। বরং আমাদের কর্ত্তৃপক্ষেরা উল্টো কথাই বলেন। তাঁহারা বলেন যে, সেখানকার ইস্কুল-ইউনিভার্সিটির life বা আব্‌হাওয়াতেই শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়িয়া উঠে। অর্থাৎ সেখানকার ছাত্রদের চরিত্র সেখানকার বিদ্যালয়গুলির সামাজিক জীবনের ফল, শিক্ষার ফল নয়। সুতরাং সামাজিক অবস্থার গুণে যেটা আপনা হইতেই জন্মলাভ করে, সেটাকে শিক্ষার ঘাড়ে চাপাইয়া আমাদের ছাত্রগণের কোনও হিতৈষী যেন

তাহাদের পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে শেলীর পরিবর্ত্তে Smiles-এর আমদানী না করেন।

(৩)

এখন শিক্ষার উদ্দেশ্য যদি আদর্শ মানুষ গড়াও না হয়, শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠন করাও না হয়—তবে তাহার উদ্দেশ্যটা কি ? এ প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া খুব কঠিন নয়, এবং সে উত্তরও সকলেরি জানা আছে; কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া বলিতে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর লজ্জিত হই। কেননা উত্তরটা অতি সাধারণ রকমের, এবং বড় কথা বলিয়া ও শুনিয়া আমরা যে আত্মপ্রসাদ লাভ করি—সোজা কথা বলায় ও শোনায় আমরা সে সুখে বঞ্চিত হই। কথাটা এই যে—শিক্ষার উদ্দেশ্য বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া; অর্থাৎ যার প্রথম সোপানকে সমস্ত বিষয়টার নামস্বরূপে ব্যবহার করিয়া আমরা বাঙ্গলা কথায় বলি—লেখাপড়া শিখান। কি পুরাতন, কি বর্ত্তমান সমস্ত শিক্ষাপ্রণালীর লক্ষ্যই যে এই বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া, তাহা টোল, পাঠশালা, ইস্কুল, কলেজগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। নিতান্ত সূক্ষ্মদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া এই স্থূল বিষয়টা আর কাহারও চোখ এড়াইবার সম্ভাবনা নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যে-সকল তত্ত্বকথা আছে, তাহাদের উদ্দেশ্যই এই নিতান্ত সোজা কথাটাকে চাপা দেওয়া, যাহাতে তাহা নিজগুণে প্রকাশ না হইয়া পড়ে।

তত্ত্বজ্ঞানীদের সমস্ত বচন উপেক্ষা করিয়া এবং বিজ্ঞব্যক্তিদের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, পৃথিবীর শিক্ষালয়গুলি যখন বরাবর বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াকেই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য করিয়াছে, তখন ইহার মূলে

যে নিছক বোকামী ছাড়া আরও কিছু আছে, তাহাতে অতি-বুদ্ধিমান ভিন্ন আর কেহ সন্দেহ করিবেন না। আমরা স্পষ্ট করিয়া বলিতে চাই যে, বিদ্যাশিক্ষাই যে কার্য্যত শিক্ষার লক্ষ্য হইয়া আছে, কেবল তাহাই নহে,—প্রকৃতপক্ষে উহাই শিক্ষার লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটু ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে যে, বিদ্যাশিক্ষা জিনিসটা মানবসমাজের যুগ-যুগান্তরসঞ্চিত সভ্যতার সহিত এ পৃথিবীতে নবাগত মানব সন্তানের পরিচয় করান। এই পরিচয় শিক্ষার দ্বারা হওয়াই সম্ভব, এবং শিক্ষা ভিন্ন আর কোনও রকমেই হইবার উপায় নাই। আদিম কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত বহু-আয়াসলব্ধ সভ্যতার ফল নানা বিদ্যারূপে সঞ্চিত আছে ও হইতেছে। শিক্ষা এই বিদ্যাগুলির সঙ্গে মানুষের পরিচয় সাধনা করে। অতি সভ্যসমাজের শিশুও অসভ্য হইয়া জন্মায়, এবং শিক্ষার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাগুলির সহিত পরিচয় লাভ না করিলে অসভ্য অবস্থাতেই বাড়িয়া উঠিত। অসভ্য অর্থে বুদ্ধিহীনও নয়, হৃদয়হীনও নয়,—অসভ্য অর্থে বিদ্যাহীন। অসভ্যের সমাজ সেই সমাজ, যাহার প্রতিপুরুষের লোকের জন্য পূর্ব্বপুরুষের ও পূর্ব্বকালের এমন কোনই সঞ্চিত বিদ্যা নাই, যাহা সে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারে। সভ্য সমাজের লোক স্কুল কলেজে শিক্ষা না পাইলেও বংশানুক্রমের ফলে এবং সামাজিক অবস্থার প্রভাবে মোটামুটী সভ্য সমাজোচিত বুদ্ধি ও চরিত্র লাভ করে; কিন্তু রীতিমত শিক্ষা না পাইলে অতি বড় পণ্ডিতবংশের প্রতিভাবান্ সন্তানও মূর্খই থাকিয়া যায়। কেননা বিদ্যায় বংশানুক্রম নাই। সকল রকম বিদ্যাই প্রতি যুগের লোককে নূতন করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। এবং এই ক্রমাগত নূতন চেষ্টার ফলেই মনুষ্যসমাজের লব্ধ বিদ্যা প্রালব্ধ না হইয়াও রক্ষিত হয়। যদি পৃথিবীর একপুরুষের

লাভ করিয়াছে, যে যাঁহাদের সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্পেন্সারের লেখার সহিত কোনও দিন কোনও পরিচয় নাই, তাঁহাদেরও এই মতের সত্যতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। এবং বোধ হয় এই মতটা পোষণ করা আধুনিকতা ও বৈজ্ঞানিকবুদ্ধির লক্ষণ বলিয়াই শিক্ষিত সমাজে গণ্য ও মান্য। কিন্তু মতটা আগাগোড়া মিথ্যা। পৃথিবীতে জীবশরীরের ক্রমবিকাশের নিয়মের সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির কোনও সম্পর্ক নাই। এই দুই ব্যাপারের নিয়ম ও প্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, এবং পৃথক বলিয়াই অসভ্য শিশুকে শিক্ষা দিয়া সুসভ্য মানুষ করা সম্ভব হয়, এবং পৃথক বলিয়াই সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা এতটা স্থান জুড়িয়া আছে। যদি সত্যই Organic Evolution-এর নিয়মে মানব সভ্যতার বিকাশ হইত তাহা হইলে মানুষের জীবনে শিক্ষার কোনও স্থান থাকিত না; বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতালব্ধ সমস্ত বিদ্যা শিশুর মনে আপনিই স্ফুরিত হইত এবং যে হতভাগ্যের হইত না স্বয়ং ফ্রোবেলও সারা জীবন শিক্ষা দিয়া তাহাকে বর্ণের পরিচয় করাইয়া দিতে পারিতেন না।

Organic Evolution-এর মূলে আছে Heredity। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গহীন, উদরসর্ব্বস্ব জীবানু হইতে যে পৃথিবীতে ক্রমে মানুষের জন্ম হইয়াছে ইহার গোড়ার কথা এই যে, জনক জননীর দেহের ও মনের ধর্ম্ম সন্তানে সংক্রেমিত হয়। ফলে যখন জনক জননীর শরীরে বা মনে নূতন কিছুর আবির্ভাব হয় তখন তাহাদের সন্তান, অন্বয়ানুসারে সেই নূতনত্ব লাভ করে। যদি জীবন-সংগ্রামে এই নূতন কিছুর দ্বারা কোনও সুবিধা হয় তবে যাহাদের সেটা আছে তাহার সাহায্যে সেই শ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে তাহারাই বাঁচিয়া থাকে এবং বংশ

রাখিয়া যায়, বাকীগুলি নির্ব্বংশ হইয়া মরে। এবং এইরূপে যুগের পর যুগ নানা বিভিন্ন অবস্থায় নূতনত্বের উপর নূতনত্ব পুঞ্জীভূত হইয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়হীন এক Cell-এর জীব হইতে নানা পশু পক্ষী ও মানুষের উদ্ভব হইয়াছে। এই হইল Organic Evolution সম্বন্ধে পণ্ডিতদের আধুনিক মত।

কেমন করিয়া জীব-শরীরে এই নূতনত্বের আবির্ভাব হয় এবং কোন্ জাতীয় নূতনত্ব Organic Evolution-এর প্রধান ভিত্তি এ সম্বন্ধে ত্রিশ বছর পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা যতটা একমত ও নিঃসংশয় ছিলেন এখন আর তেমন নহেন। তখনও ডারউইনের প্রচারিত ব্যাখ্যাই সকলে মান্য করিতেন। ঐ ব্যাখ্যা অনুসারে জনক জননীর সহিত সন্তানের যে সব ছোটখাটো জন্মগত বিভিন্নতা প্রতিদিনই দেখা যায়, যাহার ফলে ছেলেটা বাপের মত হইয়াও ঠিক তাহার মত হয় না, সেই নিত্য-নৈমিত্তিক নূতনত্বই ইভলিউশনের প্রধান সহায়। আর এক সহায়, প্রত্যেক প্রাণীর আয়ুকালের মধ্যে বাহিরের চাপে ও ভিতরের চেষ্টায় তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। কিন্তু ডারউইনের এই মতের আসন এখন টলিয়াছে। এখন পণ্ডিতেরা বলিতেছেন যে নূতনত্বের উপর ভর করিয়া unicellular জীব, মানুষে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা প্রতিদিনকার আটপৌরে সামান্য নূতনত্ব নয়। প্রাণীর শরীরে মাঝে মাঝে অতি দুজ্ঞেয় কারণে হটাৎ এক একটা বড় রকমের পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। যদি তাহাতে জীবনযুদ্ধের কোনও সহায়তা হয় তবে ত কথাই নাই, অন্তত পক্ষে যদি নিতান্ত বিপত্তিকর না হয় তাহা হইলেই ঐ পরিবর্ত্তনটী স্থায়ী হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। বর্ত্তমানে অধিকাংশ প্রাণীতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরই মত যে এই

সকল হটাৎ-উপস্থিত বড় রকমের নূতনত্বই Organic Evolution-এর প্রধান কারণ। প্রতি প্রাণীর জীবদ্দশায় বাহিরের প্রকৃতির চাপে ও ভিতরের শক্তির প্রয়োগে তাহার মধ্যে যে পরিবর্ত্তন হয় সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা এখন বলিতেছেন যে, ঐ জাতীয় পরিবর্ত্তন সন্তান সন্ততিতে মোটেই সংক্রমিত হয় না। প্রাণীর শরীরে দুই রকমের মাল মশলা আছে। এক শ্রেণীর মালমশলায় তাহার শরীর গঠিত হয়, দ্বিতীয় রকমের মালমশলা বংশরক্ষার জন্য সঞ্চিত থাকে। বাহিরের চাপে বা ভিতরের চেষ্টায় যে পরিবর্ত্তন তাহা ঐ প্রথম শ্রেণীর মালমশলাতেই আবদ্ধ থাকে, দ্বিতীয় শ্রেণীর মালমশলা সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া যায়। ফলে ঐ স্বোপার্জ্জিত পরিবর্ত্তন সন্তান সন্ততির নিকট পৌঁছে না। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর মালমশলায় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয় সেই পরিবর্ত্তনই বংশানুক্রমে চলে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ এখন পর্য্যন্তও একেবারেই অজ্ঞাত। এবং জীবশরীরে যে সকল হটাৎ বড় বড় পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া Organic Evolution-কে ধাপে ধাপে টানিয়া তুলিয়াছে তাহারও কারণ এই দ্বিতীয় রকমের মালমশলায় পরিবর্ত্তন।

এই ত গেল সংক্ষেপে Organic Evolution-এর নিয়মসম্বন্ধে পণ্ডিতদের বর্ত্তমান মত। এখন ইহার সহিত মানুষের সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্কটা কি? মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সঙ্গীত কিছুই ত মানুষের শরীরে দাগ কাটে না, বিশেষত শরীরের সেই মালমশলাগুলিতে যাহার উপর বংশানুক্রম নির্ভর করে। এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর এক পুরুষের

শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত ধনের মত দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নহে inheritance। এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার। এবং এ ধনের উত্তরাধিকারী একমাত্র অঙ্গজ নয় সমগ্র মানব সমাজ।

তারপর ডারউইনের Survival of the fittest নিয়মেরও এখানে কোনও প্রভাব নাই। সভ্যতার যাহা শ্রেষ্ঠ ফল তাহার দ্বারা জীবনসংগ্রামে কোনও কাজই হয় না। Bionomial theorem আবিষ্কার করিয়া Newton-এর জীবনযাত্রার এবং বংশরক্ষার যে কোনও সুবিধা হইয়াছিল ইহা তাহার জীবনচরিত লেখকেরা বলেন না, এবং যাঁহারা ঐ তত্ত্বটী আবিষ্কার করিতে পারেন নাই তাঁহারা যে নির্ব্বংশ হন নাই ইহাও নিশ্চিত। কাব্য রচনার ফলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের কতটা সুবিধা হয় সে সম্বন্ধে দেশী বিদেশী ভুক্তভোগী কবিদের আত্মোক্তির অভাব নাই, এবং অকবি লোকও যে সংসারে টিঁকিয়া থাকে এবং বংশরক্ষা করিয়া তবে মরে তাহাও অস্বীকার করা চলে না।

এ কথা সত্য যে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে-সব শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে ঐ শক্তিগুলি Organic Evolution-এরই ফল। মানুষের বুদ্ধি, প্রতিভা, কল্পনা, ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মানুভূতি এগুলি যে জন্মগত ইহা ত প্রতিদিন চোখেই দেখা যায়। এবং ঐ শক্তিগুলিই যে জীবনযুদ্ধে মানুষের সহায় হইয়া তাহাকেপৃথিবীর রাজাসনে বসাইয়াছে তাহাও স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু ঐ শক্তিগুলিকে যে-সব কাজে লাগাইয়া মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা Orga-

nic Evolution-এর চোখে একবারে বাজে খরচ, সম্পূর্ণ অপ-ব্যবহার। Organic Evolution-এর ফলে মানুষে লাভ করিল তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তি, যেন শিকারের ও শিকারীর মৃদু পদশব্দটীও কানে না এড়ায়, মানুষ সেই সুযোগে গড়িল সঙ্গীত-বিদ্যা। ইভলিউশনে মানুষ পাইল দশ অঙ্গুলের সূক্ষ্ম স্পর্শানুভূতি যেন তাহার তীরের লক্ষ্যটা একেবারে অব্যর্থ হয়, সে বসিয়া গেল তাঁত পাতিয়া মলমল বুনিতে, আর তুলি ধরিয়া ছবি আঁকিতে। ইভলিউশন মানুষকে দিল তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর কল্পনা যেন সে নানা ফিকিরে শরীরটাকে ভাল রকম বাঁচাইয়া বংশটা রাখিয়া যাইতে পারে, মানুষ গড়িয়া তুলিল কাব্য, বিজ্ঞান, দর্শন। ইভলিউশনে মানুষের কণ্ঠে আসিল ভাষা যাহাতে তাহার পক্ষে দলবদ্ধ হওয়া সহজ হয়, মানুষ সৃষ্টি করিয়া বসিল ব্যাকরণ আর অলঙ্কার। মোট কথা মানুষ সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে প্রাণের ঘরের চোরাই মাল মনের কাজে খরচ করিয়া। প্রাণের ঘরকন্নার জিনিস মনের বিলাসে ব্যয় করার নাম সভ্যতা।

মানুষের এই তহবীল তছরুপের একটা ফল এই যে মানুষের ইন্দ্রিয়ের ও মনের শক্তি Organic Evolution-এ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল সেই খানেই থামিয়া আছে। ঐতিহাসিক কালের মধ্যে যে এই সকল শক্তির কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে তাহা বোধ হয় না। প্রাচীন গ্রীক অপেক্ষা যে নবীন ফরাসীর বুদ্ধি ও রূপজ্ঞান অধিক তাহার কোন প্রমাণ নাই, এবং বৈদিক যুগের হিন্দুর অপেক্ষা আমাদের মানসিক শক্তি যে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে এমন কথা কি সবুজপন্থী কি সনাতনপন্থী কেহই বলিবেন না। তবে প্রাচীন কালের তুলনায় বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক বিষয়ে আশ্চর্য্যজনক বৃদ্ধি হইয়াছে, প্রাচীন

পণ্ডিতের যাহা স্বপ্নেরও অতীত ছিল বর্ত্তমানের শিশুরাও তাহা হাতে খড়ির পরেই শেখে। তাহার কারণ সভ্যতা বাড়ে টাকার সুদের মত। এক যুগের মানুষ যাহা সৃষ্টি করে, পরের যুগের মানুষ শিক্ষার সাহায্যে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া আবার তাহার উপর নূতন সৃষ্টির আমদানি করে। এই রকমে প্রাচীন সৃষ্টির উপর নবীন সৃষ্টি জমা হইয়া মানুষের সভ্যতা বাড়িয়া চলে। প্রাচীন যুগে যাঁহারা সভ্যতার গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মানসিক শক্তি যে আমাদের চেয়ে কিছু কম ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টার ফল যে অনেক বিষয়ে আমাদের কাছে খুব সামান্য বোধ হয় তাহার কারণ, আমরা পাইয়াছি তাহার পরের শত যুগের চেষ্টার পুঞ্জীভূত ফল। এবং আমরা যে নব সৃষ্টি করি তাহা এই বহুযুগের সৃষ্টিকে ভিত্তি করিয়া। এই জমান সভ্যতার পুঁজি যে মাঝে মাঝে অল্পবিস্তর খোয়া যায় না তাহা নয়; তখন আবার মানুষকে কাঁচিয়া আরম্ভ করিতে হয়। এবং বুনিয়াদী ঘরের জমান টাকার মতই ইচ্ছা করিলে কিছুমাত্র না বাড়াইয়া দুই এক পুরুষেই ইহাকে ফুঁকিয়া নিঃশেষ করিয়াও দেওয়া যায়। ইহার দৃষ্টান্তের জন্য আমাদের বেশী দূরে যাইতে হইবে না।

(৫)

Organic evolution-এর রাজ্যে বিদ্রোহী হইয়া তাহার রাজ্য-লুটিয়া আনিয়া, মানুষ যে সভ্যতার সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফল সঞ্চিত হইয়াছে সাহিত্যে, কলায়, এবং বিবিধ বিদ্যায়। শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য এইগুলির সহিত মানুষের পরিচয় করাইয়া দেওয়া। এই সকল বিদ্যা

ও কলা অতীতের নিকট হইতে বর্ত্তমানের উত্তরাধিকার। শিক্ষার লক্ষ্য এই উত্তরাধিকারে মানুষকে অধিকারী করা। কেননা এ ত কোম্পানীর কাগজের দান নয় যে ঘরে বসিয়া সুদ পাওয়া যাইবে। এ হইল কষ্টে গড়া ব্যবসায়ের উত্তরাধিকার। কাজ শিখিয়া চালাইতে পারিলে তবেই লাভের সম্ভাবনা।

সভ্যতার এই ফলগুলি শিক্ষার দ্বারা মানুষকে আয়ত্ত করান যায় কেননা যে শক্তির প্রয়োগে ইহাদের সৃষ্টি সে শক্তি অল্পবিস্তর মানুষ জন্ম হইতেই লাভ করে। সেই জন্য অসভ্য সমাজের শিশুও শিক্ষা পাইলে সভ্যসমাজের ছেলের মতই সভ্যতার বিদ্যাগুলিকে আয়ত্ত করিতে পারে। ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়া গিয়াছে। অন্যদিকে সভ্য সমাজের ছেলেকেও শিক্ষা পাইয়াই এই বিদ্যাগুলির সহিত-পরিচিত হইতে হয়। কেননা বিদ্যা ত মানসিক শক্তি নয়, উহা মানসিক শক্তির সৃষ্টি এবং সহস্র যুগের মানব প্রতিভার সমবেত সৃষ্টি। প্রকৃতি যাহার কপালে প্রতিভার তিলক পরাইয়াছেন, সে যে কেবল সভ্যতার সৃষ্টি গুলিকে নিজস্ব করিতে পারে তাহা নয়, তাহার উপর নিজের সৃষ্টিও যোগ করিতে পারে; তাহাকেও এই শিক্ষার দ্বার দিয়াই মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কেননা এমন প্রতিভার কল্পনা করা যায় না যাহা সভ্যতার কোনও সৃষ্টিকে আবার প্রথম হইতে একাই গড়িয়া তুলিতে পারে। প্রাচীন সৃষ্টির উপর দাঁড়াইয়াই তবে নূতন সৃষ্টি করা সম্ভব।

শিক্ষার লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগে আর একটী মত প্রচলিত হইয়াছে যাহা বিজ্ঞলোকের পাণ্ডিত্যের ফল নয়। সংসারের চাকা বর্ত্তমান যুগের মানুষ ও জাতির হৃদয় পিষিয়া এই মতটা নিংড়াইয়া

বাহির করিয়াছে। মতটী হইল এই যে শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা। অর্থাৎ শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে এমন ভাবে গড়িয়া তোলা যেন সে টিঁকিয়া থাকিয়া বংশরক্ষা করিয়া যাইতে পারে। এই মতটীর আবির্ভাব মানব সভ্যতার একটা tragedy। ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ। প্রাণের ঘরে ডাকাতি করিয়া মানুষ মনের ভোগের জন্য সভ্যতা গড়িয়াছে। কিন্তু ইহার দু'একটী সৃষ্টিকে আবার প্রাণের কাজে লাগাইতে গিয়া জীবন যাত্রাটা এমনই জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে মানুষ প্রাণ রাখিতে যে কেবল প্রাণান্ত হইতেছে তাহা নয়, একেবারে মনান্ত হইতেছে। মনের যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা এক প্রাণ রাখার কাজেই ব্যয় করিতে হইতেছে। ইহার বিরুদ্ধে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া কোনও লাভ নাই। যাহা জীবন হইতে ঠেলিয়া উঠিতেছে কেবল মত দিয়া তাহাকে চাপা দেওয়া চলে না। এ হইল ভিড়ের ভিতর ঠেলার মত ; ব্যাপারটা কেহ পছন্দ করে না, কিন্তু পিছু হটিবারও কাহারও সাধ্য নাই।

বর্ত্তমান যুগের মানুষের পক্ষে হয় তো এই জটিলতার হাত এড়ান অসাধ্য। এবং হয় তো বাধ্য হইয়াই বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার্থীকে জীবন যুদ্ধের জন্য তৈরী করাটাই শিক্ষার একটা প্রধান লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রাণের দাবীর সুর যখন খুব চড়া হইয়া উঠে তখন আর সব ফেলিয়া সেই দিকেই কাণ দেওয়া ছাড়া গতি নাই। কিন্তু আমরা যেন ভুলিয়াও না মনে করি যে এই বিসদৃশ ব্যাপারটাই হইল সভ্যতার উন্নতি। এ ভুলের আশঙ্কা আছে। কেননা মন আর ইন্দ্রিয়ের যে শক্তির প্রয়োগে মানুষ সভ্যতা গড়িয়াছে, আজ জীবন-যাত্রার জটিলতায় সেই সব শক্তির উপরেই প্রাণ তাহার একাধিপত্যের

দাবী পেশ করিয়াছে। ফলে মানুষের বুদ্ধি, কল্পনা, প্রতিভা ব্যয় হইতেছে অনেক, কিন্তু সকলেরি লক্ষ্য কেবল প্রাণ বাঁচান জাত বাঁচান। এ ত সভ্যতা নয়, এ হইল সভ্যতা যে পথে চলে তাহার একবারে বিপরীত পথ। প্রাণের কাজে যাদের প্রথম প্রকাশ, মনের ভোগে তাদের শেষ পরিণতি হইল সভ্যতা। প্রাণের ব্যাগারে সমস্ত মন-টাকেই নিঃশেষ করিয়া দেওয়া অসভ্যতা না হইতে পারে কিন্তু সভ্যতা নয়।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

দাদার ডায়েরি।

——ঃ০ঃ——

৫ই জ্যৈষ্ঠ ঃ—এক একটা গানের সুর যেমন একবার মাথায় ঢুকলে আর কিছুতেই বেরতে চায় না, "ঘরে বাইরে" সম্বন্ধে আমার বন্ধুর বেসুরো কথাগুলো তেমনি এই কদিন ধরে সকাল বিকাল আমার মাথায় ঘুরছে। তাদের বিচার না কর্‌লে দেখছি তারা বিদায় হবে না।

বিদ্যাসাগর মশায় তাঁর উপক্রমণিকায় বলছেন, "যে-কয়েক পদে সমাস করা যায়, সেই কয়েক পদের যে অর্থ তাহা না বুঝাইয়া যদি অন্য বস্তু বা ব্যক্তিকে বুঝায় তবে তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে" যথা বৃক্ষে আরূঢ়ঃ যঃ সঃ ইতি বৃক্ষারূঢ়ঃ অর্থাৎ বাঁদর। মানসিক জগতেও ঐ রকম সমাস হয়, তবে সেটা বাক্যের, পদের নয়। সমাস আবার সময় সময় ইংরেজী বচনেরও হয় তবে তফাৎ এইটুকু "না বুঝাইয়া"র বদলে "না বুঝিয়া"। যেমন "Art holds the mirror to Life" এবং "Life comes from the soil" এই দুটি বাক্যের বহুব্রীহি সমাসে দাঁড়াল এই যে Art এর soil-এর সঙ্গে একটা নাড়ীর যোগ আছে। অতএব ন্যায়শাস্ত্র অনুসারে ঠিক হল যে, কলাবিদ্যা দেশের মাটি অর্থাৎ বুকের উপর গড়ে ওঠা চাই। এই সিদ্ধান্তের এই উপ-সিধ্বান্তও সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পন্ন হল যে, কলাবিৎ মশায় শতকরা ৯৯ জন লোকের একজন হওয়া চাই, যদি তিনি দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বক্রী ভদ্র-লোকটি হন তা হলে তাঁর কালোয়াতী যে শুধু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে

তাই নয়, সমাজদারেরা তাঁর হুঁকো নাপিতও বন্ধ করবেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে রবিবাবু অবশ্য কলাবিৎ নন—কেননা তিনি একশর মধ্যে নয়, লাখের মধ্যে একজন। তাঁর অপরাধ তাঁর লেখায় সমাজ-চিত্র নেই।

আমিও বলি তা নেই, তবে আমি আরও একটি কথা বলি—"সেটার দরকারও নেই"। পাঠকেরা যদি নিজের দেশের খাঁটি সমাজ-চিত্র দেখতে চান, তাহলে টাকা খরচ করে বই কেনার চেয়ে তার জলজ্যান্ত চিত্র দেখবার আর একটি প্রশস্ত ও শাস্ত্রসঙ্গত উপায় অবলম্বন করা ভাল, যাতে টাকা আসে এমন কি ভবিষ্যৎ নরক থেকেও উদ্ধার পাওয়া যায়। আর পাঠিকাদের কথা আলাদা—১৩ বৎসর পার হতে না হতেই ত তাঁদের সমাজের অঙ্গিসন্ধী জানতে বাকী থাকে না।

তারপর আমার প্রায়ই এই একটি কথা মনে হয় যে, কোন Artist নিজের চারপাশের ছবি তোলেন না। আর যদিও বা তোলেন সে অন্য কোন চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে। ফটোগ্রাফীতে হাজার লাভ থাকলেও সেটা তাঁর ব্যবসা হতে পারে না, negative platesগুলো কেবল তাঁর হাতের কাঁচামাল হতে পারে। যেমন বঙ্কিম বাবুর হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো একটা বড় ব্যাপারের ভিতর এত চাপা পড়ে গেছে যে দূরবিন্ না কষলে চোখে পড়ে না। যদি গা-ঘেঁসা জিনিসের হুবহু নকল করাটাই লিখিয়ে কি আঁকিয়ের কারিগরীর চরম হত, তা হলে হেম বাবুর "বাঙ্গালীর মেয়ে" এই দেশের সব চেয়ে সুন্দরী কবিতা হয়ে উঠ্‌ত।

তবে আর এক কথা উঠতে পারে যে—সাহিত্যে যে চরিত্র বা

ঘটনাবলীর সমাবেশে করতে হবে সেগুলির ছাঁচ দেশী হওয়া চাই। আমি ছাঁচ মানে কি তা ঠিক্ বুঝি নে—তবে তার মানে যদি "সাধারণ মানুষের চালচলন কি তাদের মনের ভাবভঙ্গী হয়" তা হলে জিজ্ঞেস করি ইংরেজী ভাষায় King Lear-এর স্থান কোথায়? আর ফরাসী-ভাষায় Old Goriot কি Andre Cornelis লেখা হলই বা কেন আর রুষ-সাহিত্যে Lear of the Steppes কি Virgin Soil-এর এত বড় মান কেন? তা হলে ত কাব্যে আর Hamlet-এর জাত থাকে না। আর Hamlet-এর জাত বাদ দিলে কাব্যের থাকে কি? আর যদি ছাঁচের মানে হয় সেই চরিত্র যেটা হওয়া উচিত, তাহলে নীতি-পাঠের সুবোধ বালককেই সাহিত্যের অতুলনীয় সৃষ্টি বলে ধরতে হবে। আবার ছাঁচ বলতে যদি এমন একটি সনাতন পাত্র বোঝায় যার অন্তরে নিজের মনকে ঢালাই করাই শিল্পীর কর্ত্তব্য, তা হলে শিল্পের কোন দরকারই নেই, কেননা Art-এর প্রাণ হচ্ছে পার্থক্যের অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত, আর আমার বন্ধুর মতে সেই স্বাতন্ত্র্যের আবার অভি-ব্যক্তিও হয়য়া চাই। যাই হোক্ আমি বলি সেই চরিত্র typical যেটা তোমার আমার মত খানিকটা, আবার একজন পরদেশী এসেও বলবে "আমার মতনও খানিকটা"; অথচ প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে যে সেই চরিত্রের ভিতর আরও কিছু আছে যা আমাদের মধ্যে নেই এবং সেই কিছুটাই কবিকল্পিত চরিত্রের যা-কিছু। রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে "স্বদেশী" কথাটার খুব সার্থকতা থাকতে পারে কিন্তু আর্টের ক্ষেত্রে সেটার মানে যে কি এখনও বুঝতে পারি নি।

পূর্ব্বোক্ত ইংরাজী বাক্যের বহুব্রীহি সমাস করে আর একটি অপূর্ব্ব জিনিস হালে আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটা এই যে "কালোয়াৎ aristocrat

হলে চল্‌বে না।” কিন্তু আমার মনে হয় যে এ সব ক্ষেত্রে aristocrat আর demos-এর তফাৎ এই মাত্র যে, কারুর অন্ন কাজ করে মাথা ঘামাবার সময় আছে, আর কারুর বা তা নেই। সাহিত্য গড়ে ওঠে দেশের মাটির উপর নয়, তার মাথার উপর, আর মাথার সেই যায়গাটায় যেখানে সাংসারিক ভাবনা থাকে না। কলাবিদ্যার আলোচনায়— কি সাহিত্য চর্চ্চা, কি গান বাজনা, কি ছবি আঁকা যাই বলনা কেন, অধিকার আছে শুধু সেই সব বেপরোয়া লোকের যাদের মনের ঘরে প্রাণখুলে আড্ডা দেবার সাহস আছে, যাদের অন্নের চিন্তা নেই, কি থাকলেও থাকে না; যারা সময়ের মূল্য বোঝা উচিত হলেও বোঝে না, যারা খেয়ালের ডানায় চড়ে পরীর রাজ্যে গিয়ে তাদের আসর উড়িয়ে আনতে পারে। আর্টিষ্টরা সব রূপলোকের অধিবাসী অর্থলোকের নয় সুতরাং সে দেশে বৈশ্য শূদ্র নেই সবাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। এঁদের aristocrat নাম দেওয়া হয়তঃ হোক্, তাতে তাঁদের লজ্জা পাবার কিছু নেই। একথা খুব ঠিক্ যে যিনি আদৎ শিল্পী, শিল্প কখনও তাঁর পেশা হতে পারে না। সব দেশেই এমন সাহিত্যিকের অভাব নেই যাঁদের পক্ষে সাহিত্যের সেবা হচ্ছে একটা জীবিকা মাত্র। আমি এটা জোর করে বলতে পারি যে তাঁদের দ্বারা সাহিত্যের কোনও অসাধারণ উপকার সাধিত হয় নি। যাঁরা পৃথিবীর অন্য কর্ত্তব্য সম্পাদন করে কিম্বা উপেক্ষা করে মরজিমাফিক সাহিত্য চর্চ্চা করেন তাঁরাই কিছু স্থায়ী রেখে যেতে পারেন।

তবে কেউ কেউ বলেন aristocratic মানেই অস্বাভাবিক (artificial)। তাঁরা স্বভাবের অর্থ বোঝেন প্রকৃতি (nature)। এবং তাঁদের মতে Nature-এ সাধারণের রাজত্ব। অথচ তাঁরা অভিব্যক্তিবাদেও বিশ্বাস করেন। কিন্তু তাঁদের এটা জানা

উচিত যে ঐ মতে Democracy-র দাবীটে উড়িয়ে দিয়েছে। এই সোজা কথাটা না বোঝার জন্যে তাঁরা প্রকৃতিদেবীর লোহার সিন্দুকে সমস্ত শিল্পের শুধু মালমসলা নয় একেবারে গড়া জিনিস খুঁজে বার করতে চান, যা হবে শিল্পের আদর্শ। দর্শনের দর্পণে না দেখেও এই সত্যের দর্শনলাভ হতে পারে, যে প্রকৃতি, সুন্দরীর আদর্শ হওয়া দূরে থাকুক তাঁর কোন সৌন্দর্য্যই নেই। আছে শুধু খান কতক হাড় ও খানিকটা মাংস। কথাতেই আছে সওদাগর-পুত্র প্রথম প্রহরে হাড় যোগাড় করেন, সেনাপতির পুত্র দ্বিতীয় প্রহরে মাংস যুড়ে দেন, তৃতীয় প্রহরে মন্ত্রী-পুত্র মূর্ত্তি গড়েন কিন্তু চতুর্থ প্রহরে প্রাণ দিতে পারেন রাজপুত্তুর এবং একমাত্র তিনিই। সত্যি কথা এই যদি এ পৃথিবীতে আর্টের রাজপুত্রেরা না জন্মাতেন তা হলে প্রকৃতিকে চিরকাল ঐ অস্থিচর্ম্মসার আদ্যিকালের বুড়ি হয়েই থাকতে হত। প্রত্যেক কলাবিৎই প্রকৃতিকে নিজের মনের ঐশ্বর্য্যে প্রণয়িণীর মত সাজিয়ে দেন। আমরা স্বভাবসৌন্দর্য্য দেখে যখন আত্মহারা হই তখন শুধু সেই সাজানোর ভঙ্গীই দেখি—প্রকৃতির নিজের সাজাবার ভঙ্গী দেখি নে। আর যে দৃশ্যের নিন্দে করি সেটার দুর্ভাগ্য এই যে তার ভাগ্যে কোন artist-এর কৃপাদৃষ্টি পড়ে নি। এই যদি হয় তা হলে একজনের তুলনায় আর এক জনের সাজানটা স্বতন্ত্র হয়ে কি পড়বে না? আসল ঘটনা এই যে আর্ট-রাজ্যের রাজপুত্রদের স্বভাব থেকে যা জন্মলাভ করে তাই হচ্ছে যথার্থ স্বাভাবিক। বাজে লোকে যোড়াতাড়া দিয়ে যা গড়ে তাই অস্বাভাবিক অর্থাৎ mechanical, আমরা সাধারণ লোক, আমরা প্রকৃতিরই সামিল, আমাদের অস্তিত্ব নেই বল্লেই হয়, যতক্ষণ আর কোন বড় অস্তিত্ব 'আমাদের

প্রাণ না ধার দেয়, সেই ধার পাই বলেই আমাদের বেঁচে সুখ। অনবরত Shakespeare পড়ে আমরা তাঁরই প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হই, আর সেই জন্যেই তাঁর প্রতি ভক্তি আসে, ভালবাসা আসে, তাঁকে একেবারে আপনার করে ফেলি, অর্থাৎ তিনিই আমাদের তাঁর আপনার করে তোলেন। যিনি নেহাৎ আপনার, তিনি আমার বুকের ধন, মাথার মাণিক, নিজের সম্পত্তি, অতএব তিনি artificial মোটেই হতে পারেন না। আর সেই ভক্তি সেই ভালবাসার হিসাবে Shakespeare যেমন আমাদের কাছে দেবতা হয়ে ওঠেন, ঠিক্ সেই হিসাবে আর একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তিও হন্। সচরাচর লোকের মানসিক অবস্থা এমনই শোচনীয় যে নিজের দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে গেলেই, সেই সঙ্গে আর অপর দেবতার গায়ে ঢিল ছুঁড়তে হয়—নচেৎ ভক্তির মাত্রা পূরো দেখান হয় না। আর লিখ্তে ভাল লাগছে না, মনটা এমনি এলিয়ে পড়্ছে যে এর পরে যদি কলম চালাই তাহলে কাগজের উপর শুধু ভাবের হিজিবিজি কাটব।—এর অর্থ নয়, যে এতক্ষণ বসে বসে যা লিখলুম তা একটা আটসাট প্রবন্ধ হয়ে উঠেছে। আমি বাক্যের সঙ্গে বাক্য জুড়ে হয়ত এমন একটা প্রকাণ্ড বহুব্রীহি সমাস গড়ে তুলেছি যে তাতে করে—যা বোঝাতে যাচ্ছি তার উল্টো জিনিস বোঝাবে।

শ্রীধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

লোক-শিক্ষা।

——:*:——

"Patriotism" বল্‌তে একালে আমরা যা' বুঝি, ইতিপূর্ব্বে তা' আমাদের দেশ ছিল কিনা, সে বিষয়ে অনেক মত এবং প্রচুর তর্কের অবতারণা হয়েছে। কিন্তু, তা সত্ত্বেও একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে যে—"লোকমত" বল্‌তে যা' বোঝায়, তা'র সুস্থ, সবল এবং স্বাভাবিক অভিব্যক্তির সুযোগ আমাদের দেশে কখনো ঘটে নি। নানা কারণে, আমাদের দেশের লোকসমূহ কোনোদিনই মাথা তোলবার সুবিধে পায় নি;—কাজেই, দেশের সম্বন্ধে ভালো-মন্দ কোনরকম মত পোষণের মাথাব্যথাও তাদের কাছে ঘেঁস্‌তে পারে নি! পেয়াদার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীর চিন্তা এবং পরিকল্পনা হাস্যকর হ'তে পারে, তাই বলে মোটেই অসঙ্গত নয়; কিন্তু আমাদের দেশের জন-সাধারণের পক্ষে বিনা শিক্ষায় দেশের পরে মমত্ব আরোপের আশা, তাদের বর্ত্তমান অবস্থায়, কেবল অসম্ভব নয়—নিতান্তই অস্বাভাবিক!

আজীবন যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাজার রকমে প্রমান কর্‌ছে যে তা'রা দেশের জন্য;—দেশে এমন কোন শিক্ষা নেই, এমন কোন অনুষ্ঠান নেই, এমন কোনো ইঙ্গিতও নেই যাতে বুঝিয়ে দেয়—দেশটাও তা'দেরি জন্য।

দেখেশুনে মনে হয়, জাতীয় উন্নতিপ্রয়াসী শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের প্রজা-সাধারণের পরে একটুও নির্ভর করেন না; তারা যেন জাতীয় জীবনের মোটেই আশাভরসার স্থল নয়।

অনেক সময় আমরা মনে করি, শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক আন্দোলনের ফলে দেশটা যদি রাজনৈতিক হিসেবে উন্নত হয়, তবে সব জিনিসেরই চেহারা আপনা হতেই ফিরে যাবে! এখন ও সব ছোটো খাটো বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে বিশেষ ফল হবে না।—ঘোড়া হলে আর চাবুকের জন্মে ভাব্‌তে হ'বে না!—

ঠিক কথা, কিন্তু ঘোড়া-বাতিকটাকে প্রশ্রয় দেবার আগে, ঘরে চাবুকের কড়িটীও আছে কিনা—সেটা খতিয়ে দেখা উচিত নয় কি? আর, তা' ছাড়া, পরণে যদি আমাদের কাপড় না থাকে, তবে পিঠে আমাদের শিরোপার শাল মানাবে কেন?

জন-সাধারণকে ছেড়ে দেশের যে কোন কাজ করা সম্ভব—এমন ত' আমার মনে হয় না।

লৌকিক মন উন্নতির জন্মে উন্মুখ না হ'লে, নিজের দুরবস্থার প্রতি স্বতঃই অসহিষ্ণু হয়ে না উঠলে—যথার্থ জাতীয় উন্নতির চেষ্টা বিড়ম্বনা। ক্ষিদে না লাগ্‌লে খাদ্যের ব্যবস্থা, আর তৃষ্ণা না পেলে জলের যোগাড় শরীরের পক্ষে কখনো উপকারী হতে পারে না। জাতির শরীরের যদি প্রকৃতই উপকার কর্‌তে হয়, তবে তার ক্ষিদে যাতে বাড়ে—সেই চেষ্টাই কর্‌তে হবে। দু'একজন শিক্ষিত লোক যতই ক্ষুধাতুর আর তৃষার্ত্ত হ'ন না, তাঁরা যে সমস্ত দেশটার ভোজ্য আর পানীয় উদরস্থ কর্‌তে পার্‌বেন,—সেটা মনে করা নিতান্তই কষ্টকল্পনা। আর দৈবযোগে যদি বা পারেন, তা' হ'লে তাঁদের অজীর্ণ ছাড়া আর কোনো লাভ হবে বলে ত' মনে হয় না!

লোকমতের অনুমত না হওয়ায় আমাদের অনেক কথা এবং কাজ ভুয়ো এবং ফাঁকা হ'য়ে পড়্‌ছে। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের ভিতরে

দু'একটির বুদ্ধির যতই ধার থাক্‌না কেন—জন-সংঘের সহানুভূতির ভার তার পেছনে না থাকাতে, তা'তে মোটেই কিছু কাট্‌ছে না! জনসাধারণকে বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধনের প্রয়াস, আকাশে রাজপুরী নির্ম্মাণের চেষ্টার সামিল। এরকম ব্যাপার একমাত্র রূপকথার রাজ্যেই ঘটা সম্ভব। সুতরাং জাতি-গঠনের সুব্যবস্থা করবার জন্য জনগণের চিরাগত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। প্রজা চিরদিনই আমাদের দেশে রাজার সম্পত্তি বলে' গণ্য হ'য়ে এসেছে। আর, তা'তে করেই, পাশার দানের সাথে তাদের রাজার বদল হ'য়েছে, রাজকন্যের বিবাহে তারা যৌতুক গিয়েছে, ব্রাহ্মণের দানে তারা দক্ষিণে হয়েছে। তাদের যে একটা স্বতন্ত্র শক্তি, সমবেত সত্তা এবং মহত্তর সার্থকতা আছে, সে কথা তা'দের কেউ বলে নি! জাতীয় শক্তির সাধন, জাতীয় আত্মার উদ্বোধন, জাতীয় স্বার্থের সমীকরণ আমাদের দেশে কখনো হয় নি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের ঐহিক আর পারলৌকিক স্বার্থ এবং পরমার্থের খিচুড়ি পাকিয়ে, তার পরিবেশনের ভার স্বর্গের তেত্রিশ কোটির হাতে দিয়েই দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলেন!

ফলে, দেশের জাতীয় আত্ম-শক্তি-বোধ জাগ্রত হ'তে পারে নি। অদৃষ্টের দোষ আর দেবতার দোহাই দিয়েই আমরা বরাবর আস্‌ছি। অবস্থার উৎপীড়ন নিতান্ত অসহনীয় হ'লে—"ঘোর কলি" বলে' বক্ষমন্থন করে' দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়েছি! বসন্তে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হ'য়ে যাচ্ছে—আমরা চাঁদা করে' কর্‌ছি শীতলাদেবীর পূজা! কলেরায় পল্লী মহাশ্মশানে পরিণত হতে চলেছে—আমরা ঘটা করে কর্‌ছি শ্মশান-কালীর পূজা! সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা এই আমাদের দেশ;

এর 'পরে বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষের আক্রোশ বেড়ে চলেছে —নিতান্ত নিরুপায় পল্লী-বৃদ্ধেরা পরম নিশ্চিন্ত ভাবে ঘরের দাবায় বসে' কল্কেয় ফুঁ দিতে দিতে আলোচনা কর্‌ছে—তাদের কৈশোর-জীবনে ধান চালের দরদস্তর! কেন যে দুর্ভিক্ষ হয়, কেন যে মহামারী এত ঘন ঘন আসে—সে সব তা'দের ভাব্‌বার বিষয়ই নয়! অমুক সালের ভূমিকম্প বা গতসনের ঝড়ের মতন এসবেরও কোন "কেন" নেই।—আর কিনারা ত দূরের কথা!

জনসাধারণ আশৈশব নিজ নিজ পরিবারবর্গকে প্রদক্ষিণ করেই তাদের জীবনযাত্রা শেষ কর্‌ছে। পারিবারিক গণ্ডির বাইরেও যে তাদের আদান-প্রদানের যথেষ্ট অবসর আছে, ধ্যানধারণার প্রচুর আয়োজন এবং প্রয়োজন রয়েছে—সে কথা কিছুতেই তাদের মাথায় ঢুক্‌ছে না! অনেক পরিবর্ত্তনের ঝাপ্‌টা তাদের মাথার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে, অনেক উৎপীড়নের কষাঘাত তারা পিঠের পরে সয়েছে; কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুম তাদের ভাঙ্গবার এখনও ঢের দেরী!

কুম্ভকর্ণের প্রকৃতিটা যে অমন ধারা নিদ্রালু হয়ে পড়েছিল—সে অনেকটাই তার গায়ের জোরে, আর বাকীটা তার দাদার জোরে!—আর, আমাদের দেশের প্রকৃতিপুঞ্জের যে তন্দ্রালু স্বভাব, তার সমস্তটাই—দাদার জোরে!

সমাজের বড় বড় দায়িত্বগুলো যদি নিঃশেষে ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের স্কন্ধে ন্যস্ত না থাক্‌ত; আর তাঁরা যদি সুদীর্ঘকাল ধরে' তাঁদের এই নেতৃত্ব-ভার বহন করবার সুযোগ না পেতেন; তাহলে আমাদের জনসাধারণের এমন-ধারা লুপ্তজ্ঞান এবং সুপ্তিমগ্ন হবার অবসর বোধহয়

জুটতো না! এই আদিম রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মধ্যেই আমাদের সমাজে আভিজাত্য এবং সাধারণ্য বদ্ধমূল হয়ে গেল।

দেশের মঙ্গলামঙ্গলের জন্যে যাঁরা দায়ী ছিলেন, পুরুষপরম্পরায় যাঁরা দেশের অভিভাবক ছিলেন, তাঁরা ত' কখনো প্রজাসাধারণের সহকারীতা বা সহানুভূতি চান নি।—তাঁরা চেয়েছিলেন পরিচর্য্যা, পেয়েছিলেনও শুধুই তাইই। ফলে, আদিতে যা' প্রবর্ত্তিত হয়েছিল সামাজিক শৃঙ্খলার জন্যে, শেষে তাই পরিবর্ত্তিত হ'ল সামাজিক শৃঙ্খলে!

কাজেই উপর্য্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণে দেশ যখন বিধ্বস্ত হ'তে লাগলো, তখন প্রজাসাধারণ তাতে ভ্রূক্ষেপও করে নি। কারণ, "হারলেও রাজার মাটি, জিতলেও রাজার মাটি"—তাদের কি? আমাদের মাথাটার সঙ্গে যদি হাত-পায়ের সহানুভূতি না থাকে, তা' হ'লে শরীরের পতন নিতান্তই অনিবার্য্য হ'য়ে পড়ে! হ'য়েছিলও তাই।

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের রাষ্ট্রীয় অধিকার, বিদেশীর দমকা হাওয়ায় অচিরেই অযত্ন-রক্ষিত কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল। কিন্তু তাতে জনসাধারণের জীবনযাত্রার বিশেষ কোনোই পরিবর্ত্তন হয় নি। কারণ যুদ্ধটা সেকালে সত্যি সত্যিই রাজায় রাজায় হ'তো!—আর তার যতটা আঁচ প্রজার গায়ে এসে লাগতো, সেটাকে তারা দুঃস্বপ্ন ব'লেই চিরকাল উড়িয়ে দিয়ে এসেছে।

মাঝে মাঝে মনে হয়, প্রাকৃতিক হিসেবে আমাদের দেশটা যত ভালো "অত ভালোও ভালো না!"—বরং একটু খারাপ হ'লেই ভালো হ'ত! স্নেহমুগ্ধা জননীর মতন অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়ে দিয়েই

কর্‌তেই হবে। এ ছাড়া আমাদের জাতীয়উন্নতির অন্য কোনো পন্থা নেই।

আমাদের ধর্ম্মপ্রবণতার সাথে কর্ম্মপ্রবৃত্তির যোগ দিতে হবে—তা' হলেই, দেশমাতার সোনার মুকুটে মাণিকের ঝালর মানাবে ভালো!

শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

ফাল্গুন, ১৩২৩।

রূপের কথা।

——:০:——

এ দেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায়, তাই যদি তাদের মনের কথা হয়,—তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানব-সভ্যতার চরম পদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশীরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়—কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সুচেহারা নেই, তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন। বিদেশী বলতে দু'শ্রেণীর লোক বোঝায়—এক পরদেশী, আর এক বিলেতি। আমরা যে বড় একটা কারও চোখে পড়ি নৈ, সে বিষয়ে এই দুই দলের বিদেশীই একমত।

যাঁরা কালাপাণি পার হয়ে আসেন, তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জুড়োয়—কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষুণ্ন হয়; এর কারণ—আমাদের দেশের মোড়কে রঙ আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলা-দেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন, তার রঙ সবুজ; আর বাঙ্গালী নিজে যে কাপড় পরেছে, তার রঙ আর যেখানেই পাওয়া যাক্—ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রঙছুট বলেই অপর কারো নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে, তারা আমাদের দেখে খুসি হয় না। যাঁর বোম্বাই সহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন কলিকাতার সঙ্গে সে সহরের প্রভেদটা

কোথায় এবং কত জাজ্বল্যমান। সে দেশে জনসাধারণ পথেঘাটে সকালসন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায়, এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্য্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধূলি,—তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশী ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকটূ। বাকী ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশী,—আমরা আধ-স্বদেশী হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় সাদা নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না; রঙ চাই শুধু সঙ সাজবার জন্যে। আমাদের নব-সভ্যতাও কার্য্যতঃ এই মতে সায় দিয়েছে।

(২)

আপনারা বলতে পারেন যে, এ কথা যদি সত্যও হয়, তাতে আমাদের কি যায় আসে? বিদেশীর মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা ত আর জাতকে জাত আমাদের পরণ-পরিচ্ছদ, আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেলতে পারি নে? জীবনযাত্রা ব্যাপারটা ত আর অভিনয় নয়, যে দর্শকের মুখ চেয়ে সে জীবন গড়তে হবে, এবং তার উপর আবার রঙ ফলাতে হবে?—এ কথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি, তা না জানলেও, এটা জানি যে পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে,—অপর দেশের অপর লোকের জন্য ত নয়ই। তবে বিদেশীর কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয় জীবনের ত্রুটি বিদেশীর চোখে যেমন এক নজরে ধরা পড়ে, স্বদেশীর চোখে তা পড়ে না। কেননা আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে তাদের চোখে তা সয় না।

এই বিদেশীরাই আমাদের সজ্ঞান করে দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাক্‌তেও কাণা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই—কিম্বা যদি থাকে ত অতি কম—সে বিষয়ে বোধহয় কোনও মতভেদ নেই। কেননা এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে' মনে করি নে। বরং সত্যকথা বল্‌তে গেলে—আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতা-টাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্বের পরিচয় দেয়। রূপ ত একটা বাইরের জিনিস—শুধু তাই নয়, বাহ্যবস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমন কি অবজ্ঞা কর্‌তে না শিখেছে, তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আর কিছু হই আর না হই—বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক,—সে কথা যে অস্বীকার করবে, সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতিদ্রোহী।

(৩)

রূপ জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন, তাঁদের মতে অবশ্য রূপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু দলে পাতলা হলেও, পৃথিবীতে এমন সব লোক আছে, যারা রূপকে মান্য করে, শ্রদ্ধা করে, এমন কি পূজা করতেও প্রস্তুত—অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপভক্তের দল অবশ্য স্বদেশীর কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য,—অর্থাৎ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে রূপের স্বত্বসাব্যস্ত কর্‌তে বাধ্য। আপশোষের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এদেশে প্রমাণ কর্‌তে হয়,—অর্থাৎ একটা সহজ কথা বল্‌তে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের তর্কস্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।

যা সকলে জানে আছে,—তা নেই বলাতে অতিবুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমরা এই "অতির" অতিভক্ত হওয়াতে, আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।

বস্তুর রূপ বলে যে একটি ধর্ম্ম আছে, এ হচ্ছে শোনা কথা নয়,—দেখা জিনিস। যাঁর চোখ নামক ইন্দ্রিয় আছে, তিনিই কখন-না-কখনও তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরি চোখ আছে,—সম্ভবতঃ শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্য্যের নাম কর্‌লেই অতীন্দ্রিয়-তার ব্যাখান অর্থাৎ উপাখ্যান সুরু করেন। কিন্তু আমি এই রূপ জিনিসটিকে অতি-বর্জ্জিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিঁকিয়ে রাখ্‌তে চাই—কেননা অতীন্দ্রিয় জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।

(৪)

রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না বলেন, তাতে কিছু যায় আসে না; কেননা যা দৃষ্টির অগোচর, তাই দর্শনের বিষয়। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে, তা মানুষমাত্রেই জানে এবং মানে। তবে সেই গুণের পক্ষ-পাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের—এই নিয়েই যা মতভেদ।

রূপকে আমরা ভক্তি করিনে; সম্ভবতঃ ভালও বাসিনে। আপ-নারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুল প্রচার হয়েছে, যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্য্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবতঃ এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয়

আত্মমর্য্যাদার লক্ষণ—এ কথা স্বীকার করা যায় না; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরুদ্ধে চিরদিন সাক্ষী দিয়ে আস্‌ছে।

স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই, অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্য্যাদা যে কত বেশী, তার প্রমাণ হাতে হাতে পাওয়া যাবে। বর্ত্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না,—সে দেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিষ্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে—অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট বাড়ী ঘরদোর মন্দির প্রাসাদ, মানুষের আসন বসন সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি—নিত্য নূতন করে, সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টার ফল সু কি কু হচ্ছে—সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর অবশ্য একটা কুৎসিত দিক্ আছে—যার নাম Commercialism—কিন্তু এই দিকটে কদর্য্য বলেই তার সর্ব্বনাশের দিক।—Commercialism-এর মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাক্‌তে পারে, কিন্তু লোভের নেই।

ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রূপের আরাধনাই সে দেশের প্রকৃত ধর্ম্ম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরাপ্রীতিবশতঃ, চীন-জাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই—তা সে ঘটিই হোক্ আর বাটিই হোক্। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন, তাঁরাই তাদের রূপ-সৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গল জাতিকে ভগবান রূপ দেন নি,—সম্ভবতঃ সেই কারণে সুন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছে। এই ত গেল বিদেশের কথা।

(৫)

আবার স্বদেশের নয়, স্বকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে, আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকোইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চ্চার ইতিহাস ত জগৎ-বিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না; কেননা আমরা যাই বলি নে কেন, সে সভ্যতাও মানব-সভ্যতা,—একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়, দেহ ছিল,—এবং সে দেহকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়্‌তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সুমুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল, তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃত-সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্য্যজ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃত-কাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড় কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের—বিশেষতঃ রমণীর দেহের বর্ণনা—কেননা সে কাব্য-সাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে, তাও বস্তুতঃ রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ, নারী-অঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃত-সাহিত্যে হরেক রকমের ছবি আছে, কিন্তু Landscape নেই বল্লেই হয়,—অর্থাৎ, মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির অস্তিত্বের বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। Landscape প্রাচীন গ্রীস কিম্বা রোমের হাত থেকেও বেরয় নি।—তার কারণ, সে কালে মানুষে, মানুষ বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখ্‌তে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আর্টে নয়, দর্শনে বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নব-বিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের

পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবতঃ সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য্যকে অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যাকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়—পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল।—যাঁর অলোকসামান্য রূপ নেই, তাঁকে এদেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্য্যের অবতার ছিলেন। রূপগুণের সন্ধিবিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়,—আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘৃণা ছিল যে, পুরাকালে শূদ্রেরা যে দাসত্ব হতে মুক্তি পায় নি, তার একটি প্রধান কারণ,—তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত—অন্ততঃ আর্য্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও, সেকালের ধর্ম্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ্ম নিরাকার হলেও, ভগবান মন্দিরে মন্দিরে মূর্ত্তিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ ব্রহ্ম অরূপ, এবং সগুণ ব্রহ্ম স্বরূপ।

(৬)

সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্য্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ—সভ্য-সমাজ বলতে বোঝায় গঠিত সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই, তাকে আমরা সভ্য-সমাজ বলিনে। এ কালের ভাষায় বলতে হলে, সমাজ হচ্ছে একটি organism; আর আপনারা সকলেই জানেন যে, সকল organism এক-জাতীয় নয়—ও বস্তুর ভিতর উঁচুনীচুর প্রভেদ বিস্তর। Organic জগতে protoplasm হচ্ছে সব চাইতে নীচে, এবং

মানুষ সব চাইতে উপরে। এবং মানুষের সঙ্গে protoplasm-এর প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে ;—অপর কোনও প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে protoplasm-এর চাইতে রূপবান, এ বিষয়ে আশা করি কোনও মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর, সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ ; সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই—এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশী শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্রমে অধিক সুশ্রী হয়ে ওঠে, এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয়—জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্য্যতা দুর্ব্বলতার বাহ্য লক্ষণ,—সৌন্দর্য্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে, তখনই মঠে মন্দিরে বেশে ভূষায়, মানুষের আশায় ভাষায় নব সৌন্দর্য্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ।

আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়—সেই দিনই বাঙ্গালী সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণব-সাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যবুদ্ধি যে টিঁকল না, বাঙ্গলার ঘরে-বাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফুটল না, তার কারণ চৈতন্য-দেব যা দান করতে এসেছিলেন, তা ষোল-আনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাঙ্গলার বৈষ্ণবধর্ম্ম বাঙ্গালী সমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয়ত সেই একই কারণে তা বাঙ্গালী সভ্যতাকে সাকার করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমা-

দের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে—আমাদের মনে ও হাতে তা' জমে নি। ফলে এক গান ছাড়া আর কিছুরই আমরা নবরূপ দিতে পারি নি।

(৭)

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু এ কথা মুখ ফুটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগুড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বল্‌ছি।

সত্য ও সৌন্দর্য্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা কর্‌তে পারেন না। হয় এদের ভক্তি কর্‌তে হবে—নয় অভক্তি কর্‌তে হবে। অর্থাৎ, সত্যকে উপেক্ষা কর্‌লে মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হবে; আর সুন্দরকে অবজ্ঞা কর্‌লে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক সু আর এক কু। 'সু'কে অর্জ্জন না কর্‌লে 'কু'কে বর্জ্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়,—ঘোরতর বিরাগ আছে।

আমরা দিনে দুপুরে চিৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফুলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে—সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।

এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তাহলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠ্‌বে—এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনও কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ও reflector ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন—সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং

ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সয় না—তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না, তাতে আর বিচিত্র কি? জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে, যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে; কিন্তু রূপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য উদর ও প্রাণ protoplasm-এরও আছে,—কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেঁচে থাকা, এবং তজ্জন্য উদরপূর্ত্তি করা,—তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও, রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল;—অপরপক্ষে রূপের আলো রঙীন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল। আদিম মানবের কাছে ফুলের কোনও আদর নেই—কেননা ও বস্তু আমাদের কোনও আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না;—ফুল আর যাই হোক, চর্ব্ব চোষ্য কিম্বা লেহ্য পেয় নয়।

(৮)

এ সব কথা শুনে, আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সে সব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়—সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি সাদা বল্‌ছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো; সেই সমস্ত-আলো refracted অর্থাৎ

ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই refraction-এর একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান-কারণ হচ্ছে, পঞ্চ-ভূতের বহির্ভূত ইথার নামক রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম্ম হচ্ছে—এই জড়-জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রূপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের স্থূল-শরীরের কাজে লাগে না, তার কারণ বিশ্বের স্থূল-শরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সূক্ষ্ম-শরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরের রূপের স্পর্শে সেই সূক্ষ্ম-শরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপ-জ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূল-শরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ,—আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

(৯)

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে, ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন, কেননা ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চল্‌তি উদাহরণ নেওয়া যাক্।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো refracted হয়ে আসে, তা

ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত্ত হয়ে আস্‌তে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা পুরো বুঝুক আর না বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে— সত্য শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে, সে সুন্দরকে তাড়না কর্‌তে হলে, হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবতঃ সে ব্যক্তি সত্য কিম্বা শিবের কখনও একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা করো—অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দুর্নীতির কথা! বিষয়বুদ্ধির মতে সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা বিলাসিতা, এবং রূপের চর্চ্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দরের উপর এদেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এদেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া ধন। এ তিনটির প্রত্যেকটি যে প্রতি অপরটির শত্রু তার কোনও প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনও সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি,—আমার বিশ্বাস সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সে কথা উপেক্ষা করে, সে-সত্য প্রচার কর্‌তেও বাধ্য। কেননা সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষ ফল ভাল বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি কর্‌তে বাধ্য—তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে,—কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষ ফল ভাল বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ কর্‌তে দেরী লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সব চাইতে আগে—কেননা মোটামুটি ও জ্ঞান না থাক্‌লে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া ত দূরের কথা। ও জ্ঞান বিষয়বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও, একটা অঙ্গমাত্র।

তারপর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিব-জ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্মজ্ঞান, এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়—এবং আংশিকভাবে তার বহির্ভূত অতএব মনের সম্পদ।

সব শেষে আসে রূপজ্ঞান, কেননা এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্য সমাজের গোড়ার কথা হলেও, সুরুচি তার শেষ কথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসর বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে, এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল হয়ে গিয়েছে। সত্য কথা এই যে, মানব-সমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ,—খোয়ানো সহজ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সাধনার সেই সঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতে সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলুক আর না টলুক, তার চূড়া ভেঙ্গে পড়েছে।

এ বিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধ-দার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সব নীচে কাম-লোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।

আমার ধারণা, আমরা সব জন্মতঃ কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।

আর এক কথা, রূপের চর্চ্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি—অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের Commercialism আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব কর্‌ছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয় শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়,—মনের দারিদ্র্য। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাসানের বেশভূষা সাজ-সজ্জা আচার অনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা, সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত আমাদের ধনী-সমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই করুক—আমাদের রূপকাণা করেছে। "গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়"—ভারতচন্দ্রের এ কথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এই কথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে—তাহলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়ঃ। তাতে পৃথিবীর কারও কোন ক্ষতি হবে না,—এমন কি আমাদেরও নয়।

বীরবল।

সবুজ পত্র

সম্পাদক

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী এম্, এ, বার-য়্যাট-ল

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা ছয় আনা।

সবুজ পত্র কার্য্যালয়, ৩ নং হেষ্টিংস্ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সম্পাদকের নিবেদন।

—:০:—

সবুজ পত্রের বয়েস আজ তিন বৎসর পূর্ণ হ'ল। এই তিন বৎসর ধরে সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে যে-সকল অপবাদ, তার সম্বন্ধে যে-সকল প্রবাদ রটানো হয়েছে—আমরা ইতিপূর্ব্বে তার কোনও প্রতিবাদ করি নি। তার প্রথম কারণ, আমরা আমাদের মনের কথা যথাসম্ভব স্পষ্ট করে বল্‌বার চেষ্টা করি;—এ সত্ত্বেও সে কথা যদি কারও বুঝতে কষ্ট হয়, তাহলে কোনও স্বরচিত টীকা-ভাষ্যের সাহায্যে তা আরও পরিস্কার করা আমাদের সাধ্যের অতীত। দ্বিতীয়তঃ, সমালোচকদের বিরুদ্ধবাদের অর্থ যে আমরা সব সময়ে বুঝতে পেরেছি তাও নয়; কেননা, সে বাদের ভিতর একমাত্র জিনিস যা স্পষ্ট, সে হচ্ছে এই যে তা বিরুদ্ধ। মন নামক পদার্থটিও, অপরাপর তরল পদার্থের মত, স্থির না-হলে স্বচ্ছ হয় না। এবং সবুজ পত্রের সমালোচকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরিচয় দেন শুধু চিত্তচাঞ্চল্যের। এ ক্ষেত্রে প্রতিবাদ নিস্ফল। চিত্তবৃত্তির ক্ষিপ্ত অবস্থায় মানুষের বিচারবুদ্ধি নষ্ট হয়, এবং সে অবস্থায় তর্কযুক্তি তার কাণে ঢুকলেও, মনে ধরে না। তৃতীয়তঃ, সমালোচনার চোট্‌টা সবুজ পত্রের লেখার চাইতে লেখকদের উপরই বেশী পড়েছে; এ কারণেও আমাদের নিরুত্তর থাক্‌তে হয়েছে। সাহিত্য-জগতে মতের সঙ্গে মতের সংঘর্ষ হওয়াই শ্রেয়ঃ, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ সে জগতে প্রেয়ও নয়, শ্রেয় ও নয়। এই সব কারণে এই সমালোচনার উপদ্রব

এতদিন আমরা হাসিমুখেই সহ্য করে এসেছি—কেননা আমাদের বিশ্বাস, নিন্দা-প্রশংসার হুজুগে সাহিত্যের কোনও চিরস্থায়ী ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না।

যে কথার ভিতর কোনও সত্য আছে, তা আজ না হোক্, কাল গ্রাহ্য হবে। শতমুখের শতনিন্দার ফুৎকারে সে সত্যের আগুন নেভা দূরে যাক্—আরও জ্বলে উঠবে। আর যে কথার ভিতর কোনও সত্য নেই, শতমুখের শতপ্রশংসার ফুঁয়ে তার মিথ্যার ছাই শুধু আকাশে উড়বে—এবং সম্ভবতঃ সমাজের চোখেও ঢুক্‌বে; কিন্তু তাতে কারও চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ হবে না।

আমার বিশ্বাস সাহিত্য-সমাজে অযথা নিন্দার চাইতে অযথা প্রশংসা আরও বেশী মারাত্মক, কেননা ও-জাতীয় প্রশংসায় মানুষকে মুগ্ধ করে এবং মোহ আত্মশক্তিকে অভিভূত করে। আমাদের কপালে যে তা জোটে নি—এ আমাদের সৌভাগ্য। সবুজ পত্রের কথার ভিতর কোনও সত্য আছে কিনা, তার পরিচয় পাওয়া যাবে, যখন সে কথা বাসি হবে। ইতিমধ্যে আমরা ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে পার্‌ব, কেননা সাহিত্য-সমাজে আমরা নগদ বিদায়ের প্রত্যাশী নই। সবুজ পত্র যে উপেক্ষিত না হয়ে, বিড়ম্বিত হচ্ছে—এতেই আমরা কৃতার্থ হয়েছি। সাহিত্য-জগতে তিরস্কারকে অনেক সময়ে পুরস্কার হিসাবেই গণ্য কর্‌তে হয়।

তবে সবুজ পত্র নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্য-সমাজে যে ছোট-খাটো হুজুগটির সৃষ্টি করা হয়েছে, তা আমার কাছে নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় বলে মনে হয়। আমরা যে হুজুগপ্রিয়, এ কথা ত সর্ব্ববাদী-সম্মত। হুজুগ জিনিসটি কোন দেশেই জাতীয় মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়;—এদেশে ত বিশেষ ক্ষতিকর। হুজুগেরও একটা

নেশা আছে, এবং ও জিনিসে মাত্রা একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, মনকে সুস্থ রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। কৃত্রিম উত্তেজনার পিঠ পিঠ আসে অকৃত্রিম অবসাদ। কথায় কথায় দশা ধরা দুর্দ্দশারই সামিল,—তা সে ভক্তির ক্রোড়েই হোক, আর অভক্তির তোড়েই হোক। Hypnotised হবার প্রবণতাটা মনের বলের পরিচয় দেয় না। সাহিত্য-জগতে মানুষ শুধু মনের কারবারই করে থাকে; সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিকে ঘুম পাড়ানো যার ধর্ম্ম—এমন ব্যাপারের প্রশ্রয় দেওয়াটা অন্ততঃ সে ক্ষেত্রে সঙ্গত নয়। এক কথা একশবার আওড়ালে যে মানুষের ঘুম পায়, তা সকলেই জানে—বিশেষতঃ সে কথার যদি কোনও মানেমোদ্দা না থাকে।

পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের চিন্তা করবার অবসর নেই, অভ্যাসও নেই; এবং অনভ্যাসবশতঃ তাদের অন্তর্দৃষ্টিও পারিবারিক গণ্ডির বাইরে যায় না। সুতরাং তার বাইরেকার দেশের কথায় তারা সহজেই অবিশ্বাস করে,—সম্ভবতঃ সেই সঙ্গে ভয়ও পায়। আমাদের সকল লেখাপড়ার উদ্দেশ্য মনোরাজ্যের অপরিচিত দেশের সঙ্গে সকলের মনের পরিচয় করিয়ে দেওয়া—এক কথায় সামাজিক মনের পরিসর বাড়ানো। . . মানুষের শরীরের বৃদ্ধির একটা সীমা আছে,—কিন্তু মনের নেই; এই সনাতন সত্যই হচ্ছে মানবের সকল শিক্ষাদীক্ষার ভিত্তি। সুতরাং যাঁরা জাতীয়-মনকে তাঁর বর্ত্তমান সামাজিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখতে ব্রতী হন—তাঁরা সাহিত্যের ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অজানার ভয় দেখানো মানব-মনকে তটস্থ করে রাখবার একটি সহজ উপায়—এবং হুজুগ জিনিসটে অনেক সময়ে অকারণ ভয় থেকেই জন্ম-লাভ করে। বোধহয় বহুলোকের স্মরণ আছে যে, আজ বছর দশেক

আগে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান সভ্যতার কেন্দ্রস্থল, এই কলিকাতা রাজধানীতে ছেলেধরার ভয়ে কি বিপুল হুজুগের সৃষ্টি হয়! এবং কত শত শত লোক দিনদুপুরে সদর রাস্তায় ছেলেধরার সাক্ষাৎও লাভ করেন,—যদিচ সে বেচারার কোন অস্তিত্বই ছিল না। এই হুজুগের প্রভাবে যে-সব নিরীহ ব্যক্তিরা লাঞ্ছিত ও তাড়িত হয়েছিল, তাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। কিন্তু তাতে বেশী কিছু আসে যায় না;—হুজুগের প্রভাবে দেশসুদ্ধ লোক যে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে—সেইটিই আসলে আক্ষেপের বিষয়। সুতরাং সাহিত্য-সমাজে জুজুর ভয় দেখানোটা সুবুদ্ধির কার্য্য নয়। হুজুগ মনোরাজ্যের একটা সংক্রামক ব্যাধি; ও-বস্তুর একবার আবির্ভাব হলে বহুলোকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ও-রোগগ্রস্ত হতে বাধ্য।

এটা নিতান্তই দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশের কোনও কোনও প্রবীন ব্যক্তি সবুজ পত্রের বিরুদ্ধে এই অন্যায় হুজুগের প্রশ্রয় দিয়েছেন। যাঁরা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের জাতিধর্ম্ম,—এবং এ ধর্ম্মের উচ্ছেদটাও বাঞ্ছনীয় নয়, কেননা সৌজন্যকে ত্যাগ করে সমাজ তার সভ্যতা রক্ষা করতে পারে না। কিন্তু এই সৌজন্য উভয়পাক্ষিক হওয়াই শ্রেয়—নচেৎ অন্ততঃ সাহিত্য-সমাজের আলোচনা বাক্‌বিতণ্ডায় পরিণত হয়। নবীনেরা সহগুণের পরিচয় দেবেন আর প্রবীনেরা অসহিষ্ণুতার—জাতীয় জীবনের এ রীতিটা মোটেই শোভন নয়। আর আমাদের বিশ্বাস যে, যা শোভন নয়, তা শুভও নয়। আমরা যদি আমাদের কথার ও ব্যবহারের সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি রাখি, তাহলে সে কথার ও ব্যবহারের মূল্য বেড়ে যাবে। সীমার জ্ঞান ও মাত্রার জ্ঞান হারিয়ে বসলে, মানুষের হাতের কিম্বা মনের কোন কাজই সুন্দর হয় না। পৃথিবীতে একমাত্র তাই অশোভন, যার সর্ব্বাঙ্গে অসংযমেরই স্পষ্ট

পরিচয় পাওয়া যায়। যা কদাকার তা কখনই সদাচার হতে পারে না।

আমাদের সাহিত্য-সমাজে, মনের ও বাক্যের অসংযত প্রকৃতিটা যে দিন দিন বেশী করে ফুটে উঠছে, তার আর সন্দেহ নেই। কথায় কথায় ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়াটা প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞার পরিচয় দেয় না। বাঙ্গলা মতে রাগই পুরুষের লক্ষণ, কিন্তু সংস্কৃত মতে ঠিক তার উল্টো। যে জাতি মুখে গীতার এত ভক্ত—সে জাতি যে ব্যবহারে এতটা অধীরতার পরিচয় দেন—এ বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। কোনও একটি কথা মনে হওয়া মাত্র আমরা তা বলবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি, বিশেষতঃ তা যদি ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অপ্রিয় হয়। সে কথার কোনও মূল্য আছে কি না, তা বিচার করবার আমাদের আর ত্বর সয় না। যে মত আমরা নিজে গড়ে তুলি নি, সে মত প্রকাশ করতে,—যে কথার অর্থ আমরা পূরো বুঝি নে, তা অন্যকে বোঝাতে, আমরা সদাই ব্যস্ত। এ সবই মানসিক অসংযমের বাহ্য লক্ষণ। বাঙ্গলার প্রথম গদ্যলেখক ৺মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার বলেছেন যে "বাক্য কহা বড় কঠিন, উহা সকল হইতে কহা যায় না।" এই কথাটি যদি সকলে স্মরণ রাখতেন, এবং সেই সঙ্গে এ ধারণাও যদি সকলের থাকৃত যে, বাক্য শুধু "কহা" নয়, বুঝাও কঠিন, এবং উহা সকল হইতে বুঝা যায় না—তাহলে আমাদের দেশের কোনও কোনও ধনেমানে অগ্রগণ্য ব্যক্তি কাব্য সম্বন্ধে প্রকাশ্যে অযথা বাক্যব্যয় করতে কুন্ঠিত হতেন। সীমাজ্ঞান ও মাত্রাজ্ঞানের অভাববশতঃই আমরা অনধিকারচর্চ্চা করতে সদাই প্রস্তুত। এ সকল কথা, কি বক্তা কি শ্রোতা কারও পক্ষেই প্রিয় নয়—কিন্তু তাহলেও বলা আবশ্যক—কেননা কথাগুলি সব সত্য।

এ যুগের সমালোচনা অনধিকারীর হাতে যে কতদূর অদ্ভুত আকার ধারণ করতে পারে, তার উদাহরণস্বরূপ আমি দুটি সমালোচকের দুটি কথার উল্লেখ করতে চাই। এঁদের একজন প্রস্তাব করেছেন যে, যে-কোন উপায়ে হোক, সবুজ পত্রের লেখা বন্ধ করা কর্ত্তব্য; আর এক জন প্রস্তাব করেছেন যে, এ পত্রের ঐ ভাবে পাঠ বন্ধ করা কর্ত্তব্য। বলা বাহুল্য এই সোদ্বেগ প্রস্তাবের মূলে মানসিক স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য ছাড়া আর কিছুই নেই। এঁরা ভুলে যান যে, এরকম কথা বলায় প্রকারান্তরে সবুজ পত্রের প্রশংসাই করা হয়, কেননা আমরা ধরে নিতে পারি যে, এ শ্রেণীর সমালোচকদের ধারণা এই যে, সবুজ পত্রের বাণীর অন্তরে শক্তি আছে, এবং সম্ভবতঃ সে শক্তি মোহিনী শক্তি! নচেৎ তাঁরা হয় আমাদের মুখে, নয় নিজেদের কাণে হাত দেবার প্রস্তাব করতেন না। কিন্তু এই প্রস্তাব শুনে হাসি পেলেও—ব্যাপারটা আসলে হাসির জিনিস নয়; কেননা এই সূত্রেই আমরা আমাদের ভদ্রসমাজের এক দলের প্রকৃত মনোভাবের সন্ধান পাই।

সর্দ্দি লাগবার ভয়ে ঘরের দরজাজানালা এঁটে বসে থাকাটা যে দেহের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কিম্বা বলকারক নয়, এ কথা সকলেই জানেন। মনের বদ্ধঘরের রুদ্ধ বায়ুও দূষিত বায়ু, তবুও যে অনেকে বাইরের হাওয়া-আলোর সংস্পর্শে আসতে চান না তার কারণ, তাঁরা স্বাস্থ্য ও বল এ দুয়ের কোনটিই চান্ না,—চান শুধু মনের ঘরের কোণে গা গড়িয়ে আরামে দিন কাটাতে। শক্তির গতি বহির্মুখী, সুতরাং মনের শক্তি সঞ্চয় করাতে মনের আরামের ব্যাঘাৎ ঘট্তে পারে। পৃথিবীতে আরাম যদি কোথাও থাকে ত সে ঘরের কোণে। নূতন সত্যের সঙ্গে পরিচয় লাভ করতে হলে, মনকে জাগতে হবে উঠতে হবে চলতে হবে,

এবং এ ব্যাপারগুলোর একটিও আরামজনক নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের মনকে ঠেলা মেরে জাগাতে চেষ্টা করে, তার উপর চোখ রাঙানো আমাদের পক্ষে নিতান্তই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় আমরা আত্মসংযম ঘুমের ঘোরেই হারিয়ে বসি, এবং তখন আমাদের মুখ থেকে বাক্যস্রাব আপনিই হয়। আমাদের সাহিত্যের সকল অসঙ্গত বাক্যের এই হচ্ছে মূল কারণ।

কতকটা স্বভাবের এবং কতকটা অবস্থার গুণেই আমরা এতটা আরামভক্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের জাতীয় জীবনের কোনও বড় কর্ত্তব্য নেই। অপরে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে' আমাদের দেশ রক্ষা করে, আমরা সেই সুযোগে ঘরে বসে শাস্ত্রচর্চ্চা করে জাত বাঁচাই। ইউরোপ বই লেখে, আমরা তা মুখস্থ করে পাশ হই। মানচেষ্টার কাপড় বোনে, আমরা পরি,—জাপান পাঠায় দিয়াশলাই, তা দিয়ে আমরা ধরাই চুরুট। ইংরেজ হাতে ধরে রাজ্য চালায়, আমরা মুখস্থ ইংরেজিতে তার টিপ্‌নি কাটি। এ বন্দোবস্ত যদি আরামের না হয়, তাহলে আর কি হতে পারে? কিন্তু সকলেরি বোঝা উচিত যে, এ পৃথিবীটে যখন অপর সকলের কর্ম্মক্ষেত্র, তখন তা একলা আমাদের শয়নমন্দির হতে পারে না। ভগবান মানুষকে পা দিয়েছেন চলবার জন্য, হাত দিয়েছেন গড়বার জন্য, মন দিয়েছেন জানবার জন্য, হৃদয় দিয়েছেন ভালবাসবার জন্য—এবং অক্লান্ত চেষ্টার দ্বারা জ্ঞান কর্ম্ম ও প্রীতির প্রসার সাধন করাতেই মানব-জীবনের সার্থকতা ও চরিতার্থতা। যে জাতি অল্পেতে সন্তুষ্ট, সে জাতি যথার্থ আনন্দের সাক্ষাৎ কখনই পাবে না। উপনিষদের এ কথা পুরাতন হলেও, সনাতন সত্য। এ সত্য যে অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছে, তার মনের ভিতর আরাম নামক বস্তু থাকতেই

পারে না, এবং সে অপরকেও সেই সত্য অনুভব করাতে চেষ্টা কর্‌বে। তার জন্য সে শত লাঞ্ছনাগঞ্জনাও সহ্য কর্‌তে প্রস্তুত। মনোরাজ্যের বালবৃদ্ধবনিতার কলরবে সে তার কর্ত্তব্যকর্ম্ম থেকে বিচলিত হবে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে আমরা নিত্যনূতন অধিকার চাই —কিন্তু তার চাইতে যা ঢের বড় জিনিস, অর্থাৎ প্রতি লোকের জাতীয়-জীবনের দায়িত্বজ্ঞান—সে বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। এবং এই ঔদাসীন্যবশতঃই আমরা আমাদের জীবনকে মনের অধীন কর্‌তে চাই নে—চাই শুধু মনকে জীবনের অধীন কর্‌তে। এবং যেহেতু সে জীবনের পরিসরও অতি ক্ষুদ্র, সে কারণ সেই ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকা মনের পক্ষে আরামজনক হলেও, শ্রেয়স্কর নয়। মন জীবনের একরাট, আজ্ঞাদাস নয়। এ দুয়ের এই নৈসর্গিক সম্বন্ধটা উল্টে ফেলাতেই মানুষে তার মনুষ্যত্বকে খর্ব্ব করে, নষ্ট করে। মানুষে যদি আপাততঃ সুবিধার লোভে তার বিচার বুদ্ধিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে তাহলে সে বুদ্ধি অনেক সুখস্বপ্ন, হয়ত অনেক শুভস্বপ্নও দেখে কিন্তু সে স্বপ্ন একদিন না একদিন ভাঙ্গতে বাধ্য। আমার বিশ্বাস যে এই স্বপ্ন দেখবার প্রবৃত্তিটা আমাদের মধ্যে এ যুগে অযথা রকম বেড়ে চলেছে। সবুজ পত্রের অপরাধ এই যে, তা আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দিবানিদ্রার ব্যাঘাৎ ঘটায়। আমরা সকলকে মনের চোখ মেল্‌তে বলি, কেননা আমরা জানি, যে সে চোখ মেললে সকলেই নিজের চোখেই দেখ্‌তে পাবেন যে আমাদের ভিতর বাইরের দৈন্য কত বেশী। এর উত্তরে অনেকে বল্‌তে পারেন যে, তোমার চোখে যা দৈন্য ঠেকে, আমাদের চোখে তা ঐশ্বর্য্য। এরূপ মতভেদ হওয়া শুধু সম্ভব নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক। সেই জন্যই ত বিচারের আবশ্যক,

এবং তার জন্য বিচারবুদ্ধিকে সজাগ সক্ষম ও সবল রাখা আবশ্যক। সুতরাং যারা বলেন যে, "হয় তোমরা মূক হও নচেৎ আমরা বধির হই"—তাঁদের এই উচ্চবাচ্য শুনে আমরা লজ্জিত হয়ে পড়ি। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, বর্ত্তমান যুগে, বাইরের প্রচণ্ড ধাক্কায় আমাদের মনের ঘরে যে উত্তাপ জন্মেছে, তাকে আলোকে পরিণত করতে হবে, নচেৎ তা নিজগুণে ধোঁয়ারই সৃষ্টি করবে। আমরা আমাদের ধর্ম্ম-সমাজ রীতিনীতি নিয়ে যা বলাক'ওয়া করছি—তার ভিতর জ্ঞানের আলোর চাইতে, ভাবের ধোঁয়ার পরিমাণ ঢের বেশী; এক কথায় আমরা এ সব নিয়ে শিখেছি শুধু Sentimentalise করতে। আমরা এই Sentimentalism-এর প্রশ্রয় দিতে সম্পূর্ণ নারাজ—কেননা, Sentimentalism-এর চর্চ্চায় মানুষে তার আত্ম-শক্তি একান্ত ক্ষুণ্ণ করে। Sentimentalism মানুষের শুধু মস্তিষ্ক নয়, হৃদয়কেও দুর্ব্বল করে ফেলে কেননা ও বস্তু হচ্ছে একপ্রকার মানসিক বিলাসিতা। সুতরাং সবুজ পত্র বাঙ্গালী জাতিকে কখনও আত্মপ্রবঞ্চনা করতে উৎসাহ দেবে না। এ সংকল্প যদি অপরাধ হয়, তাহলে সে অপরাধে আমরা চিরদিনই অপরাধী থাকব।

শিশুশিক্ষার মূলমন্ত্র।

——:০:——

শিশু-সাহিত্য ও শিশুশিক্ষা নিয়ে 'সবুজ পত্রে' যে আন্দোলন উঠেছে, তা বিশেষরূপে ভাববার বিষয়। আলোচনাটি জুড়োতে দেওয়া ঠিক নয় ভেবে, আমি আজ লিখতে বসেছি।

আমাদের দেশের শিশুরা মনুষ্য-শাবক বলেই মানুষ হয়; অর্থাৎ মনুষ্যাকৃতি লাভ করে। তাদের মানুষ করবার জন্য রীতিনীতি বিধি পদ্ধতির বালাই নেই। স্তন্য আছে, কাঁদলেই পায়; ধুলোমাটি আছে, গড়াগড়ি দেয়; বছর পাঁচেক হ'তে না হ'তে ছেলেরা লেখাপড়া শিখতে (ঠিক শিখতে নয়,—গিলতে) স্কুলে যায়। তারপর অদৃষ্টের গুণে বা দোষে—ডাক্তার, উকীল, ব্যারিষ্টার, কেরাণী, মোটর-ড্রাইভার ট্রাম-কণ্ডাক্টর, ছাপাখানার প্রিণ্টার ইত্যাদি ইত্যাদি যা বল হ'য়ে—কেউ বা স্বচ্ছন্দে, কেউ বা অস্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে' চলে' যায়। এই হ'ল আজকালকার বাঙ্গালীর জীবন। এই জীবনযাত্রার গতি ফেরাতে হ'লে, মূল ধরে' ব্যবস্থা করতে হয়। এখন দেখা যাক্ এর মূলটা কোথায়।

মনুষ্য-সমাজে শিশুপালনের ভার পিতা ও মাতা উভয়ের হ'লেও, আসলে সেটি মায়েরই কাজ। পিতা জীবিকা অর্জ্জনে ব্যস্ত, তাঁর অবসর নেই—সুতরাং শিশুর সম্পূর্ণ ভার মায়ের উপর পড়ে। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর বালিকারাই মা হ'য়ে থাকে। ১৬।১৭

বৎসরের মেয়ের ২।৩ সন্তান, ঘরে ঘরেই দেখা যায়। এই সব বালিকা— এক স্তন্যদান বা বোতলে বিলাতী ফুড্ খাওয়ানো, ও যতটুকু পরিস্কার না করলে নয়,—তাই ছাড়া আর কি করতে পারে? তাদের ঘুমন্ত যৌবন কখনো জাগতে পায় না; কৈশোর থেকে যৌবনের ধাপ ডিঙ্গিয়ে তারা প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌঁচেছে—অথচ ধাপটা আছে। ঠিক বয়সে যৌবন যখন তার আশাভরসা সাধআহ্লাদ নিয়ে সাড়া দেয়, তখন বালিকা তার শিশুদের সামলাতেই ব্যস্ত,—কাজেই মা কিম্বা শিশু কারো মেজাজ ভাল থাকে না। ফলে শিশুদেহ এবং মন দুইয়েরই স্বাভাবিক খোরাক পায় না। বাঙ্গালী শিশুর ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই যেমন স্তন্যদানের সময় অসময় থাকে না, তেমনি আদর তিরস্কারেরও সময় অসময় নেই। কখনও বা শোন মা তাকে নাচাচ্ছে "ওরে আমার টাকার তোড়া, ওরে আমার ধনের ঘড়া"—আবার খানিক পরেই দেখ সেই অস্ফুটবাক্ শিশুর গায়ে চড়ের উপর চড় পড়ছে—এ দৃশ্য ঘরে ঘরে। অতএব যদি মনুষ্য-শাবককে যথার্থ মানুষ করে' তুলতে হয়, তবে শিশুকাল হ'তে শুধু পুত্রসন্তানকে মানুষ করলে হবে না; কন্যাসন্তানকেও সমান যত্নসহকারে পালন করতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হ'ল—শাঁখ বাজলো না—"ওগো মেয়ে হয়েছে";—এই যে সেই শিশুর প্রতি অবহেলা আরম্ভ হ'ল, তার শেষ হবে শেষদিনে। আর তিনি যদি ভাগ্যবতী হন, পতিপুত্র রেখে যদি মরতে পারেন, তবে তাঁর আদর হবে তাঁর শ্রাদ্ধের সময়!

মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কন্যাগুলিকে নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে সবাই বুঝতে পারবেন—তাদের কি অসহায় ভাব, কি ভীতচকিত মলিন

মুখ। তিন বছরের মেয়ে, তিন মাসের ছোট ভাইবোনের পরিচর্য্যায় দীক্ষিত হয়। পাঁচ বছরের মেয়ে, হাতে কাঁকে ছেলে নিয়ে পাড়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে, তা বোধহয় সকলেই দেখেছেন। তারা যেমন করে নিজেরা 'মানুষ' হয়েছে, বড় হ'য়ে নিজ নিজ সন্তানকেও তেমনি করে' মানুষ করে। এই হল সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থ ভদ্রঘরের কথা। ধনী দরিদ্রের ব্যবস্থা আলাদা। ধনীর ঘরে সেকাল একাল চিরকালই শিশুরা চাকরদাসীর কাছে মানুষ হয়। তাদের মধ্যেও পুত্রকন্যার আদর-আপ্যায়নের তারতম্য বেশ লক্ষিত হয়। আমাদের চক্ষের উপর সেকালে একালে—অর্থাৎ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ও পরে, অনেক রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে,—কেবল হয়নি মেয়েদের অনাদরের।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শৈশবে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' চলিত ছিল, আমাদের অক্ষর-পরিচয় তাই থেকে হয়। কিন্তু মায়ের একখানা 'শিশুবোধ' ছিল—সেইখানা ছিল আমাদের প্রিয় এবং অবসর পাঠ্য। তাতে যে সেই কয়ে করাত, খয়ে খরগোস, গয়ে গাধা, ঘয়ে ঘুঘু, ঙয়ে নোঙর-এর ছবিগুলি ছিল, তা দেখে দেখে আমাদের আর তৃপ্তি হ'ত না। সেই কালির আঁচড় ও ছোপগুলিতে আমাদের চর্ম্মচক্ষু না হোক্ মনশ্চক্ষু ঠিক জিনিসটী দেখতে পেত এবং চিত্তপটে চিত্রিত করে' রাখতো। দাতাকর্ণ পড়তে পড়তে প্রাণ কেমন ক'রতো; মা কোলে করে' বৃষকেতুকে কাটতে নিয়ে চলেছে—হোক্ সে ছবি হাস্যকর, কিন্তু তখন কই হাসি ত পেত না? অতএব বীরবল যে বলেছেন "সেজেগুজে শিশু-সাহিত্য লেখবার আবশ্যকতা নেই",—এটা খাঁটি কথা। বড়দের নকল করাই হ'ল শিশুদের স্বভাব। যাদের কাছে কাছে তারা সর্ব্বদা থাকে, তাদের নকল তারা করবেই। আমি

পর্য্যবেক্ষণ করে' দেখেছি, যে-শিশুরা বেশীর ভাগ দাসীচাকরের কাছে থাকে, তারা নিজেরা দাসদাসী সাজতে ভালবাসে—অর্থাৎ নিজেকে দাসী বা বেয়ারা ভেবে নিয়ে পুতুল ছেলে কোলে করে' বেড়ায় এবং তাদের শাসন ক'রে। যে শিশু মায়ের কাছে বেশীর ভাগ থাকে, সে তার মাকেই নকল করে। নকল করার প্রবণতা শিশুদের স্বভাবসিদ্ধ। শিশুদের শিক্ষা দেবার জন্য স্কুল চাইনে, বই চাইনে—চাই তাদের সামনে নিজেরা সংযত ভাবে চলাফেরা করা, কথাবার্ত্তা কওয়া। আমরা শিশুদের ত গ্রাহ্যই করি নে, তাদের সম্মুখে যা খুসি তাই বলি, যা খুসি অসঙ্কোচে তাই করি—মনে করি, ও কি বুঝবে, ওতো ছেলে! সেটি কিন্তু একেবারেই যে ভুল, তা বলা বাহুল্য। শিশুরা যেমন যা শোনে তাই বলবার জন্য ব্যগ্র হয়, তেমনি যা দেখে তাই ক'রতে যায়। শিশুকে নিয়মাধীন ক'রতে হলে, ভূমিষ্ঠ হওয়া থেকেই আরম্ভ ক'রতে হবে। গোড়া থেকে যা অভ্যাস করাবে, তাই হবে। তাই বলছি, বইয়ের শিক্ষা আরম্ভ হবার পূর্ব্বে, তার নিজস্ব স্বভাবটির প্রতি লক্ষ্য রেখে, ধীরে ধীরে রাশটি বাগিয়ে নিতে হবে। শিশুদের প্রত্যেকের যে একটা নিজস্ব স্বভাব আছে তা ঠিক,—তবে অনুকরণপ্রিয়তা এবং পৈতৃক স্বভাবও পেয়ে থাকে। অতএব যে দিক থেকে আর যেমন করেই ভেবে দেখা যায়, মোট কথা এই যে, শিশুকে পিতামাতার,—বিশেষতঃ মাতার—স্বহস্তে পালন করা কর্ত্তব্য। এখানে পালন অর্থে শুধু দুধ খাওয়ানো নয়—কিন্তু সংযত ও আদর্শভাবে শিশুর সমক্ষে চলাফেরা করা, তার কাছে অধিক সময় যাপন করা, ইত্যাদি। অবশ্য এ সব পরামর্শ দেওয়া যত সহজ, করা তত সহজ নয়; কিন্তু প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, যতদিন এদেশে

বালিকা-মাতার অস্তিত্ব না ঘুচবে, ততদিন সন্তানের যথার্থ আদর ও শিক্ষা কিছুতেই হবে না। মা হবার বয়স হলে, তবেই যথার্থ সন্তানের মর্ম্ম বোঝা যায়—তখন স্বভাবতঃই তার প্রতি আসক্তি জন্মায়, তার প্রতি যে একটা কর্ত্তব্য আছে, সেটা প্রত্যেক মায়েই প্রাণে প্রাণে অনুভব করতে পারে। মূল ধরে' শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা করতে হলে, মায়ের দিকে প্রথমে দেখতে হবে। "মেয়ে হয়েছে" বলে' হতশ্রদ্ধা ও অবহেলা করলে চলবে না। শাঁখ বাজিয়ে, হুলুধ্বনি দিয়ে, মাতৃ-রূপিণী ক্ষুদ্র শিশুকে সাদরে প্রসন্নমনে কোলে তুলে নিতে হবে। সকল ঘরের সকল জাতির সকল দেশের কল্যাণময়ী হ'ল নারী। যদি বাঙ্গালীর গৌরববৃদ্ধির কামনা থাকে, তবে "মেয়েটা"কেও আদর যত্ন কর—সেই মঙ্গলময়ী কল্যাণীর আশীর্ব্বাদে জাতির মঙ্গল, দেশের মঙ্গল হবে।

শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী।

আমাদের অহঙ্কার।

——ঃ০ঃ——

নিজের দেশের অতীত সম্বন্ধে যে জাতি সম্পূর্ণ অজ্ঞ, সে জাতির ভবিষ্যৎ যে বিশেষ আশাপ্রদ হতে পারে না, একথা সকলেই জানেন। পঞ্চাশ ষাট বৎসর আগে আমাদের অবস্থাটা ছিল ঠিক তাই। সেই আত্ম-অবমানের দিনে এমন কোন নিন্দা ছিল না, যা আমাদের দেশের সম্বন্ধে আমরা বিশ্বাস না করতুম। নিজেদের আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, সমাজের উপর আমরা একেবারে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলুম। দেশের ইতিহাস যে আমাদের মনে দেশের প্রতি, শ্রদ্ধা জাগিয়ে তুলবে, তারও কোন সম্ভাবনা ছিল না; কেননা অতীতের যে দু'টি ঘটনা আমাদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল—সে হচ্ছে জয়চাঁদের বিশ্বাসঘাতকতা ও লক্ষণসেনের পলায়ন। তাই সে যুগে আমরা আচারে ধর্ম্মে ইংরেজ হবার চেষ্টা করেছিলুম। গোলদীঘিতে মদ এবং মুসলমানের দোকানের মাংস খাওয়া ছাড়া দেশোদ্ধারের অন্য কোন সহজ উপায় আমাদের মনে আসে নি। সেদিন শুধু আত্মরক্ষার নিমিত্তই আমাদের অহঙ্কারের প্রয়োজন ছিল, এবং মহাত্মা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ভূদেব বাবু, রাজনারায়ণ বাবু, বঙ্কিম বাবু, বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত সকলে সেই অহঙ্কারকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ধীরে ধীরে আমরা নিজেদের ভাষাকে, ধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করতে শিখলুম। তারপর যেদিন স্বদেশী ভাবের বন্যা অকস্মাৎ আমাদের মরা গাঙ্গে কূল-

ভাসানো জোয়ার এনে দিলে, সেদিন আমাদের আশার আর অন্ত রইল না—সেদিন মনে হল ভগবান যেন কল্পতরু হয়েছেন, যে-কোন বর চেয়ে নিলেই হল। আমাদের অক্ষমতা, আমাদের অযোগ্যতার দরুণ দেশবিধাতার সে দান একেবারে বিফল হয়ে গিয়েছে—এ কথা যাঁরা মনে করেন, তাঁরা যে ঠিক কি আশা করেছিলেন জানি নে। যদি তাঁরা এই আশা করে থাকেন যে, বিধাতার বিধানে সহরে সহরে দেশী কাপড়ের কল স্থাপন করে আমরা ম্যানচেষ্টারকে ফেল করব, অথবা প্রতিবেশীর সাথে আমাদের কোনরকম ঝগড়াবিবাদ ঘটবে না,—তাহলে তাঁদের আশার দৌড়ও আশ্চর্য্য বলতে হবে। সেদিন আমাদের যা সব চেয়ে দরকার ছিল তাই আমরা পেয়েছিলুম—সে হচ্ছে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং ঔৎসুক্য। তখন নিজেদের মনের দিকে চেয়ে নিজেরাই বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলুম ;—মুহূর্ত্তে সে মনের রূপ এতই নবীন, এতই অপূর্ব্ব হয়ে উঠেছিল। তারপর যখন অকূল সাগরের জোয়ার ফিরে গেল, তখন যে কেবল ফসল ফলাবার রসাল মাটি রেখে গেল তা নয়, সেই সঙ্গে ঢের আবর্জ্জনাও রেখে গেল; এবং আমাদের ভাগ্যদোষে তার সংস্পর্শে দেশের হাওয়া আজ দূষিত হয়ে উঠেছে। আত্ম-অবজ্ঞার দিনে অহঙ্কারের দরকার ছিল ; কিন্তু এখন যখন শুধু অহঙ্কারে চলবে না, এখন যখন সমস্ত বিশ্বের সামনে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে, তখনও আমরা আমাদের অহঙ্কার আঁকড়েই বসে আছি। সে অহঙ্কারের আর সীমা নেই। এ কথা সত্য যে, পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিই মনে করে যে তাদের সমতুল্য দুনিয়াতে আর কেউ নেই তারাই হচ্ছে God's elect ; এবং এও সত্য যে, ধনী বংশের দরিদ্র উত্তরাধিকারীর ন্যায়, বংশগৌরবের অহঙ্কার ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর,—কারণ

এক সেই অহঙ্কার ছাড়া আমাদের আর ত কিছুই নেই! তবু এই স্বভাবের উপর উঠতে হবে, কেননা স্বভাবের নানাবিধ ক্রটিই আমাদের এই বর্ত্তমান অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। আমাদের দেশের জনসাধারণের মন এমন হয়ে উঠেছে যে, দেশ সম্বন্ধে একটি সত্য কথা বলবার জো নেই;—যদি কেউ বলে, তবে সে দেশদ্রোহী ত বটেই, সম্ভবতঃ যবনও হতে পারে! আমরা প্রমাণ করেছি যে, এ দেশে সেকালে দ্বিচক্রযান, ত্রিচক্রযান, ব্যোমযান প্রভৃতি ছিল, আশ্চর্য্য এই যে যাঁরা আমাদের আধ্যাত্মিকতার গর্ব্ব করেন, তাঁরা সেটা প্রমাণ না করে ব্যোম-যানাদির অস্তিত্ব প্রমাণ করতে এত ব্যস্ত হন। অতীত সম্বন্ধে যে যত অজ্ঞ, সে তত গর্ব্বিত। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের দেশে লোভ ছিল না, মোহ ছিল না—পূর্ব্বপুরুষেরা ভাত এবং তেঁতুল-পাতার ঝোল খেতেন—বড় জোর একটু হর্ত্তুকী; তাঁরা পরতেন কৌপীন; তাঁরা যে বিবাহ করতেন, তাও কেবল পিণ্ডার্থে; এবং তাঁরা সকলেই বুড়ো বয়সে বনে গিয়ে যোগান্তে দেহত্যাগ করে' হয় সাযুজ্য নয় স্বালোক্য লাভ করতেন! আমাদের অহঙ্কার চলে দুতরফা। রাজপুতরমণী যুদ্ধ থেকে পলাতক স্বামীকে দুর্গে প্রবেশ করতে দেন নি—সে দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বলি যে, এ কাজ কেবল হিন্দুরমণীই করতে পারত, তারা ত কেবল ভোগের দাসী নয়, তারা ছিল সহধর্ম্মিণী; আবার লক্ষহীরার গল্পের বেলায় সহধর্ম্মিণী কথাটার উল্লেখ করিনে, বলি দেখেছ হিন্দুনারীর স্বামীভক্তি,—স্বামী পাপকার্য্য করতে যাচ্ছেন, তবু সে স্বামীকে বিচার করতে বসে নি, স্বামী যা চেয়েছেন তাই জুগিয়ে দেবার সে সাহায্য করেছে। প্রাচীনকালে আমরা ছিলাম নির্লোভ, নিষ্কাম,—আর পাশ্চাত্য-সভ্যতার সংস্পর্শে হয়ে গেছি লোভী, বিলাসী; অথচ ভারতবর্ষের সাহিত্যে বিলাসের যে চিত্র আছে,

তা অন্যদেশে বিরল। আমরা ভুলে গেছি যে, বাৎসায়নের কামশাস্ত্র আমাদের দেশেই লেখা হয়েছে। আর বাৎসায়ন কোনও হেজিপেজি লোক নন,—তিনি হচ্ছেন ন্যায়শাস্ত্রের সর্ব্বাগ্রগণ্য টীকাকার। আমাদের দেশেই পিতাকে হত্যা করে অজাতশত্রু রাজা হয়েছিলেন, প্রভুকে হত্যা করে পুষ্পমিত্র রাজা হয়েছিলেন। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের যে কলহ হত, তাও অবিশ্বাস করবার কোন কারণ নেই—কারণ তা নাহলে মহাভারত সৃষ্টি হল কি ক'রে?—ভাইয়ের সঙ্গে ভাই ঝগড়া করে; এ দৃষ্টান্ত অন্য দেশে অনেক আছে; কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে ভ্রাতৃ-বধূকে সভামধ্যে লোকসমক্ষে বিবস্ত্রা করবার প্রবৃত্তি মানুষের যে হতে পারে—মানবের এ হীনতার দৃষ্টান্ত আমাদেরই মহাকবি এঁকে গেছেন।

আসল কথা, দোষগুণ দুই নিয়ে,—মানুষ এবং আমাদের পিতামহের যতই ভাল থাকুন না কেন, মানুষই ছিলেন; তাঁদের সভ্যতা ত সঙ্কীর্ণ ছিল না। নানা দিকে তাঁদের প্রতিভা তাঁরা ঢেলে দিয়েছিলেন। তাঁরা ভোগ করতে জানতেন, ত্যাগও করতে জানতেন। তাঁরা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে জানতেন, আবার ভগবান বুদ্ধের ন্যায় এক নিমেষে রাজ্য ত্যাগও করতে পারতেন। আর আমরা না পারি ত্যাগ করতে, না জানি ভোগ করতে। অপমানের যে প্রতিকার করতে পারে না, তার মুখে ক্ষমাশীলতার স্পর্দ্ধা শোভা পায় না। আমরা গর্ব্ব করে বলি, আমাদের মত উদার জাতি আর নেই; আমাদের দেশে যখনই যে ধর্ম্ম উঠেছে, আমরা তাকে বাধা দিই নি—আমরা বনস্পতির মত সবাইকে আশ্রয় দিয়েছি। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আমাদের ঔদার্য্য কেবল ধর্ম্মের প্রতি সীমাবদ্ধ নয়,—হুন, তাতার, পাঠান, মোগল, কাউকেও আমরা বিশেষ বাধা দিই

নি ; ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, অগ্নিভয়, জলকষ্ট, দুর্ভিক্ষ—কাউকেও আমরা বাধা দিচ্ছি নে, কিন্তু সে যে আমাদের বিশ্বপ্রেম বা আধ্যাত্মিকতার ফল—এ কথা তর্কপটু বাঙালীও প্রমাণ করতে পারবেন না। বিশ্বপ্রেম বুঝি সবলের বেলায় ;—দুর্ব্বল অস্পৃশ্য যখন আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট হচ্ছে তখন আমাদের বিশ্বপ্রেম থাকে কোথায় ? অস্পৃশ্যদের দেবতার ভোগও আমাদের কাছে অস্পৃশ্য। আমি জানি তর্ক উঠবে, বিলেতে কি জাত নেই ;—নাহয় ধরে নেওয়া যাক্ তাদের আছে, —কিন্তু তাতে কি আসে যায় ? তারা হচ্ছে অহিন্দু দেহাত্মবাদী,—কিন্তু আমরা যে আধ্যাত্মিক জাত, আমরা যে সমদর্শী, আমাদের যে তুলনা নেই !—যদি কেবল অতীত নিয়েই গর্ব্ব করতুম, তাহলে তত ক্ষতি ছিল না—কিন্তু আমরা এখন বর্ত্তমান নিয়েও গর্ব্ব করতে আরম্ভ করেছি। আমাদের আচার, অনুষ্ঠান, ধর্ম্ম যে জগতে অতুলনীয়, সে সম্বন্ধে আমাদের আর মতভেদ নেই। আমরা বলি, আমরা হিন্দু-সন্তান স্থূলকে পূজা করি না, কিন্তু জানতে চাই কোন্ সূক্ষ্মকে আমরা পূজা করি ? অর্থের নেশা কি আমাদের ধরে নি ?—অন্যের কথা দূরে থাকুক, দেবী সরস্বতীর মন্দিরে যাঁদের প্রবেশের অধিকার আছে, তাঁরাও আজ লক্ষ্মীর দ্বারস্থ। এখন এমন কি আদর্শ আছে, যার কাছে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি ? এই যে পাশ্চাত্য জাতদের আমরা জড়-উপাসক বলে ঘৃণা করি, তারাই ত আজ দেশের জন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। এই যে জাতীয় আদর্শের কাছে ব্যক্তির স্বার্থের বলিদান,—একি আধ্যাত্মিকতার এক অঙ্গ নয় ? কেউ হয়ত বলবেন যে, তারা কোনও আদর্শের আকর্ষণে প্রাণ দিচ্ছে না, তারা হিংসা-দেবতার কাছে আত্মবলি দিচ্ছে। কিন্তু এ কথাটা ভেবে

দেখা উচিত যে, আমাদেরও হিংসা আছে, রাগ আছে, কিন্তু আমরা রাগ করি কেবল সেই ব্যাপারে, যা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে;—সমস্ত দেশের হয়ে রাগ করা, হিংসা করা, সে কি কেবল নিজের স্বার্থের জন্যে হিংসা করার চেয়ে মহৎ নয়?

যেদিন থেকে আমরা আমাদের অতীত নিয়ে গর্ব্ব করতে আরম্ভ করলুম, সেদিন থেকে সংস্কৃত-ভাষার মাহাত্ম্য বেড়ে গেল। এর আগে নূতন ইংরেজী-শিক্ষার দিনে মনে করতুম, ইংরেজী-ভাষায় যে কথা লেখা আছে, সে কথা সম্বন্ধে কোন বিবেচনা করবার দরকার নেই—তার মধ্যে কোন লুকোচুরি থাকতেই পারে না। ইংরেজীর উপর সে শ্রদ্ধা যে কেটে গেছে তা নয়—উপরন্তু এখন সংস্কৃত বচন সম্বন্ধেও আমরা সেইরূপ শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছি। যে কথা সাদা বাংলায় বল্লে আমরা তর্ক করি, সেই কথা সংস্কৃতে বল্লে আমরা সসম্ভ্রমে মাথা নত করি। বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয়, এ কথা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু যখন বক্তৃতাপ্রসঙ্গে শুনি সর্ব্বমত্যন্তং গর্হিতম্, তখন আমরা অভিভূত হয়ে পড়ি, এবং গলদশ্রু-লোচনে বলি—অহো! অহো! সনাতন ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিদের কি গভীর জ্ঞান ছিল—তাঁরা সেদিন যা বলে গেছেন, হাজার বছর পরে আজকেও সে কথার মূল্য অশেষ। বলা বাহুল্য, আমাদের কাছে চাণক্যও ঋষি হয়ে দাঁড়িয়েছেন। আজকাল যাঁরা রক্ষণশীল ও যাঁরা পরিবর্ত্তন চান, উভয়ই শাস্ত্রের দোহাই পাড়তে আরম্ভ করেছেন,—যেন যে জিনিসটা ভাল, সে শুধু নিজের জোরে ভাল হতে পারে না! আর শাস্ত্রও ত এক আধ-খানা নয়—এখন আমাদের কাছে সংস্কৃত-গ্রন্থমাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র। এই পুঁথির শাসন থেকে আমরা কি কোনদিন মুক্ত হব না—একবার

ইংরেজী-পুঁথির, একবার সংস্কৃত-পুঁথির সাম্‌নেমাথা নত করে, নিজেদের বুদ্ধিকে আর কত দিন এমন করে অপমান করব? লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কাহিনী ঐতিহাসিক সত্য নয় একথা প্রমাণ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা যে symbolically true, সে বিষয় লেশমাত্র সন্দেহ নেই। দুর্জ্জয় পাঠান যখন বাংলায় এসে উপস্থিত হল, তখন দেশের রাজা, মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন না, সেনাপতিকে ত নয়ই ;—তিনি ডেকে পাঠালেন পণ্ডিতকে,—শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে কি লেখা আছে তাই জানবার জন্য ; এবং যখন শুনলেন যে, মুসলমানের রাজা হবার কথাই লেখা আছে,—তখন তিনি নিশ্চিন্তমনে, আধ্যাত্মিকভাবে রাজধানী ত্যাগ করে সরে গেলেন! আজ বিশ্বের সকল জাতি, এগিয়ে যাচ্ছে—তাদের মাথায় স্বর্ণ-মুকুট, তাদের গলায় মুক্তার হার, তাদের গায়ে লৌহবর্ম্ম, তাদের শক্তি-শেল ;—আর আমরা আমাদের ঘরের মেঝেতে সনাতন মাদুরের উপর বসে, পুঁথি খুলে, লুপ্ত অকারের সন্ধানে মগ্ন হয়ে আছি।

যদি নিজেদের দোষের প্রতি কেবল অন্ধ থাকতুম, তাহলেও আশা ছিল ; কিন্তু আমরা ত শুধু অন্ধ নয়, আমরা দোষগুলোকে গুণ বলে স্পর্দ্ধা করছি। যে অলসবুদ্ধি, জড়তা, নৈরাশ্য আমাদের মনকে অবসন্ন করেছে, মাংসপেশীকে শিথিল করেছে, তারই নাম দিয়েছি আধ্যাত্মিকতা—অথচ আমাদের লোভ আছে, মোহ আছে, হিংসা আছে,—নেই শুধু বল, আর বীর্য্য। জীবনীশক্তির হ্রাসটাকেই আমরা আত্মশক্তির বৃদ্ধি বলে বরণ করে নিয়েছি, এবং তারই মাহাত্ম্যে আমরা বিভোর হয়ে আছি। এই যে শীর্ণ, রক্তহীন, মলিন আদর্শ—এ ত আর্য্য-ভারতবর্ষের আদর্শ নয়। সেকালের আদর্শ-পুরুষ ছিলেন

অর্জ্জুন, যাঁর হৃদয় ছিল পুষ্পের মত কোমল আর বজ্রের মত কঠিন।

বিধাতার যা শ্রেষ্ঠ দান, সেই যৌবন যাদের হাতে—এই অবসাদের দিনে তাদের ডেকে বলি, আজ কেবল পুঁথির শাসন মেনে সে দানকে তোমরা অবমানিত কোরো না। তোমরা সমস্ত পৃথিবীকে নূতন করে দেখবে, সব জিনিসকে নিজহাতে পরখ করবে,—হোক না সে প্লেটোর Republic, হোক না সে পরাশরের সংহিতা। এই যে দেশভরা রোগ, অনশন, দারিদ্র্য—এর পিছনে আছে আমাদের গভীর ঔদাসীন্য, আমাদের চরম নিরুৎসাহ। দেশে দেশে যুগে যুগে যারা মৃত্যুকে জয় করে অমৃতের সন্ধান করেছে—তারাও কি আজ বল্‌বে মায়াময়মিদং অখিলং?

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীর উক্তি।

—:০:—

সেদিন কোন একটী বাংলা-পত্রিকাতে দেখলুম, সম্পাদক মহাশয় ভারতীর মাঘ সংখ্যার সমালোচনা করতে গিয়ে রসিকতা করে লিখেছেন, "সাহিত্যের ভাষা—শ্রীযুত প্রমথ নাথ চৌধুরী লিখিত। এগারটী দফায় সাধুভাষার, সমর্থক দলকে, কথিত ভাষার প্রচলনেচ্ছু দলের মুখপাত্র স্বরূপে উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ফলে যা হউক না হউক উত্তর প্রত্যুত্তরে মাসিক মহলের প্রচুর খাদ্য জুটিয়াছে।" এ রকম সম্পাদকদের রসিকতা দেখলে রাগও হয়, দুঃখও হয়। তবে, এই বলে মনকে প্রবোধ দেওয়া যায় যে যাঁরা কোনও নূতন সত্য প্রচার করতে চান্ তাঁরা চিরদিনই প্রথমে এই শ্রেণীর বিদ্রূপের ভাগী হয়ে থাকেন।

যাক্ সে কথা এ সব বাজে রসিকতায় কারও কিছুই যায় আসে না। যারা দোষগুণ বিচার করতে পারে না কিম্বা চায় না, শুধু পূর্ব্বসংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে চলতে চায়, তাদের কোনও কথার যে কিছু মূল্য আছে তার কোনও প্রমাণ নেই।

লেখ্য-ভাষা ও কথ্য-ভাষা নিয়ে সাধুপন্থী লেখকগণ অনেক বার অনেক কথা বলেছেন। তাঁদের আলোচনার পুনরাবৃত্তি না করে, কথ্য-ভাষার প্রচলনে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কি কি লাভ ও সুবিধা হতে পারে সে সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলতে চাই।

সাধারণ সমালোচকগণ আজকালকার বাংলা-ভাষাকে দু' জাতিতে ভাগ করেছেন।—একটীকে তাঁরা বলেন 'কথ্য', আর একটীকে বলেন 'লেখ্য'। আমি কিন্তু কথ্য-ভাষাকে ওঁরা যে অর্থে বল্‌তে চান, সে অর্থে গ্রহণ কর্‌তে নারাজ। কারণ ভাষা মানেই হচ্ছে সেই বস্তু—যার দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করা যায়। মনের ভাব ব্যক্ত কর্‌তে হলে যে ভাষা ব্যবহার করব—তাই হচ্ছে কথ্য-ভাষা অথবা শুধু 'ভাষা' বল্‌লেই চলে। তবে 'লেখ্য-ভাষা' আবার পদার্থটা কি? মনের কথা মুখ দিয়ে না বলে কলম দিয়ে লিখলেই তো লেখ্য-ভাষা হবে। শব্দ বদ্‌লে ভাষার চেহারা বিগড়ে দিয়ে লিখ্‌তে গেলে মনের কথা বলা হয় কই? যে যতই ইংরেজ জানুক না কেন, মনের কথা ব্যক্ত করতে গেলে সে নিজের মাতৃভাষায় যেমন পারবে, ইংরেজিতে তেমন কিছুতেই পারবে না। আজকাল যাকে লেখ্য-ভাষা বলা হয় তাও আমাদের কাছে কতকটা ঐ ইংরেজ-জাতীয়—কেননা তাও মুখস্থ করে শিখতে হয়। লেখ্য-ভাষায় লিখতে হলে মনের কথাটাকে একবার অনুবাদ করে নিতে হবে এবং তা সোজাসুজি বুঝতে হলে তাকে আবার সোজা কথ্য-ভাষায় অনুবাদ করা ভিন্ন উপায় নেই। অভ্যাস গুণে এর কষ্টটা যতই কম হোক্ না কেন—এর ব্যাপার নিহাৎ সোজা নয়। যাদেরই কথ্য-ভাষা আছে—তাদেরই এ লেখ্য-ভাষা কিছু না কিছু যন্ত্রণা দিতে বাধ্য একথা আমরা আজ ভুলে গেলেও সেদিন ভুলি নি, যখন প্রথম বই পড়তে শিখি। প্রমথ বাবুর ভাষা লেখ্য-ভাষা হলেও আমরা সেই কষ্ট পাব কিন্তু কল্‌কাতার লোকে ত পাবে না।

পূর্ব্ববঙ্গবাসীরা হয়তো বল্‌বেন, যে কল্‌কাতার ভাষা তো

আর আমাদের কথ্য-ভাষা নয়, আমরা তার প্রচলনে কেন সহায় হব? কিন্তু তাঁরা যদি একটু ভেবে দেখেন, তবে নিজেদের ভুল বুঝতে পারবেন। আমাদের পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কাছে লেখ্য-ভাষা ও কথ্য-ভাষা এ দুয়ের কোনটিই নিজের মুখের ভাষা নয়, আর মুখের ভাষাই যে মুখ্য-ভাষা তা কে না জানে? সে মুখ্য-ভাষা এখনো যখন আমাদের মুখে ছাড়া অন্য কোথাও নেই, তখন লেখায় কেন আমরা একটা ছেড়ে আর একটা ধরতে আপত্তি করব? লেখায় কল্‌কাতার কথ্যভাষা চল হলে' আমাদের অনেক বিষয়ে সুবিধাও হবে, লাভও হবে। কারণ তখন আমাদের কথার উপরেও কল্‌কাতার ভাষার প্রভাব অনেকটা ছড়িয়ে পড়বে। সচরাচরই দেখা যায় কল্‌কাতায় যাঁরা দু' এক বছর বাস করেছেন, তাঁদের কথাও অনেকটা বদ্‌লে গেছে। লেখ্য-ভাষা কল্‌কাতাই হলে পূর্ব্ববাংলার নিতান্ত পাড়াগেঁয়ে লোকেরাও কল্‌কাতার ভাষা সহজে বুঝতে ও বল্‌তে শিখবে। এবং সেটা যে তাদের বিশেষ দরকার, তা তারাও একদিন না একদিন ঠেকে স্বীকার করে। এখন দেখা যায়, তারা পাড়াগাঁ ছেড়ে সহরে এলেই শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্‌তে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কল্‌কাতাই-ভাষা যদি লেখ্য-ভাষারূপে ব্যবহৃত হয় তবে পূর্ব্ববাংলার ভাষারও এ প্রাদেশিকতা থাক্‌বে না। ক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমবাংলার লোকের ভাষা এক হয়ে যাবে; অন্ততঃ তফাৎটা অনেক কমে যাবে এবং সে ফল যদি বাঞ্ছনীয় হয়—তবে কল্‌কাতা পূর্ব্ববঙ্গের কাছে না এলেও, পূর্ব্ববঙ্গকে কল্‌কাতার কাছে যেতে হবে। ইংরেজি আমাদের বিজাতীয় ভাষা, তবু আমাদের মধ্যে যারা ইংরেজি জানে, তারা কথা বল্‌তে গেলেই প্রায় ইংরাজি কথা

ব'লে ফেলে। কল্‌কাতার ভাষা তো আর বিজাতীয় নয়, যে সেটা আমাদের কথায় আয়ত্ত হবে না। ভাষার শক্ত অংশই হচ্ছে উচ্চারণের টান, লেখায় যখন তা ধরা পড়বার আশঙ্কা নেই, তখন আমরা নূতন পথে যেতে পিছ্‌-পা হব কেন? সমস্ত বাংলাদেশের ভাষাই এতদিনে এক হয়ে যেত, যদি না তার মাঝে লেখ্য-ভাষা বলে একটা Medium থাকত। তাই বল্‌ছিলুম সে ভাষাটা সাহিত্যের ভাষা হলে—আমাদের কথাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে জীবনের অনেক প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য ঘুচে যাবে। তখন পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের আর পূর্ব্বের আপত্তির কারণ থাক্‌বে না।

সে দিন একটী প্রবন্ধে দেখ্‌লুম, লেখক মহাশয় বলেছেন যে কথ্য-ভাষার প্রচলনে সাহিত্যে এমন অনেক প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহৃত হবে যা নাকি অন্য জেলার লোকেরা বুঝ্‌তে পারবে না। যদি তাই হয় তবে তাঁর মতে বোধ হয় নাটকেও লেখ্য-ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত এবং বক্তৃতাতেও। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সাধুপন্থীই ততদূর চরমপন্থী হতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর মতে নাটক কি সাহিত্যের অঙ্গ নয়, না দুর্ব্বোধ বলে পরিত্যজ্য? আমি কিন্তু বাংলা-ভাষায় যে সকল বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটক পড়েছি, তার একখানিতেও এমন কোনও একটা শব্দ পাই নি যা, লেখক যে জেলার লোক, সে জেলা ছাড়া অন্য জেলার লোকে বুঝ্‌তে পারে না। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও গিরিশচন্দ্রের কোনও নাটকেরই ভাষায় সে দোষ নেই, অথচ সে গুলি সবই কথ্য-ভাষায় লেখা। নভেলের যে জায়গাটাতে কথাবার্ত্তা রয়েছে, সে জায়গাতে সকলেই কথ্য-ভাষা ব্যবহার করে থাকেন। তবে আবার লেখ্য-ভাষা বলে সাহিত্যে সতন্ত্র একটা ভাষার অস্তিত্ব

রাখবার প্রয়োজন কি? কলিকাতাবাসীদের মধ্যেও অনেকে বলেন, কথ্য-ভাষার প্রচলন হলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের বই পড়্তে বিশেষ অসুবিধা হবে। পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের প্রতি তাঁদের এ সহানুভূতি দেখে সুখী হলুম, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি নাটকগুলি কি তবে পূর্ব্ববাংলার লোকদের জন্য লেখা হয় নি? মান্‌লুম পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের বুঝ্‌তে অসুবিধা হবে, কিন্তু তা'হলে কথ্য-ভাষার প্রচলনই যে আরো বিশেষ ভাবে আবশ্যক। তা না হলে, কল্‌কাতার ভাষা যারা বুঝ্‌বে না, নাটক গুলি এবং নভেলের অনেকটা অংশই তাঁদের নিহাৎ দুর্ব্বোধ্য হ'য়ে থাক্‌বে। সুতরাং দেখা গেল, সাহিত্যে কথ্য-ভাষার প্রচলন হলেই বরং আমাদের সুবিধা।

শুন্‌লে হাসি পায় কেউ কেউ নাকি বলেছেন, নাটকেতেও লেখ্য-ভাষার প্রচলন করা উচিত। পূর্ব্ববাংলার লোকের প্রতি এঁদের দয়াটা হটাৎ কিছু বেশী বেড়ে উঠেছে দেখ্‌তে পাচ্ছি! এঁরা বোধ হয় কথা বলতেও লেখ্য-ভাষা ব্যবহার করে থাকেন! অর্থাৎ চাকরকে ডেকে জল আন্‌তে বল্‌বার সময়, বোধ হয় বলে থাকেন—"হে ভৃত্য! বারি আনয়ন কর।" পাঠক শুনে হাস্‌বেন, শুনেছি, এহেন সাহিত্য-রথীদের একজন নাকি তাই বল্‌তে সুরু করেছিলেন! তিনি একদিন চাকরকে বলেছিলেন, "রে ভৃত্য! তুই কি হেতু আমার শিশুপুত্রকে লইয়া রাজপথোপরি গমন করিয়াছিলি? যদি অকস্মাৎ একটা দ্রুতগামী অশ্বশকট আসিয়া পড়িত, তবে তুই কি করিতি?" চাকরটা তো শুনে অবাক্!—বাবু কি বল্‌ছেন?

গল্পটা সত্যি হোক—আর মিথ্যে হোক্, এতে আমরা এ পর্য্যন্ত বুঝ্‌তে পারি যে সাহিত্যে কথ্য-ভাষার ব্যবহারটা আমরা কিছুতেই

ছাড়তে পারি না। পূর্ব্ববঙ্গবাসী মুখে যাই বলুন্ না কেন, নাটক নভেল পড়তে হলে কল্‌কাতার ভাষা জানা চাই, ও তাঁরা যদি নিজেরা নাট্যকার হন তবে তাঁদেরও কল্‌কাতার ভাষাতেই লিখ্‌তে হবে। যদি নাটকে আমরা পূর্ব্ববঙ্গের ভাষা ব্যবহার করি তবে সেটা রঙ্গ-নাট্য ছাড়া আর কিছুই হবে না।

সে কাল গেছে যে দিন নভেলের Dialogue এতে লেখ্য-ভাষার ব্যবহার ছিল। বঙ্কিম বাবুও তাই করে গেছেন। এখন আর কেউ তা' করে না। যাঁরা লেখ্য-ভাষার পক্ষপাতী, তাঁদের প্রণীত নভেল গুলিতেও তাঁরা Dialogue-য়ে একমাত্র কথ্য-ভাষাই ব্যবহার করে থাকেন। অথচ তাঁরাই আবার বঙ্কিমী ভাষার দোহাই দিয়ে থাকেন!

কেউ কেউ নাকি আবার বলেছেন, কথ্য-ভাষার ব্যবহারে ভাষার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য লুপ্ত হয়। কিন্তু তাঁদের একথা যে নিতান্তই ভুল, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের লেখার সঙ্গে বিশেষতঃ রবীন্দ্র-নাথের 'ঘরে বাইরে'র ভাষার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারবেন। তা ছাড়া উদার, গম্ভীর বা উদাত্ত ভাব যে কোন ভাষারই একচেটে জিনিস নয়—এ কথা তাঁরা না স্বীকার করুন, সকল দেশের সকল ভাষাবিৎরা স্বীকার করেছেন। যাক্‌, আর এ সম্বন্ধে বেশী কথা বলে প্রবন্ধকে ভারি কর্‌তে চাই না। আমার উদ্দেশ্য ছিল, শুধু কথ্য-ভাষার প্রচলনে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের কি কি ক্ষতি-বৃদ্ধি হতে পারে, তাই নিয়ে আলোচনা করা। তা' ছাড়াও দু'একটি অন্য কথা বলে ফেলেছি। পাঠক ও সম্পাদক মহাশয় মাফ্ করবেন।

শ্রীসুশীলকুমার দাসগুপ্ত।

বরিশাল।

ভাষার কথা।

——ঃ০ঃ——

পদ্মায় যখন পুল হয় নাই তখন এপারে ছিল চওড়া রেলপথ, ওপারে ছিল সরু। মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ ছিল বলিয়া রেলপথের এই দ্বিধা আমাদের সহিয়াছিল। এখন সেই বিচ্ছেদ মিটিয়া গেছে তবু ব্যবস্থার কার্পণ্যে যখন অর্দ্ধেক রাত্রে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ি বদল করিতে হয় তখন রেলের বিধাতাকে দোষ না দিয়া থাকিতে পারি না।

ওত গেল মানুষ এবং মাল চলাচলের পথ, কিন্তু ভাব চলাচলের পথ হইল ভাষা। কিছুকাল হইতে বাংলা দেশে এই ভাষায় দুই বহরের পথ চলিত আছে। একটা মুখের বুলির পথ, আর একটা পুঁথির বুলির পথ। দুই একজন সাহসিক বলিতে সুরু করিয়াছেন যে, পথ এক মাপের হইলে সকল পক্ষেই সুবিধা; অথচ ইহাতে বিস্তর লোকের অমত। এমন কি তাঁরা এতই বিচলিত যে, সাধু ভাষার পক্ষে তাঁহারা যে ভাষা প্রয়োগ করিতেছেন তাহাতে বাংলা-ভাষায় আর যাই হোক্, সাধুতার চর্চ্চা হইতেছেনা।

এ তর্কে যদিও আমি যোগ দিই নাই তবু আমার নাম উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে আমার যে কি মত তাহা আমি ছাড়া আমার দেশের পনেরো আনা লোকেই একপ্রকার ঠিক করিয়া লইয়াছেন, এবং যাঁর যা মনে আছে বলিতে কসুর করেন নাই। ভাবিয়াছিলাম চারিদিকের তাপটা কমিলে ঠাণ্ডার সময় আমার কথাটা পাড়িয়া দেখিব। কিন্তু বুঝিয়াছি

সে আমার জীবিত কালের মধ্যে ঘটিবার আশা নাই। অতএব আর সময় নষ্ট করিব না।

ছোটবেলা হইতেই সাহিত্য রচনায় লাগিয়াছি। বোধ করি সেই জন্যই ভাষাটা কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট কোন মত ছিল না। যে-বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন, পুঁথির ভাষাতেই পুঁথি লেখা চাই, এ কথায় সন্দেহ করিবার সাহস বা বুদ্ধি ছিল না। তাই, সাহিত্যভাষার পথটা যে এই সরু বহরের পথ, তাহা যে প্রকৃত বাংলা-ভাষার চওড়া বহরের পথ নয়, এই কথাটা বিনা দ্বিধায় মনের মধ্যে পাকা হইয়া গিয়াছিল।

একবার যেটা অভ্যাস হইয়া যায় সেটাতে আর নাড়া দিতে ইচ্ছা হয় না। কেননা স্বভাবের চেয়ে অভ্যাসের জোর বেশী। অভ্যাসের মেঠো পথ দিয়া গাড়ির গরু আপনিই চলে, গাড়োয়ান ঘুমাইয়া পড়িলেও ক্ষতি হয় না। কিন্তু ইহার চেয়ে প্রবল কারণ এই যে, অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা অহঙ্কারের যোগ আছে। যেটা বরাবর করিয়া আসিয়াছি সেটার যে অন্যথা হইতে পারে এমন কথা শুনিলে রাগ হয়। মতের অনৈক্যে রাগারাগি হইবার প্রধান কারণই এই অহঙ্কার। মনে আছে বহুকাল পূর্ব্বে যখন বলিয়াছিলাম বাঙালীর শিক্ষা বাংলা-ভাষার যোগেই হওয়া উচিত তখন বিস্তর শিক্ষিত বাঙালী আমার সঙ্গে যে কেবল মতে মেলেন নাই তা নয় তাঁরা রাগ করিয়াছিলেন। অথচ এ জাতীয় মতের অনৈক্য ফৌজদারী দণ্ডবিধির মধ্যে পড়ে না। আসল কথা, যাঁরা ইংরাজি শিখিয়া মানুষ হইয়াছেন তাঁরা বাংলা শিখিয়া মানুষ হইবার প্রস্তাব শুনিলেই যে উদ্ধত হইয়া ওঠেন, মূলে তাহার অহঙ্কার।

একদিন নিজের স্বভাবেই ইহার পরিচয় পাইয়াছিলাম, সে কথাটা এইখানেই কবুল করি। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে-ভাষা পুঁথিতে পড়িয়াছি সেই ভাষাতেই চিরদিন পুঁথি লিখিয়া হাত পাকাইলাম; এ লইয়া এ পক্ষে বা ও পক্ষে কোনোপ্রকার মত গড়িয়া তুলিবার সময় পাই নাই। কিন্তু সবুজ পত্র সম্পাদকের বুদ্ধি নাকি তেমন করিয়া অভ্যাসের পাকে জড়ায় নাই এইজন্য তিনি ফাঁকায় থাকিয়া অনেক দিন হইতেই বাংলা-সাহিত্যের ভাষাসম্বন্ধে একটা মত খাড়া করিয়াছেন।

বহুকাল পূর্ব্বে তাঁর এই মত যখন আমার কানে উঠিয়াছিল আমার একটুও ভাল লাগে নাই। এমন কি, রাগ করিয়াছিলাম। নূতন মতকে পুরাতন সংস্কার অহঙ্কার বলিয়া তাড়া করিয়া আসে, কিন্তু অহঙ্কারটা যে পুরাতন সংস্কারেরপক্ষেই প্রবল এ কথা বুঝিতে সময় লাগে। অতএব, প্রাকৃত বাংলাকে পুঁথির পংক্তিতে তুলিয়া লইবার বিরুদ্ধে আজকের দিনে যে সব যুক্তি শোনা যাইতেছে সেগুলো আমিও একদিন আবৃত্তি করিয়াছি।

এক জায়গায় আমার মন অপেক্ষাকৃত সংস্কারমুক্ত। পদ্য রচনায় আমি প্রচলিত আইন কানুন কোনো দিন মানি নাই। জানিতাম কবিতায় ভাষা ও ছন্দের একটা বাঁধন আছে বটে, কিন্তু সে বাঁধন নূপুরের মত, তাহা বেড়ির মত নয়। এইজন্য কবিতার বাহিরের শাসনকে উপেক্ষা করিতে কোনোদিন ভয় পাই নাই।

ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রাকৃত বাংলা-ভাষা ও প্রাকৃত-বাংলার ছন্দ ব্যবহার করিয়াছিলাম। তখন সেই ভাষার শক্তি, বেগ ও সৌন্দর্য্য প্রথম স্পষ্ট করিয়া বুঝি। দেখিলাম এ ভাষা

পাড়াগাঁয়ের টাট্টু ঘোড়ার মত কেবলমাত্র গ্রাম্য-ভাবের বাহন নয়, ইহার গতিশক্তি ও বাহনশক্তি কৃত্রিম পুঁথির ভাষার চেয়ে অনেক বেশী।

বলা বাহুল্য ক্ষণিকায় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন, কোনোটার উপরেই আপন দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই। কিন্তু কোন্ দিকে তার অভ্যাসের টান এবং কোন্ দিকে অনুরাগের, সে বিচার পরে হইবে এবং পরে করিবে।

যাই হোক্ এ সম্বন্ধে আমার মনে যে তর্ক আছে সে এই—বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা-ভাষার সঙ্গে যাঁদের ভাসুর ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। তাঁরা এ ভাষার কখনো মুখদর্শন করেন নাই। এই সজীব ভাষা তাঁদের কাছে ঘোমটার ভিতরে আড়ষ্ট হইয়াছিল সেইজন্য ইহাকে তাঁরা আমল দিলেন না। তাঁরা সংস্কৃত-ব্যাকরণের হাতুড়ি পিটিয়া নিজের হাতে এমন একটা পদার্থ খাড়া করিলেন যাহার কেবল বিধিই আছে কিন্তু গতি নাই। সীতাকে নির্ব্বাসন দিয়া যজ্ঞ-কর্ত্তার ফরমাসে তাঁরা সোনার সীতা গড়িলেন।

যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়াপেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। তবে গোড়ায় তাহা কাঁচা থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে পাকা নিয়মে তাহার বাঁধন আঁট হইয়া উঠিত। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজন মত সংস্কৃত-ভাষার ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত।

কিন্তু বাংলা গদ্য-সাহিত্য ঠিক তার উল্টা পথে চলিল। গোড়ায়

দেখি তাহা সংস্কৃত-ভাষা, কেবল তাহাকে বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে তাহাতে বাংলার খাদ মিশাল করা হইয়াছে। এ এক রকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল।

যদি কেবল ইংরেজকে বাংলা শিখাইবার জন্যই বাংলা গদ্যের ব্যবহার হইত, তবে সেই মেকি-বাংলার ফাঁকি আজ পর্য্যন্ত ধরা পড়িত না.। কিন্তু এই গদ্য যতই বাঙালীর ব্যবহারে আসিয়াছে ততই তাহার রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের গতি কোন্ দিকে? প্রাকৃত বাংলার দিকে। আজ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য, সংস্কৃত-ভাষার বাধা ভেদ করিয়া, নিজের যথার্থ আকৃতি ও প্রকৃতি প্রকাশ করিবার জন্য যুঝিয়া আসিতেছে।

অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূল ধনকে বাড়াইয়া তোলা, ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা-গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া সুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার সুরু। সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিবার জন্যই তাহার চেষ্টা।

আমাদের পুঁথির ভাষার সঙ্গে কথার ভাষার মিলন ঘটিতে এত বাধা কেন, তাহার কারণ আছে। যে গদ্যে বাঙালী কথাবার্ত্তা কয় সে গদ্য বাঙালীর মনোবিকাশের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণত বাঙালী যে বিষয় ও যে ভাব লইয়া সর্ব্বদা আলোচনা করিয়াছে বাংলার চলিত গদ্য সেই মাপেরই। জলের পরিমাণ যতটা, নদীপথের গভীরতা ও বিস্তার সেই অনুসারেই হইয়া থাকে। স্বয়ং ভগীরথও আগে লম্বা চওড়া পথ কাটিয়া তাহার পরে গঙ্গাকে নামাইয়া আনেন নাই।

বাঙালী যে ইতিপূর্ব্বে কেবলি চাষবাস এবং ঘরকন্নার ভাবনা লইয়াই কাটাইয়াছে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তার চেয়ে বড় কথা যাঁরা চিন্তা করিয়াছেন তাঁরা বিশেষ সম্প্রদায়ে বদ্ধ। তাঁরা প্রধানত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল। তাঁদের শিক্ষা এবং ব্যবসা, দুইয়েরই অবলম্বন ছিল সংস্কৃত পুঁথি। এইজন্য ঠিক বাংলা-ভাষায় মনন করা বা মত প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। তাই সেকালের গদ্য উচ্চ চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিতে পারে নাই।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও আমাদের দেশে ভাষা ও চিন্তার মধ্যে এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিয়াছে। যাঁরা ইংরেজিতে শিক্ষা পাইয়াছেন তাঁদের পক্ষে ইংরেজিতেই চিন্তা করা সহজ; বিশেষত যে সকল ভাব ও বিষয় ইংরেজি হইতেই তাঁরা প্রথম লাভ করিয়াছেন সেগুলা বাংলা-ভাষায় ব্যবহার করা দুঃসাধ্য। কাজেই আমাদের ইংরেজি-শিক্ষা ও বাংলা-ভাষা সদরে অন্দরে স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিয়া আসিতেছে।

এমন সময় যাঁরা শিক্ষার সঙ্গে ভাষার মিল ঘটাইতে বসিলেন বাংলার চলিত গদ্য লইয়া কাজ চালানো তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হইল। শুধু যদি শব্দের অভাব হইত তবে ক্ষতি ছিল না কিন্তু সব চেয়ে বিপদ এই যে, নূতন শব্দ বানাইবার শক্তি প্রাকৃত বাংলার মধ্যে নাই। তার প্রধান কারণ বাংলায় তদ্ধিত প্রত্যয়ের উপকরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত সংকীর্ণ। "প্রার্থনা" সংস্কৃত শব্দ, তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ "চাওয়া"। "প্রার্থিত" ও "প্রার্থনীয়" শব্দের ভাবটা যাদ ঐ খাঁটি বাংলায় ব্যবহার করিতে যাই তবে অন্ধকার দেখিতে হয়। আজ

পর্য্যন্ত কোন দুঃসাহসিক "চায়িত" ও "চাওনীয়" বাংলায় চালাইবার প্রস্তাব মাত্র করেন নাই। মাইকেল অনেক জায়গায় সংস্কৃত বিশেষ্য পদকে বাংলার ধাতুরূপের অধীন করিয়া নূতন ক্রিয়াপদে পরিণত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলায় এ পর্য্যন্ত তাহা আপদ আকারেই রহিয়া গেছে, সম্পদরূপে গণ্য হয় নাই।

সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তাহার তদ্ধিত প্রত্যয় পর্য্যন্ত লইতে গেলে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অনেকটা অংশ আপনি আসিয়া পড়ে। সুতরাং দুই নৌকায় পা দিবামাত্রই যে টানাটানি বাধিয়া যায় তাহা ভালো করিয়া সাম্‌লাইতে গেলে সাহিত্য-সার্কাসের মল্লগিরি করিতে হয়। তার পর হইতে এ তর্কের আর কিনারা পাওয়া যায় না যে, নিজের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার স্বাধীন অধিকার কতদূর এবং তাহাতে সংস্কৃত শাসনের সীমা কোথায়। সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ-জমাবন্দীর ভার পড়ে তখন একেবারে বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে তখন তাঁরা বাংলায় সংস্কৃত ব্যাকরণ বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন।

কিন্তু মুস্কিলের বিষয় এই যে, যে-ভাষায় মল্লবিদ্যার সাহায্য ছাড়া এক পা চলিবার জো নেই সেখানে সাধারণের পক্ষে পদে পদে অগ্রসর হওয়ার চেয়ে পদে পদে পতনের সম্ভাবনাই বেশী। পথটাই যেখানে দুর্গম সেখানে হয় মানুষের চলিবার তাগিদ থাকে না, নয় চলিতে হইলে পথ অপথ দুটোকেই সুবিধা অনুসারে আশ্রয় করিতে হয়। ঘাটে মাল নামাইতে হইলে যে দেশে মাশুলের দায়ে দেউলে হওয়ার কথা সে দেশে আঘাটায় মাল নামানোর অনুকূলে নিশ্চয়ই স্বয়ং বোপদেব

চোখ টিপিয়া ইসারা করিয়া দিতেন। কিন্তু বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়; বোপদেবের চেলারা যেখানে ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া আছেন সেখানে বাংলা ভাষায় বাংলা-সাহিত্যের ব্যবসা চালানো দুঃসাধ্য হইল।

জাপানীদের ঠিক এই বিপদ। চান ভাষার শাসন জাপানী ভাষার উপর অত্যন্ত প্রবল। তার প্রধান কারণ প্রাকৃত জাপানী প্রাকৃত বাংলার মত; নূতন প্রয়োজনের ফরমাস জোগাইবার শক্তি তার নাই। সে শক্তি প্রাচীন চীন ভাষার আছে। এই চীন ভাষাকে কাঁধে লইয়া জাপানী ভাষাকে চলিতে হয়। কাউণ্ট ওকুমা আমার কাছে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছিলেন যে, এই বিষম পালোয়ানীর দায়ে জাপানী-সাহিত্যের বড়ই ক্ষতি করিতেছে। কারণ এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, যে-ভাষায় ভাবপ্রকাশ করাটাই একটা কুস্তি-গিরি সেখানে ভাবটাকেই খাটো হইয়া থাকিতে হয়। যেখানে মাটি কড়া, সেখানে ফসলের দুর্দ্দিন। যেখানে শক্তির মিতব্যয়িতা অসম্ভব শক্তির সদ্ব্যয়ও সেখানে অসম্ভব। যদি পণ্ডিত মশায়দের এই রায়ই পাকা হয় যে, সংস্কৃত ভাষায় মহামহোপাধ্যায় না হইলে বাংলা ভাষায় কলম ধরা ধৃষ্টতা, তবে যাঁদের সাহস আছে ও মাতৃভাষার উপর দরদ আছে, প্রাকৃত বাংলার জয়পতাকা কাঁধে লইয়া তাঁদের বিদ্রোহে নামিতে হইবে।

ইহার পূর্ব্বেও আলালের ঘরে দুলাল প্রভৃতির মত বই বিদ্রোহের শাঁখ বাজাইয়াছিল কিন্তু তখন সময় আসে নাই। এখনি যে আসিল এ কথা বলিবার হেতু কি? হেতু আছে। তাহা বলিবার চেষ্টা করি।

ইংরেজি হইতে আমরা যা লাভ করিয়াছি যখন আমাদের দেশে ইংরেজিতেই তার ব্যবসা চলিতেছিল তখন দেশের ভাষার সঙ্গে দেশের

শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য ঘটে নাই। রামমোহন রায় হইতে সুরু করিয়া আজ পর্য্যন্ত ক্রমাগতই নূতন ভাব ও নূতন চিন্তা আমাদের ভাষার মধ্যে আনাগোনা করিতেছে। এমন করিয়া আমাদের ভাষা চিন্তার ভাষা হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা ঘরে ঘরে মুখে মুখে যে সব শব্দ নিরাপদে ব্যবহার করি তাহা আর পঁচিশ বছর পূর্ব্বে করিলে দুর্ঘটনা ঘটিত। এখন আমাদের ভাষা বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে পূর্ব্বে সাধুভাষায় যাদের জল-চল ছিল না। সেই জন্যই পুঁথির ভাষায় ও মুখের ভাষায় সমান বহরের রেল পাতিবার যে-প্রস্তাব উঠিয়াছে, অভ্যাসের আরামে ও অহঙ্কারে ঘা লাগিলেও সেটাকে একেবারে উড়াইয়া দিতে পারি না।

আসল কথা সংস্কৃত ভাষা যে-অংশে বাংলা ভাষার সহায় সে-অংশে তাহাকে লইতে হইবে, যে-অংশে বোঝা সে-অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। বাংলাকে সংস্কৃতের পুত্র বলিয়াই যদি মানিতে হয় তবে সেই সঙ্গে একথাও মানা চাই যে তার ষোলো বছর পার হইয়াছে, এখন আর শাসন চলিবে না, এখন মিত্রতার দিন। কিন্তু যতদিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে ততদিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না। ততদিন সংস্কৃত বৈয়াকরণের বর্গির দল আমাদের লেখকদের ত্রস্ত করিয়া রাখিবেন। প্রাকৃত বাংলার ঠাটে যখন লিখিব তখন স্বভাবতই সুসঙ্গতির নিয়মে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রভাব বাংলা ভাষার বেড়া ডিঙাইয়া উৎপাত করিতে কুণ্ঠিত হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বেড়ার ভিতরকার গাছ যেখানে একটু আধটু ফাঁক পায় সেইখান দিয়াই আলোর দিকে ডালপালা মেলে, তেমনি করিয়াই বাংলার সাহিত্যভাষা সংস্কৃতের গরাদের ভিতর দিয়া, চল্‌তি ভাষার দিকে মাঝে মাঝে মুখ বাড়াইতে সুরু করিয়াছিল। তা লইয়া তাহাকে কম লোকনিন্দা সহিতে হয় নাই। এই জন্যই বঙ্কিম চন্দ্রের অভ্যুদয়ের দিনে তাঁকে কটুকথা অনেক সহিতে হইয়াছে। তাই মনে হয় আমাদের দেশে এই কটু কথার হাওয়াটাই বসন্তের দক্ষিণ হাওয়া। ইহা কুঞ্জবনকে নাড়া দিয়া তাড়া দিয়া অস্থির করিয়া দেয় কিন্তু এই শাসনটা ফুলের কীর্ত্তন পালার প্রথম খোলের চাঁটি।

পুঁথির বাংলার যে অংশটা লইয়া বিশেষ ভাবে তর্ক প্রবল, তাহা ক্রিয়ার রূপ। "হইবে"র জায়গায় "হবে", "হইতেছে"র জায়গায় "হচ্চে" ব্যবহার করিলে অনেকের মতে ভাষার শুচিতা নষ্ট হয়। চীনেরা যখন টিকি কাটে নাই তখন টিকির খর্ব্বতাকে তারা মানের খর্ব্বতা বলিয়া মনে করিত। আজ যেই তাদের সকলের টিকি কাটা পড়িল অমনি তারা হাঁফ ছাড়িয়া বলিতেছে আপদ গেছে। এক সময়ে ছাপার বহিতে "হয়েন" লেখা চলিত, এখন "হন" লিখিলে কেহ বিচলিত হন না। "হইবা" করিবা"র আকার গেল, "হইবেক" "করিবেক"-এর ক খসিল, "করহ" "চলহ"র হ কোথায়? এখন "নহে"র জায়গায় "নয়" লিখিলে বড় কেহ লক্ষ্যই করে না। এখন যেমন আমরা "কেহ" লিখি, তেমনি এক সময়ে ছাপার বইয়েও "তিনি"র বদলে "তেঁহ" লিখিত। এক সময়ে "আমারদিগের" শব্দটা শুদ্ধ বলিয়া গণ্য ছিল, এখন "আমাদের" লিখিতে কারো হাত কাঁপে না। আগে যেখানে লিখিতাম "সেহ" এখন সেখানে লিখি "সেও",

অথচ পণ্ডিতের ভয়ে "কেহ"কে "কেও" অথবা "কেউ" লিখিতে পারি না। ভবিষ্যৎবাচক "করিহ" শব্দটাকে "করিয়ো" লিখিতে সঙ্কোচ করি না, কিন্তু তার বেশী আর একটু অগ্রসর হইতে সাহস হয় না।

এই ত আমরা পণ্ডিতের ভয়ে সতর্ক হইয়া চলি কিন্তু পণ্ডিত যখন পুঁথির বাংলা বানাইয়াছিলেন আমাদের কিছুমাত্র খাতির করেন নাই। বাংলা গদ্য-পুঁথিতে যখন তাঁরা "যাইয়াছি" "যাইল" কথা চালাইয়া দিলেন তখন তাঁরা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করেন নাই যে, এই ক্রিয়াপদটি একেবারে বাংলাই নয়। যা ধাতু বাংলায় কেবলমাত্র বর্ত্তমান কালেই চলে, যথা, যাই, যাও, যায়। আর, "যাইতে" শব্দের যোগে যে সকল ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন হয় তাহাতেও চলে যেমন, "যাচ্চি" "যাচ্ছিল" ইত্যাদি। কিন্তু "যেস" "যেয়েছি" "যেয়েছিলুম" পণ্ডিতদের ঘরেও চলে না। এ স্থলে আমরা বলি "গেল" "গিয়েছি" "গিয়েছিলুম"। তার পরে পণ্ডিতেরা "এবং" বলিয়া এক অদ্ভুত অব্যয় শব্দ বাংলার স্কন্ধে চাপাইয়াছেন এখন তাহাকে ঝাড়িয়া ফেলা দায়। অথচ সংস্কৃত বাক্যরীতির সঙ্গে এই শব্দ ব্যবহারের যে মিল আছে তাও ত দেখি না। বরঞ্চ সংস্কৃত "অপর" শব্দের আত্মজ যে "আর" শব্দ, সাধারণে ব্যবহার করিয়া থাকে তাহা শুদ্ধরীতিসঙ্গত। বাংলায় "ও" বলিয়া একটা অব্যয় শব্দ আছে তাহা সংস্কৃত অপি শব্দের বাংলা রূপ। ইহা ইংরেজি "and" শব্দের প্রতিশব্দ নহে, too শব্দের প্রতিশব্দ। আমরা বলি আমিও যাব তুমিও যাবে—কিন্তু কখনও বলি না "আমি ও তুমি যাব।" সংস্কৃতের ন্যায় বাংলাতেও আমরা সংযোজক শব্দ ব্যবহার না করিয়া দ্বন্দ্বসমাস ব্যবহার করি। আমরা

বলি "বিছানা বালিশ মশারি সঙ্গে নিয়ো।" যদি ভিন্ন শ্রেণীয় পদার্থের প্রসঙ্গ করিতে হয় তবে বলি "বিছানা বালিশ মশারি আর বইয়ের বাক্সটা সঙ্গে নিয়ো।" এর মধ্যে "এবং" কিম্বা "ও" কোথাও স্থান পায় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা বাংলা-ভাষার ক্ষেত্রেও বাংলা-ভাষার আইনকে আমল দেন নাই। আমি এই যে দৃষ্টান্তগুলি দেখাইতেছি তার মৎলব এই যে, পণ্ডিত মশায় যদি সংস্কৃতরীতির উপর ভর দিয়া বাংলারীতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারেন, তবে আমরাই বা কেন বাংলা-রীতির উপর ভর দিয়া যথাস্থানে সংস্কৃতরীতিকে লঙ্ঘন করিতে সঙ্কোচ করি? "মনোসাধে" আমাদের লজ্জা কিসের? "সাবধানী" বলিয়া তখনি জিব কাটিতে যাই কেন? এবং "আশ্চর্য্য হইলাম" বলিলে পণ্ডিত মশায় "আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন" কি কারণে?

আমি যে-কথাটা বলিতেছিলাম সে এই—যখন লেখার ভাষার সঙ্গে মুখের ভাষার অসামঞ্জস্য থাকে তখন স্বভাবের নিয়ম অনুসারেই এই দুই ভাষার মধ্যে কেবলি সামঞ্জস্যের চেষ্টা চলিতে থাকে। ইংরেজি-গদ্যসাহিত্যের প্রথম আরম্ভে অনেক দিন হইতেই এই চেষ্টা চলিতে-ছিল। আজ তার কথায় লেখায় সামঞ্জস্য ঘটিয়াছে বলিয়াই উভয়ে একটা সাম্য দশায় আসিয়াছে। আমাদের ভাষায় এই অসামঞ্জস্য প্রবল সুতরাং স্বভাব আপনি উভয়ের ভেদ ঘুচাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে আয়োজন করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ আইনকর্ত্তার প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁরা বলিলেন লেখার ভাষা আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে ইহার বেশী আর তাহার নড়িবার হুকুম নাই।

সবুজ পত্র সম্পাদক বলেন বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে কথার ভাষার সঙ্গে মালা বদল করিবার জন্য। গুরুজন ইহার প্রতি-

বাদী। তিনি ঘটকালি করিয়া কৌলিন্যের নির্ম্মম শাসন ভেদ করিবেন এবং শুভ বিবাহ ঘটাইয়া দিবেন—কারণ কথা আছে শুভস্য শীঘ্রং।

যাঁরা প্রতিবাদী তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলায় চলিত ভাষা নানা জিলায় নানা ছাঁচের, তবে কি বিদ্রোহীর দল একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে! ইহার উত্তর এই যে, যে-যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়। প্রথমত খুসিরও একটা কারণ থাকা চাই। কলিকাতার উপর রাগ করিয়া বীরভূমের লোক বীরভূমের প্রাদেশিক ভাষায় আপন বই লিখিবে এমন খুসিটাই তার স্বভাবত হইবে না। কোনো একজন পাগলের তা হইতেও পারে কিন্তু পনেরো আনার তা হইবে না। দিকে দিকে বৃষ্টির বর্ষণ হয় কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। ভাষারও সেই দশা। স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা। কলিকাতার একটা স্বকীয় অপভাষা আছে যাহাতে "গেনু" "করনু" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং "ভেয়ের বে" (ভাইয়ের বিয়ে) "চেলের দাম" (চালের দাম) প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, এ সে ভাষাও নয়। যদি বল—তবে এই ভাষাকে কে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? তবে তার উত্তর এই যে, যে-সকল লেখক এই ভাষা ব্যবহার করিবেন তাঁদের যদি প্রতিভা থাকে তবে তাঁরা তাঁদের সহজ শক্তি হইতেই বাংলার এই সর্ব্বজনীন ভাষা বাহির করিবেন। দান্তে নিজের প্রতিভাবলে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন ইটালির কোন্ প্রাদেশিক ভাষা ইটালির সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের ভাষা। বাংলার কোন্ ভাষাটি সেইরূপ বাংলার বিশ্বভাষা কিছুকাল হইতে আপনিই তার প্রমাণ

চলিতেছে। বঙ্কিমের কাল হইতে এ পর্য্যন্ত বাংলার গদ্য-সাহিত্যে প্রাদেশিক ভাষার প্রাদুর্ভাব ঘটিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে কিন্তু সে কোন্ প্রাদেশিক ভাষা? তাহা ঢাকা অঞ্চলের নহে। তাহা কোনো বিশেষ পশ্চিম বাংলা প্রদেশেরও নয়। তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল প্রদেশের মথিত একটি ভাষা। সকল ভদ্র ইংরেজের এক ভাষা যেমন ইংলণ্ডের সকল প্রাদেশিক ভাষাকে ছাপাইয়া বিশ্বব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে, এও সেইরূপ। এ ভাষা এখনো তেমন সম্পূর্ণভাবে ছড়াইয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু সাহিত্যকে আশ্রয় করিলেই ইহার ব্যাপ্তির সীমা থাকিবে না। সমস্ত দেশের লোকের চিত্তের ঐক্যের পক্ষে কি ইহার কোনো প্রয়োজন নাই? শুধু কি পুঁথির ভাষার ঐক্যই একমাত্র ঐক্যবন্ধন? আর এ কথাও কি সত্য নয় যে, পুঁথির ভাষা আমাদের নিত্য ব্যবহারের ভাষা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলে তাহা কখনই পূর্ণ শক্তি লাভ করিতে পারে না? যখন বঙ্গবিভাগের বিভীষিকায় আমাদের গায়ে কাঁটা দিয়াছিল তখন আমাদের ভয়ের একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে এটা রাজনৈতিক ভূগোলের ভাগ নয়, ভাষার ভাগকে আশ্রয় করিয়া বাংলার পূর্ব্ব পশ্চিমে একটা চিত্তের ভাগ হইবে। সমস্ত বাংলা দেশের একমাত্র রাজধানী থাকাতে সেইখানে সমস্ত বাংলা দেশের একটি সাধারণ ভাষা আপনি জাগিয়া উঠিতেছিল। তাহা ফরমাসে গড়া কৃত্রিম ভাষা নহে তাহা জীবনের সংঘাতে প্রাণলাভ করিয়া সেই প্রাণের নিয়মেই বাড়িতেছে। আমাদের পাকযন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাকযন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতই দেশের পাক-যন্ত্র। এইখানে নানা ভাব, নানা বাণী এবং নানা শক্তির পরিপাক

ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়। রাগ করিয়া এবং ঈর্ষা করিয়া যদি বলি প্রত্যেক প্রদেশ আপন স্বতন্ত্র পাকযন্ত্র বহন করুক তবে আমাদের হাত পা বুক পিঠ বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বলিতে পারে আমাদের নিজের নিজের একটা করিয়া পাকযন্ত্র চাই। কিন্তু যতই রাগ করি আর তর্ক করি, সত্যের কাছে হার মানিতেই হয় এবং সেইজন্যই সংস্কৃত বাংলা আপনার খোলস ভাঙিয়া যে ছাঁদে ক্রমশ প্রাকৃত বাংলার রূপ ধরিয়া উঠিতেছে সে ছাঁদ ঢাকা বা বীরভূমের নয়। তার কারণ নানা প্রদেশের বাঙালী শিখিতে, আয় করিতে, ব্যয় করিতে, আমোদ করিতে, কাজ করিতে অনেক কাল হইতে কলিকাতায় আসিয়া জমা হইতেছে। তাহাদের সকলের সম্মিলনে যে এক ভাষা গড়িয়া উঠিল তাহা ধীরে ধীরে বাংলার সমস্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। এই উপায়ে, অন্য দেশে যেমন ঘটিয়াছে, তেমনি এখানেও একটি বিশেষ ভাষা বাংলা দেশের সমস্ত ভদ্রঘরের ভাষা হইয়া উঠিতেছে। ইহা কল্যাণের লক্ষণ। অবশ্য স্বভাবতই এই ভাষার ভূমিকা দক্ষিণ বাংলার ভাষায়। এইটুকু নম্রভাবে স্বীকার করিয়া না লওয়া সদ্বিবেচনার কাজ নহে। ঢাকাতেই যদি সমস্ত বাংলার রাজধানী হইত তবে এতদিনে নিশ্চয়ই ঢাকার লোক-ভাষার উপর আমাদের সাধারণ ভাষার পত্তন হইত এবং তা লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা যদি মুখ বাঁকা করিত তবে সে বক্রতা আপনিই সিধা হইয়া যাইত, মানভঞ্জনের জন্য অধিক সাধাসাধি করিতে হইত না।

এই যে বাংলা দেশের এক-ভাষা, আজকের দিনে যাহা অবাস্তব নহে, অথচ যাহাকে সাহিত্যে ব্যবহার করি না বলিয়া যাহার পরিচয় আমাদের কাছে সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয় নাই, যখনি শক্তিশালী সাহিত্যিকেরা এই

ভাষায় ভাব প্রকাশ করিবেন তখনি ইহা পরিব্যক্ত হইয়া উঠিবে, সেটাতে কেবল ভাষার উন্নতি নয়, দেশের কল্যাণ।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে একটা যে-তর্ক আছে সেটা একটু ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে-ভাষা ব্যবহার করিতেছি তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নাহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। আবার শক্তি যাদের অল্প অসংযম তাদেরই বেশী। অতএব আমাদের যে চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্যে নূতন করিয়া চালাইবার কথা উঠিয়াছে, তাহার আদব কায়দা এখনো দাঁড়াইয়া যায় নাই। অতএব এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। বস্তুত বর্ত্তমানে এই চল্‌তি ভাষায় লেখা, পুঁথির ভাষায় লেখার চেয়ে অনেক শক্ত। বিধাতার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য থাকিবেই এই জন্য ভদ্রতা সকলের পক্ষে স্বভাবিক নয়। তাই অন্তত প্রথাগত ভদ্রতার বিধি যদি পাকা না হয় তবে সমাজ অত্যন্ত কুশ্রী হইয়া ওঠে। সবুজপত্র-সম্পাদকের শাসনে আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য রচনা সুরু করিয়া দেয় তবে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকেই কানে হাত দিয়া দেশ ছাড়া হইতে হইবে এ কথা আমি লিখিয়া দিতে পারি। অতএব সুখের বিষয় এই যে, এখনি এই দুর্য্যোগের সম্ভাবনা নাই। নূতনকে যাহারা বহন করিয়া আনে তাহারা যেমন বিধাতার সৈনিক, নূতনের বিরুদ্ধে যাহারা অস্ত্র ধরিয়া খাড়া হইয়া উঠে তাহারাও তেমনি বিধাতারই সৈন্য। কেননা প্রথমেই বিধানের সঙ্গে লড়াই করিয়া নূতনকে আপন রাজ্য গ্রহণ করিতে হয় কিন্তু যতদিনে তার আপন বিধান পাকা না হইয়া উঠে ততদিনের অরাজকতা সামলাইবে কে?

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং তাহা সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়। অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রধানত নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়। এই জন্যই স্বভাবতই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ এবং বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

আমার কথা এই, প্রতিদিনের যে-ভাষার খাদে আমাদের জীবন স্রোত বহিতে থাকে, সাহিত্য আপন বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যত দূর পড়ে ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চিরপ্রবাহিত জীবন-ধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে একদিকে সাধারণ, আর একদিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে। সাহিত্যের বিশিষ্টতা তাহার সাধারণতাকে যখন ছাড়িয়া চলে তখন তাহার বিলাসিতা তাহার শক্তি ক্ষয় করে। সকল দেশের সাহিত্যেরই সেই বিপদ। সকল দেশেই বিশিষ্টতার বিলাসে ক্ষণে ক্ষণে সাহিত্য কৃত্রিমতার বন্ধ্যাদশায় গিয়া উত্তীর্ণ হয়। তখন তাহাকে আবার কুলরক্ষার লোভ ছাড়িয়া প্রাণরক্ষার দিকে ঝোঁক দিতে হয়। সেই প্রাণের খোরাক কোথায়? সাধারণের ভাষার মধ্যে, যেখানে বিশ্বের প্রাণ আপনাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রকাশ করিতেছে। ইংরেজি সাহিত্যিক ভাষা প্রথমে পণ্ডিতের ভাষা ল্যাটিন এবং রাজভাষা ফরাসীর একটা কৌলিন্য খিচুড়ি ছিল, তার পরে কুল ছাড়িয়া যখন সে সাধারণের ঘরে আশ্রয় লইল তখনি সে ধ্রুব হইল। কিন্তু তাহার পরেও বারে বারে সে কৃত্রিমতার দিকে

ঝুঁকিয়াছে, আবার তাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সাধারণের জাতে উঠিতে হইয়াছে। এমন কি, বর্ত্তমান ইংরেজি সাহিত্যেও সাধারণের পথে সাহিত্যের এই অভিসার দেখিতে পাই। বার্ণার্ড্ শ, ওয়েল্‌স্, বেনেট্, চেস্‌টরটন্, বেলক প্রভৃতি আধুনিক লেখকগুলি হাল্‌কা চালের ভাষায় লিখিতেছেন।

আমাদের সাহিত্য যে ভাষাবিশিষ্টতার দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে সেখান হইতে তাহাকে লোকালয়ের ভাষার মধ্যে নামাইয়া আনিবার জন্য সবুজ পত্র সম্পাদক কোমর বাঁধিয়াছেন। তাঁর মত এই যে সাহিত্য পদার্থটি আকারে সাধারণ এবং প্রকারে বিশিষ্ট—এই হইলেই সত্য হয়। এ কথা মানি। কিন্তু হিন্দুস্থানীতে একটা কথা আছে "পয়লা সামাল্‌না মুস্কিল হ্যায়।" স্বয়ং বিধাতাও মানুষ গড়িবার গোড়ায় বানর গড়িয়াছেন, এখনও তাঁর সেই আদিম সৃষ্টির অভ্যাস লোকালয়ে সদাসর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন,

বোলপুর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুন।

——:*:——
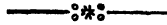
আমাদের দেশে কিছুরই হঠাৎ বদল হয় না, ঋতুরও নয়। বর্ষা কেবল কখন কখন বিনা নোটিসে একেবারে হুড়দ্দুম করে এসে গ্রীষ্মের রাজ্য জবরদখল করে নেয়। ও ঋতুর চরিত্র কিন্তু আমাদের দেশের ধাতের সঙ্গে মেলে না। প্রাচীন কবিরা বলে গেছেন, বর্ষা আসে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধার মত,—আকাশে জয়ঢাক বাজিয়ে, বিদ্যুতের নিশান উড়িয়ে, অজস্র বরুণাস্ত্র বর্ষণ করে'; এবং দেখ্‌তে না দেখ্‌তে আসমুদ্র হিমালয় সমগ্র দেশটার উপর একছত্র আধিপত্য বিস্তার করে। এক বর্ষাকে বাদ দিলে, বাকী পাঁচটা ঋতু যে ঠিক কবে আসে আর কবে যায়, তা এক জ্যোতিষী ছাড়া আর কেউ বল্‌তে পারেন না। আমাদের ছয় রাগের মধ্যে এক মেঘ ছাড়া আর পাঁচটী যেমন এক সুর থেকে আর একটিতে বেমালুম ভাবে গড়িয়ে যায়, আমাদের স্বদেশী পঞ্চঋতুও তেমনি ভূমিষ্ঠ হয় গোপনে, ক্রমবিকশিত হয় অলক্ষিতে, ক্রমবিলীন হয় পরঋতুতে।

ইউরোপ কিন্তু ক্রমবিকাশের জগৎ নয়। সে দেশের প্রকৃতি লাফিয়ে চলে, এক ঋতু থেকে আর এক ঋতুতে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বছরে চারবার নব-কলেবর ধারণ করে, নবমূর্ত্তিতে দেখা দেয়। তাদের প্রতিটির রূপ যেমন স্বতন্ত্র তেমনি স্পষ্ট। যাঁর চোখ আছে তিনিই দেখ্‌তে পান যে, বিলেতের চারটি ঋতু চতুর্বর্ণ। সে দেশে মৃত্যুর

স্পর্শে বহু যে এক হয়, আর প্রাণের স্পর্শে এক যে বহু হয়, এ সত্য প্রত্যক্ষ করা যায়। সেখানে শীতের রং তুষার-গৌর, সকল বর্ণের সমষ্টি; আর বসন্তের রং ইন্দ্রধনুর, সকল বর্ণের ব্যষ্টি। তারপর নিদাঘের রং ঘন-সবুজ, আর শরতের গাঢ় বেগনি। বিলেতি ঋতুর চেহারা শুধু আলাদা নয়, তাদের আসা যাওয়ার ভঙ্গীও বিভিন্ন।

সে দেশে বসন্ত শীতের শব-শীতল কোল থেকে রাতারাতি গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, মহাদেবের যোগভঙ্গ করবার জন্য মদন-সখা বসন্ত যে-ভাবে একদিন অকস্মাৎ হিমাচলে আবির্ভূত হয়েছিলেন। কোন এক সুপ্রভাতে, ঘুমভেঙ্গে চোখ মেলে হঠাৎ দেখা যায় যে, রাজ্যির গাছ মাথায় একরাশ ফুল পরে দাঁড়িয়ে হাসছে—অথচ তাদের পরণে একটিও পাতা নেই। সে রাজ্যে বসন্তরাজ তাঁর আগমনবার্ত্তা আকাশের নীল পত্রে সাতরঙা ফুলের হরফে এমন স্পষ্ট, এমন উজ্জ্বল করে ছাপিয়ে দেন যে, সে বিজ্ঞাপন—মানুষের কথা ছেড়ে দিন,—পশুপক্ষীরও চোখ এড়িয়ে যেতে পারে না।

ইউরোপের প্রকৃতির যেমন ক্রমবিকাশ নেই, তেমনি ক্রমবিলয়ও নেই; শরৎও সে দেশে কালক্রমে জরাজীর্ণ হয়ে, অলক্ষিতে শিশিরের কোলে দেহত্যাগ করে না। সে দেশে শরৎ তার শেষ উইল, পাণ্ডুলিপিতে নয়—রক্তাক্ষরে লিখে রেখে যায়, কেননা মৃত্যুর স্পর্শে তার পিত্ত নয়, —রক্ত প্রকুপিত হয়ে ওঠে। প্রদীপ যেমন নেভ্‌বার আগে জ্বলে ওঠে, শরতের তাম্রপত্রও তেমনি ঝরবার আগে অগ্নিবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন দেখ্‌তে মনে হয়, অস্পৃশ্য শত্রুর নির্ম্মম আলিঙ্গন হতে আত্মরক্ষা করবার জন্য, প্রকৃতিসুন্দরী যেন রাজপুত রমণীর মত স্বহস্তে চিতা রচনা করে সোল্লাসে অগ্নি-প্রবেশ করছেন।

(২)

এদেশে ঋতুর গমনাগমনটি অলক্ষিত হলেও, তার পূর্ণাবতারটি ইতি-পূর্ব্বে আমাদের নয়নগোচর হত। কিন্তু আজ যে ফাগুন মাসের পোনেরো তারিখ্, এ সুখবর পাঁজি না দেখলে জান্‌তে পেতুম না। চোখের সুমুখে যা দেখ্‌ছি, তা বসন্তের চেহারা নয়, একটা মিশ্রঋতুর,—শীত ও বর্ষার যুগলমূর্ত্তি। আর এদের পরস্পরের মধ্যে পালায় পালায় চল্‌ছে সন্ধি ও বিগ্রহ। আমাদের এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শীত ও বর্ষার দাম্পত্যবন্ধন এভাবে চিরস্থায়ী হওয়াটা আমার মতে মোটেই ইচ্ছনীয় নয়। কেননা এহেন অসবর্ণ বিবাহের ফলে শুধু সঙ্কীর্ণবর্ণ দিবানিশার জন্ম হবে।

এই ব্যাপার দেখে আমার মনে ভয় হয় যে হয়ত বসন্ত, ঋতুর খাতা থেকে নাম কাটিয়ে চিরদিনের মত এদেশ থেকে সরে পড়্‌ল। এ পৃথিবীটি অতিশয় প্রাচীন হয়ে পড়েছে ; হয়ত সেই কারণে বসন্ত এটিকে ত্যাগ করে, এই বিশ্বের এমন কোনও নবীন পৃথিবীতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, যেখানে ফুলের গন্ধে, পত্রের বর্ণে, পাখীর গানে, বায়ুর স্পর্শে আজও নরনারীর হৃদয় আনন্দে আকুল হয়ে ওঠে।

আমরা আমাদের জীবনটা এমন দৈনিক করে তুলেছি যে, ঋতুর কথা দূরে যাক্ – মাস পক্ষের বিভাগটারও আমাদের কাছে কোনও প্রভেদ নেই। আমাদের কাছে শীতের দিনও কাজের দিন, বসন্তের দিনও তাই ; এবং অমাবশ্যাও ঘুমবার রাত, পূর্ণিমাও তাই। যে জাত মনের আপিস কামাই কর্‌তে জানে না, তার কাছে বসন্তের অস্তিত্বের কোনও অর্থ নেই, কোনও সার্থকতা নেই,—বরং ও একটা অনর্থেরই মধ্যে ; কেননা ও ঋতুর ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষের মনভোলানো, তার কাজ

ভোলানো। আর আমরা সব ভুলতে, সব ছাড়্‌তে রাজি আছি—এক কাজ ছাড়া; কেননা অর্থ যদি কোথায়ও থাকে ত ঐ কাজেই আছে! বসন্তে প্রকৃতিসুন্দরী নেপথ্যবিধান করেন, সে সাজগোজ দেখবার যদি কোনও চোখ না থাকে, তাহলে কার জন্যই বা নবীন পাতার রঙীন শাড়ী পরা, কার জন্যই বা ফুলের অলঙ্কার ধারণ, আর কার জন্যই বা তরুণ আলোর অরুণ হাসি হাসা?—তার চাইতে চোখের জল ফেলা ভাল। অর্থাৎ এ অবস্থায় শীতের পাশে বর্ষাই মানায় ভাল। শুনতে পাই কোনও ইউরোপীয় দার্শনিক আবিষ্কার করেছেন যে, মানবসভ্যতার তিনটি স্তর আছে। প্রথম আসে শ্রুতির যুগ, তারপর দর্শনের, তারপর বিজ্ঞানের। এ কথা যদি সত্য হয় ত, আমরা বাঙ্গালীরা আর যেখানেই থাকি—মধ্যযুগে নেই; আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা হয় সভ্যতার প্রথম অবস্থা, নয় শেষ অবস্থা। আমাদের এ যুগ যে দর্শনের যুগ নয়, তার প্রমাণ,—আমরা চোখে কিছুই দেখি নে, কিন্তু হয় সবই জানি, নয় সবই শুনি। এ অবস্থায় প্রকৃতি যে আমাদের প্রতি অভিমান করে, তাঁর বাসন্তী-মূর্ত্তি লুকিয়ে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

(৩)

আমি এইমাত্র বলেছি যে, এ যুগে আমরা হয় সব জানি, নয় সব শুনি। কিন্তু সত্য কথা এই যে, আমরা একালে যা-কিছু জানি, সে সব শুনেই জানি,—অর্থাৎ দেখে কিম্বা ঠেকে নয়; তার কারণ, আমাদের

কোন-কিছু দেখবার আকাঙ্ক্ষা নেই—আর সব-তাতেই ঠেকবার আশঙ্কা আছে।

এই বসন্তের কথাটাও আমাদের শোনা কথা, ও একটা গুজবমাত্র। বসন্তের সাক্ষাৎ আমরা কাব্যের পাকা খাতার ভিতর পাই, গাছের কচি পাতার ভিতর নয়। আর বইয়ে যে বসন্তের বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়—তা কস্মিনকালেও এ ভূভারতে ছিল কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার বৈধ কারণ আছে।

গীতগোবিন্দে জয়দেব বসন্তের যে রূপবর্ণনা করেছেন, সে রূপ বাঙ্গলার কেউ কখনো দেখে নি। প্রথমত, মলয়সমীরণ যদি সোজা-পথে সিধে বয়, তাহলে বাঙ্গলা দেশের পায়ের নীচে দিয়ে চলে যাবে, তার গায়ে লাগ্‌বে না। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নেওয়া যায় যে, সে বাতাস উদ্ভ্রান্ত হয়ে, অর্থাৎ পথভুলে, বঙ্গভূমির গায়েই এসে ঢলে পড়ে,—তাহলেও লবঙ্গলতাকে কখনই পরিশীলিত করতে পারে না। তার কারণ লবঙ্গ গাছে ফলে, কি লতায় ঝোলে, তা আমাদের কারও জানা নেই। আর হোক না সে লতা, তার এদেশে দোদুল্যমান হবার কোনই সম্ভাবনা নেই এবং ছিল না। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা "কাবেরীতীরে কালাগুরুতরুর" উল্লেখে ঘোরতর আপত্তি করেছেন, কেননা ও বাক্যটি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন প্রকৃত নয়। কাবেরীতীরে যে কালাগুরুতরু কালেভদ্রেও জন্মাতে পারে না—এ কথা জোর করে আমরা বল্‌তে পারি নে; অপরপক্ষে অজয়ের তীরে লবঙ্গলতার আবির্ভাব এবং প্রাদুর্ভাব যে একেবারেই অসম্ভব—সে কথা বঙ্গভূমির বীরভূমির সঙ্গে যাঁর চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন। ঐ এক উদাহরণ থেকেই অনুমান, এমন কি প্রমাণ পর্য্যন্ত

করা যায় যে, জয়দেবের বসন্তবর্ণনা কাল্পনিক—অর্থাৎ সাদা ভাষায় যাকে বলে অলীক। যার প্রথম কথাই মিথ্যে, তার কোন কথায় বিশ্বাস করা যায় না;—অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, এই কবি-বর্ণিত বসন্ত আগাগোড়া মনগড়া।

জয়দেব যখন নিজের চোখে দেখে বর্ণনা করেন নি, তখন তিনি অবশ্য তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের বই থেকে বসন্তের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন; এবং কবিপরম্পরায় আমরাও তাই করে আসছি। সুতরাং এ সন্দেহ স্বতঃই মনে উদয় হয় যে, বসন্তঋতু একটা কবি-প্রসিদ্ধিমাত্র;—ও বস্তুর বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নেই। রমণীর পদতাড়নার অপেক্ষা না রেখে, অশোক যে ফুল ফোটায়, তার গায়ে যে আলতার রঙ দেখা দেয়, এবং ললনাদের মুখমদ্যসিক্ত না হলেও বকুল ফুলের মুখে যে মদের গন্ধ পাওয়া যায়,—এ কথা আমরা সকলেই জানি। এ দুটি কবিপ্রসিদ্ধির মূলে আছে, মানুষের ঔচিত্য-জ্ঞান। প্রকৃতির যথার্থ কার্য্যকারণের সন্ধান পেলেই বৈজ্ঞানিক কৃতার্থ হন—কিন্তু কবি কল্পনা করেন তাই, যা হওয়া উচিত ছিল। কবির উক্তি হচ্ছে প্রকৃতির যুক্তির প্রতিবাদ। কবি চান সুন্দর, প্রকৃতি দেন তার বদলে সত্য। একজন ইংরাজ কবি বলেছেন যে, সত্য ও সুন্দর একই বস্তু—কিন্তু সে শুধু বৈজ্ঞানিকদের মুখ বন্ধ করবার জন্য। তাঁর মনের কথা এই যে, যা সত্য তা অবশ্য সুন্দর নয়, কিন্তু যা সুন্দর তা অবশ্যই সত্য; অর্থাৎ তার সত্য হওয়া উচিত ছিল। তাই আমার মনে হয় যে, পৃথিবীতে বসন্তঋতু থাকা উচিত—এই ধারণাবশতঃ সেকালের কবিরা কল্পনা-বলে উক্ত ঋতুর সৃষ্টি করেছেন। বসন্তের সকল উপাদানই তাঁরা মন-অঙ্কে সংগ্রহ করে, প্রকৃতির গায়ে তা বসিয়ে দিয়েছেন।

(৪)

আমার এ অনুমানের স্পষ্ট প্রমাণ সংস্কৃত-কাব্যে পাওয়া যায়, কেননা পুরাকালে কবিরা সকলেই স্পষ্টবাদী ছিলেন। সেকালে তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সকল সত্যই বক্তব্য,—সে সত্য মনেরই হোক, আর দেহেরই হোক্। অবশ্য একালের রুচির সঙ্গে সেকালের রুচির কোনও মিল নেই। সেকালে সুরুচির পরিচয় ছিল, কথা ভাল করে বলায়,—একালে ওগুণের পরিচয়, চুপ করে থাকায়। নীরবতা যে কবির ধর্ম্ম, এ জ্ঞান সেকালে জন্মে নি। সুতরাং দেখা যাক্—তাঁদের কাব্য থেকে বসন্তের জন্ম-কথা উদ্ধার করা যায় কি না?

সংস্কৃত মতে বসন্ত মদন-সখা। মনসিজের দর্শনলাভের জন্য মানুষকে প্রকৃতির দ্বারস্থ হতে হয় না। কেননা, মন যার জন্মস্থান, তার সাক্ষাৎ মনেই মেলে।

ও-বস্তুর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনের দেশের অপূর্ব্ব রূপান্তর ঘটে,—তখন সে রাজ্যে ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, আকাশ বাতাস বর্ণে গন্ধে ভরপুর হয়ে ওঠে।—মানুষের স্বভাবই এই যে, সে বাইরের বস্তুকে অন্তরে, আর অন্তরের বস্তুকে বাইরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এই ভিতর-বাইরের সমন্বয় করাটাই হচ্ছে আত্মার ধর্ম্ম। সুতরাং মনসিজের প্রভাবে মানুষের মনে যে রূপরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তারই প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপে বসন্তঋতু কল্পিত হয়েছে,—আসলে ও ঋতুর কোনও অস্তিত্ব নেই। এর একটি অকাট্য প্রমাণ আছে। যে শক্তির বলে, মনোরাজ্যের এমন রূপান্তর ঘটে—সে হচ্ছে যৌবনের শক্তি। তাই আমরা বসন্তকে প্রকৃতির যৌবনকাল বলি, অথচ এ কথা আমরা কেউ ভাবি নে যে, জন্মাবামাত্র যৌবন কারও দেহ

আশ্রয় করে না; অথচ পয়লা ফাল্গুন যে বসন্তের জন্মতিথি—এ কথা আমরা সকলেই জানি। অতএব দাঁড়াল এই যে, বসন্ত প্রকৃতির রাজ্যে একটা আরোপিত ঋতু।

আমার এ সব যুক্তি যদিও সুযুক্তি না হয়—তাহলেও আমাদের মেনে নিতে হবে যে বসন্ত, মানুষের মনোকল্পিত; নচেৎ আমাদের স্বীকার করতে হয় যে, বসন্ত ও মনোজ, উভয়ে সমধর্ম্মী হলেও, উভয়েরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। বলা বাহুল্য, এ কথা মানার অর্থ, সংস্কৃতে যাকে বলে দ্বৈতবাদ, এবং ইংরাজিতে Parallelism—সেই বাতিল দর্শনকে গ্রাহ্য করা। সে ত অসম্ভব। অবশ্য অনেকে বলতে পারেন যে, বসন্তের অস্তিত্বই প্রকৃত, এবং তার প্রভাবেই মানুষের মনের যে বিকার উপস্থিত হয়, তারই নাম মনসিজ। এ ত পাকা জড়বাদ, অতএব বিনা বিচারে অগ্রাহ্য।

আমার শেষ কথা এই যে, এ পৃথিবীতে বসন্তের যখন কোনকালে অস্তিত্ব ছিল না, তখন সে অস্তিত্বের কোনকালে লোপ হতে পারে না। আমরা ও-বস্তু যদি হারাই, তবে সে আমাদের অমনোযোগের দরুণ। যে জিনিস মানুষের মনগড়া, তা মানুষের মন দিয়েই খাড়া রাখতে হয়। পূর্ব্ব কবিরা কায়মনোবাক্যে যে রূপের-ঋতু গড়ে তুলেছেন—সেটিকে হেলায় হারানো বুদ্ধির কাজ নয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিকেরা যখন বস্তুগত্যা প্রকৃতিকে মানুষের দাসী করেছেন, তখন কবিদের কর্ত্তব্য হচ্ছে কল্পনার সাহায্যে তাঁর দেবীত্ব রক্ষা করা। এবং এ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তাঁর মূর্ত্তির পূজা করতে হবে,—কেননা পূজা না পেলে দেববেদীরা যে অন্তর্ধান হন,—এ সত্য ত ভুবন-বিখ্যাত। দেবতা যে মন্ত্রাত্মক। আর এ পূজা যে অবশ্যকর্ত্তব্য তার

কারণ, বসন্ত যদি অতঃপর আমাদের অন্তরে লাঁট খেয়ে যায়—তাহলে সরস্বতীর সেবকেরা নিশ্চয়ই স্ফীত হয়ে উঠবে, তাতে করে বঙ্গ-সাহিত্যের জীবনসংশয় ঘটতে পারে। এ স্থলে সাহিত্য-সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, একালে আমরা যাকে সরস্বতী পূজা বলি আদিতে তা ছিল বসন্তোৎসব।

বীরবল।

সালতামামি।

——০*০——

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আর একটা বছর কেটে গেল; কিন্তু আমরা যেখানে ছিলুম, বোধহয় ঠিক সেইখানেই আছি। যদি কোনও দিকে কিছু বদল হয়ে থাকে ত সে এত আস্তে যে, সে পরিবর্ত্তন আমাদের চোখে পড়ে নি। জাতীয় জীবনে একটা চোখে-আঙ্গুল-দেওয়া ঘটনা না ঘটলে, লোকের মনে হয় কিছুই ঘটে নি। মুখে যিনিই যা বলুন, সকলেই জানেন যে, জীবনেরও একটা স্রোত আছে;—এবং যদি কোনও জাতির ভিতর সে স্রোত মরে এসে সমাজকে মরা গাঙ্গে পরিণত করে; তাহলে সে দৃশ্য দেখে মানুষে স্বতঃই মনক্ষুণ্ণ হয়।

বছরের পর বছর মানবসমাজকে অল্পবিস্তর বাড়্‌তেই হবে, প্রকৃতির ধর্ম্মশাস্ত্রে অবশ্য এমন কোনও বিধি নেই—বরং সত্যকথা এই যে, প্রকৃতির রাজ্যে, অর্থাৎ জড়জগতে, কোনও কিছু এগোয় না। এই ব্রহ্মাণ্ডে ছোটবড় যতরকম মৃৎপিণ্ড আছে, তাদের সবারই গতি আছে,—কিন্তু উন্নতি নেই। আমাদের এই পৃথিবীটে গত তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ যোজন ঘুরে, ঠিক যেখানে ছিল সেইখানেই ফিরে এসেছে। আকাশের গ্রহতারার এই চক্রাকারে ভ্রমণটা দাঁড়িয়ে থাকারই সামিল। আমরা কিন্তু প্রকৃতির হাতে-গড়া হলেও, তার ধাতে গড়া নই। আমাদের মন বলে যে, জীবনের গতির একটা লক্ষ্য আছে, তাই আমরা ধরে নিই যে, জীবনের গতি একটা সরল রেখা ধরে চলে—আর তার একটা অনির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থান আছে। সে স্থানটা

কারও মতে সুমুখের দিকে, কারও মতে উপরের দিকে—ও দুই এক কথা। কেননা উভয়েই এ বিষয়ে একমত যে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘুরপাক খাওয়াটা জীবনের ধর্ম্ম নয়।

প্রকৃতির চলনধরণের সঙ্গে প্রাণের হালচালের আর একটা বিশেষ প্রভেদ আছে। প্রকৃতি চলে এক চালে, এক তালে, তার ভিতর ঠাঁ দুন নেই, তাল-ফেরতা নেই। এই তিনশ পঁয়ষট্টি দিনের ভিতর পৃথিবী প্রতি-দিন ঠিক এক মাত্রায়, এক মাপে চলেছেন,—সে মাপের একচুলও এদিক ওদিক হয় নি। জীবনের চাল কিন্তু কখনো দ্রুত, কখনো বিলম্বিত হয়। শুধু তাই নয়, প্রকৃতির গতির কোনও বিরাম নেই, কোনও বিশ্রাম নেই। প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তের জন্যও জিরতে জানেন না,—আমরা জানি। তাই আমরা ফাঁক পেলেই এ ক্ষমতার অপব্যবহার করি।

এই সব কারণে নববর্ষের প্রথমঃ দিনে, মানুষের মনে নব-আশার উদয় হয়। সে আশা অবশ্য অধিকাংশ স্থলে পূর্ণ হয় না, তবুও বছরের শেষ দিনে আমরা যখন বছরের কারবারের হিসেব নিকেশ করতে বসি, তখন যদি দেখি যে আমাদের নতুন খাতায় শূন্যের জের টেনে নিয়ে যেতে হবে, তাহলে আমাদের পক্ষে মনমরা হয়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

গত এক বৎসরের ভিতর, আমাদের জাতীয় জীবনের জমার অঙ্ক যদি এক পয়সাও বেড়ে থাকে ত সে অলক্ষিতে বেড়েছে। প্রথমতঃ আমাদের সমাজ অপরিবর্ত্তনীয়, দ্বিতীয়তঃ আমাদের ব্যবসাবানিজ্যের বালাইনেই। সুতরাং আমাদের সমাজের পূর্ণতা আর আমাদের গৃহের শূন্যতা সমানই রয়ে গেছে। বাকী থাকল এক সাহিত্য, আর এক রাজনীতি। এ দুই ক্ষেত্রেও গত বৎসরে আমরা কোনও নূতন কৃতীত্বের পরিচয় দিই নি।

এদানিক আমরা লিখছি বেশী, কিন্তু বিশেষ কিছু লিখছি নে। আমাদের সাহিত্যগগনে নূতন কোনও নক্ষত্রের উদয় হয় নি, এ অন্ধকারের গায়ে যে-সব আলোর ছিটেফোঁটা এখানে ওখানে দেখা যায়—সে সব জোনাকির। বর্ত্তমান সাহিত্যরাজ্যে আমাদের যে কোনও কৃতীত্ব নেই—তা আমরা সকলেই জানি। আমরা যে তা জানি তার প্রমাণ, এ বিষয়ে আমরা শুধু অপরের কৃতীত্বের বিচার করতেই ব্যস্ত।

একজন নামী ইংরাজ লেখক বলেছেন যে, সাহিত্যরাজ্যে দুটী যুগ আছে। সে রাজ্যে নাকি সৃষ্টির যুগ আর সমালোচনার যুগ দিন রাত্তিরের মত পালায় পালায় যায় আসে। এ নিয়ম যে নৈসর্গিক, তার কোনও প্রমাণ নেই। মানুষের মনকেও যে পৃথিবীর দেহের মত প্রকৃতির নিয়মে ক্রমাগত ওলটপালট হতে হবে—এ কথা আমি মানি নে; কেননা মানুষের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি আছে, প্রকৃতির অন্তরে নেই। তবুও তর্কের খাতিরে মেনে নেওয়া যাক যে, সাহিত্যরাজ্যের একটা যুগ আছে যখন মানুষে সাহিত্য গড়ে, এবং তার পরের যুগে মানুষে সেই সাহিত্য পড়ে; কেননা সমালোচনার যুগেও একমাত্র যুগধর্ম্মের বলে, সাহিত্য না পড়ে তার চর্চ্চা করা অসম্ভব। কিন্তু বর্ত্তমানের সমালোচকদের লেখা পড়ে, তাঁরা যে কেউ কিছু পড়েন তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। যা যথার্থ সাহিত্য, তার ধর্ম্মই হচ্ছে যে তা নানা লোকের মনে নানারকমে ঘা দেবে। সুতরাং সমালোচনাটা যখন একঘেয়ে হয়ে ওঠে—তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সমালোচকদের হয় পরের লেখার সঙ্গে, নয় নিজের মনের সঙ্গে পরিচয় নেই। বর্ত্তমানের এই সমালোচনা-সাহিত্য খতিয়ে দিলে দুটি মোটা কথা পাওয়া যায়,— এক বঙ্কিমচন্দ্রের স্তুতিবাদ, আর এক রবীন্দ্রনাথের নিন্দাবাদ। কথা

মুখে মুখে বেড়ে যায়, এবং এক পুনরাবৃত্তির গুণে এই নিন্দা-প্রশংসা একটা হট্টগোলে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে কে কার উপর টেক্কা দিতে পারেন, সমালোচকদের মধ্যে এই নিয়েই যা রেষারেষী। আমাদের সাহিত্য আদালতে এখন জজ নেই—সব জুরি। এবং জুরির বিচারটা অবশ্য সরস্বতীর পক্ষে সুবিচার নয়। বঙ্গ-সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের আসন যে কত উচ্চ, তা আমরা সকলেই জানি,—কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই যে আমাদের সাহিত্যের ইভলিউসান বন্ধ হয়ে গিয়েছে—সমালোচকদের এ কথা আমরা মানিনে। বাংলার প্রথম লেখক যে তাঁর শেষ লেখক—এ ত নৈরাশ্যের উক্তি। শুনতে পাই এই নিন্দাপ্রশংসার মূলে আছে জাতীয় অহংজ্ঞান ও পরজ্ঞান, আর সেই সঙ্গে আছে হিতবুদ্ধি ভূতবুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের নিন্দার ভিতর যা আদপেই নেই—সে হচ্ছে জ্ঞান ও বুদ্ধি। আমার মনে হয়, এই নিন্দাপ্রশংসার মূলকারণ এই যে—রবীন্দ্রনাথ আজও ইহলোকে আছেন, আর বঙ্কিমচন্দ্র নেই। আমরা জীবনকে আজও শ্রদ্ধা করতে শিখি নি।

তারপর রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা পিছিয়ে পড়েছি। এ যুগে বাংলায় যেমন কোনও বড় লেখক জন্মান নি, তেমনি কোনও বড় বক্তারও আবির্ভাব হয় নি। এটা কম আপশোষের কথা নয়। এতদিন আমরা গলার জোরেই ভারতবর্ষের রাজনীতির আসর জমিয়ে রেখেছিলুম। কংগ্রেসে ও কাউনসিলে আমরাই ছিলুম মূল গায়েন,—বম্বে, মাদ্রাজ, পশ্চিম, পাঞ্জাব এতদিন শুধু আমাদেরই দোহার দিয়ে এসেছে। আমরা যে ধূয়ো ধরিয়ে দিয়েছি—দেশসুদ্ধ লোক তাই ধরেছে। আমরাই বাকী ভারতবর্ষকে উঁচুগলায় কথা কইতে শিখিয়েছি;—নবযুগের মুখ-পাত্র হওয়াটা বাঙ্গালীর পক্ষে একটা কম গৌরবের কথা নয়। চেঁচিয়ে

চিন্তা করাই হচ্ছে বর্ত্তমান সভ্যতার ধর্ম্ম। কিন্তু আজকের দিনে বাংলা দেশে সভাজাগানো বক্তা কোথায়? যে দেশে রামগোপাল ঘোষ, কেশবচন্দ্র সেন, লালমোহন ঘোষ, কালি ব্যানার্জি প্রভৃতির জন্ম—সেই দেশে আজ উচ্চবাচ্য করতে হলে,—"মরাহাতি লাখ-টাকা" বলে সেই সেকালের সুরেন্দ্রনাথকেই আবার আসরে নামাই; কেননা এ যুগের কণ্ঠস্বর এত ক্ষীণ যে, তা দেশের কাণে পৌঁছয় না। এককালে প্রবাদ ছিল যে, বম্বেওয়ালারা রাজদরবারে যেতেন হাতে নিয়ে অঙ্ক, আর বাঙ্গালীরা শঙ্খ। সেখানে শঙ্খধ্বনি শুধু বাঙ্গালীতেই করতে পারত। কিন্তু আজকের দিনে আমাদের হাতের শঙ্খ খসে পড়েছে, অথচ তার বদলে অঙ্কও আসে নি। সে দরবারে এখন মুখে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মুখরক্ষা করছেন,—শর্ম্মা শাস্ত্রী প্রভৃতি দক্ষিণী ব্রাহ্মণগণ।

এই সব দেখে শুনে মনে হয়, আমাদের জাতীয় মনটা আজকাল ঝিমিয়ে পড়েছে। আর সে মন যে ঝিমিয়েই পড়েছে, তার প্রমাণ—আমাদের মনের গায়ে কেউ হাত দিলে আমরা অমনি চমকে উঠি; তারপরে চোখ রগড়ে লাল করে, যা মুখে আসে তাই বলি,—আর সেই কথার নাম দিই জাতীয়-সাহিত্য। কিন্তু এ সব দেখে শুনেও আমি আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইনে। আমার বিশ্বাস বাঙ্গালীজাতি এ যুগে নীরবে নিজের অন্তরে নবশক্তি সঞ্চয় করছে—নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। লৌকিক সাহিত্যেই যে জাতীয়-জীবনের যথার্থ বিকাশ—এ কথা আমি মানি নে। একটা বড়গোছের পরিবর্ত্তনের মুখে, জাতীয় মন স্বভাবতঃই সঙ্কুচিত হয়, তখন তা রীতিনীতির পরিচিত শামুকের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকতে চায়। যে

অতীত আমাদের সমাজ-তরীর পাল হওয়া উচিত, সেই অতীতকে যে আমরা তার নোঙর করতে চাচ্ছি, তার কারণ—আমাদের জাতীয়-জীবনের প্রবাহ ক্রমে যে প্রসারতা লাভ করবে, কল্পনার চোখে তার দুকুল-হারানো চেহারা দেখে আমরা ভীত হয়ে পড়েছি। তাই আমরা মাঝগাঙ্গে নোঙর ফেলে নিশ্চিন্ত থাকবার বৃথা চেষ্টা করছি।

পৃথিবীর কোন জাতই এ যুগে ঘরের কোণে আলগোছ হয়ে থেকে নিজের জাত বাঁচানো দূরে থাক্, জানও বাঁচাতে পারবে না। আজকের দিনে পৃথিবীর অনেক জাতিই পরস্পর হতে বিভিন্ন হলেও, কোন দেশই অপর দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিছুদিন থেকে পৃথিবীর নানা দেশের ভিতর ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে, পরস্পরের বন্ধনটা ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ ও দৃঢ় হয়ে আসছিল, এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঈর্ষ্যার মাত্রাটাও বেড়ে চলেছিল। এই পৃথিবীজোড়া বিরাট যুদ্ধটার মূলে ছিল—এই জাতিতে জাতিতে দেহের সংস্পর্শ ও মনের অমিল। এবং মানব-সভ্যতার এই মহা সমস্যার মীমাংসাটাও এই মহাযুদ্ধেই হবে।

মানবের ভবিষ্যৎ সভ্যতার উপর এই যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিষয়ে ইউরোপে বহুলোকে বহু মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দেখা গিয়েছে যে, লোকের আশা তাদের ইচ্ছাকে অনুসরণ করেছে। যাঁর মতে সমাজের যেরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া বাঞ্ছনীয়—তিনি তাঁর কল্পনার চক্ষে ভবিষ্যতের পটে সমাজের সেই নবমূর্ত্তি দেখেছেন। মানুষের পক্ষে এই সর্ব্বনাশের অন্তরে একটা সর্ব্বসিদ্ধির রাজ্যের আবিষ্কার করাও নিতান্ত স্বাভাবিক এবং একেবারে অবৈধ নয়। এত বড় একটা ব্যাপার হয়ে

গেল, অথচ মানবসমাজ যেখানে যেমন ছিল ঠিক সেখানে তেমনি থাকবে—এ কথা মনে করাও অসম্ভব। এত নরবলিদানেও দেবতা যদি মানুষের উপর প্রসন্ন না হন্, তাহলে মানব-জাতির মরাই শ্রেয়ঃ—অথচ মানুষে বাঁচতেই চায়, মরতে চায় না।

এ যুদ্ধের ফল যে অপূর্ব্ব হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—তবে সে ফল, সুফল কি কুফল হবে, সেই নিয়েই ত যত ভাবনা। প্রথম থেকেই আমার ধারণা ছিল যে, এ যুদ্ধে মানুষের মনের কি পরিবর্ত্তন হয়, তার উপরই তার ভবিষ্যৎ সামাজিক ফলাফল নির্ভর করবে। এবং ঘরে বসে কেউ আন্দাজ্ করতে পারেন না যে, মানুষের মন কোন্ অবস্থায় কোন্ দিকে যাবে—বিশেষতঃ সে অবস্থাটা যদি একেবারে বিপর্য্যস্ত অবস্থা হয়।

জার্ম্মাণী যে মানব-সমাজে ন্যায়ের অপেক্ষা বলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই খড়্গহস্ত হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোনও কারণ নেই; কেননা গত চল্লিশ বৎসর ধরে জার্ম্মাণী এই বলের সাধনা তার নবধর্ম্ম করে তুলেছে, এবং তার গুরুপুরোহিতেও সমগ্র জাতটাকে এই শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছে। এই নবধর্ম্ম দেবদানবের ধর্ম্ম হতে পারে,—কিন্তু মানবের নয়। সুতরাং জার্ম্মাণী হারুক আর জিতুক—এই অমানব বা অতিমানব ধর্ম্ম অপর মানবের মনের উপর কতদূর প্রভুত্ব লাভ করবে—সেইটেই ছিল আসল জানবার বিষয়।

জার্ম্মাণীর উপর জয়লাভ করতে হলে, জার্ম্মাণ-মনোভাব আয়ত্ত করা ও জার্ম্মাণ-রীতিনীতি অবলম্বন করা যে আবশ্যক—এমন কথা গত দু বৎসরের মধ্যে ইউরোপের সকল দেশেই শোনা গেছে। সুতরাং কোন কোন সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত লোক যেমন মরবার আগে নিজের

রোগ অস্ত্রচিকিৎসককে দান করে যান, জার্ম্মাণীও যে মৃত্যুর মুখে তার নৈতিক রোগ সমগ্র ইউরোপকে দিয়ে যাবে, এ ভয় পাবার কারণ ছিল।

কিন্তু এখন ভরসা করে বলা যেতে পারে যে, সে বিপদের ভয় কেটে গেছে। রুসিয়ার Czardom হতে মুক্তিলাভ, এবং আমেরিকার এই যুদ্ধে যোগদানই প্রমাণ যে, মানবের স্বাধীনতা যে সভ্যতার মূলমন্ত্র, সে সভ্যতার জয় অবশ্যম্ভাবী। আজ এ আশা করা অসঙ্গত হবে না যে, মানুষে তার এ যুগের পাপের, আস্‌ছে যুগে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌বে,—এবং ভবিষ্যতে পরস্পরের প্রতি হিংসার পরিবর্ত্তে পরস্পরের প্রতি মৈত্রীই হবে বিশ্বমানবের নব-সভ্যতার অটল ভিত্তি। অতঃপর মানুষে যে শান্তির জন্য লালায়িত হবে, তার প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে মৈত্রীর ধর্ম্ম প্রচার কর্‌তে হবে—এবং ভবিষ্যৎ সাহিত্যের বলবীর্য্য এই নবধর্ম্মের প্রচারেই নিয়োজিত হবে।

এই নব-সভ্যতার অংশীদার হবার অধিকারও সকল জাতিরই থাক্‌বে, কেননা এই সভ্যতার প্রতিষ্ঠা করবার দায়িত্ব অল্পবিস্তর সকল জাতিরই ঘাড়ে পড়্‌বে। কায়মনোবাক্যে যে জাতি এই আদর্শের সাধনা না কর্‌বে, সে জাতি বিশ্বমানব-সমাজে পতিত হয়ে থাক্‌বে,—এবং সে সাধনার প্রথম পদ হচ্ছে দেশরক্ষার জন্য মানুষের আত্মোৎসর্গ। কেননা ভবিষ্যতের এই ঈপ্সিত শান্ত সভ্যতা গড়ে তোলবার জন্যে মানুষের বাহুবল ও ধর্ম্মবল দুয়েরই প্রয়োজন হবে। বলহীন ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মহীন বলের হাতে কিছুই গড়ে ওঠে না—সব ভেঙ্গে পড়ে। ভারতবর্ষে এই নবযুগের নবব্রত উদ্‌যাপন করবার জন্য সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী-যুবকই অগ্রসর হয়েছে—সুতরাং বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ

কোনও কারণ নেই। ইতিমধ্যে বিজ্ঞেরা মাথা নাড়বেন, কিন্তু সেই শিরোকম্পন দেখে ইতস্ততঃ করবে শুধু তারা, যাদের আত্মশক্তিতে আস্থা নেই। যদি কেউ বলেন এ আশা দুরাশা মাত্র, এবং এ দুরাশা শুধু কল্পনাপ্রসূত তার উত্তরে আমরা বলি যে, কল্পনা করবার এবং সংকল্প করবার শক্তিই মানুষের যথার্থ আত্মশক্তি; আশায় বুকবাঁধা ও কোমর বাঁধার নামই পুরুষকার। আমাদের সকল ভাবনার সকল সাধনার শেষ ফল দৈবাধীন। এই সত্য মেনে নিয়েও, মানুষকে যুগে যুগে মানবজীবনটাকে মনের মত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে হবে। এ দায় জীবনের দায়, এবং জীবনকে ফাঁকি দেবার চেষ্টায় মানুষে শুধু নিজেই ফাঁকি পড়ে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।